পত্রধারা

প্রথম—তৃতীয় খণ্ড

পত্রধারা

প্রথম—তৃতীয় খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ
২১০ নং কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা।

পত্রধারা

১ম—৩য় খণ্ড

প্রথম সংস্করণ ১৩৩৫ সাল।

মূল্য—৩॥০ টাকা।

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞাপনী

পত্রধারা, ১ম খণ্ড—ছিন্নপত্র।

পত্রধারা, ২য় খণ্ড—ভানুসিংহের পত্রাবলী।

পত্রধারা, ৩য় খণ্ড—পথে ও পথের প্রান্তে।

ভূমিকা

পৃথিবী আপনাকে প্রকাশ করে দু'রকমের চলন দিয়ে। একটা চলন তার নিজেকে ঘিরে ঘিরে—আর একটা চলন বড়ো যাত্রাপথে, সূর্যের চারদিকে। পৃথিবীর বর্ষচক্রমণ্ডলে দেখা দেয় তার ঋতুপর্যায়, নানা জাতের ফল ফসলের ডালি ভরে ওঠে, সর্বজনের পণ্যশালায়। আর তার দিনযাত্রায় দেখা যায় জলে স্থলে আলো ছায়ার ইশারা, আকাশে আকাশে প্রকৃতির মেজাজ বদল, সকাল সন্ধ্যার দিক্‌সীমানায় রঙের খেয়াল, ঘুম জাগরণের আনাগোনার পথে নানা কণ্ঠের কলকাকলী।

পৃথিবীর এই দুই শ্রেণীর প্রদক্ষিণের সঙ্গে তুলনা করা চলে সর্বজনের দরবারে সাধারণ সাহিত্যের আর অন্তরঙ্গ মহলে চিঠির সাহিত্যের গতিবিধির। সাধারণ সাহিত্যকে টানে বিরাট পাঠককেন্দ্র, চালায় দূর দেশ দূরকালের পথে ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে। আর চিঠির সাহিত্যে ধরা দেয় লেখকের কাছঘেঁষা জগতের দৈনিক ছায়া প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনি প্রতিধ্বনি, তার ক্ষণিক হাওয়ার মর্জি আর তার সঙ্গে প্রধানত মিলিয়ে থাকে সদ্যপ্রত্যক্ষ সংসার পথের চলতি ঘটনা নিয়ে আলাপ প্রতিলাপ। অন্তত যে চিঠিগুলি এই পত্রধারায় প্রকাশ করা হোলো তাদের সম্বন্ধে একথা অনেকখানি সত্য।

পত্রধারার "ছিন্নপত্র" পর্যায়ে যে চিঠির টুকরোগুলি ছাপানো হয়েছে তার অধিকাংশই আমার ভাইঝি ইন্দিরাকে লেখা চিঠির থেকে নেওয়া। তখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বাংলার পল্লীতে পল্লীতে, আমার পথচলা মনে সেই সকল গ্রাম-দৃশ্যের নানা নতুন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছিল; তখনি তখনি তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে। কথা কওয়ার অভ্যাস যাদের মজ্জাগত, কোথাও কৌতুক কৌতূহলের একটু ধাক্কা পেলেই তাদের মুখ খুলে যায়। যে বকুনি জেগে উঠতে চায় তাকে টেঁকসই পণ্যের প্যাকেটে সাহিত্যের বড়ো হাটে চালান করবার উদ্যোগ করলে তার স্বাদের বদল হয়। চারদিকের বিশ্বের সঙ্গে নানা কিছু নিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় আমাদের মোকাবিলা চলছেই, লাউড স্পীকারে চড়িয়ে তাকে ব্রডকাস্ট করা সয় না। ভিড়ের আড়ালে চেনালোকের মোকাবিলাতেই তার সহজরূপ রক্ষা হোতে পারে।

পত্রধারার দ্বিতীয় পর্যায়ের চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল একটি বালিকাকে। সে চিঠির বেশির ভাগ লেখা শান্তিনিকেতন থেকে। তাই সেগুলির মধ্যে দিয়ে স্বতই বয়ে চলেছে শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার চলচ্ছবি। এগুলিতে মোটা সংবাদ বেশি কিছু নেই, হাসিতামাশায় মিশিয়ে আছে সেখানকার আবহাওয়া, জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস; আর তারি সঙ্গে লেখকের সকৌতুক স্নেহ। বিশেষ কিছু বলতে হবে না মনে করে হাল্‌কা মনে আটপৌরে রীতিতে যা বলা যেতে পারে

তাকে কোনো শান-বাঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তায় প্রকাশ করবার উপায় নেই।

পত্রধারার তৃতীয় পর্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে "পথে ও পথের প্রান্তে।" তার একটু ইতিহাস আছে। সেবার যখন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম সেখানকার নানা দেশে আমার ডাক পড়েছিল। তখন অসুস্থদশায় রথীন্দ্রনাথ বন্দী ছিলেন বার্লিনে আরোগ্যশালায়। তাই আমার সাহচর্যের ভার পড়েছিল প্রশান্ত মহলানবিশের পরে, তাঁর স্ত্রী রাণী ছিলেন তাঁর সঙ্গে। সমস্ত ভার বিনা বাক্যে কখনো বা প্রবল বাক্যব্যয়ে তিনিই নিয়েছিলেন নিজের হাতে। ভ্রমণ-কালীন ব্যবস্থার কাজে পুরুষ দুজনের অঘটন-ঘটানো অপটুতা সংশোধন করে চলতে হয়েছিল তাঁকে। জিনিসপত্র বাঁধা ছাঁদা, গোছগাছ করা, বস্তুপুঞ্জ হিসাব করে রাখা, সামলিয়ে নিয়ে বেড়ানো, বিদেশী কর্তৃমহলে নিষ্পরোয়ায় অযথা বা যথোচিত দাবি দাওয়া করায় ঐ কয়েক মাসে রাণীর অসামান্যতার পরিচয় পাওয়া গেছে। নতুন নতুন রেলের কামরায়, জাহাজের ক্যাবিনে, হোটেলের প্রকোষ্ঠে, বারবার ব্যবস্থা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন লোকের সঙ্গে ব্যবহার করে চলেছি; তার নানা প্রকার অভাবনীয় সমস্যাসমাধানের ভার তাঁর হাতে দিয়ে নির্লজ্জ নিশ্চিন্ত মনে অজস্র সেবা-শুশ্রূষায় দিন কাটিয়েছিলেম। অবশেষে য়ুরোপে ভ্রমণের পালা শেষ করে যখন আমরা গ্রীসের বন্দর থেকে ঘরমুখো জাহাজে চড়ে বেরিয়ে পড়লুম তাঁরা রয়ে গেলেন বিদেশে।

তখন তাঁদের সাহচর্যে-গাঁথা পথযাত্রার ছিন্নসূত্রকে যে সব চিঠির দ্বারা জুড়তে জুড়তে চলে ছিলুম দেশের দিকে, সেই গুলি ও তারই পরবর্তী কালের চিঠিগুলি পত্রধারার তৃতীয় পর্যায়ে সংকলিত হোলো। কিছুকাল ধরে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নিরন্তর যে তর্কবিতর্ক আলোচনা চলেছিল তারই বাক্যালাপের বেগ এই চিঠিগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু য়ুরোপভ্রমণের বৃত্তান্ত যা কোথাও প্রকাশ পেল না তার দাম খুব বেশি।

যে সকল চিন্তা ও চেষ্টার অনুষঙ্গে বলবার বিশেষ বিষয় মনের মধ্যে মথিত হয় ও রচনার মধ্যে দানা বাঁধে তাদের উপলক্ষ্য জীবনান্ত কাল পর্যন্ত থাকে। কিন্তু মানসিক জীবনে যে স্রোতাবেগে চলার সঙ্গে সঙ্গে বলা আপনি মুখরিত হয়ে ওঠে একদিন তার একটা অবসন্নতা বা অবসান আছে। ভরতি মনের অবস্থায় জরুরি কথা ছাপিয়েও উদ্বৃত্ত থাকে মুখরতা। যাঁরা মজলিসি স্বভাবের লোক তাঁদের সেই উদ্বৃত্ত প্রকাশ পায় বৈঠকে, যাঁরা অন্তর্নিবিষ্ট তাঁরা স্বগত উক্তি লেখেন ডায়ারিতে, আমার মতো যাঁদের রচনায় মৌতাত তাঁরা বকুনি চালান করেন এমন কারোর কাছে যাঁদের দিকে চিঠির রাস্তা সহজ হয়ে গেছে। অবশেষে মনটা এমন অবস্থায় এসে ঠেকে যখন উদ্বৃত্তের উদ্বেলতা তটসীমার নিচে তলিয়ে যায়, জীবন নদীতে চলার ধারায় বলার কল্লোল মরে আসে। আজ কাছে এসেছে আমার সেই ধ্বনিহীনতার বয়েস, স্বেচ্ছারচিত চিঠি লেখার দিন গেছে পেরিয়ে;—

আমার যে চিঠিগুলো অনাবশ্যক একদিন ছড়িয়ে পড়ছিল সমুদ্রের ধারে রং বেরঙের ঝিনুক শামুকের মতো, বাইরের পাঠকদের মতোই আমি তাদের কৌতূহলের চোখে দূরের থেকে দেখছি। এখনকার বিরলভাষার মন তখনকার প্লাবন ধারার মনের প্রতি যে ঈর্ষা করছে তার সঙ্গে কিছু আনন্দেরও রেশ আছে। যখন ফসল ফলা শেষ হয়ে যায় তখন থেকে শস্য সংগ্রহ ক'রে গোলায় তোলবার সময় আসে, আজ সেদিনকার বাণীমুখর ঋতুর ফসল গোলায় তোলা গেল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিন্নপত্র

বন্দোরা সমুদ্রতীর,

৩০ অক্টোবর, ১৮৮৫।

ভারি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। এক সপ্তাহ ধ'রে ক্রমাগতই বৃষ্টি। এখনও বিরামের লক্ষণ নেই। আমার বারান্দার কাঁচের জানালা সমস্ত বন্ধ ক'রে চুপ মেরে ব'সে আছি। নিতান্ত মন্দ লাগছে না, আপনাতে আপনি বেশ একরকম আচ্ছন্ন হয়ে আছি—কোনো প্রকার Emotion-এর প্রাবল্য নেই—ঝড় ঝঞ্ঝা যা-কিছু সমস্তই বাহিরে। অসহায় অনাবৃত সমুদ্র ফুলে ফুলে ফেনিয়ে ফেনিয়ে সাদা হয়ে উঠছে। সমুদ্রকে দেখে আমার মনে হয় কী একটা প্রকাণ্ড অন্ধ শক্তি বাঁধা প'ড়ে আস্ফালন করছে—আমরা নিশ্চিন্ত মনে তীরে দাঁড়িয়ে আছি—সমুদ্রের বিস্ফারিত গ্রাসের মুখেই আমরা ঘর বাড়ি বেঁধে বসে আছি। আমরা যেন সিংহের কেশর ধরে টানছি অথচ অসহায় সিংহ কিছু বলতে পারছে না—একবার যদি সমস্ত সমুদ্র ছাড়া পায় তাহলে আমাদের আর চিহ্নমাত্র থাকে না। খাঁচার মধ্যে বাঘ তার লেজ আছড়াচ্ছে,

আমরা কেবল তু হাত তফাতে দাঁড়িয়ে হাসছি। একবার চেয়ে দেখুন কী বিপুল বল। তরঙ্গগুলো যেন দৈত্যের মাংসপেশীর মতো ফুলে উঠছে। পৃথিবীর সৃষ্টির আরম্ভ থেকে এই ডাঙায় জলে লড়াই চলছে--ডাঙা ধীরে ধীরে নীরবে এক এক পা ক'রে আপনার অধিকার বিস্তার করছে, আপনার সন্তানদের ক্রমেই কোল বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছে — আর পরাজিত সমুদ্র পিছু হটে হটে কেবল ফুঁসে ফুঁসে বক্ষে করাঘাত ক'রে মরছে। মনে রাখবেন এক কালে সমুদ্রের একাধিপত্য ছিল—তখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত। ভূমি তারই গর্ভ থেকে উঠে তার সিংহাসন কেড়ে নিয়েছে, উন্মাদ বৃদ্ধ সমুদ্র তার শুভ্র ফেনা নিয়ে King Lear-এর মতো ঝড়ে ঝঞ্ঝায় অনাবৃত আকাশে কেবল বিলাপ করছে।

সোলাপুর,

অক্টোবর, ১৮৮৫।

আপনি তো সব্-ডেপুটি সাহেব—বন্যার মুখে বাংলা মুল্লুকে বেড়াচ্ছেন—আমরা কলকাতায় যাচ্ছি সে খবর রাখেন কি। এই চিঠি এবং আমরা শুক্রবারের সকালের ডাকে কলকাতায় বিলি হব। আমাদের প্রবাসের পালা সাঙ্গ করলুম—এখানকার অগাধ আকাশ, অবাধ বাতাস, উদার মাঠ, বিমল শান্তি এসব পশ্চাতে রেখে সেই বাঁশতলার গলি, জোড়াসাঁকোর মোড়, সেই ছেক্ড়া গাড়ির আস্তাবল, সেই ধুলো, সেই ঘড়্ ঘড়্—হুড়্ মুড়্—হৈ হৈ, সেই মাছি-ভন্‌ভন্ ময়রার দোকান, সেই ঘোরতর হিজিবিজি হ-য-ব-র-লর মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করতে চললুম। সেখানে তিন হাজার গির্জের চুড়ো, কলের চিমনি, জাহাজের মাস্তুল নীল আকাশে যেন গুঁতো মারতে উঠেছে, কলকাতা তার সমস্ত লোষ্ট্রকাষ্ঠ দিয়ে প্রকৃতিকে গঙ্গা পার করেছে—তার উপরে আবার এক পাঁচিল-দেওয়া নিমতলার ঘাট, মানুষের মরেও সুখ নেই। এখানে আমরা ক'জনে মিলে অশোক কাননের নীড়ের মধ্যে ছিলুম, সেখানে এক প্রকার ইঁটের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করতে চললুম। সেখানকার সেই লক্ষ লক্ষ কয়েদির সঙ্গে Municipalityর দুর্গের মধ্যে বন্দী হোতে চললুম। শুনে সুখী হলেন তো?

এতদিন ভুলে ছিলেম কিন্তু আজ আবার আমার সেই পর্দাটানা ঘোমটা-দেওয়া ঘরটি মনে পড়ছে।—কিন্তু কোথায় আপনি, কোথায় আপনার সেই ছাতা, পাপোষ-শয্যায় শয়ান সেই পুরাতন জুতোযুগল। আমার সেই হৃষ্টপুষ্ট বিরহিণী তাকিয়া—সে কি আমাদের বিরহে রোগা হয়ে গেছে, আমি তাই ভাবছি। আমার বইগুলো কাঁচের অন্তঃপুর থেকে চেয়ে আছে—কিন্তু কার দিকে চেয়ে আছে। আমার শূন্যহৃদয়া চৌকি দিনরাত্রি তার দুই বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এখন তার এই নীরব আহ্বান কেউ গ্রাহ্য করে না। আমার সেই ঘড়িটা টিক্ টিক্ করছে, সে বড়ো একটা কাউকে খাতির করে না, সে কেবল সময়ের পদচিহ্নের হিসেব রাখতেই ব্যস্ত।—কিন্তু আমার সেই হার্মোনিয়ম! সে আপনার নীরব সংগীতের উপর বনাত মুড়ি দিয়ে ভাবছে, ঘড়িটা ব্রাকেটের উপর দাঁড়িয়ে মিছেমিছি তাল দিয়ে মরছে কেন। দেয়ালগুলো তাকিয়ে আছে—ভাবছে ঘরের প্রধান আসবাবটা গেল কোথায়। কলকাতার সেই জনতাসমুদ্রের মধ্যে আমার সেই বিরহান্ধকার ঘরটিই কেবল বিজন। তার সেই রুদ্ধ দ্বারের ভিতর থেকে কাতর স্বর উঠছে—"রবি বাবু —উ—উ—উ।" রবিবাবু আজ এখান থেকে সাড়া দিচ্ছেন—"এই যা—আ—আ—ই।"

কলকাতায় ফিরে গিয়ে কি আর আপনার সঙ্গে দেখা হোতে পারে না। আপনি কি এখন ইহজন্মের মতো সব-ডেপুটিপুরে প্রয়াণ করলেন। শীঘ্র আর মুক্তির ভরসা নেই?

আইনের গলগ্রহ গলায় বেঁধে আপনি কি তাহলে সর্বিস-সরোবরে একরকম ডুব মারলেন। যাক, তাহলে আপনার আশা একেবারে পরিত্যাগ ক'রে আমরা আসমানে বিহার করি আর বলাবলি করি "আহা, শ্রীশ বাবু লোকটা ছিলেন ভালো।"

---

১৭ এপ্রেল, ১৮৮৬।

সব্‌ডেপুটি সা'ব,—

৺গয়াধামে আপনি গমন করেছেন, এখন আমার কী গতি করে গেলেন। আপনার দর্শন আমার নিয়মিত বরাদ্দের মতো হয়ে গিয়েছিল এখন তার থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি মৌতাতহীন অহিফেন-সেবীর মতো ছটফট করছি। বাস্তবিক আপনি আমাকে অহিফেনই ধরিয়েছেন বটে। আপনি এসে নানা কৌশলে আমাকে গোটাকতক ছোটো ছোটো কল্পনার গুলি গেলাতেন, আমার স্বপ্ন জাগিয়ে তুলতেন, আমাকে আমারই প্রভাতসংগীত সন্ধ্যাসংগীতের মধ্যে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতেন, আমি চোখ বুজে আনন্দে আমার নিজের মধ্যে প্রবেশ ক'রে বসে থাকতুম এবং সেইখান থেকে নেশার ঝোঁকে স্বগত উক্তি প্রয়োগ করতুম, আপনি শুনে মনে মনে হাসতেন। আফিমের নেশা একেই বলে। আত্মম্ভরিতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে নিজের স্বপ্নে ভোর হওয়াকেই বলে আফিমের নেশা। আপনি সেই নেশাটাই আমাকে অভ্যেস করিয়েছেন। আপনি প্রায় আপনার নিজের কথা বলতেন না, উল্‌টে পাল্‌টে আমারই কবিতা, আমারই লেখা, আমারই কথার মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে ফেলতেন—আমাকে খুব মাতিয়ে রেখেছিলেন যাহোক। ইংরেজেরা বর্মায়, চীনে আফিম ঢুকিয়েছে, আপনি আমার সেই অয়েল্‌ক্লথ্‌ মণ্ডিত ক্ষুদ্র ঘরটির

মধ্যে গোপনে অলক্ষ্যে আফিমের ব্যবসা প্রবেশ করিয়েছেন— আপনি সহজ লোকটি নন্। কিন্তু একবার আফিম ধরিয়ে আপনি কৌটা সমেত কোথায় অন্তর্ধান হলেন। আমি মৌতাত-বিরহে এই দুরন্ত গ্রীষ্মে একলা ঘরে ব'সে দুবেলা হাই তুলছি এবং গা-মোড়া দিচ্ছি। নিদেন, আমার দ্বারের পার্শ্বে আপনার সেই পরিচিত ছাতিটা, জুতোটা রেখে গেলেও আমার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা ছিল। আপনার পত্র পাঠে অবগত হলেম আপনি শ্রীগয়াধামে আপনার প্রেতপুরীতে মনুষ্যাভাবে নিতান্ত কাতর আছেন, কিন্তু আপনার কাজ আপনার সঙ্গী, অর্থাৎ আপনি আছেন এবং আপনার চিরসঙ্গী "সব্-ডেপুটী" আপনার ছায়ার মতো সঙ্গে আছেন। সে সঙ্গীকে এখনও আপনার তেমন ভালো লাগছে না কিন্তু ক্রমে তার প্রতি প্রীতি জন্মানো কিছু অসম্ভব নয়।

আমি-ব্যক্তির হাতে এখন কোনো কাজকর্ম নেই— চাপকানের বোতামগুলো খুলে দেহ এলিয়ে এখন গায়ে বাতাস লাগাচ্ছি, সৌভাগ্যক্রমে এখন অহিফেনের ততটা দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তাকিয়ার মধ্যে স্বপ্ন পোষা রয়েছে—সেটা একটা স্বপ্নের বৃহৎ ডিমের মতো বোধ হচ্ছে, তার উপরে মাথা রাখলেই মাথার মধ্যে হুহু ক'রে নেশা প্রবেশ করে। এতদিন মাথার উপরে বালক কাগজের বোঝাটা থাকাতেই মাথা যেন রুদ্ধ হয়ে ছিল, নেশা একেবারে ছুটে গিয়েছিল—এখন সমস্ত খোলাসা—দক্ষিণে বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা যেন চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে।

এ সময়ে আমাকে যদি একটা বাগান দিতে পারতেন ;
নদীর তীর, গাছের ছায়া, মাঠের বাতাস, আমের বোল,
কোকিলের কুহু, বসন্তী রঙের চাদর, বকুল ফুলের মালা,
এবং সেই সঙ্গে আপনাকেও চাচ্ছি। কলকাতা শহর,
পোলিটিকেল্ এজিটেশন্, বসন্তকালে এ তো সহ্য হয় না ;
কোথায় আপনার বাগান শ্রীশ বাবু, কোথায় আপনি।
সংস্কৃত কবি বলেছেন—

সঙ্গম-বিরহ-বিকল্পে
বরমপি বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ
সঙ্গে সৈব তথৈকা
ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।

ভাবার্থ ঃ—"সংগম এবং বিরহের মধ্যে বরং বিরহ ভালো তবু
সংগম কিছু না—কারণ মিলনের অবস্থায় সে একা আমার
কাছে থাকে মাত্র, আর বিরহাবস্থায় ত্রিভুবন তা'তেই পূরে
যায়।" কিন্তু ভট্চার্য মশায়ের সঙ্গে আমার মতের মিল
হোলো না—আপনার বিরহে আমার এই রকম মনে হচ্ছে
যে, ত্রিভুবনময় শ্রীশ বাবুর ঝাঁক থাকার চেয়ে হাতের কাছে
একটা শ্রীশ বাবু থাকা ভালো। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ
আছে "ঝোপের মধ্যে গণ্ডাখানেক পাখি থাকার চেয়ে মুঠোর
মধ্যে একটা পাখি থাকা ঢের ভালো।" এ সম্বন্ধে আমি
এই ইংরেজের মতো Practical view নিয়ে থাকি।
আপনি কী বলেন আমি জানতে ইচ্ছে করি।

---

৩০ এপ্রেল, ১৮৮৬।

ইতিমধ্যে একদিন গো—বাবুদের ওখানে যাওয়া গিয়েছিল। সেখানে আমি আপনার "বাঙ্গালার বসন্তোৎসবের" কথা পাড়লুম, আশ্চর্য হলুম, তাঁরাও সকলে একবাক্যে আপনার এই লেখার প্রশংসা করলেন। আশ্চর্য হবার কারণ এই যে, ভালো লাগা এক, এবং ভালো বলা এক। ভালো জিনিস সহজেই ভালো লাগে, তর্কবিতর্ক যুক্তি বিচার ক'রে ভালো লাগে না—কিন্তু সমালোচনা করবার সময়ে মনের মধ্যে এমনি তর্কবিচারের প্রাচুর্ভাব হয়, যে, খপ্ ক'রে একটা জিনিসকে ভালো বলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে ওঠে। তখন মনে হয়, যে লেখাটা পড়লুম সেটা লিখেছে কে, তাতে আছে কী, তাতে নূতন কথা বলা হয়েছে কী, এই রকম লেখাকে সমালোচকেরা কী ব'লে থাকে, এ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং তার পরে দেখতে দেখতে দলে দলে "যদি" "কিন্তু" "কী জানি" "হয় তো" প্রভৃতি সহস্র রক্তশোষকের আমদানি হয়। তাঁরা চতুর্দিকে তিন ক্রোশের মধ্যে রসকস কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না। "ভালো লাগা" জিনিসটি এমনি কোমল সুকুমার যে, ভালো লেগেছে কি না এই সহজ সত্যটুকু ঘটা ক'রে প্রমাণ করতে বসলে সে ব্যক্তি যায়-যায় হয়ে ওঠে। সমালোচকেরা আপনার বিরুদ্ধে আপনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে থাকে, ভালো লাগলেও তারা

যুক্তির দ্বারা প্রমাণ ক'রে দেয় যে ভালো লাগেনি। এই গেল সমালোচনতত্ত্ব। যাহোক, আপনার বহিটা শেষ হয়ে গেলে সাধারণ পাঠকদের কী রকম লাগে জানতে ইচ্ছে রইল। হয়তো বা ভালো লাগতেও পারে। ভালো লাগবার একটা কারণ এই দেখছি, আপনি আপনার কেতাবের মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত বাংলাদেশের একটি সজীব মূর্তি জাগ্রত ক'রে তুলেছেন, বাংলার আর কোনো লেখক এতে কৃতকার্য হয় নি। এখানকার অধিকাংশ বাংলা বই প'ড়ে আমার এই মনে হয় যে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সময় বাংলাদেশই ছিল কি না ভবিষ্যতে এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন কোনো মার্কিণ দেশীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলেন, পাণিনি যে ভাষার ব্যাকরণ, সে ভাষাই কোনোকালে ছিল না—তিনি দেখেছেন পাণিনিতে এমন অনেক ধাতু প্রভৃতি পাওয়া যায় সমস্ত সংস্কৃত ভাষায় যা খুঁজলে মেলে না। এইরূপ নানা কারণে তিনি ঠিক ক'রে রেখেছেন যে পাণিনি ব্যাকরণটি এমন একটি ঘোড়ার ডিম যা কোনো ঘোড়ায় পাড়েনি। অনেক ভাষা আছে যার ব্যাকরণ এখনও তৈরি হয় নি কিন্তু কে জান্ত এমন ব্যাকরণ আছে যার ভাষা তৈরি হয় নি। এই ঘটনায় আমার মনে হয়েছে ভবিষ্যতে এমন একজন তত্ত্বজ্ঞের প্রাতুর্ভাব হোতে পারে, যিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ ক'রে দিতে পারবেন, যে, বাংলা সাহিত্য যে-দেশের সাহিত্য সে-দেশ মূলেই ছিল না—তখন বঙ্কিম বাবুর এত সাধের "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং," পুরাতত্ত্বের গবেষণায়

তোড়ে কোথায় ভেসে যাবে। পণ্ডিতেরা বলবেন, বঙ্গ-সাহিত্য একটা কলেজের সাহিত্য, এটা দশের সাহিত্য নয় কিন্তু সে কলেজটা ছিল কোথায় এ বিষয়ে কিছুই মীমাংসা হবে না। আপনার সেই লেখাটির মধ্যে বাংলাদেশের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের পূর্ব-বিভাগের জিওগ্রাফির প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। আপনার সেই লেখার মধ্যে অধিকাংশ স্থলে বাংলার ছেলেমেয়েরা কালেজি কথা কয় না ও কালেজি কাজ করে না, তারা প্রতিদিন গৃহের মধ্যে যে রকম কথা কয় ও যে রকম কাজ করে তাই দেখতে পাওয়া যায়। অন্য কারো অথবা ক্ষুদ্র আমার লেখায় সেইটি হবার জো নেই। কিন্তু আপনাকে আর অহংকৃত করা হবে না, অতএব এখানেই সমালোচনায় ক্ষান্ত হলুম।

১৮৮৮।

আপনার চিঠি এইমাত্র পেলুম, বেলা দশটা বেজে গেছে। বাহিরে অসহ্য উত্তাপ আমাদের ঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ—অন্ধকার—মাথার উপরে পাখা আনা-গোনা করছে; আর্দ্র খস্‌খস্ ভেদ ক'রে প্রচণ্ড পশ্চিম পবন শীতল ভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে। ঘরের মধ্যে এক রকম আছি ভালো। সেই পুরাতন ডেস্কের উপর ঝুঁকে প'ড়ে চিঠি লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি। আপনার ফুলজানি আমি পূর্বেই ভারতীতে পড়েছি এবং পড়েই আপনাকে একটা চিঠি লিখব মনে করেছিলুম। তার পরে ভাবলুম আপনি একেই তো চিঠির উত্তর বহু বিলম্বে দেন তার পর যদি বিনা উত্তরেই চিঠি লিখি তবে আপনাকে অত্যন্ত আশকারা দেওয়া হয়। এ রকম ব্যবহার পেলে বন্ধুদের স্বভাব খারাপ হয়ে যায়। তাই নিবৃত্ত হলুম। আপনার লেখা আমার ভারি ভালো লাগে। ওর মধ্যে কোনো রকম নভেলি মিথ্যা ছায়া নেই। আর এমন একটি ছবি মনে এনে দেয় যা আমাদের দেশের কোনো লেখকের লেখাতে দেয় না। আপনি কোনো রকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না—সরল মানবহৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে—এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন। শীতল ছায়া, আম

কাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়. কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা এরি মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে, তরল কলধ্বনি তুলে, বিরহ মিলন হাসি কান্না নিয়ে যে মানব-জীবনস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন। প্রকৃতির শান্তির মধ্যে, স্নিগ্ধচ্ছায়া শ্যামল নীড়ের মধ্যে যে সব ছোটো ছোটো হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাস করছে দয়েল কোকিল বউকথাকওয়ের গানের সঙ্গে মানব-হৃদয়ের যে সকল আকাঙ্ক্ষাধ্বনি মিশ্রিত হয়ে অবিশ্রাম আকাশের দিকে উঠছে আপনার লেখার মধ্যে সেই ছবি এবং সেই গান মেশাবেন। কোনো রকম জটিলতা বা চরিত্রবিশ্লেষণ বা দুর্দান্ত অসাধারণ হৃদয়াবেগ এনে স্বচ্ছ মধুর শান্তিময় ঘটনাস্রোতকে ঘোলা করে তুলবেন না। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি অধিক ফলাও কাণ্ড না করেন তাহলে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসলেখকের সঙ্গে সমান আসন পেতে পারবেন। বাংলার অন্তর্দেশবাসী নিতান্ত বাঙালিদের সুখ দুঃখের কথা এ পর্যন্ত কেহই বলেন নি— আপনার উপর সেই ভার রইল। বঙ্কিম বাবু উনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালির কথা যেখানে বলেছেন সেখানে কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালির কথা বলতে গিয়েছেন সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে; চন্দ্রশেখর প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড়ো বড়ো মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোকই হোতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতি এবং

দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালি আঁকতে পারেন নি। আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল বাস্তুভিটাবলম্বী প্রচণ্ডকর্মশীল-পৃথিবীর এক নিভৃতপ্রান্তবাসী শান্ত বাঙালির কাহিনী কেউ ভালো করে বলে নি।

১৮৮৭।

মাভৈঃ মাভৈঃ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আসবে কিন্তু "সপ্তাহ" * আর বের হবে না। অতএব বন্ধুবান্ধবেরা সকলে নিশ্চিন্ত হউন। ভেবে দেখুন কী করতে বসেছিলুম। সপ্তাহ বের করবার ছল করে জীবন থেকে সপ্তাহগুলো একেবারে লোপ করতে বসেছিলুম। এখন যেমন আমি সপ্তাহে সাতটা দিন করে পাই তখন সপ্তাহে সাতটা দিন বাদ পড়ত। মাসের পর মাস আসত—কিন্তু সপ্তাহ নেই; দিনগুলো আমাকে লাঠি হাতে তাড়া করে বেড়াত। আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব ভেবে পেতুম না। হরিশ্চন্দ্র যেমন বিশ্বামিত্রকে সমস্ত পৃথিবী দান করে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন অবশেষে স্বর্গটা পর্যন্ত অদৃষ্টে জুটল না—আমিও তেমনি আমার সমস্ত সময় পরের হাতে দিয়ে অবশেষে স্বর্গ পর্যন্ত খোয়াতুম—কারণ খবরের কাগজ লিখে এ পর্যন্ত কেউ অমরলোক প্রাপ্ত হয়নি। এই বসন্তকাল এসেছে—দক্ষিণের হাওয়া বয়েছে—এ সময়টা একটু আধটু গানবাজনার সময়—এ সময়টা যদি কেবলি রুশ, চীন, পাঠানের অরাজকত্ব, মগের মুল্লুক, আবকারি ডিপার্টমেণ্ট, লুনের মাশুল, তারের খবর এবং পৃথিবীর যত সয়তানের উপর নজর রাখতে হয়

* সপ্তাহ নামক সাপ্তাহিক পত্র বাহির করার আয়োজন উপলক্ষ্যে লিখিত।

তাহলে তো আর বাঁচিনে। পৃথিবীর গুপ্তচর হয়ে বেঁচে কোনো সুখ নেই। জীবনে তো বসন্তকাল বেশি আসে না। যতদিন যৌবন ততদিন গোটাকতক বসন্ত হাতে পাওয়া যায় —সে কটা না খুইয়ে মনে করছি বুড়ো বয়সে একটা খবরের কাগজ খুলব—তখন হয়তো প্রাণ খোলা নেই, গান বন্ধ, সেই সময়টা ভাঙাগলায় পলিটিক্স প্রচার করা যাবে। এখনো অনেক কথা বলা বাকি আছে সেগুলো হয়ে যাক আগে। কী বলেন।—আপনার চিঠিতে রানী শরৎসুন্দরীর বিবরণ পড়ে আমার বড়ো ভালো লাগল। আপনি তাঁর স্নেহ ভোগ করেছেন এ আপনার নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা। তাঁর জীবনসম্বন্ধে কিছু লিখলে ভালো হয়। আমাদের মহদ্দৃষ্টান্ত নানা কারণে আমাদের নজরে পড়ে না সেগুলো যাতে আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে সে চেষ্টা করা উচিত।

অক্টোবর, ১৮৮৭।

আমি প্রায় একমাস কাল দার্জিলিঙে কাটিয়ে এলুম। আপনার পত্র কলকাতায় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমি ফিরে এসে পেলুম। আপনাকে অনেক দিন থেকে লিখি-লিখি করছি, কিন্তু দৈব বিপাকে হয়ে ওঠে নি। এবার আমার ততটা দোষ ছিল না। আমার কোমরে বাত হয়ে কিছুকাল শয্যাগত হয়ে পড়েছিলুম এখনো ভালো করে সারিনি। তবে এখন বিছানা থেকে উঠে বসেছি। কিন্তু বেশিক্ষণ চৌকিতে বসে থাকতে পারিনে। আমার কোমর ছাড়া পৃথিবীতে আর আর সমস্ত মঙ্গল। আমার স্ত্রী কন্যা দার্জিলিঙে, আমি কলকাতায় ঘরে ব'সে বিরহ ভোগ করছি—কিন্তু বিরহের চেয়ে কোমরের বাতটা বেশি গুরুতর বোধ হচ্ছে। কবিরা যাই বলুন আমি এবার টের পেয়েছি বাতের কাছে বিরহ লাগে না। কোমরে বাত হোলে চন্দনপঙ্ক লেপন করলে দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে চন্দ্রমা-শালিনী পূর্ণিমা-যামিনী সান্ত্বনার কারণ না হয়ে যন্ত্রণার কারণ হয়—আর স্নিগ্ধ সমীরণকে বিভীষিকা ব'লে জ্ঞান হয়—অথচ কালিদাস থেকে রাজকৃষ্ণ রায় পর্যন্ত কেহই বাতের উপর একছত্র কবিতা লেখেন নি, বোধ হয় কারু বাত হয়নি। আমি লিখব।—এই প্রসঙ্গে আমি আপনাকে একটা তত্ত্বের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করি—বিরহের কষ্টই বা কেন কবিতার বিষয় আর বাতের

কষ্টই বা কেন কবিতার বিষয় নয়। কোমরটাকে যত সামান্য বোধ হোত এখন তো তত সামান্য বোধ হয় না। হৃদয় ভেঙে গেলেও মানুষ মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে—কিন্তু কোমর ভেঙে গেলেই মানুষ একেবারে কাৎ—তার আর উত্থানশক্তি থাকে না। তখন প্রেমের আহ্বান, স্বদেশের আহ্বান, সমস্ত পৃথিবীর আহ্বান এলেও সে কোমরে টার্পিন তেল মালিশ করবে। যতদিন মানুষের কোমর না ভাঙে ততদিন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি মানুষ ঠিক অনুভব করতে পারে না—আপনি কেতাবে পড়েছেন কিন্তু তবুও জানেন না যে জননী বসুন্ধরা ক্রমাগতই আমাদের মধ্যদেশ ধ'রে আকর্ষণ করছেন—বাত হোলেই তবে তাঁর সেই মাতৃস্নেহের প্রবল টান সবিশেষ অনুভব করা যায়। যা হোক শ্রীশ বাবু বন্ধুর দুর্দশা অবধান ক'রে কোমরকে আর কখনো হেয়জ্ঞান করবেন না—কপাল ভাঙা সে তো রূপক মাত্র—কিন্তু কোমর ভাঙা অত্যন্ত সত্য—তাতে কল্পনার লেশমাত্র নেই। সেই সত্য বর্তমান কালে অত্যন্ত অনুভব করছি ব'লে আপনাকে আর চিঠি লিখতে পারছিনে। বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আপনি প্রশ্ন করেছেন সে বিষয় পরে উত্থাপন করা যাবে আপাতত এই ব'লে রাখছি বাল্যবিবাহ যে ইচ্ছে করুক—কিন্তু কোমরে বাত যেন কারো না হয়।

---

২৭ জুলাই, ১৮৮৭।

বহুদিন চিঠিপত্র লিখিনি, কারণ চিঠি লেখা কম কাণ্ড নয়। দিনের পর দিন চ'লে যাচ্ছে—কেবল বয়স বাড়ছে। দু বৎসর আগে পঁচিশ ছিলুম এইবার সাতাশে পড়েছি—এই ঘটনাটাই কেবল মাঝে মাঝে মনে পড়ছে—আর কোনো ঘটনা তো দেখছিনে। কিন্তু সাতাশ হওয়াই কি কম কথা। কুড়ির কোঠার মধ্যাহ্ন পেরিয়ে ত্রিশের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া।—ত্রিশ-অর্থাৎ-ঝুনো-অবস্থা। অর্থাৎ যে অবস্থায় লোকে সহজেই রসের অপেক্ষা শস্যের প্রত্যাশা করে—কিন্তু শস্যের সম্ভাবনা কই। এখনও মাথা নাড়া দিলে মাথার মধ্যে রস থল্ থল্ করে—কই তত্ত্বজ্ঞান কই। লোকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছে—"তোমার কাছে যা আশা করছি তা কই। এতদিন আশায় আশায় ছিলুম তাই কচি অবস্থার শ্যাম শোভা দেখেও সন্তোষ জন্মাত—কিন্তু তাই ব'লে চিরদিন কচি থাকলে তো চলবে না। এবারে তোমার কাছে কতখানি লাভ করতে পারব তাই জানতে চাই—চোখে-ঠুলি-বাঁধা নিরপেক্ষ সমালোচকের ঘানি-সংযোগে তোমার কাছ থেকে কতটুকু তেল আদায় হোতে পারে এবার তার একটা হিসাব চাই।"—আর তো ফাঁকি দিয়ে চলে না। এতদিন বয়স অল্প ছিল, ভবিষ্যতে সাবালক অবস্থার ভরসায় লোকে ধারে খ্যাতি দিত। এখন ত্রিশ বৎসর হোতে চলল

আর তো তাদের বসিয়ে রাখলে চলে না। কিন্তু পাকা-কথা কিছুতেই বেরোয় না শ্রীশবাবু। যাতে পাঁচ জনের কিছু লভ্য হয় এমন বন্দোবস্ত করতে পারছিনে। দুটো গান বা গুজোব, হাসি বা তামাশা এর চেয়ে বেশি আর কিছু হয়ে উঠল না। যারা প্রত্যাশা করেছিল তারা মাঝের থেকে আমারই উপর চটবে। কিন্তু কে তাদের মাথার দিব্যি দিয়ে প্রত্যাশা করতে বলেছিল। হঠাৎ একদিন বৈশাখের প্রভাতের নববর্ষের নূতন পত্র পুষ্প আলোক ও সমীরণের মধ্যে জেগে উঠে যখন শুনলুম আমার বয়স সাতাশ তখন আমার মনে এই সকল কথার উদয় হোলো। আসল কথা—যতদিন আপনি কোনো লোককে বা বস্তুকে সম্পূর্ণ না জানেন ততদিন কল্পনা ও কৌতূহল মিশিয়ে তার প্রতি একপ্রকার বিশেষ আসক্তি থাকে। পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত কোনো লোককে সম্পূর্ণ জানা যায় না—তার যে কী হবে কী হোতে পারে কিছুই বলা যায় না, তার যতটুকু সম্ভূত তার চেয়ে সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু সাতাশ বৎসরে মানুষকে একরকম ঠাহর করা যায়—বোঝা যায় তার যা হবার তা একরকম হয়েছে—এখন থেকে প্রায় এই রকমই বরাবরই চলবে—এ লোকের জীবনে হঠাৎ আশ্চর্য হবার আর কোনো কারণ রইল না। এই সময়ে তার চারিদিক থেকে কতকগুলো লোক ঝরে যায়, কতক-গুলো লোক স্থায়ী হয়—এই সময়ে যারা রইল তারাই রইল। কিন্তু আর নূতন প্রেমের আশাও রইল না, নূতন বিরহের আশঙ্কাও গেল। অতএব এ এক রকম মন্দ নয়।

জীবনের আরামজনক স্থায়িত্ব লাভ করা গেল। আপনাকেও বোঝা গেল এবং অন্যদেরও বোঝা গেল। ভাবনা গেল।

আজকাল আমাদের এখানে বর্ষা পড়েছে। ঘন মেঘ ও অবিরাম বৃষ্টি। এই সময়ই তো বন্ধুসংগমের সময়। এই সময়টা ইচ্ছে করছে, তাকিয়া আশ্রয় ক'রে প'ড়ে প'ড়ে যা-তা বকাবকি করি। বাইরে কেবল ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি—ঝন ঝন বজ্র—হু হু বাতাস এবং রাজপথে সেকড়া গাড়ির জীর্ণ চক্রের কদাচিৎ খড়খড় শব্দ। ইংরেজরাজের উপদ্রবে তাও ভালো করে হবার জো নেই—ইংরেজ রাজত্বে বজ্র বৃষ্টি বাতাস এবং সেকড়া গাড়ির অভাব নেই—কিন্তু এই রাক্ষসী তার দেশ-বিদেশ-ব্যাপী আফিস আদালত প্রভৃতি বদন-ব্যাদন পূর্বক তাকিয়ার কোমল কোল শূন্য ক'রে আমাদের গোটা গোটা বন্ধুবান্ধবদের গ্রাস ক'রে ফেলছে; এই ভরা বাদরে আমাদের মন্দির হাহাকার করছে। আষাঢ়ে গল্প নামক আমাদের একটি নিতান্ত দেশজ পদার্থ অন্যান্য সহস্র দেশজ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাবার উপক্রম করছে। আমাদের সেই বহু পুরাতন আষাঢ় সহস্র দালান চণ্ডীমণ্ডপের চক্ষের সম্মুখে অবিশ্রাম কেঁদে মরছে কিন্তু তার আষাঢ়ে গল্প নেই। আমাদের সেই শত শত গান গল্প সাহিত্য-চর্চার স্মৃতিতে ও তুলোতে পরিপূর্ণ তাকিয়াই বা কোথায়, আমিই বা কোথায়, এবং আপনিই বা কোথায়। যদুপতিই বা কোথায়, মথুরা-পুরীই বা কোথায়। অতএব হে বন্ধুবর—

ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমন স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্য বধারয়।

এই আমার চিঠির Moral, তত্ত্ব, উদ্দেশ্য--অতএব কেবল এইটুকু গ্রহণ ক'রে বাকিটুকু বাদ দেবেন কিন্তু চটপট উত্তর দিতে ভুলবেন না।

আপনার বিশেষরূপে মনে থাকবে ব'লে এই চিঠির কিয়দংশ পদ্যে অনুবাদ ক'রে পাঠাই। অবধান করা হউক—বন্ধুহে

পরিপূর্ণ বরষায়
আছি তব ভরসায়,
কাজ কর্ম করো সায়,—
এসো চট্‌পট্‌।
শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য
তুমি করো ডেপুটিত্ব,
একা প'ড়ে মোর চিত্ত
করে ছট্‌ফট্‌।
যখন যা সাজে ভাই
তখন করিবে তাই ;
কালাকাল মানা নাই
কলির বিচার,
শ্রাবণে ডেপুটি-পনা
এ তো কভু নয় সনা-

তন প্রথা এ যে অনা-
স্বষ্টি অনাচার।
রাজছত্র ফেলো শ্যাম,
এসো এই ব্রজধাম,
কলিকাতা যার নাম
কিংবা ক্যালকাটা।
ঘুরেছিলে এইখেনে
কত রোডে কত লেনে,
এইখেনে ফেলো এনে
জুতোসুদ্ধ পা-টা।
ছুটি লয়ে কোনোমতে
পোটমাণ্টো তুলি' রথে,
সেজেগুজে রেলপথে
করো অভিসার।
লয়ে দাড়ি লয়ে হাসি,
অবতীর্ণ হও আসি',
রুধিয়া জানালা শাসি
বসি একবার।—
বজ্ররবে সচকিত
কাঁপিবে গৃহের ভিৎ,
পথে শুনি কদাচিৎ
চক্র খড়্‌খড়্‌।—

হারেরে ইংরেজ-রাজ
এ সাধে হানিলি বাজ
শুধু কাজ শুধু কাজ
শুধু ধড়ফড়।
আম্‌লা শাম্‌লা স্রোতে
ভাসাইলি এ ভারতে,
যেন নেই ত্রিজগতে
হাসি গল্প গান।
নেই বাঁশি, নেই বঁধু,
নেইরে যৌবন-মধু,
মুছেছে পথিক-বঁধূ
সজল নয়ান।
যেনরে শরম টুটে
কদম্ব আর না ফুটে,
কেতকী শিহরি' উঠে'
করে না আকুল ;
কেবল জগৎটাকে
জড়ায়ে সহস্রপাকে
গবর্মেণ্টো প'ড়ে থাকে
বিরাট বিপুল।
বিষম রাক্ষস ওটা,
মেলিয়া আফিস-কোটা,

গ্রাস করে গোটাগোটা
বন্ধুবান্ধবেরে—
বৃহৎ বিদেশে দেশে
কে কোথা তলায় শেষে
কোথাকার সর্বনেশে
সার্বিসের ফেরে।
এদিকে বাদর ভরা
নবীন শ্যামল ধরা,
নিশিদিন ঝর্‌ঝরা
সঘন গগন।
এদিকে ঘরের কোণে
বিরহিনী বাতায়নে,
গহন তমাল বনে
নয়ন মগন।
হেঁট মুণ্ড করি' হেঁট
মিছে করো অ্যাজিটেট্
খালি রেখে খালি পেট
লিখিছ কাগজ,—
এ দিকে গোরায় মিলে
কালা-বন্ধু লুটে নিলে,
তার বেলা কী করিলে,
নাই কোনো খোঁজ।

দেখিছ না আঁখি খুলে',
ম্যাঞ্চেস্টর্‌ লিভারপুলে
দিশী শিল্প জলে গুলে'
করিল finish।
"আষাঢ়ে গল্প" সে কই।
সেও বুঝি গেল ওই,
আমাদের নিতান্তই
দেশের জিনিস।
আষাঢ় কাহার আশে,
বর্ষে বর্ষে ফিরে আসে,
নয়নের নীরে ভাসে
দিবসরজনী।
আছে ভাব নাই ভাষা,
নাই শস্য আছে চাষা,
আছে নস্য নাই নাসা,
এও যে তেমনি।
তুমি আছ কোথা গিয়া,
আমি আছি শূন্য হিয়া,
কোথায় বা সে তাকিয়া
শোকতাপহরা।
সে তাকিয়া, গল্প-গীতি—
সাহিত্যচর্চার স্মৃতি,

কত হাসি কত প্রীতি
কত তুলো ভরা।
কোথায় সে যদুপতি,
কোথা মথুরার পতি,
অথ চিন্তা করি' ইতি
কুরু মনস্থির—
মায়াময় এ জগৎ
নহে সৎ, নহে সৎ,
যেন পদ্মপত্রবৎ
তদুপরি নীর।
অতএব ত্বরা ক'রে
উত্তর লিখিবা মোরে,
সর্বদা নিকটে ঘোরে
কাল সে করাল ;
(সুধী তুমি ত্যজি' নীর
গ্রহণ করিয়ো ক্ষীর)
এই তত্ত্ব এই চিঠির
জানিয়ো Moral।

দার্জিলিং,
১৮৮৭

এইতো দার্জিলিং এসে পড়লুম। পথে বে—খুব ভালো রকম behave করেছে। বড়ো একটা কাঁদেনি। খুব চেঁচা-মেচি গোলমাল করেছে—উলু দিয়েছে—হাতও ঘুরিয়েছে এবং পাখিকে ডেকেছে যদিও পাখি কোথায় দেখতে পাওয়া গেল না। সারাঘাটে স্টীমারে ওঠবার সময় মহা হাঙ্গাম। রাত্রি দশটা—জিনিসপত্র সহস্র, কুলি গোটাকতক, মেয়ে মানুষ পাঁচটা এবং পুরুষ মানুষ একটি মাত্র। নদী পেরিয়ে একটি ছোটো রেলগাড়িতে উঠা গেল—তাতে চারটে ক'রে শয্যা, আমরা ছটি মনিষ্যি। মেয়েদের এবং অন্যান্য জিনিস পত্র ladies compartment-এ তোলা গেল, কথাটা শুনতে যত সংক্ষেপ হোলো কাজে ঠিক তেমনটা হয়নি। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয়নি—তবু ন—বলেন আমি কিছুই করিনি—অর্থাৎ একখান আস্ত মানুষ একেবারে আস্ত রকম খেপ্‌লে যে-রকমটা হয় সেই প্রকার মূর্তি ধারণ করলে ঠিক পুরুষ মানুষের উপযুক্ত হোত। কিন্তু এই দুদিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি এবং বেঞ্চির নিচে ঠেলে গুঁজেছি, এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের করেছি, এত বাক্স এবং পুঁটুলির পিছনে আমি ফিরেছি এবং এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেছে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং

এত পাওয়া যায়নি এবং পাবার জন্য এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোনো ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্রসন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটেনি। আমার ঠিক বাক্স-phobia হয়েছে; বাক্স দেখলে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে। যখন চারিদিকে চেয়ে দেখি বাক্স, কেবলি বাক্স, ছোটো বড়ো মাঝারি, হাল্‌কা এবং ভারি, কাঠের এবং টিনের এবং পশুচর্মের এবং কাপড়ের—নিচে একটা, উপরে একটা, পাশে একটা, পিছনে একটা—তখন আমার ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি করবার স্বাভাবিক শক্তি একেবারে চলে যায় এবং তখন আমার শূন্য দৃষ্টি শুষ্ক মুখ এবং দীনভাব দেখলে নিতান্ত কাপুরুষের মতো বোধ হয় অতএব আমার সম্বন্ধে ন—র যা মত দাঁড়িয়েছে তা ঠিক। যাক, তার পরে আমি আর একটা গাড়িতে গিয়ে শুলুম। সে গাড়িতে আরো দুটি বাঙালি ছিলেন। তাঁরা ঢাকা থেকে আসছেন—তাঁদের মধ্যে একজনের মাথা টাকে প্রায় পরিপূর্ণ এবং ভাষা অত্যন্ত বাঁকা—তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনার পিতা দার্জিলিঙে ছিল?" লক্ষ্মী থাকলে এর যথোচিত উত্তর দিতে পারত—সে হয়তো বল্‌ত "তিনি দার্জিলিঙে ছিল কিন্তু তখন দারজিলিং বড়ো ঠাণ্ডা ছিলেন ব'লে তিনি বাড়ি ফিরে গেছে।" আমার উপস্থিতমতো এক রকম বাংলা জোগাল না। * * * * * *

সিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ক্রমাগত স—র উচ্ছ্বাস উক্তি। "ও মা" "কী চমৎকার" "কী আশ্চর্য" "কী

সুন্দর”—কেবলি আমাকে ঠেলে আর বলে “র—দেখো দেখো”। কী করি, যা দেখায় তা দেখতেই হয়—কখনো বা গাছ,কখনো বা মেঘ, কখনো বা একটা দুর্জয় খাঁদা নাকওয়ালী পাহাড়ী মেয়ে—কখনো বা এমন কত কী, যা দেখতে না দেখতেই গাড়ি চ'লে যাচ্ছে, এবং স——দুঃখ কচ্ছে যে র——দেখতে পেলে না। গাড়ি চলতে লাগল। ক্রমে ঠাণ্ডা, তার পরে মেঘ, তার পরে সর্দি, তার পরে হাঁচি, তার পরে শাল, কম্বল, বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কন্ কন্, হাত ঠাণ্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার এবং ঠিক তার পরেই দারজিলিং। আবার সেই বাক্স, সেই ব্যাগ, সেই বিছানা সেই পুঁটুলি, মোটের উপর মোট, মুটের উপর মুটে। ব্রেক থেকে জিনিস পত্র দেখে নেওয়া, চিনে নেওয়া, মুটের মাথায় চাপানো, সাহেবকে রশিদ দেখানো, সাহেবের তর্ক বিতর্ক, জিনিস খুঁজে না পাওয়া এবং সেই হারানো জিনিস পুনরুদ্ধারের জন্য বিবিধ বন্দোবস্ত করা, এতে আমার ঘণ্টা দুয়েক লেগেছিল।

শিলাইদহ,
১৮৮৮।

শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চর—ধূ ধূ করছে—কোথাও শেষ দেখা যায় না—কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায়—আবার অনেক সময়ে বালিকে নদী ব'লে ভ্রম হয়। গ্রাম নেই, লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই—বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটলধরা ভিজে কালো মাটি, জায়গায় জায়গায় শুক্‌নো সাদা বালি। পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে দেখা যায় উপরে অনন্ত নীলিমা আর নিচে অনন্ত পাণ্ডুরতা। আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য, নিচে দরিদ্র শুষ্ক কঠিন শূন্যতা আর উপরে অশরীরী উদার শূন্যতা। এমনতরো desolation কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ পশ্চিমে মুখ ফেরাবামাত্র দেখা যায় স্রোতহীন ছোটো নদীর কোল, ওপারে উঁচু পাড়, গাছপালা, কুটীর, সন্ধ্যা-সূর্যালোকে আশ্চর্য স্বপ্নের মতো। ঠিক যেন এক পারে সৃষ্টি এবং আর এক পারে প্রলয়। সন্ধ্যাসূর্যালোক বলবার তাৎপর্য এই—সন্ধ্যার সময়ই আমরা বেড়াতে বেরই এবং সেই ছবিটাই মনে অঙ্কিত হয়ে আছে। পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার

মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতিরাত্রে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎসংসারে এ যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়। সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্বদিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে এক প্রকাণ্ড পাতা উল্‌টে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য লিখন—আর, এই ক্ষীণ-পরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর, আর ওই ছবির মতন পরপার, ধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ—এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা। যাক। এ কথাগুলো রাজধানীতে অনেকটা "পৈট্রি‌র" মতো শুনতে হবে, কিন্তু এখানকার পক্ষে কথাগুলো কিছুমাত্র বেখাপ নয়।

সন্ধ্যাবেলা এই চরের মধ্যে ছাড়া পেয়ে অনুচরসমেত ছেলেরা একদিকে যায়, বলু একদিকে যায়, আমি একদিকে যাই, দুটি রমণী আর একদিকে যায়। ইতিমধ্যে সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যায়, আকাশের সুবর্ণ আভা মিলিয়ে যায়, অন্ধকার চারি দিকে অস্পষ্ট হয়ে আসে, ক্রমে আপনার পাশের ক্ষীণ ছায়া দেখে বুঝতে পারি, বাঁকা কৃশ চাঁদখানির আলো অল্প অল্প ফুটেছে। পাণ্ডুবর্ণ বালির উপরে এই পাণ্ডুবর্ণ জ্যোৎস্নায় চোখে আরো কেমন বিভ্রম জন্মিয়ে দেয়—কোথায় বালি, কোথায় জল, কোথায় পৃথিবী, কোথায় আকাশ নিতান্ত অনুমান করে নিতে হয়। কাজেই সবটা জড়িয়ে ভারি একটা অবাস্তবিক

মরীচিকা-জগতের মতো বোধ হয়। * * * * গত-কল্য এই মায়া উপকূলে অনেকক্ষণ ধ'রে বিচরণ ক'রে বোটে ফিরে গিয়ে দেখি ছেলেরা ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ ফেরেন নি —আমি একখানি কেদারায় স্থির হয়ে বসলুম— Animal Magnetism নামক একখানা অত্যন্ত ঝাপ্‌সা subject-এর বই একটা বাতির ঝাপ্‌সা আলোতে বসে পড়তে আরম্ভ করলুম। কিন্তু কেউ আর ফেরে না। বইখানাকে খাটের উপরে উপুড় ক'রে বেরলুম—উপরে উঠে চারিদিকে চেয়ে কালো মাথার কোনো চিহ্ন দেখতে পেলুম না। সমস্ত ফেকাশে, ধূ ধূ করছে। একবার বলু ব'লে পুরো জোরে চীৎকার করলুম—কণ্ঠস্বর হু হু করতে করতে দশ দিকে ছুটে গেল—কিন্তু কারো সাড়া পেলুম না। তখন বুকটা হঠাৎ চারদিক থেকে দমে গেল, একখানা বড়ো খোলা ছাতা হঠাৎ বন্ধ ক'রে দিলে যেমনতরো হয়। গোফুর আলো নিয়ে বেরল—প্রসন্ন বেরল—বোটের মাঝিগুলো বেরল, সবাই ভাগ ক'রে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চললুম—আমি একদিকে বলু বলু ক'রে চীৎকার করছি —প্রসন্ন আর একদিকে ডাক দিচ্ছে "ছোটো মা"—মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে মাঝিরা "বাবু" "বাবু" ক'রে ফুকরে উঠছে। সেই মরুভূমির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রে অনেকগুলো আর্তস্বর উঠতে লাগল। কারো সাড়া শব্দ নেই। গোফুর তুই একবার অতি দূর থেকে হেঁকে বললে—"দেখতে পেয়েছি" তার পরেই আবার সংশোধন ক'রে বললে "না" "না"। আমার মানসিক অবস্থাটা একবার

কল্পনা ক'রে দেখো—কল্পনা করতে গেলে নিঃশব্দ রাত্রি, ক্ষীণ চন্দ্রালোক, নির্জন নিস্তব্ধ শূন্য চর, দূরে গোফুরের চলনশীল একটি লণ্ঠনের আলো, মাঝে মাঝে এক এক দিক থেকে কাতর কণ্ঠের আহ্বান এবং চতুর্দিকে তার উদাস প্রতিধ্বনি—মাঝে মাঝে আশার উন্মেষ এবং পর মুহূর্তেই সুগভীর নৈরাশ্য এই সমস্তটা মনে আনতে হবে। অসম্ভব রকমের আশঙ্কাসকল মনে জাগতে লাগল। কখনো মনে হোলো চোরাবালিতে পড়েছে, কখনো মনে হোলো বলুর হয়তো হঠাৎ মূর্ছা কিংবা কিছু একটা হয়েছে—কখনো বা নানাবিধ শ্বাপদ জন্তুর বিভীষিকা কল্পনায় উদয় হোতে লাগল। মনে মনে হোতে লাগল "আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা, নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ। স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলুম। এমন সময়ে ঘণ্টাখানেক পরে রব উঠল এঁরা চড়া বেয়ে ওপারে গিয়ে পড়েছেন আর ফিরতে পারছেন না। বোট ওপারে গেল—বোটলক্ষ্মী বোটে ফিরলেন—বলু বলতে লাগল "তোমাদের নিয়ে আমি আর কখনো বেরব না"—সকলেই অনুতপ্ত শ্রান্তকাতর, সুতরাং আমার ভালো ভালো উপাদেয় ভর্ৎসনাবাক্য হৃদয়েই রয়ে গেল। পরদিন প্রাতঃ-কালে উঠেও কোনোমতেই রাগতে পারলুম না।

কলিকাতা,

জুন, ১৮৮৯।

গাড়ি ছাড়বার পর বে—চারিদিক চেয়ে গম্ভীর হয়ে ব'সে রইল, ভাবলে এসংসারে কোথা থেকে আগমন, কোথায় গতি, জীবনের উদ্দেশ্য কী—ভাবতে ভাবতে ক্রমে দেখলুম ঘন ঘন হাই তুল্‌তে লাগল, তার পরে খানিক বাদে আমার কোলে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে নিদ্রা আরম্ভ ক'রে দিল। আমার মনেও সংসারের সুখদুঃখসম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তার উদয় হয়েছিল, কিন্তু ঘুম এল না। সুতরাং আপন মনে ভৈরবী আলাপ করতে লাগলুম। ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো কানে এলে জগতের প্রতি এক রকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। মনে হয় একটা নিয়মের যন্ত্র-হস্ত অবিশ্রাম আর্গিন যন্ত্রের হাতা ঘোরাচ্ছে এবং সেই ঘর্ষণ বেদনায় সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মর্ম্মস্থল হতে একটা গভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। সকালবেলাকার সূর্য্যের সমস্ত আলো ম্লান হয়ে এসেছে, গাছপালা নিস্তব্ধ হয়ে কী যেন শুনছে, এবং আকাশ একটা বিশ্বব্যাপী অশ্রুর বাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে অর্থাৎ দূর আকাশের দিকে চাইলে মনে হয় যেন একটা অনিমেষ নীল চোখ কেবল ছলছল ক'রে চেয়ে আছে।

• খিড়কি স্টেসনের কাছাকাছি আমাদের সেই আকের

খেত, গাছের সার, টেনিস খেত, কাঁচের জানালা মোড়া বাড়ি দেখতে পেলুম, দেখে মনটা ক্ষণকালের জন্য কেমন ক'রে উঠল। এই এক আশ্চর্য। যখন এখানে বাস করতুম তখন এ বাড়ির উপরে যে সবিশেষ স্নেহ ছিল তা নয়—যখন এবাড়ি ছেড়ে গিয়েছিলুম তখনও যে সবিশেষ কাতর হয়েছিলুম তাও বলতে পারিনে অথচ দ্রুতগতি ট্রেনের বাতায়নে ব'সে যখন কেবল নিমেষের মতো দেখলুম সেই একলা বাড়ি তার খেলার জায়গা এবং ফাঁকা ঘরগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তখন সমস্ত হৃদয়টা বিদ্যুৎবেগে সেই বাড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল, অমনি বুকের ভিতরে বাঁদিক থেকে ডান দিক পর্যন্ত ধক্ ক'রে একটা শব্দ হোলো, হুস্ ক'রে গাড়ি চ'লে গেল, আকের খেত মিলিয়ে গেল—বাস্ সমস্ত ফুরল—কেবল হঠাৎ ঘা খাওয়ার দরুণ মনের ছোটো বড়ো দু চার্টে তার প্রায় দেড় সুর আন্দাজ নেবে গেল। কিন্তু গাড়ির এঞ্জিন এ সকল বিষয়ে বড়ো একটা চিন্তা করে না, সে লোহার রাস্তার উপর দিয়ে এক রোখে চ'লে যায়, কোন্ লোক কোথায় কী ভাবে যাচ্ছে, সে বিষয়ে তার খেয়াল করবার সময় নেই—সে কেবল গল গল ক'রে জল খায়, হুস্ হুস্ ক'রে ধোঁয়া ছাড়ে, গাঁ গাঁ ক'রে চীৎকার করে, এবং গড় গড় ক'রে চ'লে যায়। সংসারের গতির সঙ্গে এর সুন্দর তুলনা দেওয়া যেতে পারত কিন্তু সেটা এত পুরোনো এবং অনাবশ্যক যে কেবল একবার নির্দেশ ক'রে ক্ষান্ত থাকা গেল। খাণ্ডালার কাছাকাছি এসে মেঘ এবং

বৃষ্টি। সেই সব পাহাড়গুলার উপর মেঘ জমে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে—ঠিক যেন কে পাথর এঁকে তার পরে রবার দিয়ে ঘসে দিয়েছে; খানিক খানিক outline দেখা যাচ্ছে এবং খানিকটা পেন্সিলের দাগ চারিদিকে ধেবড়ে গেছে। অবশেষে গাড়ির ঘণ্টা দিলে—দূর থেকে গাড়ির নিদ্রাহীন লাল চক্ষু দেখা গেল, ধরণী থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল, স্টেসনের কর্তারা চটি জুতো, ঘুন্টি দেওয়া চাপকান এবং টিকির উপরে তকমা দেওয়া গোল টুপি প'রে নানা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল—বিপুল হাতল্যাণ্ঠন চারিদিকে আলো নিক্ষেপ করতে লাগল—খানসামাবর্গ সচকিত হয়ে যে যার জিনিস পত্র আগলে দাঁড়াল, বে—ঘুমোতে লাগল। গাড়িতে ওঠা গেল। * * * * বে—অকারণে খুঁৎ খুঁৎ আরম্ভ করলে—বেলা বাড়তে লাগল—যদিও রোদ্দুর নেই তবুও গরম বোধ হোতে লাগল, কিন্তু সময় আর কাটে না। প্রত্যেক মিনিটকে যেন স্পর্শ ক'রে ঠেলে ঠেলে এগোতে হচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে খানিক দূর গিয়ে ঘোরতর বৃষ্টি আরম্ভ হোলো—চারিদিক বন্ধ ক'রে কাঁচের জানালার কাছে ব'সে মেঘবৃষ্টি দেখতে বেশ লাগল। এক জায়গায় একটা বর্ষার নদীর কাণ্ড যে দেখলুম সে আর কী বলব—সে একেবারে ফুলে ফেঁপে ফেনিয়ে পাকিয়ে ঘুলিয়ে, ছুটে, মাথা খুঁড়ে, পাথরগুলোর উপরে প'ড়ে আছড়ে বিছড়ে তাদের ডিঙিয়ে, তাদের চারিদিকে ঘুরপাক খেয়ে একটা কাণ্ড করতে লাগল। এরকম উন্মত্ততা আর কোথাও দেখিনি।

সোহাগপুরে বিকেলে এসে যখন খেলুম তখন বৃষ্টি থেমেছে—যখন গাড়ি ছাড়লে তখন দেখলুম সূর্য অত্যন্ত রাঙা হয়ে মেঘের মধ্যে অস্ত যাচ্ছে। আমি ভাবছিলুম, খাওয়া দাওয়া গল্পস্বল্প খেলাধুলো পড়াশুনোর মধ্যে আর সবার সময় কেবল অলক্ষিতভাবে কেটে যাচ্ছে, সময় তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে—তার অস্তিত্বই তারা টের পাচ্ছে না—আর আমি সময়ের উপরে সাঁতার কেটে চলেছি, সমস্ত অগাধ সময়টা আমার বুকে মুখে সর্বাঙ্গে লাগছে। * * * * যথাসময়ে হাওড়ায় গাড়ি গিয়ে পৌঁছল। প্রথমে বাড়ির জমাদার তার পরে যো—তার পরে স—একে একে দৃষ্টিপথে পড়ল। তারপরে সেকেণ্ড ক্লাসের সেক্‌রা গাড়ির ছাতের উপরে গুটানো বিছানা, আয়ার দোম্‌ড়ানো টিনের বাক্স এবং নাবার টব (তার মধ্যে দুধের বোতল, লোটা, হাঁড়ি, টিন্‌পট, পুঁটুলি ইত্যাদি) চাপিয়ে বাড়ি পেঁছনো গেল। একটা কলরব, লোকের ভিড়, দারোয়ানদের সেলাম, চাকরদের প্রণাম, সরকারদের নমস্কার, আমাদের মধ্যে কে মোটা হয়েছি কে রোগা হয়েছি সে সম্বন্ধে সাধারণের সম্পূর্ণ মতভেদ, বে—কে নিয়ে স্ব—এণ্ড কোম্পানির লুটোপুটি, চায়ের টেবিলে লোকসমাগম, স্নান, আহার ইত্যাদি।

সাজাদপুর,

জানুয়ারি, ১৮৯০।

—কাজেই দুপুর বেলা পাগড়ি প'রে কার্ডে নাম লিখে পালকি চ'ড়ে জমিদারবাবু চললেন। সাহেব তাঁবুর বারান্দায় ব'সে বিচার করছেন, দক্ষিণ পার্শ্বে পুলিসের চর। বিচার-প্রার্থীর দল মাঠে ঘাটে গাছতলায় প'ড়ে অপেক্ষা ক'রে আছে —একেবারে তার নাকের সাম্‌নে পাল্‌কি নাবালে—সাহেব খাতির ক'রে চৌকিতে বসালেন। ছোক্‌রা-হেন, গোঁফের রেখা উঠছে—চুল খুব কটা, মাঝে মাঝে একটু একটু কালো চুলের তালি দেওয়া—হঠাৎ মনে হয় বুড়ো মানুষ, অথচ মুখ নিতান্ত কাঁচা। সাহেবকে বললুম কাল রাত্রে আমার সঙ্গে খেতে এসো, তিনি বললেন আমি আজই আর এক জায়গায় যাচ্ছি—Pig-sticking-এর জোগাড় করতে। বাড়ি চলে এলুম। ভয়ানক মেঘ ক'রে এল—ঘোরতর ঝড়—মুষলধারে বৃষ্টি। বই ছুঁতে ইচ্ছে করছে না, কিছু লেখা অসম্ভব—মনের মধ্যে যাকে কবিত্বের ভাষায় বলে, কী যেন কী ইত্যাদি। এ ঘর থেকে ও ঘরে পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলুম। অন্ধকার হয়ে এসেছে—গড়গড় শব্দে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুৎ—হু হু ক'রে এক-একটা বাতাসের দমকা আসছে আর আমাদের বারান্দায় সামনের

বড়ো নিচু গাছটার ঘাড় ধ'রে যেন তার দাড়ি সুদ্ধ মাথাটা নাড়িয়ে দিচ্ছে। দেখতে দেখতে বৃষ্টির জলে আমাদের শুকনো খালটা প্রায় পূরে এল। এই রকম ক'রে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ আমার মনে হোলো ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে এই বাদলায় আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে অনুরোধ করা আমার কর্তব্য। চিঠি লিখে দিলুম। চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে ঘর তদারক করতে গিয়ে দেখি, সে ঘরে দুটো বাঁশের ঝোলার উপর তাকিয়া গদি ময়লা লেপ ঠাঙানো।—চাকরদের গুল টিকে তামাক, তাদেরই দুটো কাঠের সিন্ধুক—তাদেরই মলিন লেপ, ওয়াড়হীন তৈলাক্ত বালিশ ও মসীবর্ণ মাদুর, এক টুকরো ছেঁড়া চট ও তার উপরে বিচিত্র জাতীয় মলিনতা—কতকগুলো প্যাক বাক্সর মধ্যে নানাবিধ জিনিসের ভগ্নাবশেষ—যথা ম'রচেপড়া কাৎলির ঢাকনি, তলাহীন ভাঙা লোহার উনুন, অত্যন্ত ময়লা একটা দস্তার চাদানি, ভাঙা সেজের কাঁচ ও ময়লা শামাদান, দুটো অকর্মণ্য ফিলটার, meatsafe, একটা সুপপ্লেটে খানিকটা পাতলা গুড়—ধুলো পড়ে পড়ে সেটা গাঢ় হয়ে এসেছে, গোটাকতক ময়লা কালীবর্ণ ভিজে ঝাড়ন, কোণে বাসন ধোবার গাম্‌লা, গোফুর মিঞার একটা ময়লা কোর্তা এবং পুরোনো মকমলের Skull-cap, জলের দাগ তেলের দাগ দুধের দাগ কালো দাগ brown দাগ, সাদা দাগ এবং নানা মিশ্রিত দাগ বিশিষ্ট আয়নাহীন একটা জীর্ণ পোকাকাটা Dressing table; তার পায়াকটা ভাঙা, আয়নাটা অন্যত্র দেয়ালে ঠেসান দেওয়া, তার খোপের মধ্যে

ধুলো, খড়্কে, ন্যাপকিন, পুরোনো তালা, ভাঙা গেলাসের তলা এবং সোডাওয়াটার বোতলের তার, কতকগুলো খাটের খুরো ভাঙা—ব্যাপার দেখে আমার চক্ষু স্থির—ডাক্ লোকজন, নিয়ে আয় নায়েব, ডেকে আন্ খাজাঞ্চি, জোগাড় কর্ কুলি, আন্ ঝাঁটা, আন্ জল, মই লাগা, দড়ি খোল্, বাঁশ খোল্, তাকিয়া লেপ কাঁথা টেনে ফেল্, ভাঙা কাঁচের টুকরো গুলো খুঁটে খুঁটে তোল্, দেয়ালের পেরেকগুলো একে একে উপড়ে ফেল্—ওরে তোরা সব হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন, নে না একটা একটা ক'রে জিনিস নে না—ওরে ভাঙ্লেরে সব ভাঙ্লে—ঝন ঝন ঝনাৎ—তিনটে সেজ ভেঙে চুরমার, খুঁটে খুঁটে তোল্—ভাঙা চুপড়িগুলো এবং ছেঁড়া চটটা বহুদিনসঞ্চিত ধুলোসমেত নিজের হাতে টেনে ফেলে দিলুম—নিচে থেকে পাঁচ ছটা আরসলা সপরিবারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন তাঁরা আমারই সঙ্গে একান্নবর্তী হয়ে বাস করছিলেন, আমার গুড়, আমার পাউরুটি এবং আমারই নতুন জুতোর বার্ণিশ তাঁদের উপজীবিকা ছিল। সাহেব লিখলেন, "আমি এখনি যাচ্ছি বড়ো বিপদে পড়েছি।" ওরে এলরে এল—চট পট কর্। তার পরে—ঐ এসেছে। তাড়াতাড়ি চুল দাড়ি সমস্ত ঝেড়ে ফেলে ভদ্র লোক হয়ে যেন কোনো কাজ ছিল না যেন সমস্ত দিন আরামে বসে-ছিলুম এই রকম ভাবে হলের ঘরে ব'সে রইলুম—সাহেবের সঙ্গে ঈষৎ হেসে হাত নাড়ানাড়ি ক'রে অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে গল্প করতে লাগলুম—সাহেবের শোবার ঘরে কী হোলো এই

চিন্তা ক্রমাগত মনের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। গিয়ে দেখলুম এক রকম দাঁড়িয়ে গেছে; রাত্তিরটা ঘুমিয়ে কাটতেও পারে যদি না সেই গৃহহীন আরস্লোগুলো রাত্তিরে তাঁর পায়ের তেলোয় সুড়সুড়ি দেয়।

লণ্ডন,

১০ই অক্টোবর, ১৮৯০।

মানুষ কি লোহার কল, যে, ঠিক নিয়ম-অনুসারে চলবে। মানুষের মনের এত বিচিত্র এবং বিস্তৃত কাণ্ড কারখানা, তার এত দিকে গতি এবং এত রকমের অধিকার যে এদিকে ওদিকে হেলতেই হবে। সেই তার জীবনের লক্ষণ, তার মনুষ্যত্বের চিহ্ন, তার জড়ত্বের প্রতিবাদ। এই দ্বিধা, এই দুর্বলতা যার নেই তার মন নিতান্ত সংকীর্ণ এবং কঠিন এবং জীবনবিহীন। যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই তো আমাদের জীবনের গতিশক্তি—সেই আমাদের নানা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত ক'রে তুলছে। নদী যদি প্রতি পদে বলে. কই সমুদ্র কোথায়—এ যে মরুভূমি—ঐ যে অরণ্য—ঐ যে বালির চড়া—আমাকে যে শক্তি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে বুঝি আমাকে ভুলিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে—তাহলে তার যেরকম ভ্রম হয় প্রবৃত্তির উপরে একান্ত অবিশ্বাস করলে আমাদেরও কতকটা সেই রকম ভ্রম হয়। আমরাও প্রতিদিন বিচিত্র সংশয়ের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছি—আমাদের শেষ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে—কিন্তু যিনি আমাদের অনন্ত জীবনের মধ্যে প্রবৃত্তি নামক প্রচণ্ড গতিশক্তি দিয়েছেন তিনিই

জানেন তার দ্বারা আমাদের কী রকম ক'রে চালনা করবেন। আমাদের সর্বদা এই একটা মস্ত ভুল হয় যে আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের যেখানে নিয়ে এসেছে সেইখানেই বুঝি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে—আমরা তখন জানতে পারিনে সে আমাদের তার মধ্যে থেকে টেনে তুলবে। নদীকে যে শক্তি মরুভূমির মধ্যে নিয়ে আসে সেই শক্তিই সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে যায়। ভ্রমের মধ্যে যে ফেলে ভ্রম থেকে সেই টেনে নিয়ে যায়—এই রকম করেই আমরা চলছি। যার এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবনীশক্তির প্রাবল্য নেই, যার মনের রহস্য-ময় বিচিত্র বিকাশ নেই, সে সুখী হোতে পারে সাধু হোতে পারে, এবং তার সেই সংকীর্ণতাকে লোকে মনের জোর বলতে পারে—কিন্তু অনন্ত জীবনের পাথেয় তার বেশি নেই।

পতিসর,

১৮৯১।

আমার বোট কাছারির কাছ থেকে অনেক দূরে এনে একটি নিরবিলি জায়গায় বেঁধেছি। এ দেশে গোলমাল কোথাও নেই, ইচ্ছে করলেও পাওয়া যায় না, কেবল হয়তো অন্যান্য বিবিধ জিনিসের সঙ্গে হাটে পাওয়া যেতে পারে।— আমি এখন যেখানে এসেছি এ জায়গায় অধিকন্তু মানুষের মুখ দেখা যায় না। চারিদিকে কেবল মাঠ ধূধূ করছে—মাঠের শস্য কেটে নিয়ে গেছে, কেবল কাটা ধানের গোড়াগুলিতে সমস্ত মাঠ আচ্ছন্ন। সমস্ত দিনের পর সূর্যাস্তের সময় এই মাঠে কাল একবার বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। সূর্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে পৃথিবীর শেষরেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। চারিদিক কী যে সুন্দর হয়ে উঠল সে আর কী বলব। বহুদূরে একেবারে দিগন্তের শেষ প্রান্তে একটু গাছ-পালার ঘের দেওয়া ছিল, সেখানটা এমন মায়াময় হয়ে উঠল, নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া হয়ে এল, —মনে হোলো ঐখানে যেন সন্ধ্যার বাড়ি, ঐখানে গিয়ে সে আপনার রাঙা আঁচলটি শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়, আপনার সন্ধ্যাতারাটি যত্ন ক'রে জ্বালিয়ে তোলে, আপন নিভৃত নির্জনতার মধ্যে সিঁদুর প'রে বধূর মতো কার প্রতীক্ষায় বসে থাকে, এবং বসে বসে পা দুটি মেলে তারার মালা

গাঁথে এবং গুন গুন স্বরে স্বপ্ন রচনা করে। সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে—একটি কোমল বিষাদ—ঠিক অশ্রুজল নয়—একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পল্লবের নিচে গভীর ছলছলে ভাবের মতো। এমন মনে করা যেতে পারে—মা পৃথিবী লোকালয়ের মধ্যে আপন ছেলে-পুলে এবং কোলাহল এবং ঘরকরনার কাজ নিয়ে থাকে, যেখানে একটু ফাঁকা, একটু নিস্তব্ধতা, একটু খোলা আকাশ, সেইখানেই তার বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য এবং বিষাদ ফুটে ওঠে, সেইখানেই তার গভীর দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। ভারতবর্ষে যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি আছে এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই জন্যে আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম বৈরাগ্য আবিষ্কার করতে পেরেছে,—এই জন্যে আমাদের পুরবীতে কিম্বা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হা হা ধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারো ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটা অংশ আছে, যেটা কর্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায়নি; পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন বিরল অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মীড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে। কাল সন্ধ্যের সময় নির্জন মাঠের মধ্যে পুরবী বাজছিল, পাঁচ ছ ক্রোশের মধ্যে কেবল আমি একটি প্রাণী বেড়াচ্ছিলুম, এবং আর একটি প্রাণী বোটের

কাছে পাগড়ি বেঁধে লাঠি হাতে অত্যন্ত সংহতভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার বাঁ পাশে ছোটো নদীটি দুই ধারের উঁচু পাহাড়ের মধ্যে এঁকেবেঁকে খুব অল্প দূরেই দৃষ্টিপথের বার হয়ে গেছে, জলে ঢেউয়ের রেখামাত্র ছিল না, কেবল সন্ধ্যার আভা অত্যন্ত মুমূর্ষু হাসির মতো খানিকক্ষণের জন্যে লেগে ছিল। যেমন প্রকাণ্ড মাঠ, তেমনি প্রকাণ্ড নিস্তব্ধতা; কেবল একরকম পাখি আছে তা'রা মাটিতে বাসা ক'রে থাকে, সেই পাখি, যত অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল তত আমাকে তার নিরালা বাসার কাছে ক্রমিক আনাগোনা করতে দেখে ব্যাকুল সন্দেহের স্বরে টী টী ক'রে ডাকতে লাগল। ক্রমে এখানকার কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলো ঈষৎ ফুটে উঠল। বরাবর নদীর ধারে ধারে মাঠের প্রান্ত দিয়ে একটা সংকীর্ণ পথচিহ্ন চলে গেছে, সেইখানে নতশিরে চলতে চলতে ভাবছিলুম।

কালিগ্রাম

৫ই মাঘ, ১৮৯১।

বেশ কুঁড়েমি করবার মতো বেলাটা। কেউ তাড়া দেবার লোক নেই, তা ছাড়া প্রজা এবং কাজের ভিড় এখনো চতুর্দিকে ছেঁকে ধরেনি। সবসুদ্ধ খুব ঢিলে-ঢিলে একলা-একলা কী-একরকম মনে হচ্ছে। যেন পৃথিবীতে অত্যাবশ্যক কাজ ব'লে একটা কিছুই নেই—এমন কি, নাইলেও চলে, না নাইলেও চলে, এবং ঠিক সময়মতো খাওয়াটা কলকাতার লোকের মধ্যে প্রচলিত একটা বহুদিনের কুসংস্কার ব'লে মনে হয়। এখানকার চতুর্দিকের ভাবগতিকও সেই রকম। একটা ছোট্টো নদী আছে বটে কিন্তু তাতে কানাকড়ির স্রোত নেই, সে যেন আপন শৈবালদলের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে অঙ্গ-বিস্তার ক'রে দিয়ে পড়ে পড়ে ভাবছে যে যদি না চললেও চলে তবে আর চলবার দরকার কী। জলের মাঝে মাঝে যে লম্বা ঘাস এবং জলজ উদ্ভিদ জন্মেছে, জেলেরা জাল ফেলতে না এলে সেগুলো সমস্ত দিনের মধ্যে একটু নাড়া পায় না। পাঁচটা ছ'টা বড়ো বড়ো নৌকা সারি সারি বাঁধা আছে—তার মধ্যে একটার ছাতের উপর একজন মাঝি আপাদমস্তক কাপড় মুড়ে রোদ্দুরে নিদ্রা দিচ্ছে—আর একটার উপর একজন ব'সে ব'সে দড়ি পাকাচ্ছে এবং রোদ পোহাচ্ছে, দাঁড়ের কাছে একজন আধ-বৃদ্ধ লোক অনাবৃতগাত্রে ব'সে

অকারণে আমাদের বোটের দিকে চেয়ে আছে; ডাঙার উপরে নানান রকমের নানান লোক অত্যন্ত মৃদুমন্দ অলস চালে কেন যে আসছে কেন যে যাচ্ছে, কেন যে বুকের মধ্যে নিজের দুটো হাঁটুকে আলিঙ্গন ক'রে ধ'রে উবু হয়ে বসে আছে, কেন যে অবাক হয়ে বিশেষ কোনো-কিছুর দিকে না তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। কেবল গোটাকতক পাতি হাঁসের ওরি মধ্যে একটু ব্যস্ত ভাব দেখা যাচ্ছে—তারা ভারি কলরব করছে, এবং ক্রমাগতই উৎসাহ-সহকারে জলের মধ্যে মাথা ডুবোচ্ছে, এবং তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে নিয়ে সবলে ঝাড়া দিচ্ছে। ঠিক মনে হচ্ছে যেন তারা জলের নিচেকার নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কার করবার জন্যে প্রতিক্ষণেই গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং তার পরে সবেগে মাথা নেড়ে বলছে, "কিছুই না কিছুই না।" এখানকার দিনগুলো এইরকম বারো ঘণ্টা পড়ে পড়ে কেবল রোদ পোহায়, এবং অবশিষ্ট বারো ঘণ্টা খুব গভীর অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা দেয়। এখানে সমস্তক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে কেবল নিজের মনের ভাবগুলোকে বসে বসে দোলা দিতে ইচ্ছে করে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু গুন গুন ক'রে গান গাওয়া যায়, মাঝে মাঝে বা ঘুমে চোখ একটু অলস হয়ে আসে। মা যেমন ক'রে শীতকালের সারা বেলা রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ছেলে কোলে ক'রে গুন গুন স্বরে দোলা দেয়, সেই রকম।

পতিসর

৭ই মাঘ, ১৮৯১।

ছোটো নদীটি ঈষৎ বেঁকে এইখানে একটুখানি কোণের মতো একটু কোলের মতো তৈরি করেছে—দুই ধারে উঁচু পাড়ের মধ্যে সেই কোলের কোণটুকুতে বেশ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকি—একটু দূর থেকে আমাদের আর দেখা যায় না। নৌকাওয়ালারা উত্তর দিক থেকে গুন টেনে টেনে আসে, হঠাৎ একটা বাঁক ফিরেই এই জনহীন মাঠের ধারে অকারণে একটা মস্ত বোট বাঁধা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। "হাঁ গা, কাদের বজরা গা।" "জমিদার বাবুর।" "এখানে কেন। কাছারির সামনে কেন বাঁধোনি।" "হাওয়া খেতে এসেছেন।" এসেছি হাওয়ার চেয়ে আরো ঢের বেশি কঠিন জিনিসের জন্য। যাহোক এরকম প্রশ্নোত্তর প্রায় মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়। এইমাত্র খাওয়া শেষ ক'রে বসেছি—এখন বেলা দেড়টা। বোট খুলে দিয়েছে, আস্তে আস্তে কাছারির দিকে চলেছে। বেশ একটু বাতাস দিচ্ছে। তেমন ঠাণ্ডা নয়—দুপুরবেলার তাতে অল্প গরম হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ঘন শৈবালের মধ্যে দিয়ে যেতে খস খস শব্দ হচ্ছে। সেই শৈবালের উপরে অনেকগুলো ছোটো ছোটো কচ্ছপ আকাশের দিকে সমস্ত গলা বাড়িয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। অনেক দূরে দূরে একটা একটা ছোটো ছোটো গ্রাম আসছে। গুটিকতক খোড়ো

ঘর কতকগুলি চালশূন্য মাটির দেয়াল, দুটো একটা খড়ের স্তূপ, কুলগাছ, আমগাছ, বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়, গোটা-তিনেক ছাগল চরছে, গোটাকতক উলঙ্গ ছেলেমেয়ে—নদী-পর্যন্ত একটি গড়ানে কাঁচা ঘাট, সেখানে কেউ কাপড় কাচছে, কেউ নাচছে, কেউ বাসন মাজছে, কোনো কোনো লজ্জাশীলা বধূ দুই আঙুলে ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক ক'রে ধ'রে কলসী কাঁখে জমিদার বাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে, তার হাঁটুর কাছে আঁচল ধ'রে একটি সদ্যস্নাত তৈলচিক্কণ বিবস্ত্র শিশুও একদৃষ্টে বর্তমান পত্রলেখকসম্বন্ধে কৌতূহলনিবৃত্তি করছে—তীরে কতকগুলো নৌকো বাঁধা এবং একটা পরিত্যক্ত প্রাচীন জেলেডিঙি অর্ধনিমগ্ন অবস্থায় পুনরুদ্ধারের প্রতীক্ষা করছে। তার পরে আবার অনেকটা দূর শস্যশূন্য মাঠ—মাঝে মাঝে কেবল দুই একজন রাখালশিশুকে দেখতে পাওয়া যায়, এবং দুটো একটা গোরু নদীর ঢালু তটের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এসে সরস তৃণ অন্বেষণ করছে দেখা যায়। এখানকার দুপুর-বেলার মতো এমন নির্জনতা নিস্তব্ধতা আর কোথাও নেই।

কালিগ্রাম

জানুয়ারি, ১৮৯১।

কাল যখন কাছারি করছি, গুটি পাঁচ ছয় ছেলে হঠাৎ অত্যন্ত সংযতভাবে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালে—কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে না করতে একেবারে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আরম্ভ ক'রে দিলে "পিতঃ, অভাগ্য সন্তানগণের সৌভাগ্য-বশত জগদীশ্বরের কৃপায় প্রভুর পুনর্বার এতদ্দেশে শুভাগমন হইয়াছে।" এমনি ক'রে আধ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা ক'রে গেল; মাঝে মাঝে মুখস্থ বক্তৃতা ভুলে যাচ্ছিল, আবার আকাশের দিকে চেয়ে সংশোধন ক'রে নিচ্ছিল। বিষয়টা হচ্ছে তাদের স্কুলের টুল ও বেঞ্চির অপ্রতুল হয়েছে, "সেই কাষ্ঠাসন অভাবে আমরাই বা কোথায় উপবেশন করি, আমাদের পূজনীয় শিক্ষক মহাশয়ই বা কোথায় উপবেশন করেন, এবং পরিদর্শক মহাশয় উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই বা কোথায় আসন দান করা যায়।" ছোট্ট ছেলের মুখে হঠাৎ এই অনর্গল বক্তৃতা শুনে আমার এমনি হাসি পাচ্ছিল। বিশেষত এই জমিদারি কাছারিতে, যেখানে অশিক্ষিত চাষারা নিতান্ত গ্রাম্য ভাষায় আপনাদের যথার্থ দারিদ্র্য-দুঃখ জানায়—যেখানে অতিবৃষ্টি দুর্ভিক্ষে গোরু বাছুর হাল লাঙল বিক্রি ক'রেও উদরান্নের অনটনের কথা শোনা যাচ্ছে, যেখানে "অহরহ" শব্দের পরিবর্তে "রহরহ", "অতিক্রমের"

স্থলে "অতিক্রয়" ব্যবহার, সেখানে টুল বেঞ্চির অভাবে সংস্কৃত বক্তৃতা কানে এমনি অদ্ভুত শোনায়। অন্যান্য আমলা এবং প্রজারা এই ছোকরার ভাষার প্রতি এতাদৃশ দখল দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল—তারা মনে মনে আক্ষেপ করছিল বাপ-মা-রা আমাদের যত্ন ক'রে লেখাপড়া শেখায়নি, নইলে আমরাও জমিদারের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এইরকম শুদ্ধ ভাষায় নিবেদন করতে পারতুম। আমি শুনতে পেলুম একজন আর একজনকে ঠেলে ঈষৎ বিদ্বেষের ভাবে বলছে—"একে কে শিখিয়ে দিয়েছে।" আমি তার বক্তৃতা শেষ না হোতেই তাকে থামিয়ে বললুম, আচ্ছা তোমাদের টুল বেঞ্চির বন্দোবস্ত ক'রে দেব। তাতে সে দম্‌ল না—সে যেখানে বক্তৃতা ভঙ্গ করেছিল সেইখান থেকে আবার আরম্ভ করলে—যদিও তার আবশ্যক ছিল না কিন্তু শেষ কথাটি পর্যন্ত চুকিয়ে প্রণাম ক'রে বাড়ি ফিরে গেল। বেচারা অনেক কষ্টে মুখস্থ ক'রে এসেছিল, আমি তার টুল বেঞ্চি না দিলে সে ক্ষুণ্ণ হোত না, কিন্তু তার বক্তৃতা কেড়ে নিলে বোধ হয় অসহ্য হোত—সেই জন্যে যদিও আমার অনেক গুরুতর কাজ ছিল, তবু খুব গম্ভীরভাবে আদ্যোপান্ত শুনে গেলুম।

কালিগ্রাম

জানুয়ারি, ১৮৯১।

ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ ক'রে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি। ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটাসুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম। স্বর্গ আর কী দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতাময় এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত। আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত্য-হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে ক'রে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগারা তাদের রাখতে পারিনে, বাঁচাতে পারিনে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে মনে আছে—"আমি দেবতার মেয়ে কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই; আমি ভালবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে, আরম্ভ করি

সম্পূর্ণ করতে পারিনে, জন্ম দিই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে।" এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি ক'রে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালবাসি; এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তা-কাতর ব'লেই।

সাজাদপুরের অনতিদূরে,
১২ই মাঘ, ১৮৯১।

এখনো পথে আছি। ভোর থেকে আরম্ভ ক'রে সন্ধ্যা সাতটা আটটা পর্যন্ত ক্রমাগতই ভেসে চলেছি। কেবলমাত্র গতির কেমন একটা আকর্ষণ আছে—দুধারের তটভূমি অবিশ্রাম চোখের উপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে—সমস্তদিন তাই চেয়ে আছি—কিছুতে তার থেকে চোখ ফেরাতে পারছিনে—পড়তে মন যায় না, লিখতে মন যায় না, কোনো কিছু কাজ নেই, কেবল চুপ ক'রে চেয়ে ব'সে আছি। কেবল যে দৃশ্যের বৈচিত্র্যের জন্যে তা নয়—হয়তো দুধারে কিছুই নেই, কেবল তরুহীন তটের রেখামাত্র চ'লে গেছে—কিন্তু ক্রমাগতই চলছে এই হচ্ছে তার প্রধান আকর্ষণ। আমার নিজের কোনো চেষ্টা নেই, পরিশ্রম নেই, অথচ বাই-রের একটা অশ্রান্ত গতি মনটাকে বেশ মৃদু প্রশান্তভাবে ব্যাপৃত করে রাখে। মনের পরিশ্রমও নেই বিশ্রামও নেই এই-রকমের একটা ভাব। চৌকিতে বসে বসে অলস অন্যমনস্ক-ভাবে পা-দোলানো যেরকম এও সেইরকম, শরীরটা মোটের উপর বিশ্রাম করছে, অথচ শরীরের যে অতিরিক্ত উদ্যমটুকু কোনোকালে স্থির থাকতে চায় না, তাকেও একটা একঘেয়ে রকম কাজ দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়েছে। আমাদের কালি-গ্রামের সেই মুমূর্ষুর নাড়ির মতো অতি ক্ষীণস্রোত নদী কাল

কোন্‌কালে ছাড়িয়ে এসেছি। সেই নদী থেকে ক্রমে একটা স্রোতস্বিনী নদীতে এসে পড়া গেল। সেটা বেয়ে ক্রমে এমন এক জায়গায় এসে পড়লুম যেখানে ডাঙায় জলে একাকার হয়ে গেছে। নদী এবং তীর উভয়ের আকার-প্রকারের ভেদ ক্রমশই ঘুচে গেছে—দুটি অল্পবয়সের ভাই-বোনের মতো। তীর এবং জল মাথায় মাথায় সমান—একটুও পাড় নেই। ক্রমে নদীর সেই ছিপছিপে আকারটুকু আর থাকে না—নানাদিকে নানারকমে ভাগ হয়ে ক্রমে চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল। এই খানিকটা সবুজ ঘাস এই খানিকটা স্বচ্ছ জল। দেখে পৃথিবীর শিশুকাল মনে পড়ে—অসীম জলরাশির মধ্যে যখন স্থল সবে একটুখানি মাথা তুলেছে—জলস্থলের অধিকার নির্দিষ্ট হয়ে যায়নি। চারিদিকে জেলেদের বাঁশ পোঁতা—জেলেদের জাল থেকে মাছ ছোঁ মেরে নেবার জন্যে চিল উড়ছে, পাঁকের উপরে নিরীহ বক দাঁড়িয়ে আছে—নানারকমের জলচর পাখি—জলে শ্যাওলা ভাসছে—মাঝে মাঝে পাঁকের মধ্যে অযত্নসম্ভূত ধানের গাছ, স্থির জলের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা উড়ছে। ভোরের বেলা বোট ছেড়ে দিয়ে কাঁচিকাঠায় গিয়ে পড়া গেল। একটি বারো তেরো হাত সংকীর্ণ খালের মতো ক্রমাগত এঁকে বেঁকে গেছে—সমস্ত বিলের জল তারি ভিতর দিয়ে প্রবল বেগে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে—এর মধ্যে আমাদের এই প্রকাণ্ড বোট নিয়ে বিষম কাণ্ড—জলের স্রোত বিদ্যুতের মতো বোটটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দাঁড়িরা লগি হাতে ক'রে

সামলাবার চেষ্টা করছে, পাছে ডাঙার উপর বোটটাকে আছড়ে ফেলে। এদিকে হু হু ক'রে বাদলার বাতাস দিচ্ছে, ঘন মেঘ ক'রে রয়েছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে, শীতে সবাই কাঁপছে। ক্রমে খোলা নদীতে এসে পড়লুম। শীতকালে মেঘাচ্ছন্ন ভিজে দিন ভারি বিশ্রী লাগে। সকালবেলাটা তাই নিতান্ত নির্জীবের মতো ছিলুম। বেলা দুটোর সময় রোদ উঠল। তার পর থেকে চমৎকার। খুব উঁচু পাড়ে বরাবর দুই ধারে গাছপালা লোকালয় এমন শান্তিময়, এমন সুন্দর, এমন নিভৃত—দুই ধারে স্নেহসৌন্দর্য বিতরণ ক'রে নদীটি বেঁকে বেঁকে চ'লে গেছে—আমাদের বাংলাদেশের একটি অপরিচিত অন্তঃপুরচারিণী নদী। কেবল স্নেহ এবং কোমলতা এবং মাধুর্যে পরিপূর্ণ। চাঞ্চল্য নেই অথচ অবসরও নেই। গ্রামের যে মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসে এবং জলের ধারে বসে বসে অতি যত্নে গামছা দিয়ে আপনার শরীরখানি মেজে তুলতে চায় তাদের সঙ্গে এর যেন প্রতিদিন মনের কথা এর ঘরকন্নার গল্প চলে।

আজ সন্ধ্যাবেলায় নদীর বাঁকের মুখে ভারি একটি নিরালা জায়গায় বোট লাগিয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, জলে একটিও নৌকা নেই—জ্যোৎস্না জলের উপর ঝিকমিক করছে—পরিষ্কার রাত্রি—নির্জন তীর—বহুদূরে ঘনবৃক্ষবেষ্টিত গ্রামটি সুষুপ্ত—কেবল ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে আর কোনো শব্দ নেই।

সাজাদপুর

ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১।

আমার সামনে নানারকম গ্রাম্য দৃশ্য দেখতে পাই, সে-গুলো আমার দেখতে বেশ লাগে। ঠিক আমার জানলার সুমুখে খালের ওপারে একদল বেদে বাখারির উপর খানকতক দরমা এবং কাপড় টাঙিয়ে দিয়ে তারি মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। গুটিতিনেক খুব ছোট্টো ছোট্টো ছাউনিমাত্র—তার মধ্যে মানুষের দাঁড়াবার জো নেই—ঘরের বাইরেই তাদের সমস্ত গৃহকর্ম চলে—কেবল রাত্তিরে সকলে মিলে কোনো প্রকারে জড়পুঁটুলি হয়ে সেই ঘরের মধ্যে ঘুমতে যায়। বেদে জাতটাই এই রকম। কোথাও বাড়ি ঘর নেই, কোনো জমিদারকে খাজনা দেয় না, একদল শুয়োর, গোটা তুয়েক কুকুর এবং কতকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। পুলিস সর্বদা এদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। আমাদের এখানে যারা আছে, আমি জানলায় দাঁড়িয়ে প্রায় তাদের কাজকর্ম দেখি। এদের দেখতে মন্দ নয়, হিন্দুস্থানী ধরণের। কালো বটে কিন্তু বেশ শ্রী আছে, জোরালো সুডোল শরীর। মেয়েদেরও বেশ দেখতে—ছিপছিপে লম্বা আঁটসাঁট, অনেকটা ইংরেজ মেয়েদের মতো শরীরের স্বাধীন ভঙ্গী, অর্থাৎ বেশ অসংকোচ চালচলন, নড়া-চড়ার মধ্যে সহজ সরল দ্রুতভাব আছে—আমার তো ঠিক

মনে হয় কালো ইংরেজের মেয়ে। পুরুষটা রান্না চড়িয়ে দিয়ে ব'সে ব'সে বাঁশ চিরে চিরে ধামা চাঙারি কুলো প্রভৃতি তৈরি করছে—মেয়েটা কোলের উপর একটা ছোটো আয়না নিয়ে অত্যন্ত সাবধানে একটি গামছা ভিজিয়ে বিশেষ যত্নের সঙ্গে দু তিনবার ক'রে মুছলে, তার পরে আঁচল টাঁচল গুলো একটু ইতস্তত টেনে টুনে সেরে সুরে নিয়ে বেশ ফিটফাট হয়ে পুরুষটার কাছে উবু হয়ে বসল, তার পরে একটু আধটু কাজে হাত দিতে লাগল। এরা নিতান্তই মাটির সন্তান, নিতান্তই পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে আছে—যেখানে-সেখানে জন্মাচ্ছে, পথে পথেই বেড়ে উঠছে এবং যেখানে-সেখানে মরছে, এদের ঠিক অবস্থাটা ঠিক মনের ভাবটা ভারি জানতে ইচ্ছে করে। দিনরাত খোলা আকাশে, খোলা-বাতাসে, অনাবৃত মৃত্তিকার উপরে এ একরকম নূতন রকমের জীবন, অথচ এরি মধ্যে কাজকর্ম ভালবাসা ছেলেপুলে ঘরকরনা সমস্তই আছে। কেউ যে একদণ্ড কুঁড়ে হয়ে ব'সে আছে তা দেখলুম না—একটা-না একটা কাজে আছেই। যখন হাতের কাজ ফুরোল তখন খপ ক'রে একজন মেয়ে আর একজন মেয়ের পিঠের কাছে ব'সে তার ঝুটি খুলে দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে উকুন বাচতে আরম্ভ ক'রে দিলে এবং বোধ করি সেই সঙ্গে, ঐ ছোটো তিনটে দরমা-ছাউনির ঘরকন্না সম্বন্ধে এক এক ক'রে গল্প জুড়ে দিলে, সেটা আমি এতদূর থেকে ঠিক নিশ্চিন্ত বলতে পারিনে, তবে অনেকটা অনুমান করা যেতে পারে। আজ সকালবেলায় এই নিশ্চিন্ত বেদের

পরিবারের মধ্যে একটা বিষম অশান্তি এসে জুটেছিল। তখন বেলা সাড়ে আটটা নটা হবে—রাত্রে শোবার কাঁথা এবং ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো বের ক'রে এনে দরমার চালের উপরে রোদ্দুরে মেলে দিয়েছে। শুয়োরগুলো বাচ্ছাকাচ্ছা সমেত সকলের গায়ে গায়ে লাগাও হয়ে একটা গর্তর মতো ক'রে তার মধ্যে মস্ত এক তাল কাদার মতো পড়েছিল—সমস্ত রাত শীতের পর সকাল বেলাকার রোদ্দুরে বেশ একটু আরাম বোধ করছিল—হঠাৎ তাদেরই একপরিবারভুক্ত কুকুর দুটো এসে ঘাড়ের উপর পড়ে ঘেউ ঘেউ ক'রে তাদের উঠিয়ে দিলে। বিরক্তির স্বর প্রকাশ ক'রে তারা ছোটো-হাজরি অন্বেষণে চতুর্দিকে চলে গেল। আমি আমার ডায়ারি লিখছি এবং মাঝে মাঝে সম্মুখের পথের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে দেখছি—এমন সময় বিষম একটা হাঁকডাক শোনা গেল। আমি উঠে জানলার কাছে গিয়ে দেখলুম বেদে আশ্রমের সম্মুখে লোক জড়ো হয়েছে—এবং ওরি মধ্যে একটু ভদ্রগোছের একজন লাঠি আস্ফালন ক'রে বিষম গাল মন্দ দিচ্ছে—কর্তা বেদে দাঁড়িয়ে নিতান্ত ভীত কম্পিত ভাবে কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করছে। বুঝতে পারলুম, কী একটা সন্দেহের কারণ হয়েছে তাই পুলিশের দারোগা এসে উপদ্রব বাধিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা ব'সে ব'সে আপন মনে বাখারি ছুলে যাচ্ছে, যেন সে একলা ব'সে আছে—এবং কোথাও কিছু গোলমাল নেই। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে পরম নির্ভীকচিত্তে দারোগার মুখের সামনে

বারবার বাহু আন্দোলন ক'রে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে। দেখতে দেখতে দারোগার তেজ প্রায় বারো আনা পরিমাণ কমে গেল—অত্যন্ত মৃদুভাবে দুটো একটা কথা বলবার চেষ্টা করলে কিন্তু একটুও অবসর পেলে না। যে ভাবে এসেছিল সে ভাব অনেকটা পরিবর্তন ক'রে ধীরে ধীরে চলে যেতে হোলো। অনেকটা দূরে গিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌লে "আমি এই ব'লে গেলাম, তোমাদের এখান হৎকে যাবার লাগবে।" আমি ভাবলুম আমার বেদে প্রতিবেশীরা এখনি বুঝি খুঁটি দরমা তুলে পুঁটলি বেঁধে ছানা পোনা নিয়ে শুয়োর তাড়িয়ে এখান থেকে প্রস্থান করবে। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ নেই; এখনো তারা নিশ্চিন্তভাবে ব'সে ব'সে বাখারি চিরছে, বাঁধছে বাড়ছে, উকুন বাচছে। আমার এই খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে নানা দৃশ্য দেখতে পাই। সবসুদ্ধ বেশ লাগে—কিন্তু এক একটা দেখে ভারি মন বিগড়ে যায়। গাড়ির উপর অসম্ভব ভার চাপিয়ে অসাধ্য রাস্তায় যখন গোরুকে কাঠির বাড়ি খোঁচা দিতে থাকে তখন আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। আজ সকালে দেখছিলুম একজন মেয়ে তার একটি ছোটো উলঙ্গ শীর্ণ কালো ছেলেকে এই খালের জলে নাওয়াতে এনেছে—আজ ভয়ংকর শীত পড়েছে—জলে দাঁড় করিয়ে যখন ছেলেটার গায়ে জল দিচ্ছে তখন সে করুণস্বরে কাঁদছে আর কাঁপছে, ভয়ানক কাশিতে তার গলা ঘন্ ঘন্ করছে—মেয়েটা হঠাৎ তার গালে এমন একটা চড় মারলে যে আমি আমার ঘর থেকে তার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

ছেলেটা বেঁকে পড়ে হাঁটুর উপর হাত দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল, কাশিতে তার কান্না বেধে যাচ্ছিল। তার-পরে ভিজে গায়ে সেই উলঙ্গ কম্পান্বিত ছেলের নড়া ধরে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল। এই ঘটনাটা নিদারুণ পৈশাচিক ব'লে বোধ হোলো। ছেলেটা নিতান্ত ছোটো—আমার খোকার বয়সী। এরকম একটা দৃশ্য দেখলে হঠাৎ মানুষের যেন একটা Idealএর উপর আঘাত লাগে—বিশ্বস্তচিত্তে চলতে চলতে খুব একটা হুঁচট লাগার মতো। ছোটো ছেলেরা কী ভয়ানক অসহায়—তাহাদের প্রতি অবিচার করলে তারা নিরুপায় কাতরতার সঙ্গে কেঁদে নিষ্ঠুর হৃদয়কে আরো বিরক্ত ক'রে তোলে; ভালো ক'রে আপনার নালিশ জানাতে পারে না। মেয়েটা শীতে সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন ক'রে এসেছে আর ছেলেটার গায়ে একটুকরো কাপড় নেই—তার উপরে কাশি—তার উপরে এই ডাকিনীর হাতে মার।

সাজাদপুর,

ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১।

এখানকার পোস্টমাস্টার এক একদিন সন্ধ্যার সময়ে এসে আমার সঙ্গে এইরকম ডাকের চিঠি যাতায়াত সম্বন্ধে নানা গল্প জুড়ে দেন। আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতালাতেই পোস্টআফিস বেশ সুবিধে—চিঠি আসবামাত্রই পাওয়া যায়। পোস্টমাস্টারের গল্প শুনতে আমার বেশ লাগে। বিস্তর অসম্ভব কথা বেশ গম্ভীরভাবে ব'লে যান। কাল বলছিলেন, এ দেশের লোকের গঙ্গার উপর এমন ভক্তি, যে এদের কোনো আত্মীয় মরে গেলে তার হাড় গুঁড়ো ক'রে রেখে দেয়, কোনোকালে গঙ্গার জল খেয়েছে এমন লোকের যদি সাক্ষাৎ পায় তাহলে তাকে পানের সঙ্গে সেই হাড় গুঁড়ো খাইয়ে দেয় আর মনে করে তার আত্মীয়ের একটা অংশের গঙ্গালাভ হোলো। আমি হাসতে হাসতে বললাম "এটা বোধ হয় গল্প।" তিনি খুব গম্ভীরভাবে চিন্তা ক'রে স্বীকার করলেন "তা হোতে পারে।"

শিলাইদহ,

ফেব্রুয়ারি ১৮৯১।

কাছারির পরপারের নির্জন চরে বোট লাগিয়ে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। দিনটা এবং চারিদিকটা এমনি সুন্দর ঠেকছে সে আর কী বলব। অনেক দিন পরে আবার এই বড়ো পৃথিবীটার সঙ্গে যেন দেখাসাক্ষাৎ হোলো। সেও বললে "এই যে।" আমি বললুম "এই যে।" তার পরে দুজনে পাশাপাশি বসে আছি আর কোনো কথাবার্তা নেই। জল ছলছল করছে এবং তার উপরে রোদ্দুর চিকচিক করছে—বালির চর ধূ ধূ করছে, তার উপর ছোটো ছোটো বনঝাউ উঠেছে। জলের শব্দ, দুপুরবেলাকার নিস্তব্ধতার ঝাঁ ঝাঁ, এবং ঝাউঝোপ থেকে দুটোএকটা পাখির চিকচিক শব্দ সবসুদ্ধ মিলে খুব একটা স্বপ্নাবিষ্ট ভাব। খুব লিখে যেতে ইচ্ছে করছে—কিন্তু আর কিছু নিয়ে নয়, এই জলের শব্দ, এই রোদ্দুরের দিন, এই বালির চর। মনে হচ্ছে রোজই ঘুরেফিরে এই কথাই লিখতে হবে; কেননা, আমার এই একই নেশা, আমি বারবার এই এককথা নিয়েই বকি। বড়ো বড়ো নদী কাটিয়ে আমাদের বোটটা একটা ছোটো নদীর মুখে প্রবেশ করছে। দুইধারে মেয়েরা স্নান করছে, কাপড় কাচছে, এবং ভিজে কাপড়ে একমাথা ঘোমটা টেনে জলের কলসী নিয়ে ডানহাত দুলিয়ে ঘরে চলেছে—ছেলেরা কাদা মেখে

জল ছুঁড়ে মাতামাতি করছে—এবং একটা ছেলে বিনা সুরে গান গাচ্ছে—"একবার দাদা ব'লে ডাক্‌রে লক্ষ্মণ।" উঁচু পাড়ের উপর দিয়ে অদূরবর্তী গ্রামের খড়ের চাল এবং বাঁশবনের ডগা দেখা যাচ্ছে। আজ মেঘ কেটে গিয়ে রোদ্দ‍ুর দেখা দিয়েছে। যে মেঘগুলো আকাশের প্রান্তভাগে অবশিষ্ট আছে সেগুলো সাদা তুলোর রাশের মতো দেখাচ্ছে। বাতাস ঈষৎ গরম হয়ে বচ্ছে। ছোটো নদীতে বড়ো বেশি নৌকো নেই; দুটো একটা ছোটো ডিঙি শুকনো গাছের ডাল এবং কাঠকুটো বোঝাই নিয়ে শ্রান্তভাবে ছপছপ দাঁড় ফেলে চলেছে—ডাঙায় বাঁশের উপর জেলেদের জাল শুকোচ্ছে—পৃথিবীর সকালবেলাকার কাজকর্ম খনিকক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে আছে।

চুহালি,

জলপথে ; ১৬ই জুন, ১৮৯১।

এখন পাল তুলে যমুনার মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমার বাঁ ধারে মাঠে গোরু চরছে—দক্ষিণ ধারে একেবারে কূল দেখা যাচ্ছে না। নদীর তীব্র স্রোতে তীর থেকে ক্রমাগতই ঝুপ ঝুপ করে মাটি খসে পড়ছে। আশ্চর্য এই, এত বড়ো প্রকাণ্ড এই নদীটার মধ্যে আমাদের বোট ছাড়া আর দ্বিতীয় একটি নৌকা দেখা যাচ্ছে না—চারিদিকে জলরাশি ক্রমাগতই ছল ছল খল খল শব্দ করছে—আর বাতাসের হু হু শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাল সন্ধের সময় একটা চরের উপর বোট লাগিয়েছিলুম—নদীটি ছোট্টো—যমুনার একটি শাখা—একপারে বহুদূর পর্যন্ত সাদা বালি ধূ ধূ করছে, জনমানবের সম্পর্ক নেই, আর এক পারে সবুজ শস্যক্ষেত্র এবং বহুদূরে একটি গ্রাম। আর কত বার বলব, এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে সন্ধ্যাটা কী চমৎকার—কী প্রকাণ্ড, কী প্রশান্ত, কী অগাধ ; সে কেবল স্তব্ধ হয়ে অনুভব করা যায় কিন্তু ব্যক্ত করতে গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়। ক্রমে যখন অন্ধকারে সমস্ত অস্পষ্ট হয়ে এল, কেবল জলের রেখা এবং তটের রেখায় একটা প্রভেদ দেখা যাচ্ছিল—এবং গাছপালা কুটীর সমস্ত একাকার হয়ে একটা ঝাপসা জগৎ চোখের সামনে বিস্তৃত পড়ে ছিল—তখন ঠিক

মনে হচ্ছিল এ সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার অপরূপ জগৎ—যখন এই বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পূর্ণ গঠিত হয়ে ওঠেনি—অল্পদিন হোলো সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে—প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতি বিস্ময়পূর্ণ ছমছম নিস্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন—যখন সাত সমুদ্র তেরোনদীর পারে মায়াপুরে পরমা-সুন্দরী রাজকন্যা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত—যখন রাজপুত্র এবং পাত্তরের পুত্র তেপান্তরের মাঠে একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে—এ যেন তখনকার সেই অতি সুদূরবর্তী অর্ধ-অচেতনায় মোহাচ্ছন্ন মায়ামিশ্রিত বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর এবং মনে করা যেতেও পারে আমি সেই রাজপুত্র—একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি এই ছোটো নদীটি সেই তেরোনদীর মধ্যে একটা নদী এখনো সাত সমুদ্র বাকি আছে—এখনো অনেক দূর, অনেক ঘটনা, অনেক অন্বেষণ বাকি; এখনো কত অজ্ঞাত নদীতীরে কত অপরিচিত সমুদ্রসীমায় কত ক্ষীণ চন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি অপেক্ষা ক'রে আছে—তার পরে হয়তো অনেক ভ্রমণ, অনেক রোদন, অনেক বেদনের পর হঠাৎ একদিন, আমার কথাটি ফুরোল নটে শাকটি মুড়োল—হঠাৎ মনে হবে এতক্ষণ একটা গল্প বলছিলুম—এখন গল্প ফুরিয়েছে, এখন অনেক রাত্রি, এখন ছোটো ছেলের ঘুমোবার সময়।

চুহালি,

১৯শে জুন, ১৮৯১।

কাল পনেরো মিনিট বাইরে বসতে না বসতে পশ্চিমে ভয়ানক মেঘ করে এল। খুব কালো গাঢ় আলুথালুরকমের মেঘ, তারি মাঝে মাঝে চোরা আলো প'ড়ে রাঙা হয়ে উঠেছে। দুটোএকটা নৌকা তাড়াতাড়ি যমুনা থেকে এই ছোটো নদীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে দড়িদড়া নোঙর দিয়ে মাটি আঁকড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। যারা মাঠে শস্য কাটতে এসেছিল তারা মাথায় একএক বোঝা শস্য নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে, গোরুও ছুটছে, তার পিছনে পিছনে বাছুর লেজ নেড়ে নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়বার চেষ্টা করছে। খানিক-বাদে একটা আক্রোশের গর্জন শোনা গেল; কতকগুলো ছিন্নভিন্ন মেঘ ভগ্নদূতের মতো সুদূর পশ্চিম থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল—তার পরে বিদ্যুৎ বজ্র ঝড় বৃষ্টি সমস্ত একসঙ্গে এসে পড়ে খুব একটা তুর্কি নাচন নাচতে আরম্ভ ক'রে দিলে—বাঁশ গাছগুলো হাউ হাউ শব্দে একবার পূর্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল—ঝড় যেন সোঁ সোঁ ক'রে সাপুড়ের মতো বাঁশি বাজাতে লাগল আর জলের ঢেউগুলো তিনলক্ষ সাপের মতো ফণা তুলে তালেতালে নৃত্য আরম্ভ ক'রে দিলে। কালকের সে যে কী কাণ্ড সে আর কী বলব। বজ্রের যে শব্দ সে আর থামে না—আকাশের

কোনখানে যেন একটা আস্ত জগৎ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। বোটের খোলা জানলার উপর মুখ রেখে প্রকৃতির সেই রুদ্র-তালে আমিও বসে বসে মনটাকে দোলা দিচ্ছিলুম। সমস্ত মনের ভিতরটা যেন ছুটি পাওয়া স্কুলের ছেলের মতো বাইরে ঝাঁপিয়ে উঠেছিল। শেষকালে বৃষ্টির ছাঁটে যখন বেশ একটু আর্দ্র হয়ে ওঠা গেল তখন জানলা এবং কবিত্ব বন্ধ ক'রে খাঁচার পাখির মতো অন্ধকারে চুপচাপ বসে রইলুম।

সাজাদপুর,

জলপথে ২০শে জুন, ১৮৯১।

কাল টেলিগ্রামের উত্তর পেয়ে আমাদের সমস্ত কাজ সেরে সন্ধ্যার সময় নৌকো ছেড়ে দিলুম। আকাশে মেঘ ছিল না—চাঁদ উঠেছিল—অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছিল—ঝুপঝুপ দাঁড় ফেলে স্রোতের মুখে ছোটো নদীটির মধ্যে ভেসে যাওয়া যাচ্ছিল। চারিদিক পরি-স্থান ব'লে মনে হচ্ছিল। সে সময়ে অন্যান্য সমস্ত নৌকা ডাঙায় কাছি বেঁধে পাল গুটিয়ে চন্দ্রালোকে স্তব্ধ হয়ে নিদ্রা দিচ্ছিল। অবশেষে ছোটো নদীটা যেখানে যমুনার মধ্যে গিয়ে পড়েছে তারি কাছে একটা খুব নিরাপদ স্থানে গিয়ে নৌকা বাঁধলে। কিন্তু নিরাপদ স্থানের অনেক দোষ; হাওয়া পাওয়া যায় না। ঝুপসির ভিতরে অন্যান্য নৌকোর কাছে—জঙ্গলের গন্ধ ইত্যাদি—আমি মাঝিকে বললুম—এপারে হাওয়া পাওয়া যাবে না, ওপারে চল্। ওপারে উঁচু পাড় নেই; জলে স্থলে সমান—এমন কি ধানের খেতের উপর এক হাঁটু জল উঠেছে। মাঝি সেইখানেই নৌকো নিয়ে বাঁধলে। তখন আমাদের পিছন দিকের আকাশে একটু বিদ্যুৎ চিকমিক করতে আরম্ভ করেছে। আমি বিছানায় ঢুকে জানলার কাছে মুখ রেখে খেতের দিকে চেয়ে আছি এমন সময় রব উঠল—ঝড় আসছে। কাছি ফেল্, নোঙর ফেল্, এ কর্, সে কর্, করতে

করতে এক প্রলয় ঝড় ছুটে এল। মাঝি থেকে থেকে বলতে লাগল—ভয় কোরো না ভাই আল্লার নাম করো আল্লা মালেক। থেকে থেকে সকলে আল্লা আল্লা করতে লাগল। আমাদের বোটের দুই পাশের পরদা বাতাসে আছাড় খেয়ে খেয়ে শব্দ করতে লাগল, আমাদের বোটটা যেন একটা শিকলিবাধা পাখির মতো পাখা ঝাপটে ঝটপট ঝটপট করছিল—ঝড়টা থেকে থেকে চীহিঁ চীহিঁ শব্দ ক'রে একটা বিপর্যয় চিলের মতো হঠাৎ এসে প'ড়ে বোটের ঝুঁটি ধ'রে ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়—বোটটা অমনি সশব্দে ধড়ফড় ক'রে ওঠে। অনেকক্ষণ বাদে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে ঝড় থেমে গেল। আমি হাওয়া খেতে চেয়েছিলুম—হাওয়াটা কিছু বেশি খাইয়ে দিলে—একেবারে আশাতিরিক্ত। যেন কে ঠাট্টা ক'রে ব'লে যাচ্ছিল—এইবার পেট ভরে হাওয়া খেয়ে নাও, তারপরে সাধ মিটলে কিঞ্চিৎ জল খাওয়াব—তাতে এমনি পেট ভরবে যে ভবিষ্যতে আর কিছু খেতে হবে না। আমরা কি না প্রকৃতির নাতি সম্পর্ক, তাই তিনি মধ্যেমধ্যে এই রকম একটুআধটু তামাশা ক'রে থাকেন। আমি তো পূর্বেই বলেছি জীবনটা একটা গম্ভীর বিদ্রূপ, এর মজাটা বোঝা একটু শক্ত—কারণ, যাকে নিয়ে মজা করা হয়, মজার রসটা সে তেমন গ্রহণ করতে পারে না। এই মনে করো, দুপুর রাত্রে খাটে শুয়ে আছি, হঠাৎ পৃথিবীটা ধরে এমনি নাড়া দিলে যে কে কোথায় পালাবে পথ পায় না—মৎলবটা খুব নতুন রকমের এবং মজাটা খুব আকস্মিক তার

আর সন্দেহ নেই—বড়ো বড়ো সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের অর্ধেক রাত্রে ঊর্ধ্বশ্বাসে অসম্বৃত অবস্থায় বিছানার বাইরে দৌড় করানো কি কম কৌতুক। এবং দুটো একটা সদ্যনিদ্রোত্থিত হতবুদ্ধি নিরীহ লোকের মাথার উপরে বাড়ির আস্ত ছাতটা ভেঙে আনা কি কম ঠাট্টা। হতভাগ্য লোকটা যেদিন ব্যাঙ্কে চেক্ লিখে রাজমিস্ত্রির বিল শোধ করছিল, রহস্যপ্রিয়া প্রকৃতি সেইদিন বসে বসে কত হেসেছিল।

সাজাদপুর,

২২শে জুন, ১৮৯১।

আজকাল আমার এখানে এমন চমৎকার জ্যোৎস্না রাত্রি হয় সে আর কী বলব। অবশ্য যে ঠিকানায় এ চিঠি গিয়ে পৌঁছবে সেখানেও যে জ্যোৎস্নারাত্রি হয় না তা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। স্বীকার করতেই হবে সেখানে সেই ময়দানের উপর, সেই গির্জের চূড়ার উপর সম্মুখের নিস্তব্ধ গাছপালার উপর ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না আপনার নীরব অধিকার বিস্তার করে কিন্তু সেখানে জ্যোৎস্না ছাড়াও অন্য পাঁচটা বস্তু আছে—কিন্তু আমার এই নিস্তব্ধ রাত্রি ছাড়া আর কিছুই নেই। একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতরে কী অনন্ত শান্তি এবং সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারিনে। একদল আছে তারা ছটফট করে, জগতের সকল কথা জানতে পারছিনে কেন—আর একদল ছটফটিয়ে মরে মনের সকল ভাব প্রকাশ করতে পারছিনে কেন—মাঝের থেকে জগতের কথা জগতেই থেকে যায় এবং অন্তরের কথা অন্তরেই থাকে। মাথাটা জানলার উপর রেখে দিই, বাতাস প্রকৃতির স্নেহহস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছলছল শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্ ঝিক্ করতে থাকে এবং অনেক সময় "জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়।" অনেক

সময় মনের আন্তরিক অভিমান, একটু স্নেহের স্বর শুনলেই অমনি অশ্রুজলে ফেটে পড়ে;—এই অপরিতৃপ্ত জীবনের জন্যে প্রকৃতির উপর আমাদের যে আজন্মকালের অভিমান আছে, যখনি প্রকৃতি স্নেহমধুর হয়ে ওঠে তখনি সেই অভিমান, অশ্রুজল হয়ে, নিঃশব্দে ঝরে পড়তে থাকে—তখন প্রকৃতি আরো বেশি ক'রে আদর করে, এবং তার বুকের মধ্যে অধিকতর আবেগের সহিত মুখ লুকোই।

———

সাজাদপুর,
২৩শে জুন, ১৮৯১ ।

আজকাল দুপুর বেলাটা বেশ লাগে। রৌদ্রে চারিদিক বেশ নিঃঝুম হয়ে থাকে—মনটা ভারি উড়ু উড়ু করে, বই হাতে নিয়ে আর পড়তে ইচ্ছে করে না। তীরে যেখানে নৌকো বাঁধা আছে সেইখান থেকে একরকম ঘাসের গন্ধ এবং থেকে থেকে পৃথিবীর একটা গরম ভাপ্ গায়ের উপরে এসে লাগতে থাকে—মনে হয় এই জীবন্ত উত্তপ্ত ধরণী আমার খুব নিকটে থেকে নিঃশ্বাস ফেলছে—বোধ করি আমারো নিঃশ্বাস তার গায়ে গিয়ে লাগছে। ছোটো ছোটো ধানের গাছগুলো বাতাসে ক্রমাগত কাঁপছে—পাতিহাঁস জলের মধ্যে নেবে ক্রমাগত মাথা ডুবোচ্ছে এবং চঞ্চু দিয়ে পিঠের পালক সাফ করছে। আর কোনো শব্দ নেই, কেবল জলের বেগে বোটটা যখন ধীরে ধীরে বেঁকতে থাকে তখন কাছিটা এবং বোটের সিঁড়িটা এক রকম করুণ মৃদু শব্দ করতে থাকে। অনতিদূরে একটা খেয়াঘাট আছে। বটগাছের তলায় নানাবিধ লোক জড়ো হয়ে নৌকোর জন্যে অপেক্ষা করছে—নৌকো আসবামাত্রই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ছে—অনেকক্ষণ ধরে এই নৌকোপারাপার দেখতে বেশ লাগে। ওপারে হাট; তাই খেয়া নৌকোয় এত ভীড়। কেউবা ঘাসের বোঝা, কেউবা একটি চুপড়ি, কেউবা একটা বস্তা কাঁধে ক'রে হাটে

যাচ্ছে এবং হাট থেকে ফিরে আসছে—ছোটো নদীটি এবং দুই পারের দুই ছোটো গ্রামের মধ্যে নিস্তব্ধ দুপুরবেলায় এই একটুখানি কাজকর্ম, মনুষ্যজীবনের এই একটুখানি স্রোত, অতি ধীরে ধীরে চলছে। আমি বসে বসে ভাবছিলুম, আমাদের দেশের মাঠ ঘাট আকাশ রোদ্দুরের মধ্যে এমন একটা সুগভীর বিষাদের ভাব কেন লেগে আছে। তার কারণ এই মনে হোলো আমাদের দেশে প্রকৃতিটা সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে—আকাশ মেঘমুক্ত, মাঠের সীমা নেই, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে, এর মধ্যে মানুষকে অতি সামান্য মনে হয়—মানুষ আসছে এবং যাচ্ছে—এই খেয়ানৌকার মতো পারাপার হচ্ছে—তাদের অল্প অল্প কলরব শোনা যায়, এই সংসারের হাটে ছোটোখাটো সুখদুঃখের চেষ্টায় একটুখানি আনাগোনা দেখা যায়,—কিন্তু এই অনন্তপ্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে সেই মৃদুগুঞ্জন, সেই একটুআধটু গীতধ্বনি, সেই নিশিদিন কাজকর্ম কী সামান্য, কী ক্ষণস্থায়ী, কী নিষ্ফল কাতরতাপূর্ণ মনে হয়। এই নিশ্চেষ্ট, নিস্তব্ধ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্দেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎ সৌন্দর্য-পূর্ণ নির্বিকার উদার শান্তি দেখতে পাওয়া যায় এবং তারি তুলনায় আপনার মধ্যে এমন একটা সততসচেষ্ট পীড়িত জর্জরিত ক্ষুদ্র নিত্যনৈমিত্তিক অশান্তি দেখতে পাওয়া যায় যে ঐ অতিদূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখার দিকে চেয়ে নিতান্ত উন্মনা হয়ে যেতে হয়। "ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান তরুমর্মর পবনে" ইত্যাদি। যেখানে মেঘে

কুয়াশায় বরফে অন্ধকারে প্রকৃতি আচ্ছন্ন সংকুচিত, সেখানে মানুষের খুব কর্তৃত্ব—মানুষ সেখানে আপনার সকল কাজকে সকল চেষ্টাকে চিরস্থায়ী মনে করে—আপনার সকল ইচ্ছা চিহ্নিত করে রেখে দেয়—পষ্টারিটির দিকে তাকায়, কীর্তিস্তম্ভ তৈরি করে, জীবনচরিত লেখে, এবং মৃতদেহের উপরেও পাষাণের চিরস্মরণগৃহ নির্মাণ করে—তারপরে অনেক চিহ্ন ভেঙে যায় এবং অনেক নাম বিস্মৃত হয় কিন্তু সময়াভাবে সেটা কারো খেয়ালে আসে না।

সাজাদপুর।

বিকেলবেলায় আমি এখানকার গ্রামের ঘাটের উপরে বোট লাগাই। অনেকগুলো ছেলে মিলে খেলা করে, ব'সে ব'সে দেখি। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে নিশিদিন যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তাদের জ্বালায় আর আমার মনের সুখ নেই। ছেলেদের খেলা তারা বেআদবি মনে করে; মাঝিরা যদি আপনাদের মধ্যে মন খুলে হাসি গল্প করে সেটা তারা রাজার প্রতি অসম্মান জ্ঞান করে; চাষারা যদি ঘাটে গোরুকে জল খাওয়াতে নিয়ে আসে তারা তৎক্ষণাৎ লাঠি হাতে করে রাজমর্যাদা রক্ষা করতে ধাবিত হয়। অর্থাৎ রাজার চতুর্দিকটা হাসিহীন খেলাহীন শব্দহীন জনহীন ভীষণ মরুভূমি করতে পারলে তাদের মনের মতন রাজসম্ভ্রম রক্ষা হয়। কালও তারা তাদের তাড়া করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি আমার রাজমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের নিবারণ করলুম। ঘটনাটা হচ্ছে এই—

ডাঙার উপর একটা মস্ত নৌকার মাস্তুল পড়ে ছিল—গোটাকতক বিবস্ত্র খুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে, যে যদি যথোচিত কলরবসহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ানো যেতে পারে তাহলে খুব একটা নতুন এবং আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা, অমনি কার্যারম্ভ, "সাবাস জোয়ান—হেঁইয়ো। মারো ঠেলা

হেঁইয়ো।” মাস্তুল যেমনি একপাক ঘুরছে অমনি সকলের আনন্দে উচ্চহাস্য। কিন্তু এই ছেলেদের মধ্যে যে দুটি-একটি মেয়ে আছে, তাদের ভাব আর-একরকম। সঙ্গী-অভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হয়েছে কিন্তু এই সকল শ্রমসাধ্য উৎকট খেলায় তাদের মনের যোগ নেই। একটি ছোটো মেয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে গম্ভীর-প্রশান্তভাবে সেই মাস্তুলটার উপর গিয়ে চেপে বসল। ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি। দুই একজন ভাবলে এমনস্থলে হার-মানাই ভালো; তফাতে গিয়ে তারা ম্লানমুখে সেই মেয়েটির অটল গাম্ভীর্য নিরীক্ষণ করতে লাগল। ওদের মধ্যে একজন এসে পরীক্ষাস্থলে মেয়েটাকে একটুএকটু ঠেলতে চেষ্টা করলে। কিন্তু সে নীরবে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করতে লাগল। সর্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটি এসে তাকে বিশ্রামের জন্যে অন্য স্থান নির্দেশ ক'রে দিলে, সে তাতে সতেজে মাথা নেড়ে কোলের উপর দুটি হাত জড়ো করে নড়েচড়ে আবার বেশ গুছিয়ে বসল—তখন সেই ছেলেটা শারীরিক যুক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলে এবং অবিলম্বে কৃতকার্য হোলো। আবার অভ্রভেদী আনন্দধ্বনি উঠল, পুনর্বার মাস্তুল গড়াতে লাগল—এমন কি, খানিকক্ষণ বাদে মেয়েটাও তার নারী-গৌরব এবং সুমহৎ নিশ্চেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ ক'রে কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ছেলেদের এই অর্থহীন চপলতায় যোগ দিলে। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল সে মনে মনে বলছিল—ছেলেরা খেলা করতে জানে না, কেবল যতরাজ্যের ছেলেমানুষি।

হাতের কাছে যদি একটা খোঁপাওয়ালা হলদে রঙের মাটির বেনে পুতুল থাকত তাহলে সে কি আর এই অপরিণতবুদ্ধি নিতান্ত শিশুদের সঙ্গে মাস্তুল ঠেলার মতো এমন একটা বাজে খেলায় যোগ দিত। এমনসময় আর একরকমের খেলা তাদের মনে এল, সেটাও খুব মজার। দুজন ছেলেতে মিলে একটা ছেলের হাত পা ধরে ঝুলিয়ে তাকে দোলা দেবে। এর ভিতরে খুব একটা রহস্য আছে সন্দেহ নেই—কারণ ছেলেরা বেজায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু মেয়েটার পক্ষে অসহ্য হোলো। সে অবজ্ঞাভরে ক্রীড়াক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে ঘরে চলে গেল। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটল। যাকে দোলাচ্ছিল সে গেল পড়ে। সেই অভিমানে সে সঙ্গীদের ত্যাগ করে বহুদূরে গিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে তৃণশয্যায় শুয়ে পড়ল—ভাবে এই রকম জানালে—এই পাষাণহৃদয় জগৎসংসারের সঙ্গে সে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না, কেবল একলা চীৎ হয়ে শুয়ে আকাশের তারা গণনা করবে, মেঘের খেলা দেখে হাতে মাথা রেখে জীবন কাটিয়ে দেবে এবং "যাবত জীবন র'বে কারো সঙ্গে খেলিব না।" তার এইরকম অকালে পরম বৈরাগ্য দেখে বড়ো ছেলেটা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে কোলের উপর তার মাথাটা নিয়ে সান্ত্বনয়স্বরে অনুতাপ প্রকাশ করে বলতে লাগল, আয় না ভাই, ওঠ্ না ভাই, লেগেছে ভাই! অনতিকাল পরেই দুই কুকুরশাবকের মতো দুজনের হাতকাড়াকাড়ি খেলা বেঁধে গেল—এবং দুমিনিট না যেতে দেখি সেই ছেলে ফের দুলতে আরম্ভ করেছে। এমনি

মানুষের প্রতিজ্ঞা। এমনি তার মনের বল। এমনি তার বুদ্ধির স্থিরতা। খেলা ছেড়ে একবার দূরে গিয়ে চীৎ হয়ে শোয় আবার ধরা দিয়ে হেসে হেসে মোহদোলায় দুলতে থাকে। এ মানুষের মুক্তি কী ক'রে হবে। এমন কজন ছেলে আছে যে খেলাঘর ছেড়ে মাথায় হাত দিয়ে কেবল চীৎ হয়ে পড়ে থাকে—সেই সব ভালোছেলেদের জন্যে গোলকধামে বাসা তৈরি হচ্ছে।

সাজাদপুর,

জুন, ১৮৯১।

কাল রাত্রে ভারি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলুম। সমস্ত কলকাতা শহরটা যেন মহা একটা ভীষণ অথচ আশ্চর্য ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে—বাড়িঘর সমস্তই একটা অন্ধকার কালো কুয়াশার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে—এবং তার ভিতর তুমুল কী একটা কাণ্ড চলছে। আমি একটা ভাড়াটে গাড়ি ক'রে পার্কস্ট্রীটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। যেতে যেতে দেখলুম সেণ্ট জেভিয়ার কলেজটা দেখতে দেখতে হুহু ক'রে বেড়ে উঠছে—সেই অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে অসম্ভব উঁচু হয়ে উঠছে। তারপরে ক্রমে জানতে পারলুম একদল অদ্ভুত লোক এসেছে তারা টাকা পেলে কী এক কৌশলে এইরকম অপূর্ব ব্যাপার করতে পারে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি এসে দেখি সেখানেও তারা এসেছে; বদ্‌ দেখতে, কতকটা মোঙ্গোলিয়ান ধাঁচের চেহারা—সরু গোঁপ, গোটা দশ বারো দাঁড়ি মুখের এদিকে ওদিকে খোঁচাখোঁচা রকম বেরিয়েছে। তারা মানুষকেও বড়ো করে দিতে পারে। তাই আমাদের দেউড়িতে আমাদের বাড়ির সব মেয়েরা লম্বা হবার জন্যে উমেদার হয়েছেন—তাঁরা এঁদের মাথায় কী একটা গুঁড়ো দিচ্ছে আর এঁরা হুস ক'রে লম্বা হয়ে উঠছেন। আমি কেবলি বলছি, কী আশ্চর্য, এ যেন ঠিক স্বপ্নের মতো মনে

হচ্ছে। তার পরে, কে একজন প্রস্তাব করলে আমাদের বাড়িটা উঁচু ক'রে দিতে। তারা রাজি হয়ে বাড়ি কতকটা ভাঙতে আরম্ভ করলে, খানিকটা ভেঙেচুরে বললে, এইবার এত টাকা চাই নইলে বাড়িতে হাত দেব না, কুঞ্জসরকার বললে সে কি হয়; কাজ না হয়ে গেলে কী ক'রে টাকা দেওয়া যায়। বলতেই তারা চটে উঠল—বাড়িটা সমস্তই একরকম বেঁকে চুরে বিশ্রী হয়ে গেল এবং মাঝে মাঝে দেখা গেল, আধখানা মানুষ দেয়ালের মধ্যে গাঁথা রয়েছে, আধখানা বেরিয়ে। সমস্ত দেখে শুনে মনে হোলো এ সব শয়তানী কাণ্ড। বড়দাদাকে বললুম "বড়দা, দেখছেন ব্যাপারটা। আসুন একবার উপাসনা করা যাক।" দালানে গিয়ে খুব একাগ্রমনে উপাসনা করা গেল। বেরিয়ে এসে মনে করলুম ঈশ্বরের নাম ক'রে তাদের ভর্ৎসনা করব—কিন্তু বুক ফেটে যেতে লাগল তবু গলা দিয়ে কথা বেরোল না। তারপর কখন জেগে উঠলুম ঠিক মনে পড়ছে না। ভারি অদ্ভুত স্বপ্ন না? সমস্ত কলকাতা শহরে শয়তানের প্রাদুর্ভাব; সবাই তার সাহায্যে বেড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে, একটা অন্ধকার নারকী কুজ্ঝটিকার মধ্যে সমস্ত শহরের ভয়ংকর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু ওর মধ্যে একটু পরিহাসও ছিল—এত দেশ থাকতে জেস্যুয়িট্‌দের ইস্কুলটার উপরেই শয়তানের এত অনুগ্রহ কেন।

* * তারপরে এখানকার স্কুলের মাস্টারেরা দর্শনাভিলাষী হয়ে এসে উপস্থিত। তাঁরা কিছুতেই উঠতে চান না, অথচ

আমার তেমন কথা জোগায় না—পাঁচ মিনিট অন্তর দুইএক কথা জিজ্ঞাসা করি ; তার একআধটা উত্তর পাই, তার পরে বোকার মতো বসে থাকি, কলম নাড়ি মাথা চুলকোই—জিজ্ঞাসা করি এবার এখানে শস্য কী রকম হয়েছে—স্কুল-মাস্টাররা শস্যসম্বন্ধে কিছুই জানেন না—ছাত্রসম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় তা আরম্ভেই হয়ে গেছে ; ফের আবার গোড়ার কথা পাড়লুম, জিজ্ঞাসা করলুম আপনাদের স্কুলে কজন ছাত্র। একজন বললেন আশি জন, আর একজন বললেন না একশ পচাত্তর জন। মনে করলুম দুজনের মধ্যে খুব একটা তর্ক বেধে যাবে, কিন্তু দেখলুম, তৎক্ষণাৎ মতের ঐক্য হয়ে গেল। তারপরে দেড় ঘণ্টা পরে কেন যে তাঁদের মনে পড়ল আজ তবে আসি, তা ঠিক বোঝা শক্ত—আর এক ঘণ্টা পূর্বেও মনে হোতে পারত, আর বারো ঘণ্টা পরেও মনে হোতে পারত। দেখা যাচ্ছে এর ভিতরে কোনো একটা নিয়ম নেই, অন্ধ দৈবঘটনা মাত্র।

সাজাদপুর
৪ঠা জুলাই, ১৮৯১।

আমাদের ঘাটে একটি নৌকো লেগে আছে, এবং এখানকার অনেকগুলি "জনপদবধূ" তার সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় একজন কে কোথায় যাচ্ছে এবং তাকে বিদায় দিতে সবাই এসেছে। অনেকগুলি কচিছেলে অনেকগুলি ঘোমটা এবং অনেকগুলি পাকা চুল একত্র হয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে তার প্রতিই আমার মনোযোগটা সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় বয়সে বারো-তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্ট পুষ্ট হওয়াতে চোদ্দো পনেরো দেখাচ্ছে। মুখখানি বেড়ে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরলভাব। একটা ছেলে কোলে ক'রে এমন নিঃসংকোচ কৌতূহলের সঙ্গে আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। তার মুখখানিতে কিছু যেন নির্বুদ্ধিতা কিংবা অসরলতা কিংবা অসম্পূর্ণতা নেই। বিশেষত আধা ছেলে আধা মেয়ের মতো হয়ে আরো একটু বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছেলেদের মতো আত্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব এবং তার সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারি নতুনরকমের একটি মেয়ে তৈরি হয়েছে। বাংলা দেশে যে এরকম ছাঁদের "জনপদবধূ" দেখা যাবে এমন প্রত্যাশা

করিনি। দেখছি এদের বংশটাই তেমন বেশি লাজুক নয়। একজন মেয়ে ডাঙায় দাঁড়িয়ে রৌদ্রে চুল এলিয়ে দশাঙ্গুলি দ্বারা জটা ছাড়াচ্ছে এবং নৌকোর আর একটি রমণীর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ঘরকর্নার আলাপ হচ্ছে। শোনা গেল তার একটি মাত্র "ম্যায়া" অন্য "ছাওয়াল নাই"—কিন্তু সে মেয়েটির বুদ্ধিসুদ্ধি নেই—"কারে কী কয় কারে কী হয়—আপন পর জ্ঞান নেই"—আরো অবগত হওয়া গেল গোপাল সা'র জামাইটি তেমন ভালো হয়নি, মেয়ে তার কাছে যেতে চায় না। অবশেষে যখন যাত্রার সময় হোলো তখন দেখলুম আমার সেই চুলছাঁটা, গোলগাল হাতে-বালা পরা, উজ্জ্বল সরল মুখশ্রী মেয়েটিকে নৌকোয় তুললে। বুঝ্লুম, বেচারা বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে। নৌকো যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, দুই একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাকচোখ মুছতে লাগল। একটি ছোটো মেয়ে, খুব এঁটে চুল বাঁধা, একটি বর্ষীয়সীর কোলে চড়ে তার গলা জড়িয়ে তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। যে গেল সে বোধ হয় এ বেচারির দিদিমণি, এর পুতুলখেলায় বোধ হয় মাঝেমাঝে যোগ দিত, বোধ হয় দুষ্টমি করলে মাঝেমাঝে সে একে ঢিপিয়ে দিত। সকালবেলাকার রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদে পূর্ণ বোধ হোতে লাগল। সকাল-বেলাকার একটা অত্যন্ত হতাশ্বাস করুণ রাগিণীর মতো। মনে হোলো সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায়

পরিপূর্ণ। এই অজ্ঞাত ছোটো মেয়েটির ইতিহাস আমার যেন অনেকটা পরিচিত হয়ে গেল। বিদায়কালে এই নৌকো করে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্যে যেন আরো একটু বেশি করুণা আছে। অনেকটা যেন মৃত্যুর মতো—তীর-থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া—যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। জানি, এই গভীর বেদনাটুকু, যারা রইল এবং যে গেল উভয়েই ভুলে যাবে, হয়তো এতক্ষণে অনেকটা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বেদনাটুকু ক্ষণিক এবং বিস্মৃতিই চিরস্থায়ী কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এই বেদনাটুকু বাস্তবিক সত্য – বিস্মৃতি সত্যি নয়। একএকটা বিচ্ছেদ এবং একএকটা মৃত্যুর সময় মানুষ সহসা জানতে পারে এই ব্যথাটা কী ভয়ংকর সত্য। জানতে পারে, যে মানুষ কেবল ভ্রমক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকে। কেউ থাকে না—এবং সেইটে মনে করলে মানুষ আরো ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কেবল যে থাকব না তা নয়, কারো মনেও থাকব না। একেবারে আমাদের দেশের করুণ রাগিণী ছাড়া সমস্ত মানুষের পক্ষে আর কোনো গান সম্ভবে না।

কটকাভিমুখ জলপথে।
আগস্ট, ১৮৯১।

পরিধেয় বস্ত্র প্রতিদিন মলিন এবং অসহ্য হয়ে আসছে অথচ কাপড়ের ব্যাগটি নেই, একথা চিত্তের মধ্যে অহর্নিশি জাগরুক থাকলে ভদ্রলোকের আত্মসম্ভ্রম দূর হয়ে যায়। সেই ব্যাগটা থাকলে যেরকম উন্নতমস্তকে সতেজে জনসমাজে বিচরণ করতে পারতুম এখন আর তা পারিনে। কোনো-মতে নিজেকে প্রচ্ছন্ন এবং সাধারণের দৃষ্টিঅন্তরালে রাখতে ইচ্ছা করছে। এই কাপড় পরেই রাত্রে শয়ন করছি, এবং প্রাতঃকালে প্রকাশিত হচ্ছি। স্টীমারে আবার সর্বত্রই কয়লার গুঁড়ো এবং মলিনতা, মধ্যাহ্নের অসহ্য উত্তাপে সর্ব-শরীর বাষ্পাকুল হয়ে উঠছে। তা ছাড়া স্টীমারে যে সুখে আছি সে কথা লিখে আর কী করব। কত রকমের যে সঙ্গী জুটেছে তার আর সংখ্যা নেই। অঘোরবাবু ব'লে একটি কে এসেছে সে পৃথিবীর সমস্ত জড় এবং চেতনপদার্থকে মামাশ্বশুরের ভাগনে ব'লে উল্লেখ করছে। আরএকটি সংগীতকুশল লোক অর্ধেক রাত্রে ভৈঁরো আলাপ করতে লাগল। বিবিধ কারণে সেটা নিতান্ত অসাময়িক ব'লে বোধ হোতে লাগল। একটা সুঁড়ি খালের মধ্যে জাহাজ

আটকে কাল বিকেল থেকে আজ নটা পর্যন্ত যাপন করা গেছে। সমস্ত যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে ডেকের এক ধারে নির্জীব এবং বিমর্ষভাবে শুয়ে ছিলুম। খানসামাজিকে বলেছিলুম রাতে লুচি তৈরি করতে—সে কতকগুলি আকার-প্রকারহীন ভাজা ময়দা তৈরি করে এনেছিল, তার সঙ্গে ছোকা কিংবা ভাজাভুজির উপলক্ষমাত্র ছিল না।—দেখে আমি কিঞ্চিৎ বিস্ময় এবং আক্ষেপ প্রকাশ করলুম—সে ব্যক্তি তটস্থ হয়ে বললে, হুম্ আবি বনা দেতা—রাত্রের আধিক্য দেখে আমি তাতে অসম্মত হয়ে যথাসাধ্য শুষ্ক লুচি খেয়ে আলো এবং লোক জনের মধ্যে শুয়ে পড়লুম—শূন্যে মশা এবং চতুষ্পার্শ্বে আরসোলা সঞ্চরণ করছে—ঠিক পায়ের কাছেই আরএক ব্যক্তি শয়ন করেছে, তার গায়ে মাঝেমাঝে আমার পা ঠেকছে, চারটে পাঁচটা নাক অবিরাম ডাকছে, মশকদষ্ট বীতনিদ্র হতভাগ্যগণ তামাক টানছে—এবং এরি মধ্যে ভৈঁরো রাগিণী। রাত যখন সাড়ে তিনটে তখন কতকগুলি ব্যস্তবাগীশ লোক পরস্পরকে জাগ্রত হোতে উৎসাহিত করতে লাগল। আমি নিতান্ত কাতরভাবে শয্যা ত্যাগ করে আমার চৌকিটাতে ঠেস দিয়ে প্রভাতের প্রতীক্ষায় বসে রইলুম। একটা বিচিত্র অভিশাপের মতো রাতটা কেটে গেল। একটা খালাসির কাছে সংবাদ পেলুম স্টীমার এমনি আটকে গেছে আজ সমস্ত দিন নড়বে না। একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলুম কলকাতামুখী কি কোনো জাহাজ ইতিমধ্যে পাওয়া যাবে, সে হেসে বললে এই

জাহাজই গম্যস্থানে পৌঁছে পুনশ্চ কলকাতায় ফিরবে অতএব ইচ্ছে করলে এই জাহাজে করেই ফিরতে পারি। সৌভাগ্যক্রমে অনেক টানাটানির পর প্রায় দশটার কাছাকাছি জাহাজ চলতে আরম্ভ করলে।

চাঁদনি চক, কটক,
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯১।

——বাবু খুব মোটাসোটা বর্ধিষ্ণু চেহারার লোক—তাঁর ভাবখানা খুব একজন লম্বাচৌড়া কৃষ্ণবিষ্ণুর মতো। বয়স যথেষ্ট হয়েছে—একখানি কোঁচানো চাদর কাঁধে, ফিটফাটসাজ, গায়ে এসেন্সের গন্ধ, তু-থাক চিবুক, প্রমাণসই গোঁফ, কপাল গড়ানে, বড়োবড়ো ড্যাবা চোখ আত্মম্ভরিতায় অর্ধনিমীলিত, কথা কবার সময় চোখের তারা আকাশের দিকে ওঠে—জলদ-গম্ভীরস্বরে অতি মৃদুমন্দ সুস্থ সহাস্যভাবে কথা ক'ন,—সময় যেন অনুগত ভৃত্যের মতো তাঁর অবসর অপেক্ষায় এক পাশে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে—কোনো বিষয়ে তিলমাত্র তাড়া নেই। চোখ তুটো উলটে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন "জ্যোতি এখন কোথায় আছে।" প্রশ্নকর্তার অবিচলিত গাম্ভীর্যে আমার অন্তঃকরণ সসম্ভ্রমে শশব্যস্ত হয়ে উঠল—আমি মৃতু বিনীতভাবে আমার দাদার রাজধানীতে অবস্থান জ্ঞাপন করলুম। তিনি বললেন "বীরেন্দ্রের সঙ্গে আমি একসঙ্গে পড়েছি।" শুনে আমার চিত্ত আরো অভিভূত হয়ে পড়ল। এর উপরে যখন তিনি—কারো পরামর্শের অপেক্ষা না রেখে অকস্মাৎ অসময়ে এখানে আসাসম্বন্ধে আমার বালকোচিত অবিবেচনার উল্লেখ করলেন তখন আমি কী রকম ম্লান অপ্রতিভ হয়ে গেলুম সে অনুমান করা শক্ত হবে

না। আমি কেবলি নতমুখে বারবার বলতে লাগলুম—আমি প্রকৃত অবস্থা কিছুই জানতুম না—আর কখনো আসিনি, এই প্রথম আসছি। তার থেকে তর্ক উঠল "জ্যোতি কখন্ এসেছিল"—সময়নির্ণয়সম্বন্ধে বরদার সঙ্গে তাঁর ঘোর অনৈক্য হোলো। তিনি ৭৪।৭৫ বলেন, বরদা বলেন তার পূর্বে। এর থেকেই বুঝতে পারা যাবে ইতিহাস লেখা কত শক্ত। তাই মনে করছি এইবার থেকে আমার চিঠিতে তারিখ দিতে হবে।

তিরণ,

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯১।

বালিয়ার ঘাটটি বেশ দেখতে। দুই ধারে বেশ বড়োবড়ো গাছ—সবসুদ্ধ খালটা দেখে সেই পুণার ছোটো নদীটি মনে পড়ে।

আমি ভালো করে ভেবে দেখলুম এই খালটাকে যদি নদী ব'লে জানতুম তাহলে ঢের বেশি ভালো লাগত। দুই তীরে বড়ো নারকেল গাছ, আমগাছ এবং নানাজাতীয় ছায়াতরু, ঢালু পরিষ্কার তট সুন্দর সবুজ ঘাস এবং অসংখ্য পুষ্পিত লজ্জাবতী লতায় আচ্ছন্ন; কোথাও বা কেয়াবন; যেখানে গাছগুলি একটু বিরল সেইখান থেকে দেখা যায় খালের উঁচু পাড়ের নিচে একটা অপার মাঠ ধূ ধূ করছে, বর্ষাকালে শস্য-ক্ষেত্র এমনি গাঢ় সবুজ হয়েছে যে দুটি চোখ যেন একেবারে ডুবে যায়—মাঝে মাঝে খেজুর এবং নারকেল গাছের মণ্ডলীর মধ্যে ছোটো ছোটো গ্রাম;—এই সমস্ত দৃশ্য বর্ষাকালের স্নিগ্ধ মেঘাচ্ছন্ন আনত আকাশের নিচে শ্যামচ্ছায়াময় হয়ে আছে। খালটি তার দুই পরিষ্কার সবুজ শষ্পতটের মাঝখান দিয়ে সুন্দর ভঙ্গীতে বেঁকেবেঁকে চলে গেছে। মৃদুমৃদু স্রোত; যেখানে খুব সংকীর্ণ হয়ে এসেছে সেখানে জলের কিনারার কাছে কাছে কুমুদবন এবং বড়োবড়ো ঘাস দেখা দিয়েছে। কিন্তু তবু মনের মধ্যে একটা আক্ষেপ থেকে যায় এটা একটা কাটা

খাল বই নয়—এর জলকলধ্বনি মধ্যে অনাদি প্রাচীনত্ব নেই, এ কোনো দূর দুর্গম জনহীন পর্বতগুহার রহস্য জানে না; কোনো একটি প্রাচীন স্ত্রী-নাম ধারণ ক'রে অতি অজ্ঞাত-কাল থেকে দুইতীরের গ্রামগুলিকে স্তন্যদান ক'রে আসেনি—এ কখনো কুলুকুলু ক'রে বলতে পারে না—

মেন মে কাম্ অ্যাণ্ড মেন্ মে গো,
বাট, আই গো অন্ ফর্ এভার।

প্রাচীনকালের বড়োবড়ো দিঘিও এরচেয়ে ঢের বেশি গৌরব-লাভ করেছে। এর থেকেই বেশ বোঝা যায় একটা প্রাচীন বড়ো অংশ অনেক বিষয়ে হীন হোলেও কেন এত সমাদর লাভ করে। তাদের উপরে যেন বহুকালের একটা সম্পদশ্রীর আভা থাকে। একজন সোনার ব্যাপারী হঠাৎ বড়োমানুষ হয়ে উঠলে অনেক সোনা পায় কিন্তু সেই সোনার লাবণ্যটুকু শীঘ্র পায় না। যাহোক আর একশত বৎসর পরে যখন এই তীরের গাছগুলো আরো অনেক বড়ো হয়ে উঠবে, তকতকে সাদা মাইলস্টোনগুলো অনেকটা ক্ষয়ে গিয়ে শৈবালাচ্ছন্ন ম্লান হয়ে আসবে, লকের উপরে খোদিত 1871 তারিখ যখন অনেক দূরবর্তী ব'লে মনে হবে তখন যদি আমি আমার প্রপৌত্র জন্মলাভ করে এই খালের মধ্যে বোট নিয়ে আমাদের পাণ্ডুয়া জমিদারী-তদন্ত করতে যেতে পারি তখন আমার মনের মধ্যে অনেকটা ভিন্নরকম ভাবোদয় হোতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু হায় আমার প্রপৌত্র। তার ভাগ্যে কী আছে কে জানে। হয়তো একটা অজ্ঞাত অখ্যাত কেরানিগিরি। ঠাকুরবংশের

একটা ছিন্ন টুকরো, বহুদূরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে একটা মৃত উল্কা-খণ্ডের মতো হয়তো জ্যোতিহীন নির্বাপিত। কিন্তু আমার উপস্থিত দুর্দশা এত আছে যে আমার প্রপৌত্রের জন্যে বিলাপ করবার কোনো দরকার নেই।

চারটের সময় তারপুরে পৌঁছনো গেল। এইখানে আমাদের পালকিযাত্রা আরম্ভ হোলো। মনে করলুম ছক্রোশ পথ, সন্ধ্যা আটটার মধ্যে আমাদের কুঠিতে পৌঁছতে পারব। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, মাইলের পর মাইল কেটে যাচ্ছে, ছ ক্রোশ পথ আর ফুরোয় না। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় বেহারাদের জিজ্ঞাসা করলুম আর কতদূর, তারা বললে, আর বেশি নেই, তিন ক্রোশের কিছু উপর বাকি আছে। শুনে পালকির মধ্যে একটুকু নড়েচড়ে বসলুম। পালকিতে আমার আধখানা বই ধরে না—কোমর টন টন করছে, পা ঝিন ঝিন করছে, মাথা ঠক ঠক করছে—যদি নিজেকে তিন চার ভাঁজ-ক'রে মুড়ে রাখবার কোনো উপায় থাকত তাহলেই এই পালকিতে কিছু সুবিধা হোতে পারত। রাস্তা অতি ভয়ানক। সর্বত্রই এক হাঁটু কাদা—একএক জায়গায় পিছলের ভয়ে বেহারারা অতি সাবধানে একএক পা ক'রে পা ফেলছে—তিনচারবার তাদের পা হড়কে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি সামলে নিলে। মাঝে মাঝে রাস্তা নেই—ধানের খেতে অনেকখানি ক'রে জলে দাঁড়িয়েছে—তারি উপর দিয়ে ছপ ছপ শব্দ ক'রে এগোচ্ছি। মেঘে রাত খুব অন্ধকার হয়ে এসেছে, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, তৈলাভাবে মশালটা মাঝে মাঝে নিবে

যাচ্ছে, আবার অনেক ফুঁ দিয়ে দিয়ে জ্বালাতে হচ্ছে, বেহারারা সেই আলোকের অভাব নিয়ে ভারি বকাবকি বাধিয়ে দিয়েছে। এমনি করে খানিক দূরে এসে পর বরকন্দাজ জোড়হাতে নিবেদন করলে, একটা নদী এসেছে এইখানে পাল্‌কি নৌকা-করে পার করতে হবে কিন্তু এখনো নৌকা এসে পৌঁছয়নি, অবিলম্বে এল ব'লে—অতএব খানিকক্ষণ এইখানে পাল্‌কি রাখতে হবে। পাল্‌কি রাখলে। তারপরে নৌকা আর কিছুতে এসে পৌঁছয় না। আস্তে আস্তে মশালটা নিবে গেল। সেই অন্ধকার নদীতীরে বরকন্দাজগুলো ভাঙা গলায় ঊর্ধ্বশ্বাসে নৌকোওয়ালাকে ডাকতে লাগল—নদীর পরপার থেকে তার প্রতিধ্বনি ফিরে আসতে লাগল কিন্তু কোনো নৌকোওয়ালা সাড়া দিলে না। "মুকুন্দো—ও-ও-ও" "বালকৃষ্ণ—অ-অ-অ" "নীলকণ্ঠ—অ-অ-অ"। এমন কাতরস্বরে আহ্বান করলে গোলোকধাম থেকে মুকুন্দ এবং কৈলাসশিখর থেকে নীলকণ্ঠ নেমে আসতেন—কিন্তু কর্ণধার কর্ণরোধ করে অবিচলিতভাবে নিজ নিকেতনে বিশ্রাম করতে লাগল। নির্জন নদীতীরে একটি কুঁড়েঘরমাত্রও নেই; কেবল পথপার্শ্বে চালকহীন বাহকহীন একটি শূন্য গোরুর গাড়ি পড়ে রয়েছে—আমাদের বেহারাগুলো তারি উপর চেপে বসে বিজাতীয় ভাষায় কলরব করতে লাগল। মক-মক শব্দে ব্যাং ডাকছে এবং ঝিঁঝির ডাকে সমস্ত রাত্রি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমি মনে করলুম এইখানেই পাল্‌কির মধ্যে বেঁকেচুরে দুম্‌ড়ে আজ রাতটা কাটাতে হবে—মুকুন্দ এবং নীলকণ্ঠ বোধ হয় কাল প্রভাতে

এসে উপস্থিত হোতেও পারে—মনে মনে গাইতে লাগলুম—ওগো

ওগো, যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে
মোর হাসি আর র'বে কি।
এই, জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া কবে কী।

যাই হোক না কেন, যদি কয় তো উড়ে ভাষায় কবে, আমি কিছুই বুঝতে পারব না কিন্তু মুখে যে আমার হাসি থাকবে না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অনেকক্ষণ এই ভাবে কেটে গেল। এমন সময় হুঁই হাঁই হুঁই হাঁই শব্দে বরদার পাল্‌কি এসে উপস্থিত হোলো। বরদা নৌকা আসবার সম্ভাবনা না দেখে হুকুম দিলেন পাল্‌কি মাথায় করে নদী পার করতে হবে। শুনে বেহারারা অনেক ইতস্তত করতে লাগল এবং আমার মনে দয়া এবং কিঞ্চিৎ দ্বিধা উপস্থিত হোতে লাগল। যাহোক অনেক বাকবিতণ্ডার পর তারা হরিনাম উচ্চারণ করতে করতে পাল্‌কি মাথায় করে নদীর মধ্যে নাবলে। বহুকষ্টে নদী পার হোলো। তখন রাত সাড়ে দশটা। আমি কোনোরকম গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লুম। বেশ খানিকটা নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে এমন সময়ে হঠাৎ একটা বেহারার পা পিছলে গিয়ে পাল্‌কিটা খুব একটা নাড়া পেলে—অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে বুকের ভিতর ভারি ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। তার পর থেকে অর্ধ ঘুম অর্ধ জাগরণে রাত্তির দুপুরের সময় আমাদের পাণ্ডুয়া কুঠিতে এসে উত্তীর্ণ হলুম।

তিরণ,

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯১।

অনেক দিন পর কাল মেঘবৃষ্টি কেটে শরতের সোনার রোদ্দুর উঠেছিল। পৃথিবীতে যে রোদ্দুর আছে সে কথা যেন একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম; হঠাৎ যখন কাল দশটা এগারোটার পর রোদ্দুর ভেঙে পড়ল তখন যেন একটা নতুন জিনিস দেখে মনে অপূর্ব বিস্ময়ের উদয় হোলো। দিনটি বড়ো চমৎকার হয়েছিল। আমি দুপুরবেলায় স্নানাহারের পর বারান্দার সামনে একটি আরাম কেদারার উপরে পা ছড়িয়ে দিয়ে অর্ধশয়ান অবস্থায় জাগ্রৎস্বপ্নে নিযুক্ত ছিলুম। আমার চোখের সামনে আমাদের বাড়ির কম্পাউণ্ডের কতকগুলি নারকেল গাছ—তার উদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলি শস্যক্ষেত্র, শস্যক্ষেত্রের একেবারে প্রান্তভাগে গাছপালার একটুখানি ঝাপসা নীল আভাসমাত্র। ঘুঘু ডাকছে এবং মাঝে মাঝে গোরুর গলার নূপুর শোনা যাচ্ছে। কাঠবিড়ালী একবার ল্যাজের উপর ভর দিয়ে বসে মাথা তুলে চকিতের মধ্যে অদৃশ হচ্ছে। খুব একটা নিঃঝুম নিস্তব্ধ নিরালা ভাব। বাতাস অবাধে হু হু করে বয়ে আসছে—নারকেল গাছের পাতা ঝর্ ঝর্ শব্দ করে কাঁপছে। দুচারজন চাষা মাঠের

একজায়গায় জটলা ক'রে ধানের ছোটো ছোটো চারা উপড়ে নিয়ে আঁটি ক'রে ক'রে বাঁধছে। কাজকর্মের মধ্যে এইটুকু কেবল দেখা যাচ্ছে।

শিলাইদহ,

১লা অক্টোবর, ১৮৯১।

বেলায় উঠে দেখলুম চমৎকার রোদ্দুর উঠেছে এবং শরতের পরিপূর্ণ নদীর জল তল তল থৈ থৈ করছে। নদীর জল এবং তীর প্রায় সমতল—ধানের খেত সুন্দর সবুজ এবং গ্রামের গাছপালাগুলি বর্ষাবসানে সতেজ এবং নিবিড় হয়ে উঠেছে। এমন সুন্দব লাগল সে আর কী বলব। দুপুরবেলা খুব এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তার পরে বিকেলে পদ্মার ধারে আমাদের নারকেল বনের মধ্যে সূর্যাস্ত হোলো। আমি নদীর ধারে উঠে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছিলুম। আমার সামনের দিকে দূরে আম বাগানে সন্ধ্যার ছায়া পড়ে আসছে এবং আমার ফেরবার মুখে নারকেল গাছগুলির পিছনে আকাশ সোনায় সোনালী হয়ে উঠেছে। পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্তপ্রাণে এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এই খানে না এলে মনে পড়ে না। যখন সন্ধ্যাবেলা বোটের উপর চুপ ক'রে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে, এবং আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি। কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ। এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র

থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়-রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে; আমি তার মধ্যে অবগাহন ক'রে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি, কেবল মৌলবীটা পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্রাম বক্ বক্ ক'রে আমাকে ব্যথিত ক'রে তোলে।

———

শিলাইদহ,

অক্টোবর, ১৮৯১।

আজ দিনটি বেশ হয়েছে। ঘাটে দুটি একটি ক'রে নৌকো লাগছে—বিদেশ থেকে প্রবাসীরা পূজোর ছুটিতে পোঁটলা-পুঁটলি বাক্স ধামা বোঝাই ক'রে নানা উপহার সামগ্রী নিয়ে সম্বৎসর পরে বাড়ি ফিরে আসছে। দেখলুম একটি বাবু ঘাটের কাছাকাছি নৌকো আসতেই পুরোনো কাপড় বদলে একটি নূতন কোঁচানো ধুতি পরলে, জামার উপর সাদা রেশমের একখানি চায়নাকোট গায়ে দিলে, আর একখানি পাকানো চাদর বহুযত্নে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে ছাতা ঘাড়ে ক'রে গ্রামের অভিমুখে চলল। ধানের খেত থরথর ক'রে কাঁপছে—আকাশে সাদা মেঘের স্তূপ—তারি উপর আম এবং নারকেল গাছের মাথা উঠেছে—নারকেলের পাতা বাতাসে ঝুরঝুর করছে—চরের উপর দুটো একটা ক'রে কাশ ফুটে ওঠবার উপক্রম করেছে—সবসুদ্ধ বেশ একটা সুখের দৃশ্য। বিদেশ থেকে যে লোকটি এইমাত্র গ্রামে ফিরে এল, তার মনের ভাব, তার ঘরের লোকদের মিলনের আগ্রহ, এবং শরৎকালের এই আকাশ, এই পৃথিবী, সকালবেলাকার এই ঝিরঝিরে বাতাস, এবং গাছপালা তৃণগুল্ম নদীর তরঙ্গ সকলের ভিতরকার একটি অবিশ্রাম সঘন কম্পন, সমস্ত মিশিয়ে বাতায়নবর্তী এই একক যুবকটিকে সুখে দুঃখে এক

রকম অভিভূত ক'রে ফেলছিল। পৃথিবীতে জানলার ধারে একলা বসে চোখ মেলে দেখলেই মনে নতুন সাধ জন্মায়—নতুন সাধ ঠিক নয়, পুরোনো সাধ নানা নতুন মূর্তি ধারণ করতে আরম্ভ করে। পর্শুদিন অমনি বোটের জানলার কাছে চুপ ক'রে বসে আছি—একটা জেলেডিঙিতে একজন মাঝি গান গাইতে গাইতে চলে গেল—খুব যে সুস্বর তা নয়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহুকাল হোলো ছেলেবেলায় বোটে ক'রে পদ্মায় আসছিলুম—একদিন রাত্তির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানলাটা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না হয়েছে, একটি ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে—গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনিনি। হঠাৎ মনে হোলো, আবার যদি জীবনটা ঠিক সেইদিন থেকে ফিরে পাই। আর একবার পরীক্ষা ক'রে দেখা যায়—এবার তাকে আর শুষ্ক অপরিতৃপ্ত ক'রে ফেলে রেখে দিইনে—কবির গান গলায় নিয়ে একটি ছিপছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি, গান গাই এবং বশ করি এবং দেখে আসি পৃথিবীতে কোথায় কী আছে; আপনাকেও একবার জানান দিই, অন্যকেও একবার জানি; জীবনে যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মতো একবার হু হু ক'রে বেড়িয়ে আসি, তার পরে ঘরে ফিরে এসে পরিপূর্ণ প্রফুল্ল বার্ধক্যটা কবির মতো কাটাই। খুব যে একটা উঁচু আইডিয়াল তা নয়। জগতের হিত করা এর চেয়ে ঢের বেশি বড়ো

আইডিয়াল হোতে পারে—কিন্তু আমি সবসুদ্ধ যে-রকম লোক আমার ওটা মনেও উদয় হয় না। উপবাস ক'রে, আকাশের দিকে তাকিয়ে অনিদ্র থেকে সর্বদা মনে মনে বিতর্ক ক'রে, পৃথিবীকে এবং মনুষ্যহৃদয়কে কথায় কথায় বঞ্চিত ক'রে স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চাইনে। পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ তা না মনে ক'রে একে বিশ্বাস ক'রে, ভালবেসে ভালবাসা পেয়ে মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষের মতো মরে গেলেই যথেষ্ট;—দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়।

শিলাইদহ,

অক্টোবর, ১৮৯১।২৯শে আশ্বিন।

কাল সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে একবার পশ্চিমদিকের সোনার সূর্যাস্ত এবং একবার পুবদিকের রুপোর চন্দ্রোদয়ের দিকে ফিরে গোঁফে তা দিতে দিতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলুম। রুগ্ন ছেলের দিকে মা যেমন করে তাকায় প্রকৃতি সেই রকম সুগভীর স্তব্ধ এবং স্নিগ্ধ বিষাদের সঙ্গে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল—নদীর জল আকাশের মতো স্থির, এবং আমাদের দুটি বাঁধা নৌকো জলচর পাখির মতো মুখের উপর পাখা ঝেঁপে স্থিরভাবে ঘুমিয়ে আছে এমন সময় মৌলবী এসে ভীতকণ্ঠে চুপি চুপি খবর দিলে "কলকাতার ভজিয়া আয়ছে।" এক মুহূর্তের মধ্যে কত রকম অসম্ভব আশঙ্কা যে মনে উদয় হোলো তা আর বলতে পারিনে। যা হোক মনের চাঞ্চল্য দমন করে গম্ভীর স্থির-ভাবে আমার রাজচৌকিতে এসে বসে ভজিয়াকে ডেকে পাঠালুম। ভজিয়া যখন ঘরে প্রবেশ করেই কাঁদুনির সুর ধরে আমার পা জড়িয়ে ধরলে তখন বুঝলুম দুর্ঘটনা যদি কারো হয়ে থাকে তো সে ভজিয়ার। তার পরে তার সেই বাঁকা বাংলার সঙ্গে নাকের সুর এবং চোখের জল মিশিয়ে বিস্তর অসংলগ্ন ঘটনা ব'লে যেতে লাগল। বহু কষ্টে তার যা সার সংগ্রহ করা গেল সেটি হচ্ছে এই—ভজিয়া এবং

ভজিয়ার মায়ে প্রায়ই ঝগড়া বেধে থাকে—কিছুই আশ্চর্য নয়—কারণ দুজনেই আমাদের পশ্চিম আর্যাবর্তের বীরাঙ্গনা, কেউ হৃদয়ের কোমলতার জন্যে প্রসিদ্ধ নয়। এর মধ্যে এক-দিন সন্ধ্যাবেলায় মায়ে ঝিয়ে মুখোমুখি থেকে হাতাহাতি বেধে গিয়েছিল—স্নেহালাপ থেকে যে আলিঙ্গন তা নয়, গালাগালি থেকে মারামারি। সেই বাহুযুদ্ধে তার মায়েরই পতন হয়—এবং সে কিছু গুরুতর আহতও হয়েছিল। ভজিয়া বলে, তার মা তাকে একটা কাঁসার বাটি নিয়ে মস্তক লক্ষ্য করে তাড়া করে, সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করাতে দৈবাৎ তার বালাটা তার মায়ের মাথায় না কোথায় লেগে রক্তপাত হয়। যাহোক এই সব ব্যাপারে সেই মুহূর্তেই তাকে তেতালা থেকে নিম্নলোকে নির্বাসিত করে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটা তিন চার দিন হয়েছে কিন্তু আমি কোনো খবর পাইনি—মাথার উপরে একেবারে হঠাৎ বিনা নোটিসে ভজিয়াঘাত।

শিলাইদহ

অক্টোবর, ১৮৯১।২রা কার্তিক।

আমার বোধ হয় কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে এলেই মানুষের নিজের স্থায়িত্ব এবং মহত্ত্বের উপর বিশ্বাস অনেকটা হ্রাস হয়ে আসে। এখানে মানুষ কম এবং পৃথিবীটাই বেশি—চারিদিকে এমন সব জিনিস দেখা যায় যা আজ তৈরি ক'রে কাল মেরামত ক'রে পর্শুদিন বিক্রি ক'রে ফেলবার নয়, যা মানুষের জন্মমৃত্যু ক্রিয়াকলাপের মধ্যে চিরদিন অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে, প্রতিদিন সমানভাবে যাতায়াত করছে এবং চিরকাল অবিশ্রান্তভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। পাড়াগাঁয়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্র মানুষভাবে দেখিনে। যেমন নানা দেশ দিয়ে নদী চলেছে, মানুষের স্রোতও তেমনি কলরবসহকারে গাছপালা গ্রাম নগরের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চিরকাল ধরে চলেছে—এ আর ফুরোয় না। মেন মে কাম্ এণ্ড্ মেন্ মে গো, বাট্ আই গো অন্ ফর এভার—কথাটা ঠিক সংগত নয়। মানুষও নানা শাখাপ্রশাখা নিয়ে নদীর মতোই চলেছে—তার একপ্রান্ত জন্মশিখরে আর এক প্রান্ত মরণসাগরে, দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য, মাঝখানে বিচিত্র লীলা এবং কর্ম এবং কলধ্বনি—কোনোকালে এর আর শেষ নেই। ওই শোনো মাঠে চাষা গান গাচ্ছে, জেলেডিঙি ভেসে চলেছে, বেলা যাচ্ছে, রৌদ্র ক্রমেই বেড়ে উঠছে—ঘাটে কেউ

স্নান করছে কেউ জল নিয়ে যাচ্ছে—এমনি ক'রে এই শান্তিময়ী নদীর দুই তীরে গ্রামের মধ্যে গাছের ছায়ায় শত শত বৎসর গুনগুন শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে—এবং সকলের মধ্যে থেকে একটা করুণধ্বনি জেগে উঠছে, আই গো অন্ ফর্ এভার্। দুপুরবেলার নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন কোনো রাখাল দূর থেকে ঊর্ধ্বকণ্ঠে তার সঙ্গীকে ডাক দেয়, এবং একটা নৌকো ছপছপ শব্দ ক'রে ঘরের দিকে ফিরে যায়, এবং মেয়েরা ঘড়া দিয়ে জল ঠেলে দেয় তারি ছলছল শব্দ ওঠে, তার সঙ্গে মধ্যাহ্নপ্রকৃতির নানারকম অনির্দিষ্ট ধ্বনি—দুই একটা পাখির ডাক, মৌমাছির গুন্ গুন্, বাতাসে বোটটা আস্তে আস্তে বেঁকে যেতে থাকে তারই এক রকম কাতর সুর—সবসুদ্ধ এমন একটা করুণ ঘুমপাড়ানী গান—যেন মা সমস্ত বেলা বসে বসে তার ব্যথিত ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে—বলছে আর ভাবিসনে, আর কাঁদিসনে, আর কাড়াকাড়ি মারামারি করিসনে, আর তর্ক-বিতর্ক রাখ্—একটুখানি ভুলে থাক্ একটুখানি ঘুমো; ব'লে তপ্ত কপালে আস্তে আস্তে করাঘাত করছে।

শিলাইদহ,

সোমবার, ৩রা কার্তিক।

কোজাগর পূর্ণিমার দিন, নদীর ধারে ধারে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছিলুম—আর, মনের মধ্যে স্বগত কথোপকথন চলছিল—ঠিক "কথোপকথন" বলা যায় না—বোধ হয় আমি একলাই বকে যাচ্ছিলুম আর আমার সেই কাল্পনিক সঙ্গীটি অগত্যা চুপচাপ ক'রে শুনে যাচ্ছিল, নিজের হয়ে একটা জবাব দেওয়াও সে বেচারার জো ছিল না—আমি তার মুখে যদি একটা নিতান্ত অসংগত কথাও বসিয়ে দিতুম তাহলেও তার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু কী চমৎকার হয়েছিল কী আর বলব। কতবার বলেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ কিছুতেই বলা যায় না। নদীতে একটি রেখামাত্র ছিল না—ও-ই সেই চরের পরপারে যেখানে পদ্মার জলের শেষপ্রান্ত দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে আর এপর্যন্ত একটি প্রশস্ত জ্যোৎস্নারেখা ঝিক্‌ঝিক করছে—একটি লোক নেই একটি নৌকো নেই, ওপারের নতুন চরে একটি গাছ নেই একটি তৃণ নেই—মনে হয় যেন একটি উজাড় পৃথিবীর উপরে একটি উদাসীন চাঁদের উদয় হচ্ছে—জনশূন্য জগতের মাঝখান দিয়ে একটি লক্ষ্যহীন নদী বয়ে চলেছে, মস্ত একটা পুরাতন গল্প এই পরিত্যক্ত-পৃথিবীর উপরে শেষ হয়ে গেছে, আজ সেই সব রাজা রাজ-কন্যা পাত্র মিত্র স্বর্ণপুরী কিছুই নেই, কেবল সেই গল্পের

"তেপান্তরের মাঠ" এবং "সাত সমুদ্র তেরো নদী" ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূ ধূ করছে।

আমি যেন সেই মুমূর্ষু পৃথিবীর একটিমাত্র নাড়ীর মতো আস্তে আস্তে চলছিলুম। আর সকলে ছিল আর এক পারে, জীবনের পারে—সেখানে এই বৃটিশ গবর্মেণ্ট এবং ঊনবিংশ শতাব্দী এবং চা এবং চুরোট। কতদিন থেকে কত লোক আমার মতো এই রকম একলা দাঁড়িয়ে অনুভব করেছে এবং কত কবি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে কিন্তু হে অনির্বচনীয়, এ কী, এ কিসের জন্যে, এ কিসের উদ্বেগ, এই নিরুদ্দেশ নিরাকুলতার নাম কী, অর্থ কী—হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটা বিদীর্ণ ক'রে কবে সেই সুর বেরোবে যার দ্বারা এর সংগীত ঠিক ব্যক্ত হবে।

শিলাইদহ,

রবিবার, ৪ঠা জানুয়ারি, ১৮৯২।

কিছু আগেই পাবনা থেকে এ—তার মেম এবং কচিকাচা নিয়ে এসে উপস্থিত। মেম চা খায়, আমার চা নেই—মেম ছেলেবেলা থেকে ডাল দুচক্ষে দেখতে পারে না; আমি অন্য খাদ্যের অভাবে ডাল তৈরি করতে দিয়েছি, মেম ইয়ার্স এণ্ড টুইয়ার্স এণ্ড মাছ ছোঁয় না, আমি মাগুর মাছের ঝোল রাঁধিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। কী ভাগ্যি কান্ট্রি সুইট্‌স্ ভালবাসে তাই একটা বহুকালের শক্ত শুকনো সন্দেশ বহুকষ্টে কাঁটা দিয়ে ভেঙে খেলে। এক বাক্স বিস্কুট গতবারের রসদের অবশেষ-স্বরূপে ছিল সেটা কাজে লাগবে। আমি আবার একটা মস্ত গলদ করেছি—আমি সাহেবকে বলেছি, তোমার মেম চা খায় কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার চা নেই. কোকো আছে। সে বললে আমার মেম চায়ের চেয়ে কোকো বেশি ভালবাসে। আমি আলমারি ঘেঁটে দেখি কোকো নেই—সবগুলোই কলকাতায় ফিরে গেছে। আবার তাকে বলতে হবে চা-ও নেই কোকোও নেই পদ্মার জল আর চায়ের কাৎলি আছে—দেখি কী রকম মুখের ভাব হয়। সাহেবের ছেলে দুটো এমন দুরন্ত, এবং দুষ্টু দেখতে, সে আর কী বলব। মাঝে মাঝে সাহেব মেমেতে খুব গুরুতর ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে আমি এ বোট থেকে শুনতে পাচ্ছি। ছেলেদের কান্না, চাকরবাকরদের

চেঁচামেচি, এবং দম্পতির তর্কবিতর্কের জ্বালায় অস্থির হয়ে আছি। আজ আর কোনো কাজকর্ম লেখাপড়ার সুবিধে দেখছিনে। মেমটা তার ছেলেকে ধমকাচ্ছে "What a little শুয়ার you are!" দেখো তো, আমার ঘাড়ে এ সব উপদ্রব কেন।

শিলাইদহ,

সোমবার, ৬ই জানুয়ারি, ১৮৯২।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গরমের সময় যখন বোটে ছিলুম, এই সময়টা বোটের জানালার কাছে বসে আলো নিবিয়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকতুম, নদীর শব্দে সন্ধ্যার বাতাসে, নক্ষত্রভরা আকাশের নিস্তব্ধতায় মনের সমস্ত কল্পনা মধুর আকার ধরে আমাকে ঘিরে বসত, অনেক রাত পর্যন্ত এক-প্রকার নিবিড় নির্জন আনন্দে কেটে যেত। শীতকালের সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত প্রকৃতিকে বাইরে ফেলে জানলাদরজা বন্ধ ক'রে বোটের এই ক্ষুদ্র কাষ্ঠময় গহ্বরের মধ্যে একটি বাতি জ্বেলে মনটাকে তেমন দৌড় দিতে পারিনে—যেন নিজের সঙ্গে নিজেকে বড়ো বেশি ঘেঁসাঘেঁসি ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়। এ রকম অবস্থায় আপনার মনটিকে নিয়ে থাকা বড়ো শক্ত।

সাহিত্যের মধ্যে ছুটিমাত্র গল্পের বই এনেছিলুম, কিন্তু এমনি আমার পোড়া কপাল, আজ বিদায় নেবার সময় সাহেবের মেম ছুটি বই ধার নিয়ে গেছেন, কবে শোধ করবেন তার কোনো ঠিকানা নেই। সেই দুটো হাতে তুলে নিয়ে সলজ্জ কাকুতির ভাবে আরম্ভ করলেন "মিস্টার টাগোর উড ইয়ু"—কথাটা শেষ করতে না করতে আমি খুব সজোরে ঘার নেড়ে বললুম "সার্টেন্‌লি।" এতে কতটা

দূর কী বোঝায় ঠিক বলতে পারিনে। আসলে, তাঁরা তখন বিদায় নিচ্ছিলেন সেই উৎসাহে আমি আমার অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে ফেলতে পারতুম (যে পেত তার যে খুব বেশি লাভ হোত তা নয়।) যাহোক তারা আজ গেছে—আমার এই দুটোদিন একেবারে ঘুলিয়ে দিয়ে গেছে—আবার থিতিয়ে নিতে দুদিন যাবে—মেজাজটা এমনি খারাপ হয়ে আছে যে ভয়ে ভয়ে আছি পাছে কাউকে অন্যায় অকারণে তাড়না করে উঠি—এত বেশি সাবধানে আছি যে সহজ অবস্থায় যখন একজনকে ধমক দিতুম এখন তাকে খুব নরম নরম করে বলছি—মেজাজ বিগড়ে গেলে অনেক সময় আমার এইরকম উলটোরকম ব্যাপার হয়—সে সময়ে ছেলেরা কাছে থাকলে বোধ হয় পাছে তাদের লঘুদোষে গুরুদণ্ড দিই, এই-জন্যে তাদের দণ্ডই দিইনে—খুব দৃঢ় করে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে থাকি।

শিলাইদহ,
বৃহস্পতিবার, ৯ই জানুয়ারি, ১৮৯২।

দুইএকদিন থেকে এখানকার প্রকৃতি শীত এবং বসন্তের মধ্যে ইতস্তত করছে—সকালে হয়তো উত্তরে-বাতাসে জলে-স্থলে হী হী ধরিয়ে দিয়ে গেল—সন্ধ্যাবেলায় শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় দক্ষিণে-বাতাসে চারিদিক হু হু করে উঠল। বসন্ত অনেকটা এসে পৌঁচেছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। অনেকদিন পরে আজকাল ওপারের বাগান থেকে একটা পাপিয়া ডাকতে আরম্ভ করেছে। মানুষের মনটাও কতকটা বিচলিত হয়ে উঠেছে—আজকাল সন্ধ্যা হোলে ওপারের গ্রাম থেকে গানবাজনার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়—এর থেকে বোঝা যাচ্ছে লোকে দরজা জানলা বন্ধ ক'রে মুড়িসুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বার জন্যে তেমন উৎসুক নয়। আজ পূর্ণিমারাত—ঠিক আমার বাঁ-দিকের খোলা জানালার উপরেই একটা মস্ত চাঁদ উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে—বোধ হয় দেখছে আমি চিঠিতে তার সম্বন্ধে কোনো নিন্দে করছি কিনা—সে হয়তো মনে করে, তার জ্যোৎস্নার চেয়ে তার কলঙ্কের কথা নিয়েই পৃথিবীর লোকে বেশি কানাকানি করে। নিস্তব্ধ চরে একটা টিটি পাখি ডাকছে—নদী স্থির—

নৌকো নেই, জলের উপর স্থির ছায়া ফেলে ওপারের ঘনীভূত বন স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে—ঘুমন্ত চোখ খোলা থাকলে যেমন দেখতে হয়, এই প্রকাণ্ড পূর্ণিমার আকাশ সেইরকম ঈষৎ ঝাপসা দেখাচ্ছে। কাল সন্ধ্যা থেকে আবার ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের সূত্রপাত হবে, কাল কাছারি সেরে এই ছোটো নদীটি পার হবার সময় দেখতে পাব আমার সঙ্গে আমার এই প্রবাসের প্রণয়িনীর একটুখানি বিচ্ছেদ হয়েছে, কাল যে আমার কাছে আপনার রহস্যময় অপার হৃদয় উদ্‌ঘাটন ক'রে দিয়েছিল আজ তার মনে যেন একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, যেন তার মনে হচ্ছে একেবারে এতখানি আত্মপ্রকাশ কি ভালো হয়েছিল, তাই হৃদয় আবার একটু একটু ক'রে বন্ধ করছে। বাস্তবিক বিদেশে বিজন-অবস্থায় প্রকৃতি বড়ো কাছাকাছির জিনিস··আমি সত্য সত্য দু'তিনদিন ধরে মাঝে মাঝে ভেবেছি, পূর্ণিমার পরদিন থেকে আমি আর এ জ্যোৎস্না পাব না—আমি যেন বিদেশ থেকে আর একটু বিদেশে চলে যাব, কাজকর্মের পরে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় যে একটি শান্তিময় পরিচিত সৌন্দর্য আমার জন্যে নদীতীরে অপেক্ষা ক'রে থাকত সে আর থাকবে না—অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বোটে ফিরে আসতে হবে।

কিন্তু আজ পূর্ণিমা, এ বৎসরকার বসন্তের এই প্রথম পূর্ণিমা, এর কথাটা লিখে রেখে দিলুম—হয়তো অনেকদিন পরে এই নিস্তব্ধ রাত্রিটি মনে পড়বে— ঐ টিটি পাখির ডাক-

সুদ্ধ এবং ওপারের ঐ বাঁধা নৌকোয় যে আলোটি জ্বলছে সেটিসুদ্ধ; এই একটুখানি উজ্জ্বল নদীর রেখা, ঐ একটুখানি অন্ধকার বনের একটা পোঁচ, এবং ঐ নির্লিপ্ত উদাসীন পাণ্ডুবর্ণ আকাশ।

শিলাইদহ,
৭ই এপ্রেল, ১৮৯২।

সকাল থেকে সুন্দর বাতাস দিচ্ছে—কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। বোধ হয় এগারোটা কিংবা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে—কিন্তু এ পর্যন্ত লেখা পড়া কিংবা কোনো কাজে হাত দিইনি। সকাল থেকে একটি চৌকিতে স্থির হয়ে বসে আছি। মাথার মধ্যে কত টুকরো টুকরো লাইন এবং কত অসমাপ্ত ভাব যাতায়াত করছে, কিন্তু সেগুলোকে একত্র ক'রে বাঁধি, কিংবা,পরিস্ফুট ক'রে তুলি এমন শক্তি অনুভব করছিনে। সেই গানটা মনে পড়ছে "পায়েরিয়া বাজে, ঝনক ঝনক ঝন ঝন নন নন নন" সুন্দর সকালবেলায় মধুর বাতাসে নদীর মাঝখানে মাথার মধ্যে সেইরকম ঝন নন নূপুর বাজছে—কিন্তু সে কেবল এদিক ওদিক থেকে অন্তরালে—কেউ ধরা দিচ্ছে না, দেখা দিচ্ছে না। তাই চুপচাপ ক'রে বসে আছি। নদীর জল অনেকটা শুকিয়ে এসেছে, কোথাও এক কোমরের বেশি জল আর প্রায় নেই—তাই বোটটাকে নদীর প্রায় মাঝখানে বেঁধে রাখা কিছুই শক্ত হয়নি। আমার ডান-দিকের পারে চরের উপরে চাষারা চাষ করছে এবং মাঝে মাঝে গোরুকে জল খাইয়ে নিয়ে যাচ্ছে—আমার বামপারে শিলাইদহের নারকেল এবং আমবাগান, ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছে, জল তুলছে, স্নান করছে এবং উচ্চৈঃস্বরে বাঙাল

ভাষায় হাস্যালাপ করছে—যারা অল্পবয়সী মেয়ে তাদের জলক্রীড়া আর শেষ হয় না। একবার স্নান সেরে উপরে উঠছে আবার ঝুপ ক'রে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—তাদের নিশ্চিন্ত উচ্চহাস্য শুনতে বেশ লাগে। পুরুষরা গম্ভীরভাবে এসে গোটাকতক ডুব মেরে তাদের নিত্যকর্ম সমাপ্ত ক'রে চলে যায়—কিন্তু মেয়েদের যেন জলের সঙ্গে বেশি ভাব। পরস্পরের যেন একটা সাদৃশ্য এবং সখিত্ব আছে—জল এবং মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে ছল ছল জ্বল জ্বল করতে থাকে, একটা বেশ সহজ গতি ছন্দ তরঙ্গ, দুঃখতাপে অল্পে অল্পে শুকিয়ে যেতে পারে কিন্তু আঘাতে একেবারে জন্মের মতো দু'খানা হয়ে ভেঙে যায় না। সমস্ত কঠিন পৃথিবীকে সে বাহুবন্ধনে আলিঙ্গন ক'রে আছে, পৃথিবী তার অন্তরের গভীর রহস্য বুঝতে পারে না; সে নিজে শস্য উৎপাদন করে না কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে না থাকলে পৃথিবীতে একটি ঘাসও গজাতে পারত না। মেয়েকে পুরুষের সঙ্গে তুলনা ক'রে টেনিসন বলেছেন, Water unto wine—আমার আজকার মনে হচ্ছে জল unto স্থল। তাই জন্যে মেয়েতে ও জলেতে বেশ মিশ খায়—অন্য অনেক রকম ভার বহন মেয়েকে শোভা পায় না, কিন্তু উৎস থেকে কুয়ো থেকে ঘাট থেকে জল তুলে নিয়ে যাওয়া কোনোকালেই মেয়েদের পক্ষে অসংগত মনে হয় না। গা ধোয়া স্নান করা, পুকুরের ঘাটে এক কোমর জলে ব'সে পরস্পর গল্প করা, এ সমস্ত মেয়েদের পক্ষে কেমন শোভন। আমি দেখেছি মেয়েরা জল ভালবাসে কেননা

উভয়ে স্বজাত। অবিশ্রাম সহজপ্রবাহ এবং কলধ্বনি জল এবং মেয়ে ছাড়া আর কারো নেই। ইচ্ছে করলে আরো অনেক সাদৃশ্য দেখানো যেতে পারত, কিন্তু বেলাও বোধ করি অনেক হয়েছে, এবং একটা কথা ফেনিয়ে বেশি নেংড়ানো কিছু নয়।

শিলাইদহ,

৮ই এপ্রিল, ১৮৯২।

এখানে এসে আমি এত এলিমেণ্টস্ অফ পলিটিক্স্ এবং প্রব্লেম্স্ অফ দি ফ্যুচার পড়ছি শুনে বোধ হয় খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে। আসল কথা, ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খুঁজে পাইনে। যেটা খুলে দেখি সেই ইংরেজি নাম, ইংরেজি সমাজ, লণ্ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িংরুম, এবং যত রকম হিজিবিজি হাঙ্গাম। বেশ সাদাসিধে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত এবং অশ্রুবিন্দুর মতো উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ কিছুই খুঁজে পাইনে। কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস—কেবল মানব চরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে মুচকে, তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিওরি ও নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা। সেগুলো পড়তে গেলে আমার এখানকার এই গ্রীষ্মশীর্ণ ছোটো নদীর শান্তস্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসার, দুই কূলের অবিরল শান্তি এবং চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ঘুলিয়ে দেবে। এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাইনে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটো ছোটো পদ ছাড়া। বাংলার যদি কতক-

গুলি ভালো ভালো মেয়েলিরূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর ক'রে ছেলেবেলাকার ঘোরো-স্মৃতি দিয়ে সরস ক'রে লিখতে পারতুম তাহলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হোত। বেশ ছোটো নদীর কলরবের মতো, ঘাটের মেয়েদের উচ্চহাসি মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং ছোটোখাটো কথাবার্তার মতো, বেশ নারকেল পাতার ঝুরঝুর কাঁপুনি, আম বাগানের ঘনচ্ছায়া, এবং প্রস্ফুটিত সর্ষেখেতের গন্ধের মতো—বেশ সাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়—অনেকখানি আকাশ আলো নিস্তব্ধতা এবং করুণতায় পরিপূর্ণ। মারামারি হানাহানি যোঝাযুঝি কান্নাকাটি সে সমস্ত এই ছায়াময় নদীস্নেহবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলাদেশের নয়। যাই হোক, এলিমেণ্টস্ অফ পলিটিক্স জলের উপরে তেলের মতো এখানকার নিস্তব্ধ শান্তির উপর দিয়ে অবাধে ভেসে চলে যায়, একে কোনো-রকমে নাড়া দিয়ে ভেঙে দেয় না।

নদীর মাঝখানে বসে আছি, দিনরাত্রি হূ হূ ক'রে বাতাস দিচ্ছে, দুই দিকের দুই পার পৃথিবীর দুটি আরম্ভ রেখার মতো বোধ হচ্ছে—ওখানে জীবনের কেবল আভাস মাত্র দেখা দিয়েছে, জীবন সুতীব্রভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি—যারা জল তুলছে, স্নান করছে, নৌকো বাচ্ছে, গোরু চরাচ্ছে, মেঠো পথ দিয়ে আসছে যাচ্ছে, তারা যেন যথেষ্ট জীবন্ত সত্য নয়। অন্য জায়গায় মানুষরা ভিড় করে,তারা সামনে উপস্থিত হোলে চিন্তার ব্যাঘাত করে, তাদের অস্তিত্বই যেন কুনুই দিয়ে ঠেলা দেয়, তারা প্রত্যেকে এক একটি পজিটিভ মানুষ;—এখান-

কার এরা সম্মুখে আনাগোনা চলাবলা কাজকর্ম করছে— কিন্তু মনকে ঠেলা দিয়ে যাচ্ছে না। কৌতূহলে সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে কিন্তু সেই সরল কৌতূহল ভিড় ক'রে গায়ের উপর এসে পড়ছে না। যা হোক, বেশ লাগছে।

বোলপুর,
শনিবার, ২রা মে ১৮৯২।

জগৎসংসারে অনেকগুলো প্যারাডক্স আছে তারমধ্যে এও একটি যে, যেখানে বৃহৎদৃশ্য, অসীম আকাশ, নিবিড় মেঘ গভীর ভাব, অর্থাৎ যেখানে অন্তরের আবির্ভাব সেখানে তার উপযুক্ত সঙ্গী একজন মানুষ—অনেকগুলো মানুষ ভারি ক্ষুদ্র এবং খিজিবিজি। অসীমতা এবং একটি মানুষ উভয়ে পরস্পরের সমকক্ষ—আপন আপন সিংহাসনে পরস্পর মুখোমুখি বসে থাকবার যোগ্য। আর কতকগুলো মানুষে একত্রে থাকলে তারা পরস্পরকে ছেঁটেছুঁটে অত্যন্ত খাটো ক'রে রেখে দেয়—একজন মানুষ যদি আপনার সমস্ত অন্তরাত্মাকে বিস্তৃত করতে চায় তাহলে এত বেশি জায়গার আবশ্যক করে যে কাছাকাছি পাঁচ ছ জনের স্থান থাকে না। অধিক লোক জোটাতে গেলেই পরস্পরের অনুরোধে আপনাকে সংক্ষেপ করতে হয়—যেখানে যতটুকু ফাঁক সেইখানে ততটুকু মাথা গলাতে হয়। মাঝের থেকে, দুই বাহু প্রসারিত ক'রে দুই অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে প্রকৃতির এই অগাধ অনন্ত বিস্তীর্ণতাকে গ্রহণ করতে পারছিনে।

বোলপুর,
৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯২।

রসিকতা জিনিসটা বড়ো বিপদের জিনিস—ও যদি প্রসন্ন সহাস্যমুখে আপনি ধরা দিলে তো অতি উত্তম, আর ওকে নিয়ে যদি টানাটানি করা যায় তবে বড়োই "ব্যাভ্রম" হবার সম্ভাবনা। হাস্যরস প্রাচীনকালের ব্রহ্মাস্ত্রের মতো, যে ওর প্রয়োগ জানে সে ওকে নিয়ে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতে পারে—আর যে হতভাগ্য ছুঁড়তে জানে না অথচ নাড়তে যায়, তার বেলায় "বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে," হাস্যরস তাকেই হাস্যজনক ক'রে তোলে।

মেয়েরা রসিকতা করতে গিয়ে যদি মুখরা হয়ে পড়ে তবে সেটা ভারি অশোভন দেখতে হয়। আমার তো মনে হয় "কমিক" হোতে চেষ্টা ক'রে সফল হোলেও মেয়েদের সাজে না—নিষ্ফল হোলেও মেয়েদের সাজে না। কারণ "কমিক" জিনিসটা ভারি গাবদা এবং প্রকাণ্ড। "সাব্লিমিটি"র সঙ্গে "কমিক্যালিটি"র একটা আত্মীয়তা সম্পর্ক আছে—সেই জন্যে হাতি কমিক উট কমিক, জিরাফ কমিক, স্থূলতা কমিক। সৌন্দর্যের সঙ্গে বরঞ্চ প্রখরতা শোভা পায় যেমন ফুলের সঙ্গে কাঁটা—তেমনি শাণিত কথা মেয়েদের মুখে বড্ড বাজে বটে তেমনি সাজেও বটে। কিন্তু

যে সকল বিদ্রূপে কোনোরকম স্থূলত্বের আভাসমাত্র দেয় তার দিক দিয়েও মেয়েদের যাওয়া উচিত হয় না ;—সে হচ্ছে আমাদের সাব্লাইম স্বজাতীয়ের জন্যে। পুরুষ ফলস্টাফ আমাদের হাসিয়ে নাড়ি ছিঁড়ে দিতে পারে কিন্তু মেয়ে ফলস্টাফ আমাদের গা জ্বালিয়ে দিত।

বোলপুর,
৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯২।

কাল যে ঝড় সে আর কী বলব। আমার সাধনার নিত্যনৈমিত্তিক লেখা সেরে চা খাবার জন্যে উপরে যাচ্ছি, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় এসে উপস্থিত। ধুলোয় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং বাগানের যত শুকনো পাতা একত্র হয়ে লাঠিমের মতো বাগানময় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল— যেন অরণ্যের যত প্রেতাত্মাগুলো হঠাৎ জেগে উঠে ভুতুড়ে নাচন নাচতে আরম্ভ ক'রে দিলে। বাগানের সমস্ত গাছ-পালা পায়ে শিকলি-বাঁধা প্রকাণ্ড জটায়ুপাখির মতো ডানা আছড়ে ঝটপট ঝটপট করতে লাগল। সে কী গর্জন, কী মাতামাতি, কী একটা লুটোপুটি ব্যাপার। ঝড়টা দেখে আমার মনে পড়ছিল, আমেরিকার Ranch সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে রকম বর্ণনা পড়া যায়—হঠাৎ কোনো একটা বেড়া ভেঙে ফেলে ছ সাতশো বুনো ঘোড়া ধুলো উড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে, আর তার পিছনে পিছনে তাদের তাড়িয়ে ফিরিয়ে আনবার জন্যে বড়ো বড়ো ফাঁস হাতে অনেকগুলো অশ্বারোহী ছুটছে—মাঝে মাঝে যেখানে যাকে পাচ্ছে সাঁই সাঁই শব্দে দিচ্ছে চাবকে—বোলপুরের অবারিত আকাশ এবং মাঠের মধ্যে যেন সেই রকমের একটা উচ্ছৃঙ্খল পলায়ন এবং পশ্চাদ্ধাবন চলছে—দৌড় দৌড় ধর্‌ধর্‌ পালা' পালা' হুড়মুড় হুড়দাড় ব্যাপার।

বোলপুর,
১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯২।

পূর্বেই লিখেছি অপরাহ্ণে আমি আপন মনে একাকী ছাতের উপর বেড়াই; কাল সন্ধ্যাবেলায় আমার দুই বন্ধুকে দুই পার্শ্বে নিয়ে অঘোরকে আমার পথপ্রদর্শক ক'রে তাঁদের এখানকার প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করানো আমার কর্তব্য মনে ক'রে বেরিয়ে পড়া গেল। তখন সূর্য অস্ত গেছে কিন্তু অন্ধকার হয়নি। একেবারে দিগন্তের প্রান্তে যেখানে গাছের সার নীলবর্ণ হয়ে দেখা যাচ্ছে, তারি উপরেই ঠিক একটি রেখামাত্র খুব গাঢ় নীল মেঘ উঠে খুব চমৎকার দেখতে হয়েছে—আমি তারি মধ্যে একটুখানি কবিত্ব ক'রে বললুম, ঠিক যেন নীল চোখের পাতার উপরে নীল সুর্মা লাগিয়েছে। সঙ্গীরা কেউ কেউ শুনতে পেলে না, কেউ কেউ বুঝতে পারলে না—কেউ কেউ সংক্ষেপে বললে—হাঁ, দিব্যি দেখতে হয়েছে। তারপর থেকে দ্বিতীয়বার কবিত্ব করতে আমার উৎসাহ হোলো না। প্রায় মাইলখানেক গিয়ে একটা বাঁধের ধারে একসার তালবন এবং তালবনের কাছে একটি মেঠো ঝরনার মতো আছে—সেইটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি এমন সময়ে দেখি উত্তরে সেই নীল মেঘ অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং স্ফীত হয়ে চলে আসছে এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দন্ত বিকাশ করছে। আমাদের সকলেরই মত হোলো এরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘরের মধ্যে

ব'সে দেখাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ, বাড়িমুখে যেমন ফিরেছি অমনি প্রকাণ্ড মাঠের উপর দীর্ঘ পদক্ষেপ করতে করতে সরোষগর্জনে একটা ঝড় আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। আমরা যখন প্রকৃতিসুন্দরীর চোখের সুর্মার বাহার নিয়ে তারিফ করছিলুম তখন তিলমাত্র আশঙ্কা করিনি যে, তিনি রোষাবিষ্টা গৃহিণীর মতো এত বড়ো একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাত নিয়ে আমাদের উপর ছুটে আসবেন। ধুলোয় এমনি অন্ধকার হয়ে এল যে পাঁচ হাত দূরে কিছু দেখা যায় না। বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল—কাঁকরগুলো বায়ুতাড়িত হয়ে ছিটে গুলির মতো আমাদের বিঁধতে লাগল—মনে হোলো বাতাস পিছন থেকে ঘাড় ধরে আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পিট্ পিট্ ক'রে মুখের উপর সবেগে আঘাত করতে লাগল। দৌড়্ দৌড়্। মাঠ সমান নয়। এক এক জায়গায় আবার খোয়াইয়ের ভিতর নাবতে হয়, সেখানে সহজ অবস্থাতেই চলা শক্ত, এই ঝড়ের বেগে চলা আরো মুশকিল। পথের মধ্যে আবার পায়ে কাঁটা-সুদ্ধ একটা শুকনো ডাল বিঁধে গেল—সেটা ছাড়াতে গিয়ে বাতাস আবার পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে মুখ থুবড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। বাড়ির যখন প্রায় কাছাকাছি এসেছি, তখন দেখি, তিন চারটে চাকর মহা সোরগোল ক'রে দ্বিতীয় আর একটা ঝড়ের মতো আমাদের উপরে এসে পড়ল। কেউ হাত ধরে, কেউ আহা উহু বলে, কেউ পথ দেখাতে চায়, কেউ আবার মনে করে বাবু বাতাসে উড়ে যাবেন ব'লে পিঠের

দিক থেকে জড়িয়ে ধরে; এই সমস্ত অনুচরদের দৌরাত্ম্য কাটিয়ে কুটিয়ে এলোমেলো চুলে, ধূলিমলিন দেহে, সিক্ত বস্ত্রে, হাঁপিয়ে বাড়িতে এসে তো পড়লুম। যাহোক, একটা খুব শিক্ষালাভ করেছি—হয়তো কোন্‌দিন কোন্ কাব্যে কিংবা উপন্যাসে বর্ণনা করতে বসতুম একজন নায়ক মাঠের মধ্যে দিয়ে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি ভেঙে নায়িকার মধুর মুখচ্ছবি স্মরণ ক'রে অকাতরে চলে যাচ্ছে—কিন্তু এখন আর এ রকম মিথ্যা কথা লিখতে পারব না; ঝড়েব সময় কারো মধুব মুখ মনে রাখা অসম্ভব—কী করলে চোখে কাঁকর ঢুকবে না সেই চিন্তাই সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। আমাব আবার চোখে eye-glass ছিল, সেটা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে, কিছুতেই রাখতে পারিনে। এক হাতে চষমা ধ'রে আর এক হাতে ধুতির কোঁচা সামলে পথের কাঁটাগাছ এবং গর্ত বাঁচিয়ে চলছি। যদি এখানকার কোপাই নদীর ধারে আমার কোনো প্রণয়িনীর বাড়ি থাকত, আমার চষমা এবং কোঁচা সামলাতুম, না, তার স্মৃতি সামলাতুম। বাড়িতে ফিরে এসে কাল অনেকক্ষণ ভাবলুম—বৈষ্ণব কবিরা গভীর রাত্রে ঝড়ের সময় রাধিকার অকাতর অভিসারসম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো মিষ্টি কবিতা লিখেছেন—কিন্তু একটা কথা ভাবেননি এ রকম ঝড়ে কৃষ্ণের কাছে তিনি কী মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হতেন। চুলগুলোর অবস্থা যে কী রকম হোত সে তো বেশ বোঝা যাচ্ছে। বেশবিন্যাসেরই বা কী রকম দশা। ধুলাতে লিপ্ত হয়ে, তার উপর বৃষ্টির জলে কাদা

জমিয়ে কুঞ্জবনে কী রকম অপরূপ মূর্তি ক'রে গিয়েই দাঁড়াতেন। এসব কথা কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের লেখা পড়বার সময় মনে হয় না—কেবল মানসচক্ষে ছবির মতো দেখতে পাওয়া যায় একজন সুন্দরী শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে বিকশিত কদম্ববনের ছায়া দিয়ে যমুনার তীরপথে প্রেমের আকর্ষণে ঝড়বৃষ্টির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মতো চলেছেন; পাছে শোনা যায় ব'লে পায়ের নূপুর বেঁধে রেখেছেন, পাছে দেখা যায় ব'লে নীলাম্বরী কাপড় পরেছেন, কিন্তু পাছে ভিজে যান ব'লে ছাতা নেননি, পাছে পড়ে যান ব'লে বাতি আনা আবশ্যক বোধ করেন নি। হায়, আবশ্যক জিনিসগুলো আবশ্যকের সময় এত বেশি দরকার, অথচ কবিত্বের বেলায় এত উপেক্ষিত। আবশ্যকের শতলক্ষ দাসত্ববন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি দেবার জন্যে কবিতা মিথ্যে ভান করছে। ছাতা জুতো জামাজোড়া চিরকাল থাকবে। বরঞ্চ শোনা যায় সভ্যতার উন্নতি সহকারে কাব্য ক্রমে লোপ পাবে কিন্তু ছাতা জুতোর নতুন নতুন পেটেন্ট বেরোতে থাকবে।

বোলপুর,
১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯২।

এখানে রাত্রে কোনো গির্জের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজে না—এবং কাছাকাছি কোনো লোকালয় না থাকাতে পাখিরা গান বন্ধ করবামাত্রই সন্ধ্যার পর থেকে একেবারে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা আরম্ভ হয়। প্রথম রাত্রি এবং অর্ধ রাত্রে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। কলকাতায় অনিদ্রার রাত্রি মস্ত একটা অন্ধকার নদীর মতো, খুব ধীরে ধীরে চলতে থাকে, বিছানায় চক্ষু মেলে চিৎ হয়ে পড়ে তার গতিশব্দ মনে মনে গণনা করা যেতে পারে; এখানকার রাত্রিটা যেন একটা প্রকাণ্ড নিস্তরঙ্গ হ্রদের মতো—আগাগোড়া সমান থম থম করছে কোথাও কিছু গতি নেই। যতই এপাশ ফিরি এবং যতই ওপাশ ফিরি একটা মস্ত যেন অনিদ্রার গুমট ক'রে ছিল, তার মধ্যে প্রবাহের লেশমাত্র পাওয়া যায় না। আজ সকালে কিছু বিলম্বে শয্যা ত্যাগ ক'রে আমার নিচেকার ঘরের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বুকের উপর শ্লেট রেখে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে সকালের বাতাস এবং পাখির ডাকের মধ্যে একটি কবিতা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম। বেশ জমে এসেছিল—মুখ সহাস্য, চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত, মাথা ঘন ঘন আন্দোলিত এবং গুন গুন আবৃত্তি উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল—এমন সময় একখানি চিঠি, একখানি সাধনা, একখানি সাধনার

প্রুফ এবং একখানি Monist কাগজ পাওয়া গেল। চিঠিখানি পড়লুম এবং সাধনার পাতাগুলোর মধ্যে চোখ দুটোকে একবার সবেগে ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে এলুম। তার পরে পুনশ্চ শিরশ্চালন ক'রে অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে কবিত্বে প্রবৃত্ত হলুম। শেষ ক'রে ফেলে তবে অন্য কথা। একটি কবিতা লিখে ফেললে যেমন আনন্দ হয় হাজার গদ্য লিখলেও তেমন হয় না কেন তাই ভাবছি। কবিতায় মনের ভাব বেশ একটি সম্পূর্ণতা লাভ করে, বেশ যেন হাতে ক'রে তুলে নেবার মতো। আর, গদ্য যেন এক বস্তা আলগা জিনিস—একটি জায়গা ধরলে সমস্তটি অমনি স্বচ্ছন্দে উঠে আসে না—একেবারে একটা বোঝা বিশেষ। রোজ রোজ যদি একটি ক'রে কবিতা লিখে শেষ করতে পারি তাহলে জীবনটা বেশ একরকম আনন্দে কেটে যায়—কিন্তু এত দিন ধরে সাধনা ক'রে আসছি ওজিনিসটা এখনো তেমন পোষ মানেনি—প্রতিদিন লাগাম পরাতে দেবে তেমন পক্ষীরাজ ঘোড়াটি নয়। আর্টের একটা প্রধান আনন্দ হচ্ছে স্বাধীনতার আনন্দ—বেশ আপনাকে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া যায় তার পরে আবার এই ভবকারাগারের মধ্যে ফিরে এসেও অনেকক্ষণ কানের মধ্যে একটা ঝংকার, মনের মধ্যে একটা স্ফূর্তি লেগে থাকে। এই ছোটো ছোটো কবিতাগুলো আপনা আপনি এসে পড়ছে ব'লে আর নাটকে হাত দিতে পারছিনে। নইলে দুটো তিনটে ভাবী নাটকের উমেদার মাঝেমাঝে দরজা ঠেলাঠেলি করছে। শীতকাল ছাড়া বোধ হয় সেগুলোতে

হাত দেওয়া হয়ে উঠবে না। চিত্রাঙ্গদা ছাড়া আমার আর সব নাটকই শীতকালে লেখা। সে সময়ে গীতিকাব্যের আবেগ অনেক ঠাণ্ডা হয়ে আসে অনেকটা ধীরে সুস্থে নাটক লেখা যায়।

বোলপুর,
৩১শে মে, ১৮৯২।

এখনো পাঁচটা বাজেনি কিন্তু আলো হয়েছে, বেশ বাতাস দিচ্ছে এবং বাগানের সমস্ত পাখিগুলো জেগে উঠে গান জুড়ে দিয়েছে। কোকিলটা তো সারা হয়ে গেল—সে কেন যে এত অবিশ্রাম ডাকে এ পর্যন্ত বোঝা গেল না—অবশ্য আমাদের শ্রুতিবিনোদনের জন্যে নয়, বিরহিণীকে পীড়ন করবার অভিপ্রায়েও নয়—তার নিজের একটা পার্সোনাল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু হতভাগার সে উদ্দেশ্য কি কিছুতেই সিদ্ধ হচ্ছে না। ছাড়েও না তো—কুউ কুউ চলছেই—আবার এক একবার যেন দ্বিগুণ অস্থির হয়ে দ্রুতবেগে কুহুধ্বনি করছে। এর মানে কী। আবার আর খানিকটা দূরে আর একটা কী পাখি নিতান্ত মৃদুস্বরে কুক কুক করছে—তাতে কিছুমাত্র উৎসাহ আগ্রহের ঝাঁজ নেই—লোকটা যেন নেহাৎ মন-মরা হয়ে গেছে—সমস্ত আশা ভরসা ছেড়ে দিয়েছে—কিন্তু তবু ছায়ায় বসে সমস্ত দিন ওই একটুখানি কুক কুক কুক কুক ওটুকু ছাড়তে পারছে না। বাস্তবিক ঐ ডানাওয়ালা ছোটো ছোটো নিরীহ জীবগুলি, অতি কোমল গ্রীবাটুকু বুকটুকু এবং পাঁচমিশালি রং নিয়ে গাছের ছায়ায় বসে আপন-আপন ঘরকন্না করছে—ওদের আসল বৃত্তান্ত কিছুই জানিনে। বাস্তবিক, বুঝতে পারিনে ওদের এত ডাকবার কী আবশ্যক।

শিলাইদহ,
৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯২।

এ সব শিষ্টাচার আর ভালো লাগে না—আজ কাল প্রায় বসে বসে আওড়াই—"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন।" বেশ একটা সুস্থ সবল উন্মুক্ত অসভ্যতা। ইচ্ছা করে দিনরাত্রি বিচার আচার বিবেক বুদ্ধি নিয়ে কতকগুলো বহুকেলে জীর্ণতার মধ্যে শরীর মনকে অকালে জরাগ্রস্ত না ক'রে একটা দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ নিয়ে খুব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ লাভ করি। মনের সমস্ত বাসনা ভাবনা ভালোই হোক মন্দই হোক, বেশ অসংশয় অসংকোচ এবং প্রশস্ত যেন হয় —প্রথার সঙ্গে বুদ্ধির, বুদ্ধির সঙ্গে ইচ্ছার, ইচ্ছার সঙ্গে কাজের কোনোরকম অহর্নিশি খিটিমিটি না ঘটে। একবার যদি এই রুদ্ধ জীবনকে খুব উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলভাবে ছাড়া দিতে পারতুম, একেবারে দিগ্বিদিগে ঢেউ খেলিয়ে ঝড় বাহিয়ে দিতুম, একটা বলিষ্ঠ বুনো ঘোড়ার মতো কেবল আপনার লঘুত্বের আনন্দ-আবেগে ছুটে যেতুম। কিন্তু আমি বেদুয়িন নই বাঙালি। আমি কোণে বসে বসে খুঁত খুঁত করব বিচার করব তর্ক করব, মনটাকে নিয়ে একবার ওলটাব একবার পালটাব— যেমন করে মাছ ভাজে, ফুটন্ত তেলে একবার এ পিঠ চিরবিড়

ক'রে উঠবে একবার ওপিঠ চিরবিড় করবে,—যাকগে, যখন রীতিমতো অসভ্য হওয়া অসাধ্য তখন রীতিমতো সভ্য হবার চেষ্টা করাই সংগত—সভ্যতা এবং বর্বরতার মধ্যে লড়াই বাধাবার দরকার নেই।

শিলাইদহ,
১৬ই জুন, ১৮৯২।

যতই একলা আপনমনে নদীর উপরে কিংবা পাড়াগাঁয়ে কোনো খোলা জায়গায় থাকা যায়, ততই প্রতিদিন পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, সহজভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ ক'রে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হোতে পারে না। মাঠের তৃণ থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত তাই করছে; কেউ গায়ের জোরে আপনার সীমাকে অত্যন্ত বেশি অতিক্রম করবার জন্যে চেষ্টা করছে না ব'লেই প্রকৃতির মধ্যে এমন গভীর শান্তি এবং অপার সৌন্দর্য—অথচ প্রত্যেকে যেটুকু করছে সেটুকু বড়ো সামান্য নয়—ঘাস আপনার চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে তবে ঘাসরূপে টিঁকে থাকতে পারে, তার শিকড়ের শেষ প্রান্তটুকু পর্যন্ত দিয়ে তাকে রসাকর্ষণ করতে হয়, সে যে নিজের শক্তি লঙ্ঘন ক'রে বটগাছ হবার নিষ্ফল চেষ্টা করছে না এইজন্যই পৃথিবী এমন সুন্দর শ্যামল হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক, বড়ো বড়ো উদ্যোগ এবং লম্বা-চৌড়া কথার দ্বারা নয় কিন্তু প্রাত্যহিক ছোটো ছোটো কর্তব্য-সমাধা দ্বারাই মানুষের সমাজে যথাসম্ভব শোভা এবং শান্তি আছে। কবিত্বই বলো আর বীরত্বই বলো কোনোটাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু একটি অতি ক্ষুদ্র কর্তব্যের মধ্যেও তৃপ্তি এবং সম্পূর্ণতা আছে। বসে বসে হাঁসফাঁস করা, কল্পনা করা,

কোনো অবস্থাকেই আপনার যোগ্য মনে না করা, এবং ইতিমধ্যে সম্মুখ দিয়ে সময়কে চলে যেতে দেওয়া, এর চেয়ে হেয় আর কিছু হোতে পারে না। যখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা যায় নিজের সাধ্যায়ত্ত সমস্ত কর্তব্য সত্যের সঙ্গে, বলের সঙ্গে, হৃদয়ের সঙ্গে সুখতুখের ভিতর দিয়ে পালন ক'রে যাব, এবং যখন বিশ্বাস হয় তা করতে পারব, তখন সমস্ত জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, ছোটোখাটো তুঃখবেদনা একেবারে দূর হয়ে যায়। অবশ্য, আমার জীবনের প্রতিদিন এবং প্রত্যেক মুহূর্ত আমার সম্মুখে এখন প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নেই, তাই হয়তো দূর থেকে হঠাৎ একটা কাল্পনিক আশার উচ্ছ্বাসে স্ফীত হয়ে উঠছি, সমস্ত খুঁটিনাটি খিটিমিটি সংকট এবং সংঘর্ষ বাদ দিয়ে ভাবী জীবনের একটা মোটামুটি চিত্র অঙ্কিত ক'রে এতটা ভরসা পাচ্ছি, কিন্তু তা ঠিক নয়।

শিলাইদহ,

২রা আষাঢ়, ১২৯৯।

কাল আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বর্ষার নব রাজ্যাভিষেক বেশ রীতিমতো আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে গেছে। দিনের-বেলাটা খুব গরম হয়ে বিকেলের দিকে ভারি ঘনঘটা মেঘ করে এল।

কাল ভাবলুম, বর্ষার প্রথম দিনটা, আজ বরঞ্চ ভেজাও ভালো তবুও অন্ধকূপের মধ্যে দিন যাপন করব না। জীবনে ৯৩ সাল আর দ্বিতীয়বার আসবে না—ভেবে দেখতে গেলে পরমায়ুর মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন আর কবারই বা আসবে—সবগুলো কুড়িয়ে যদি ত্রিশটা দিন হয় তাহলেও খুব দীর্ঘজীবন বলতে হবে। মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে—নিদেন আমার পক্ষে। আমি প্রায়ই এক এক সময়ে ভাবি, এই যে আমার জীবনে প্রত্যহ একটি একটি ক'রে দিন আসছে, কোনোটি সূর্যোদয় সূর্যাস্তে রাঙা, কোনোটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধশীতল, কোনোটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সাদা ফুলের মতো প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য। এবং এরা কি কম মূল্যবান। হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন—আমার জীবনেও প্রতি বৎসর সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত

আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়—সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির—সেই বহু-কালের শত শত সুখদুঃখ বিরহমিলনময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবসঃ। সেই অতি পুরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতিবৎসর একটি একটি করে কমে যাচ্ছে, অবশেষে এক সময় আসবে, যখন এই কালিদাসের দিন, এই মেঘদূতের দিন, এই ভারতবর্ষের বর্ষার চিরকালীন প্রথম দিন, আমার অদৃষ্টে আর একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। একথা ভালো করে ভাবলে পৃথিবীর দিকে আবার ভালো করে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে ; ইচ্ছে করে জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিই। আমি যদি সাধুপ্রকৃতির লোক হতুম তাহলে হয়তো মনে করতুম জীবন নশ্বর অতএব প্রতিদিন বৃথা ব্যয় না করে সৎকার্যে এবং হরিনামে যাপন করি। কিন্তু আমার সে প্রকৃতি নয়—তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে—এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছিনে। এই সমস্ত রং, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোকভূলোকের মাঝখানে সমস্ত শূন্যপরিপূর্ণ করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে। কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা। আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়া পাওয়াই যায় না। জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস

করি। লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না, সে যেন আরো লক্ষযোজন দূরে। রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক একটি মানিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না। সেই বিলেত যাবার পথে লোহিত সমুদ্রের স্থির জলের উপরে যে একটি অলৌকিক সূর্যাস্ত দেখেছিলুম, সে কোথায় গেছে। কিন্তু ভাগ্যিস আমি দেখেছিলুম, আমার জীবনে ভাগ্যিস সেই একটি সন্ধ্যা উপেক্ষিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায়নি—অনন্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি অত্যাশ্চর্য সূর্যাস্ত আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কবি দেখেনি। আমার জীবনে তার রং রয়ে গেছে। এমন এক একটি দিন এক একটি সম্পত্তির মতো। আমার সেই পেনেটির বাগানের গুটিকতক দিন, তেতালার ছাতের গুটিকতক রাত্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দার গুটিকতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা, দার্জিলিঙে সিঞ্চল শিখরের একটি সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় এই রকম কতকগুলি উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণ-খণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে। ছেলেবেলায় বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে যখন ছাতে পড়ে থাকতুম তখন জ্যোৎস্না যেন মদের শুভ্র ফেনার মতো একেবারে উপচে পড়ে নেশায় আমাকে ডুবিয়ে দিত। যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি এখানকার মানুষগুলো

সব অদ্ভুত জীব—এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে, পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এই জন্যে বহু যত্নে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে। বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারি অদ্ভুত। এরা যে ফুলের গাছে এক একটি ঘ্যাটাটোপ পরিয়ে রাখেনি, চাঁদের নিচে চাঁদোয়া খাটায়নি সেই আশ্চর্য। এই স্বেচ্ছাঅন্ধগুলো বন্ধ পালকির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে চলে যাচ্ছে। যদি বাসনা এবং সাধনা-অনুরূপ পরকাল থাকে তাহলে এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি। যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হোতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন ব'লে অবজ্ঞা করে—কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত—কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক্, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।

আমি ভদ্রলোক সেজে শহরের বড়ো রাস্তায় আনাগোনা করছি, পরিপাটী ভদ্রলোকদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথাবার্তা কয়ে জীবন মিথ্যে কাটিয়ে দিচ্ছি। আমি অন্তরে অসভ্য অভদ্র—আমার জন্যে কোথাও কি একটা ভারি সুন্দর অরাজকতা নেই, কতকগুলো খ্যাপা লোকের আনন্দমেলা নেই। কিন্তু আমি কী এ সমস্ত বকছি—কাব্যের নায়কেরা

এই রকম সব কথা বলে—কন্‌ভেন্‌শ্যানালিটির উপরে তিন-চার পাতজোড়া স্বগত উক্তি প্রয়োগ করে—আপনাকে সমস্ত মানবসমাজের চেয়ে বড়ো মনে করে। বাস্তবিক এ সব কথা বলতে লজ্জা করে। এর মধ্যে যে সত্যটা আছে সে বহুকাল থেকে ক্রমাগত কথা চাপা পড়ে আসছে। পৃথিবীতে সবাই ভারি কথা কয়—তার মধ্যে আমি একজন অগ্রগণ্য—হঠাৎ এতক্ষণে সে বিষয়ে চেতনা হোলো।

পুঃ—আসল যে কথাটা বলতে গিয়েছিলুম—সেটা ব'লে নিই—ভয় নেই, আবার চার পাতা জুড়বে না—কথাটা হচ্ছে—পয়লা আষাঢ়ের দিন বিকেলে খুব মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাস্।

শিলাইদহ,

৪ঠা আষাঢ়, ১৮৯২।

আজকাল আমি বিকেলে সন্ধ্যার দিকে ডাঙায় উঠে অনেকক্ষণ বেড়াতে থাকি—পূর্বদিকে যখন ফিরি এক রকম দৃশ্য দেখতে পাই পশ্চিমে যখন ফিরি আর এক রকম দেখতে পাই—আকাশ থেকে আমার মাথার উপরে যেন সান্ত্বনা বৃষ্টি হোতে থাকে—আমার দুই মুগ্ধ চোখের ভিতর দিয়ে যেন একটি স্বর্ণময় মঙ্গলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। এই বাতাসে আকাশে এবং আলোকে প্রতিক্ষণে আমার মন ছেয়ে যেন নতুন পাতা গজিয়ে উঠছে—আমি নতুন প্রাণ এবং বলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছি। সংসারের সমস্ত কাজ করা এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহার করা আমার পক্ষে ভারি সহজ হয়ে পড়েছে। আসলে সবই সোজা—একটিমাত্র সিধে রাস্তা আছে। চোখ চেয়ে সেই রাস্তা ধরে গেলেই হোলো, নানারকম বুদ্ধিপূর্বক short cut খোঁজবার দরকার দেখিনে—সুখ দুঃখ সকল রাস্তাতেই আছে কোনো রাস্তা দিয়েই তাদের এড়িয়ে যাবার জো নেই, কিন্তু শান্তি কেবল এই বড়ো রাস্তাতেই আছে।

শিলাইদহ,
৩রা ভাদ্র, ১৮৯২।

এমন সুন্দর শরতের সকালবেলা। চোখের উপর যে কী সুধাবর্ষণ করছে সে আর কী বলব। তেমনি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে এবং পাখি ডাকছে। এই ভরা নদীর ধারে বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপরে শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণী-সুন্দরীর সঙ্গে কোন্ এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালবাসা চলছে—তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্ধ উদাস অর্ধ সুখের ভাব, গাছের পাতা এবং ধানের খেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন,—জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা। প্রেমের যেমন একটা গুণ আছে তার কাছে জগতের মহা মহা ঘটনাও তুচ্ছ মনে হয় এখানকার আকাশের মধ্যে তেমনি যে একটি ভাব ব্যাপ্ত হয়ে আছে তার কাছে কলকাতার দৌড়-ধাপ হাঁসফাঁস ধড়ফড়ানি ঘড়ঘড়ানি ভারি ছোটো এবং অত্যন্ত সুদূর মনে হয়। চারদিক থেকে আকাশ আলো বাতাস এবং গান এক রকম মিলিতভাবে এসে আমাকে অত্যন্ত লঘু ক'রে আপনাদের সঙ্গে যেন মিশিয়ে ফেলছে—আমার সমস্ত মনটাকে কে যেন তুলিতে ক'রে তুলে নিয়ে এই রঙিন শরৎপ্রকৃতির উপর আর এক পোঁচ রঙের মতো

মাখিয়ে দিচ্ছে,—তাতে ক'রে এই সমস্ত নীল সবুজ এবং সোনার উপর আর একটা যেন নেশার রং লেগে গেছে। বেশ লাগছে। "কী জানি পরান কী যে চায়" বলতে লজ্জা বোধ হয় এবং শহরে থাকলে বলতুম না—কিন্তু ওটা ষোলো আনা কবিত্ব হোলেও এখানে বলতে দোষ নেই। অনেক পুরোনো শুকনো কবিতা—কলকাতায় যাকে উপহাসানলে জ্বালিয়ে ফেলবার যোগ্য মনে হয় তারা এখানে আসবামাত্র দেখতে দেখতে মুকুলিত পল্লবিত হয়ে ওঠে।

———

গোয়ালন্দের পথে,

২১শে জুন, ১৮৯২।

আজ সমস্ত দিন নদীর উপর ভেসে চলেছি। আশ্চর্য এই বোধ হচ্ছে যে, কতবার এই রাস্তা দিয়ে গেছি এই বোটে চড়ে জলে জলে বেড়িয়েছি এবং নদীর দুই তীরের মাঝখান দিয়ে ভেসে যাবার যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে সে উপভোগ করেছি—কিন্তু দিন দুই ডাঙায় বসে থাকলে সেটা ঠিকটা আর মনে থাকে না। এই যে একলাটি চুপ ক'রে বসে চেয়ে থাকা—দুইধারে গ্রাম ঘাট শস্যক্ষেত্র চর, বিচিত্র ছবি দেখা দিচ্ছে এবং চলে যাচ্ছে, আকাশে মেঘ ভাসছে এবং সন্ধ্যের সময় নানা রকম রং ফুটছে;—নৌকো চলেছে, জেলেরা মাছ ধরছে, অহর্নিশি জলের একপ্রকার আদরপরিপূর্ণ তরল শব্দ শোনা যাচ্ছে—সন্ধ্যেবেলায় বিস্তৃত জলরাশি শ্রান্ত নিদ্রিত শিশুর মতো একেবারে স্থির হয়ে যাচ্ছে এবং উন্মুক্ত আকাশের সমস্ত তারা মাথার উপরে জেগে চেয়ে আছে—গভীর রাত্রে যেদিন ঘুম নেই সেদিন উঠে বসে দেখি অন্ধকারাচ্ছন্ন দুই কূল নিদ্রিত, মাঝে মাঝে কেবল গ্রামের বনে শৃগাল ডাকছে, এবং পদ্মার নীরব খরস্রোতে ঝুপঝাপ ক'রে পাড় খসে খসে পড়ছে—এই সমস্ত পরিবর্তনশীল ছবি যেমন যেমন চোখে পড়তে থাকে অমনি মনের ভিতরে একটা কল্পনার স্রোত বইতে থাকে এবং তার দুই-পারে তটদৃশ্যের মতো নব নব আকাঙ্ক্ষার চিত্র দেখা দিতে

থাকে। হয়তো সম্মুখের দৃশ্যটা খুব একটা চমৎকার কিছু নয়—একটা হল্‌দে রকমের তৃণতরুশূন্য বালির চর ধূ ধূ করছে—তারি গায়ে একটা জনশূন্য নৌকো বাঁধা রয়েছে এবং আকাশের ছায়ায় ফিকে নীলবর্ণ নদী বয়ে চলে যাচ্ছে—দেখে মনের ভিতরে কী রকম করে বলতে পারিনে। বোধ হয় সেই ছেলেবেলায় তখন আরব্য উপন্যাস পড়তুম, সিন্ধবাদ নানা নূতন দেশে বাণিজ্য করতে বাহির হোত, ভৃত্যশাসিত আমি তোষাখানার মধ্যে রুদ্ধ হয়ে বসে বসে দুপুর বেলায় সিন্ধবাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতুম তখন যে আকাঙ্ক্ষাটা মনের মধ্যে জন্মেছিল সেটা যেন এখনো বেঁচে আছে, ঐ বালিচরে নৌকো বাঁধা দেখলে সেই যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ছেলে-বেলায় যদি আরব্য উপন্যাস রবিন্‌সন্ ক্রুসো না পড়তুম, রূপকথা না শুনতুম, তাহলে নিশ্চয় বলতে পারি ঐ নদী-তীর এবং মাঠের প্রান্তের দূর দৃশ্য দেখে ঠিক এমনভাব মনে উদয় হোত না—সমস্ত পৃথিবীর চেহারা আমার পক্ষে আর একরকম হয়ে যেত। এইটুকু মানুষের মনের ভিতরে বাস্তবিক কাল্পনিকে জড়িয়ে মড়িয়ে কী যে একটা জাল পাকিয়ে আছে। কিসের সঙ্গে যে কী গেঁথে গেছে—কত গল্পের সঙ্গে ছবির সঙ্গে ঘটনার সঙ্গে সামান্যের সঙ্গে বড়োর সঙ্গে জড়িয়ে গিঁঠ পড়ে আছে—প্রতিদিন অজ্ঞাতে জড়িয়ে যাচ্ছে। একটা মানুষের একটা বৃহৎ জীবনের জাল খুলতে পারলে কত ছোটো এবং কত বড়োর মিশল আলাদা করা যায়।

শিলাইদা,
২২শে জুন, ১৮৯২।

আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিলুম ঘাটে মেয়েরা উলু দিচ্ছে। শুনে মনটা কেমন ঈষৎ বিকল হয়ে গেল—অথচ তার কারণ পাওয়া শক্ত। বোধ হয় এই রকমের একটা আনন্দধ্বনিতে হঠাৎ অনুভব করা যায় পৃথিবীতে একটা বৃহৎ কর্মপ্রবাহ চলছে যার অধিকাংশের সঙ্গেই আমার যোগ নেই—পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আমার কেউ নয় অথচ তাদের কত কাজকর্ম সুখদুঃখ উৎসব আনন্দ চলছে। কী বৃহৎ পৃথিবী। কী বিপুল মানবসংসার। কত সুদূর থেকে জীবনের ধ্বনি প্রবাহিত হয়ে আসে—সম্পূর্ণ অপরিচিত ঘরের একটুখানি বার্তা পাওয়া যায়। মানুষ যখন বুঝতে পারে আমার কাছে আমি যত বড়োই হই আমাকে দিয়ে সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ করতে পারিনে—অধিকাংশ জগৎই আমার অজ্ঞাত অজ্ঞেয় অনাত্মীয় আমাহীন—তখন এই প্রকাণ্ড ঢিলে জগতের মধ্যে আপনাকে অত্যন্ত খাটো এবং একরকম পরিত্যক্ত এবং প্রান্তবর্তী ব'লে মনে হয়—তখনি মনের মধ্যে এই রকমের একটা ব্যাপ্ত বিষাদের উদয় হয়। তা ছাড়া এই উলুধ্বনিতে নিজের অতীত ভবিষ্যৎ সমস্ত জীবনটা একটি অতি সুদীর্ঘ পথের মতো চোখের সমুখে উদয় হোলো এবং তারি এক একটি সুদূর ছায়াময় প্রান্ত থেকে এই উলুধ্বনি কানে

এসে পৌঁছতে লাগল। এই রকম ভাবে তো আজ দিনটা আরম্ভ করেছি। এখনি সদর নায়েব আমলাবর্গ এবং প্রজারা উপস্থিত হোলে এই উলুধ্বনির প্রতিধ্বনিটুকু পাড়া ছেড়ে পালাবে—অতি ক্ষীণ ভূতভবিষ্যৎকে দুই কনুই দিয়ে ঠেলে ফেলে জোয়ান বর্তমান নিজ মূর্তি ধরে সেলাম ঠুকে এসে দাঁড়াবে।

সাজাদপুর,
২৮শে জুন, ১৮৯২।

আজকের চিঠির মধ্যে এক জায়গায় অ—র গানের একটুখানি উল্লেখ আছে। পড়ে মনটা কেমন হঠাৎ হুহু করে উঠল। জীবনের অনেকগুলি ছোটো ছোটো উপেক্ষিত সুখ, যারা শহরের গোলমালের মধ্যে কোনো আমল পায় না, বিদেশে এলে তারা সময় বুঝে হৃদয়ের কাছে আপন আপন দরখাস্ত পাঠিয়ে দেয়। আমি গানবাজনা এত ভালবাসি এবং শহরেও এত কণ্ঠ এবং বাদ্য আছে কিন্তু দিনের পর দিন চলে যায় এক দিনও কর্ণপাত করিনে। যদিও সব সময়ে বুঝতে পারিনে কিন্তু মনের ভিতরটা কি তৃষিত হয়ে থাকে না। আজকের চিঠি পড়বামাত্রই অ—র মিষ্টিগান শোনবার জন্যে আমার এমনি ইচ্ছা করে উঠল যে তখনি বুঝতে পারলুম প্রকৃতির অনেকগুলি ক্রন্দনের মধ্যে এও একটা ক্রন্দন ভিতরে ভিতরে চাপা ছিল। বড়ো বড়ো দুরাশার মোহে জীবনের ছোটো ছোটো আনন্দগুলিকে উপেক্ষা করে আমাদের জীবনকে কী উপবাসী করেই রাখি। যখন বিলেতে যাচ্ছিলুম আমার একটা কল্পনার সুখের ছবি এই ছিল যে কেউ একজন পিয়ানো বাজাচ্ছে, খোলা দরজা জানলার ভিতর দিয়ে আলো এবং বাতাস আসছে, খানিকটা সুদূর আকাশ ও গাছপালা দেখা যাচ্ছে,—আমি একটা

খোলা জানলার কাছে কৌচের উপর পড়ে বাইরে চোখ রেখে শুনছি। এটা যে একটা দুর্লভ দুরাশা তা বলতে পারিনে কিন্তু তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে কদিন অদৃষ্টে এ সুখ পাওয়া যায়। এই সমস্ত সুলভ আনন্দের অপরিতৃপ্তি জীবনের হিসাবে প্রতিদিন বেড়ে উঠছে—এর পরে এমন একটা দিন আসতেও পারে যখন মনে হবে যদি আবার জীবনটা সমস্তটা ফিরে পাই তাহলে আর কিছু অসাধ্য সাধন করতে চাইনে কেবল জীবনের এই প্রতিদিনের অযাচিত ছোটো ছোটো আনন্দগুলি প্রতিদিন উপভোগ করে নিই।

সাজাদপুর,
২৭শে জুন, ১৮৯২।

কাল বিকেলের দিকে এমনি ক'রে এল আমার ভয় হোলো। এমনতরো রাগী চেহারার মেঘ আমি কখনো দেখেছি ব'লে মনে হয় না। গাঢ় নীল মেঘ দিগন্তের কাছে একে-বারে থাকে থাকে ফুলে উঠেছে, একটা প্রকাণ্ড হিংস্র দৈত্যের রোষস্ফীত গোঁফজোড়াটার মতো। এই ঘন নীলের ঠিক পাশেই দিগন্তের সব শেষে ছিন্ন মেঘের ভিতর থেকে একটা টক্‌টকে রক্তবর্ণ আভা বেরচ্ছে—একটা আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড অলৌকিক "বাইসন" মোষ যেন খেপে উঠে রাঙা চোখ দুটো পাকিয়ে ঘাড়ের নীল কেশরগুলো ফুলিয়ে বক্রভাবে মাথাটা নিচু ক'রে দাঁড়িয়েছে—এখনি পৃথিবীকে শৃঙ্গাঘাত করতে আরম্ভ ক'রে দেবে এবং এই আসন্ন সংকটের সময় পৃথিবীর সমস্ত শস্যখেত এবং গাছের পাতা হী হী করছে, জলের উপরিভাগ শিউরে শিউরে উঠছে, কাকগুলো অশান্তভাবে উড়ে উড়ে কা কা ক'রে ডাকছে।

সাজাদপুর,
২৯শে জুন, ১৮৯২।

কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম আজ অপরাহ্ণ সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এনগেজমেণ্ট করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে বইখানি হাতে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার এসে উপস্থিত। মৃত কবির চেয়ে একজন জীবিত পোস্টমাস্টারের দাবি ঢের বেশি। আমি তাঁকে বলতে পারলুম না—আপনি এখন যান, কালিদাসের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে—বললেও সে লোকটি ভালো বুঝতে পারতেন না। অতএব পোস্টমাস্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হোলো। এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট অপিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম তখনি আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরল তখন আমাদের পোস্টমাস্টার বাবু তার উল্লেখ ক'রে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হোক এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানারকম

গল্প ক'রে যান আমি চুপ ক'রে বসে শুনি। ওরি মধ্যে ওঁর আবার বেশ একটু হাস্যরসও আছে।

পোস্টমাস্টার চলে গেলে সেই রাত্রে আবার রঘুবংশ নিয়ে পড়লুম। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর পড়ছিলুম। সভায় সিংহাসনের উপর সারিসারি সুসজ্জিত সুন্দর চেহারা রাজারা ব'সে গেছেন—এমন সময় শঙ্খ এবং তুরীধ্বনির মধ্যে বিবাহবেশ প'রে সুনন্দার হাত ধরে ইন্দুমতী তাঁদের মাঝখানে সভাপথে এসে দাঁড়ালেন। ছবিটি মনে করতে এমনি সুন্দর লাগে। তার পরে সুনন্দা এক এক জনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী অনুরাগহীন এক একটি প্রণাম ক'রে চলে যাচ্ছেন। এই প্রণাম করাটি কেমন সুন্দর। যাকে ত্যাগ করছেন তাকে যে নম্রভাবে সম্মান ক'রে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে। সকলেই রাজা, সকলেই তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে তাঁদের একে একে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে এই অবশ্যরূঢ়তাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত তাহলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য থাকত না।

সাজাদপুর,

৩রা জুলাই, ১৮৯২।

কাল রাত্রে আমি বেশ একটা নতুন রকমের স্বপ্ন দেখেছি। যেন কোথায় এক জায়গায় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এসেছেন এবং তাঁর অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে উৎসব হচ্ছে। অন্যান্য নানারকম আমোদের মধ্যে একটা তাম্বুতে একজন বিখ্যাত বুড়ো গাইয়ে গান গাচ্ছে। গাইয়ে একটা বড়ো রকম ইমন কল্যাণ গাচ্ছিল। গাইতে গাইতে হঠাৎ এক জায়গায় সে ভুলে গেল। দুবার সেটা ফিরে ফিরে মনে করবার চেষ্টা করলে—তারপর তৃতীয় বারের বার নিরাশ হয়ে গানের কথা-গুলো ছেড়ে দিয়ে অমনি কেবল সুরটা ভেঁজে যেতে যেতে হঠাৎ সেই সুরটা কেমন ক'রে কান্নায় পরিবর্তিত হয়ে গেল—সবাই মনে করছিল সে গান গাচ্ছে, হঠাৎ দেখে সে কান্না। তার কান্না শুনে বড়দাদা "আহা আহা" করে উঠলেন। এক-জন প্রকৃত গুণীর মনে এরকম ঘটনায় কতখানি আঘাত লাগতে পারে তিনি যেন সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। তার পরে নানারকম অসংলগ্ন হিজিবিজি কী হোলো এবং বাংলা মুল্লুকের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে কোথায় উড়ে গেলেন তার কিছুই মনে নাই।

শিলাইদা
২০ শে জুলাই, ১৮৯২।

আজ এইমাত্র প্রাণটা যাবার জো হয়েছিল। পান্টি থেকে শিলাইদা যাচ্ছিলুম, বেশ পাল পেয়েছিলুম, খুব হুহুঃ শব্দে চলে আসছিলুম। বর্ষার নদী চারদিকে থই থই করছে এবং হৈ হৈ শব্দে ঢেউ উঠছে আমি মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছি এবং মাঝে মাঝে লেখা পড়া করছি। বেলা সাড়ে দশটার সময় গড়ুই নদীর ব্রিজ দেখা গেল। বোটের মাস্তুল ব্রিজে বাধবে কিনা তাই নিয়ে মাঝিদের মধ্যে তর্ক পড়ে গেল—ইতিমধ্যে বোট ব্রিজের অভিমুখে চলেছে। মাঝিদের আশা ছিল যে, আমরা স্রোতের বিপরীতমুখে যখন চলেছি তখন ভাবনা নেই—কারণ ব্রিজের কাছাকাছি এসেও যদি দেখা যায় যে মাস্তুল বাধবে তখনি পাল নাবিয়ে দিলে বোট স্রোতে পিছিয়ে যাবে। কিন্তু ব্রিজের কাছে এসে আবিষ্কার করা গেল মাস্তুল ঠেকবে এবং সেখানে একটা আওড় (আবর্ত) আছে। সেই আওড় থাকাতে সেখানে স্রোতের গতি বিপরীত মুখে হয়েছে। তখন বোঝা গেল সামনে একটি বিপদ উপস্থিত কিন্তু বেশিক্ষণ চিন্তা করবার সময় ছিল না—দেখতে দেখতে বোট ব্রিজের উপর গিয়ে পড়ল। মাস্তুল মড়মড় ক'রে ক্রমেই কাত হোতে লাগল—আমি হতবুদ্ধি মাল্লাদের ক্রমাগত বলছি তোরা ওখান থেকে সর্, মাথায় মাস্তুল ভেঙে মরবি না কি।

এমন সময় আর একটা নৌকো তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে এসে আমাকে তুলে নিলে এবং রসি নিয়ে আমার বোটটাকে টানতে লাগল—তপ্‌সি এবং আর একজন মাল্লা রসি দাঁতে কামড়ে সাঁৎরে ডাঙায় উঠে টানতে লাগল—সেখানে আরো অনেক লোক জমা হয়ে বোট টেনে তুললে। সকলে ডাঙায় ভিড় ক'রে এসে বললে আল্লা বাঁচিয়ে দিয়েছেন নইলে বাঁচবার কোনো কথা ছিল না। সমস্ত জড় পদার্থের কাণ্ড কিনা— আমরা হাজার কাতর হই, চেঁচাই, লোহাতে যখন কাষ্ঠ ঠেকল এবং নিচের থেকে যখন জল ঠেলতে লাগল, তখন যা হবার তা হবেই,—জলও এক মুহূর্ত থামল না, মাস্তুলও এক চুল মাথা নিচু করল না, লোহার ব্রিজও তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

———

শিলাইদা,

২১শে জুলাই, ১৮৯২।

কাল বিকেলে শিলাইদহে পৌঁছেছিলুম আজ সকালে আবার পাবনায় চলেছি। নদীর যে রোখ। যেন লেজ-দোলানো কেশর-ফোলানো তাজা বুনো ঘোড়ার মতো। গতিগর্বে ঢেউ তুলে ফুলে ফুলে চলেছে—এই খ্যাপা নদীর উপর চড়ে আমরা দুলতে দুলতে চলেছি। এর মধ্যে ভারি একটা উল্লাস আছে। এই ভরা নদীর যে কলরব সে আর কী বলব। ছলছল খলখল ক'রে কিছুতে যেন আর ক্ষান্ত হোতে পারছে না, ভারি একটা যৌবনের মত্ততার ভাব। এ তবু গড়ই নদী—এখান থেকে আবার পদ্মায় গিয়ে পড়তে হবে—তার বোধ হয় আর কূলকিনারা দেখবার জো নেই—সে মেয়ে বোধ হয় একেবারে উন্মাদ হয়ে খেপে নেচে বেরিয়ে চলেছে, সে আর কিছুর মধ্যেই থাকতে চায় না। তাকে মনে করলে আমার কালীর মূর্তি মনে হয়—নৃত্য করছে, ভাঙছে, এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। মাঝিরা বলছিল নূতন বর্ষায় পদ্মার খুব "ধার" হয়েছে। ধার কথাটা ঠিক। তীব্রস্রোত যেন চকচকে খড়্গের মতো—পাতলা ইস্পাতের মতো একেবারে কেটে চলে যায়—প্রাচীন ব্রিটন-দের যুদ্ধরথের চাকায় যেমন কুঠার বাঁধা—দুইধারের তীর একেবারে অবহেলে ছারখার ক'রে দিয়ে চলেছে।

কাল যে কাণ্ডটি হয়েছিল সে কিছু গুরুতর বটে। কাল যমরাজের সঙ্গে একরকম হাউ-ড্যু-ডু ক'রে আসা গেছে। মৃত্যু যে ঠিক আমাদের নেক্সট্-ডোর-নেবার্, তা এ রকম ঘটনা না হোলে সহজে মনে হয় না। হয়েও বড়ো মনে পড়ে না। কাল চকিতের মতো যাঁর আভাস পাওয়া গিয়েছিল আজ তাঁর মূর্তিখানা কিছুই স্মরণ হচ্ছে না। অপ্রিয় অনাবশ্যক বন্ধুর মতো একেবারে অনাহূত ঘাড়ে এসে না পড়লে তাঁর বিষয়ে আমরা বড়ো একটা ভাবিনে। যদিও তিনি আড়াল থেকে আমাদের সর্বদাই খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন। যা হোক তাঁকে আমি বহুত বহুত সেলাম দিয়ে জানিয়ে রাখছি তাঁকে আমি এক কানা কড়ির কেয়ার করিনে—তা তিনি জলেই ঢেউ তুলুন আর আকাশ থেকে ফুঁ-ই দিন—আমি আমার পাল তুলে চললুম—তিনি যতদূর করতে পারেন তা পৃথিবীসুদ্ধ সকলেরই জানা আছে, তার বেশি আর কী করবেন। যেমনি হোক, হাঁউমাউ করব না।

শিলাইদা,

২০শে অগস্ট, ১৮৯২।

রোজ সকালে চোখ চেয়েই আমার বাঁ দিকে জল এবং ডানদিকে নদীতীর সূর্যকিরণে প্লাবিত দেখতে পাই। অনেক সময়ে ছবি দেখলে যে মনে হয় আহা এইখানে যদি থাকতুম, ঠিক সেই ইচ্ছাটা এখানে পরিতৃপ্ত হয়—মনে হয়, একটি জাজ্বল্যমান ছবির মধ্যে আমি বাস করছি—বাস্তব জগতের কোনো কঠিনতাই এখানে যেন নেই। ছেলেবেলায় রবিন্‌সন্-ক্রুসো, পৌলবর্জিনি প্রভৃতি বই থেকে গাছপালা সমুদ্রের ছবি দেখে মন ভারি উদাসীন হয়ে যেত—এখানকার রৌদ্রে আমার সেই ছবি দেখার বাল্যস্মৃতি ভারি জেগে ওঠে—এর যে কী মানে ঠিক ধরতে পারিনে—এর সঙ্গে যে কী একটা আকাঙ্ক্ষা জড়িত আছে ঠিক বুঝতে পারিনে। এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হোতে থাকত—আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশদেশান্তরের জলস্থলপর্বত ব্যাপ্ত ক'রে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি

জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড-ভাবে সঞ্চারিত হোতে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর ক'রে কাঁপছে। এই পৃথিবীর উপর আমার যে একটি আন্তরিক বৎসলতার ভাব আছে, ইচ্ছা করে সেটা ভালো ক'রে প্রকাশ করতে—কিন্তু ওটা বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পারবে না,—কী একটা কিম্ভূত রকমের মনে করবে।

বোয়ালিয়া,

১৮ই নবেম্বর, ১৮৯২।

ভাবছিলুম এতক্ষণে রেলগাড়ি না জানি কোথায় গিয়ে পৌঁছল। এই সময়টা সকালবেলায় নওয়াড়ির কাছে উঁচু-নিচু প্রস্তরকঠিন তরুবিরল পৃথিবীর উপর সূর্যোদয় হয়। বোধ হয় নবীন রৌদ্রে এতক্ষণে চারিদিকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে আকাশপটে নীল পর্বতের আভাস দেখা যাচ্ছে; শস্যক্ষেত্র বড়ো একটা নেই; দৈবাৎ দুই এক জায়গায় সেখানকার বুনো চাষারা মহিষ নিয়ে চাষ আরম্ভ করেছে; দুইধারে বিদীর্ণ পৃথিবী, কালো কালো পাথর, শুকনো জল-স্রোতের নুড়িছড়ানো পদচিহ্ন, ছোটো ছোটো অপরিণত শালগাছ, এবং টেলিগ্রাফের তারের উপর কালো লেজ-ঝোলানো চঞ্চল ফিঙে পাখি। একটা যেন বৃহৎ বন্য প্রকৃতি পোষ মেনে একটি জ্যোতির্ময় নবীন দেবশিশুর উজ্জ্বল কোমল করস্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব ক'রে শান্ত স্থির ভাবে শুয়ে পড়ে আছে। কী রকম ছবিটা আমার মনে আসে বলব? কালিদাসের শকুন্তলায় আছে দুষ্যন্তের ছেলে শিশু ভরত একটা সিংহশাবক নিয়ে খেলা করত। সে যেন একদিন পশুবৎসলভাবে সিংহশাবকের বড়ো বড়ো রোঁয়ার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে আপনার শুভ্রকোমল অঙ্গুলিগুলি চালনা করছে, আর বৃহৎ জন্তুটা স্থির হয়ে পড়ে আছে, এবং মাঝে

মাঝে সস্নেহে একান্ত নির্ভরের ভাবে আপনার মানববন্ধুর প্রতি আড়চক্ষে চেয়ে দেখছে। আর ঐ যে শুকনো স্রোতের নুড়িছড়ানো পথের কথা বললুম ওতে আমার কী মনে পড়ে বলব? বিলাতী রূপকথায় পড়া যায় বিমাতা যখন তার সতীনের ছেলেমেয়েকে ঘর থেকে তাড়িয়ে ছল ক'রে একটা অচেনা অরণ্যের মধ্যে পাঠিয়ে দিলে তখন দুই ভাইবোনে বনের ভিতর চলতে চলতে বুদ্ধিপূর্বক একটা একটা নুড়ি ফেলে আপনাদের পথ চিহ্নিত ক'রে গিয়েছিল। ছোটো ছোটো স্রোতগুলি যেন সেইরকম ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে; তারা খুব তরুণ শৈশবে এই অচেনা বৃহৎ পৃথিবীর মধ্যে বেরিয়ে পড়ে; তাই চলতে চলতে আপনাদের ছোটো ছোটো পথের উপর নুড়ি ছড়িয়ে রেখে যায়—আবার যদি ফিরে আসে আপনার এই গৃহপথটি ফিরে পাবে। কিন্তু ফিরে আসা আর ঘটবে না।

নাটোর,

২রা ডিসেম্বর।

কাল ম—র ওখানে গিয়েছিলুম। বিকেলে সকলে মিলে বেড়াতে গেলুম। ছুইধারে মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা আমার বেশ লেগেছিল। বাংলাদেশের ধূ ধূ জনহীন মাঠ এবং তার প্রান্তবর্তী গাছপালার মধ্যে সূর্যাস্ত—কী একটি বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা। আমাদের এই আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে আর ঐ বহুদূরবর্তী আকাশের সঙ্গে কী একটি স্নেহভারবিনত মৌন ম্লান মিলন। অন্তরের মধ্যে যে একটি প্রকাণ্ড চিরবিরহবিষাদ আছে সে এই সন্ধ্যাবেলা-কার পরিত্যক্তা পৃথিবীর উপরে কী একটি উদাস আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ ক'রে দেয়, সমস্ত জলে স্থলে আকাশে কী একটি ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয়, যদি এই চরাচর ব্যাপ্ত নীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায় তাহলে কী একটা গভীর গম্ভীর শান্তসুন্দর সকরুণ সংগীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বেজে ওঠে। আসলে তাই হচ্ছে। আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে তর্জমা ক'রে নিতে

পারি। এই জগৎব্যাপী দৃশ্যপ্রবাহের অবিশ্রাম কম্পনধ্বনিকে কেবল একবার চোখ বুজে মনের কান দিয়ে শুনতে হয়। কিন্তু আমি এই সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের কথা কতবার লিখব। নিত্য নূতন ক'রে অনুভব করা যায় কিন্তু নিত্য নূতন ক'রে প্রকাশ করি কী ক'রে।

শিলাইদহ,

৯ই ডিসেম্বর।

এখন একলাটি আমার সেই বোটের জানলার কাছে অধিষ্ঠিত হয়ে বহুদিন পরে একটু মনের শান্তি পেয়েছি। স্রোতের অনুকূলে বোট চলছে, তার উপর পাল পেয়েছে— দুপুরবেলাকার রোদ্দুরে শীতের দিনটা ঈষৎ তেতে উঠেছে, পদ্মায় নৌকো নেই—শূন্য বালির চর, হলদে রং, একদিকে নদীর নীল আর একদিকে আকাশের নীলের মাঝে একটি রেখার মতো আঁকা রয়েছে—জল কেবল উত্তরে বাতাসে খুব অল্প অল্প চিক চিক ক'রে কাঁপছে, ঢেউ নেই। আমি এই খোলা জানলার ধারে হেলান দিয়ে বসে আছি; আমার মাথায় অল্প অল্প বাতাস লাগছে বেশ আরাম করছে। অনেক দিন তীব্র রোগভোগের পর শরীরটা শিথিল দুর্বল অবস্থায় আছে, এই রকম সময় প্রকৃতির এই ধীর স্নিগ্ধ শুশ্রূষা ভারি মধুর লাগছে—এই শীতশীর্ণ নদীর মতো আমার সমস্ত অস্তিত্ব যেন মৃদু রৌদ্রে প'ড়ে অলসভাবে ঝিক ঝিক করছে, এবং যেন অর্ধেক আনমনে চিঠি লিখে যাচ্ছি। প্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয় আমার পদ্মা বোধ হয় পুরোনো হয়ে গেছে—কিন্তু যখনি বোট ভাসিয়ে দিই, চারি-দিকে জল কুল কুল ক'রে উঠে—চারিদিকে একটা স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ মৃদু কলধ্বনি, একটা সুকোমল নীল

বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামল রেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্যের একটি নিত্য উৎসব উদ্ঘাটিত হয়ে যায় তখন আবার নতুন ক'রে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়। এই পৃথিবীটি আমার অনেকদিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত ক'রে ফেলছে—তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নব পল্লব উদ্গত হোত। যখন ঘনঘটা ক'রে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘন-শ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর

মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি ক'রে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন "একখানি রৌদ্র-পীত হিরণ্য অঞ্চল" পরে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন; আমি তাঁর পায়ের কাছে কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ছি—অনেক ছেলের বহুসন্তানবতী মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনা-গোনার প্রতি তেমন দৃকপাত করেন না—তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবছেন, আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করছেন না, আর আমি কেবল অবিশ্রান্ত বকে যাচ্ছি। এই ভাবে এক রকম কেটে যাচ্ছে। প্রায় বিকেল হয়ে এল। এখন শীতের বেলা কি না, দেখতে দেখতে রোদ্দুর পড়ে যায়।

কটক,

ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩।

আমি তো বলি যতদিন না আমরা একটা কিছু ক'রে তুলতে পারব ততদিন আমাদের অজ্ঞাতবাস ভালো। কেননা আমরা যখন সত্যই অবমাননার যোগ্য তখন কিসের দোহাই দিয়ে পরের কাছে আত্মসম্মান রক্ষা করব। পৃথিবীর মধ্যে যখন আমাদের একটা কোনো প্রতিষ্ঠাভূমি হবে, পৃথিবীর কাজে যখন আমাদের একটা কোনো হাত থাকবে, তখন আমরা ওদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কইতে পারব। ততদিন লুকিয়ে থেকে চুপ মেরে আপনার কাজ করে যাওয়াই ভালো। দেশের লোকের ঠিক এর উলটো ধারণা। যা কিছু ভিতরকার কাজ, যা গোপনে থেকে করতে হবে সে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে, যেটা নিতান্ত অস্থায়ী আস্ফালন এবং আড়ম্বরমাত্র সেইটেতেই তাদের যত ঝোঁক। আমাদের এ বড়ো হতভাগা দেশ। এখানে মনের মধ্যে কাজ করবার বল রাখা বড়ো শক্ত। যথার্থ সাহায্য করবার লোক কেউ নেই। যার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে প্রাণ সঞ্চয় করা যায় এমন মানুষ দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে একটি পাওয়া যায় না। কেউ চিন্তা করে না, অনুভব করে না, কাজ করে না; বৃহৎ কার্যের, যথার্থ জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা কারো নেই, বেশ একটি পরিণত মনুষ্যত্ব কোথাও পাওয়া যায় না। সমস্ত মানুষগুলো

যেন উপছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাচ্ছেদাচ্ছে, আপিস যাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, তামাক টানছে, আর নিতান্ত নির্বোধের মতো বকর বকর বকছে। যখন ভাবের কথা বলে তখন সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়ে, আর যখন যুক্তির কথা পাড়ে তখন ছেলেমানুষি করে। যথার্থ মানুষের সংস্রব পাবার জন্যে মানুষের মনে ভারি একটা তৃষ্ণা থাকে। কিন্তু সত্যকার রক্তমাংসের শক্তসমর্থ মানুষ তো নেই—সমস্ত উপছায়া, পৃথিবীর সঙ্গে অসংলগ্নভাবে বাষ্পের মতো ভাসছে।

বালিয়া,

মঙ্গলবার : ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩।

আমার কিন্তু আর ভ্রমণ করতে ইচ্ছে করছে না। ভারি ইচ্ছে করছে একটি কোণের মধ্যে আড্ডা ক'রে একটু নিরিবিলি হয়ে বসি। ভারতবর্ষের দুটি অংশ আছে, এক অংশ গৃহস্থ, আর এক অংশ সন্ন্যাসী, কেউ বা ঘরের কোণে থেকে নড়ে না, কেউ বা একেবারে গৃহহীন। আমার মধ্যে ভারতবর্ষের সেই দুই ভাগই আছে। ঘরের কোণও আমাকে টানে, ঘরের বাহিরেও আমাকে আহ্বান করে। খুব ভ্রমণ ক'রে দেখে বেড়াব ইচ্ছে করে, আবার উদ্‌ভ্রান্ত শ্রান্ত মন একটি নীড়ের জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে। পাখির মতো ভাব আর কি। থাকবার জন্যে যেমন ছোট্ট নীড়টি, ওড়বার জন্যে তেমনি মস্ত আকাশ। আমি যে কোণটি ভালবাসি সে কেবল মনকে শান্ত করবার জন্যে। আমার মনটা ভিতরে ভিতরে এমনি অশান্তভাবে কাজ করতে চায়, লোকজনের ভিড়ের মধ্যে তার কর্মোদ্যম এমনি পদে পদে প্রতিহত হোতে থাকে যে সে অস্থির হয়ে ওঠে, খাঁচার ভিতর থেকে আমাকে কেবলি যেন আঘাত করে। একটু নিরালা পেলে সে বেশ সাধ মিটিয়ে ভাবতে পারে, চারিদিকে চেয়ে

দেখাতে পারে, ভাবগুলিকে মনের মতো ক'রে প্রকাশ করতে পারে। দিবারাত্রি সে অখণ্ড অবসর চায়—সৃষ্টিকর্তা আপনার সৃষ্টির মধ্যে যেমন একাকী সে আপনার ভাব-রাজ্যের মধ্যখানে তেমনি একলা বিরাজ করতে চায়।

কটক

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩।

এখানকার একটা উৎকট ইংরেজ—প্রকাণ্ড নাক, ধূর্ত চোখ, দেড়হাত চিবুক, গোঁফদাড়ি কামানো, মোটা গলা, একটা পূর্ণপরিণত জনবৃষ। গবর্মেণ্ট আমাদের দেশের জুরিপ্রথার উপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিল ব'লে চারিদিকে একটা আপত্তি উঠেছে। লোকটা জোর ক'রে সেই বিষয়ে কথা তুলে ব—বাবুর সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। বললে এদেশের moral standard low এখানকার লোকের life-এর sacredness সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, এরা জুরি হবার যোগ্য নয়। একজন বাঙালির নিমন্ত্রণে এসে বাঙালির মধ্যে বসে যারা এরকম ক'রে বলতে কুণ্ঠিত হয় না, তারা আমাদের কী চক্ষে দেখে। খাবার টেবিল থেকে যখন ড্রয়িংরুমের এক কোণে এসে বসলুম আমার চক্ষে সমস্ত ছায়ার মতো ঠেকছিল। আমি যেন আমার চোখের সামনে সমস্ত বৃহৎ ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেখতে পাচ্ছিলুম—আমাদের এই গৌরবহীন বিষণ্ণ জন্মভূমির ঠিক শিয়রের কাছে আমি যেন বসেছিলুম,—এমন একটা বিপুল বিষাদ আমার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল সে আর কী বলব। অথচ চোখের সামনে ঈভনিং ড্রেসপরা মেমসাহেব, এবং কানের কাছে

ইংরেজি হাস্যালাপের গুঞ্জনধ্বনি—সবসুদ্ধ এমনি অসংগত। আমাদের চিরকালের ভারতবর্ষ আমার কাছে কতখানি সত্য—আর এই ডিনার টেবিলের বিলিতি মিষ্ট হাসি, ইংরেজি শিষ্টালাপ আমাদের পক্ষে কত ফাঁকা, কত ফাঁকি।

———

পুরী,

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩।

তাঁর কবিতা যে খারাপ তা নয়, কেবল চলন সই মাত্র। কেউ কেউ যেমন প্রথম শ্রেণীতে পাস করে কেউ কেউ তেমনি প্রথম শ্রেণীতে ফেল্ করে। কিন্তু যারা পাস করে তাদেরই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নির্দিষ্ট হয়, যারা ফেল করে তারা সবাই একদলের মধ্যে প'ড়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যেমন অনেক ভালো ছেলে অঙ্কে ফেল, তেমনি কাব্যে যারা ফেল তারা অনেকেই সংগীতে ফেল। তাদের ভাব আছে, কথা আছে, রকমসকম আছে, আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই কেবল সেই সংগীতটি নেই যাতে মুহূর্তে সমস্তটি কবিতা হয়ে ওঠে। সেইটেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া ভারি শক্ত। কাঠও আছে, ফুঁও আছে, কেবল সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গটুকুমাত্র নেই যাতে সবটা ধ'রে উঠে আগুন হয়ে ওঠে। এর মধ্যে কাঠের বোঝাটা নানা স্থান থেকে পরিশ্রমপূর্বক সংগ্রহ ক'রে আনা যায় কিন্তু সেই অগ্নিকণাটুকু নিজের অন্তরের মধ্যে আছে—সেটুকু না থাকলে পর্বতপ্রমাণ স্তূপ ব্যর্থ হয়ে যায়।

———

পুরী,

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩।

কারো কারো মন ফোটোগ্রাফের wet plate-এর মতো যে ছবিটা ওঠে সেটাকে তখনি ফুটিয়ে কাগজে না ছাপিয়ে নিলে নষ্ট হয়ে যায়। আমার মন সেই জাতের। যখন যে কোনো ছবি দেখি অমনি মনে করি এটা চিঠিতে ভালো ক'রে লিখতে হবে। কটক থেকে পুরী পর্যন্ত এলুম, এই ভ্রমণের কত কী বর্ণনা করবার আছে তার ঠিক নেই। যেদিন যা দেখছি সেইদিনই সেইগুলো লেখবার যদি সময় পেতুম তাহলে ছবি বেশ ফুটে উঠতে পারত—কিন্তু মাঝে দুই একদিন গোলেমালে কেটে গেল—ইতিমধ্যে ছবির খুঁটিনাটি রেখাগুলি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তার একটা প্রধান কারণ, পুরীতে এসে পৌঁছে সামনে অহর্নিশি সমুদ্র দেখছি, সেই আমার সমস্ত মন হরণ করেছে, আমাদের দীর্ঘ ভ্রমণপথের দিকে পশ্চাৎ ফিরে চাইবার আর অবসর পাওয়া যাচ্ছে না।

শনিবার মধ্যাহ্নে আহারাদি ক'রে বলু আমি বি—বাবু, একটি ভাড়াটে ফিট্‌ন্ গাড়িতে আমাদের কম্বল বিছানা পেতে তিনটি পিঠের কাছে তিন বালিশ রেখে কোচবাক্সে একটি চাপরাশি চড়িয়ে যাত্রা আরম্ভ করে দিলুম।

কাঠজুড়ি পেরিয়ে আমাদের পথ। সেখানে গাড়ি থেকে নেবে আমাদের পালকিতে উঠতে হোলো। ধূসর বালুকা ধূ ধূ করছে। ইংরেজিতে একে যে নদীর বিছানা বলে—বিছানাই বটে। সকালবেলাকার পরিত্যক্ত বিছানার মতো—নদীর স্রোত যেখানে যেমন পাশ ফিরেছিল, যেখানে যেমন তা'র ভার দিয়েছিল, তার বালুশয্যায় সেখানে তেমনি উঁচু নিচু হয়ে আছে—সেই বিশৃঙ্খল শয়ন কেউ আর যত্ন ক'রে হাত দিয়ে সমান ক'রে বিছিয়ে রাখেনি। এই বিস্তীর্ণ বালির ওপারে একটি প্রান্তে একটুখানি শীর্ণ স্ফটিকস্বচ্ছ জল ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলে যাচ্ছে। কালিদাসেব মেঘদূতে বিরহিণীর বর্ণনায় আছে যে, যক্ষপত্নী বিরহশয়নের একটি প্রান্তে লীন হয়ে আছে—যেন পূর্বদিকের শেষ সীমায় কৃষ্ণপক্ষের কৃশতম চাঁদটুকুর মতো। বর্ষাশেষের এই নদীটুকু দেখে বিরহিণীর যেন আর একটি উপমা পাওয়া গেল।

কটক থেকে পুরী পর্যন্ত পথটি খুব ভালো। পথ উচ্চে, তার দুইধারে নিম্নক্ষেত্র। বড়ো বড়ো গাছে ছায়াময়। অধিকাংশ আমগাছ। এই সময়ে সমস্ত আমগাছে মুকুল ধরেছে, গন্ধে পথ আকুল হয়ে আছে! আম অশত্থ বট নারিকেল এবং খেজুর গাছে ঘেরা এক একটি গ্রাম দেখা যাচ্ছে। কোথাও বা স্বল্পজলা নদীর তীরে ছাপরওয়ালা গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে; গোলপাতার ছাউনির নিচে মেঠাইয়ের দোকান বসেছে; পথের ধারে গাছের তলায় এবং শ্রেণীবদ্ধ কুঁড়ে ঘরের মধ্যে যাত্রীরা খাওয়াদাওয়া করছে; ভিক্ষুকের

দল নতুন যাত্রী ও গাড়ি পালকি দেখবামাত্র বিচিত্র কণ্ঠে ও ভাষায় আর্তনাদ করতে আরম্ভ করেছে।

যত পুরীর নিকটবর্তী হচ্ছি তত পথের মধ্যে যাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখতে পাচ্ছি। ঢাকা গোরুর গাড়ি সারি সারি চলেছে। রাস্তার ধারে, গাছের তলায়, পুকুরের পাড়ে লোক শুয়ে আছে, রাঁধছে, জটলা ক'রে রয়েছে। মাঝে মাঝে মন্দির, পান্থশালা, বড়ো বড়ো পুষ্করিণী। পথের ডানদিকে একটা খুব মস্ত বিলের মতো—তার ওপারে পশ্চিমে গাছের মাথার উপর জগন্নাথের মন্দিরচূড়া দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ এক জায়গায় গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েই সুবিস্তীর্ণ বালির তীর এবং ঘন নীল সমুদ্রের রেখা দেখতে পাওয়া গেল।

বালিয়া,
১১ই মার্চ, ১৮৯৩।

ছোট্টো বোটখানি। আমার মতো লম্বা লোকের দৈর্ঘ্যগর্ব খর্ব করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছি। ভ্রমক্রমে মাথা একটুখানি তুলতে গেলেই অমনি কাষ্ঠফলকের প্রচণ্ড চপেটাঘাত মাথার উপর এসে পড়ে—হঠাৎ একেবারে দমে যেতে হয়; সেইজন্যে কাল থেকে নতশিরে যাপন করছি। কপালে যত দুঃখ যত ব্যথা ছিল তার উপরে আবার প্রত্যেকবার দাঁড়াতে গিয়ে নতুন ব্যথা বাড়ছে। সেজন্যে তত আপত্তি করিনে কিন্তু কাল মশার জ্বালায় ঘুম হয়নি সেটা আমার অন্যায় মনে হচ্ছে।

এদিকে আবার শীত কেটে গিয়ে গরম পড়ে এসেছে; রৌদ্র উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং পাশের জানলা দিয়ে মন্দ মন্দ সজল শীতল বাতাস পিঠের উপর এসে লাগছে। আজ আর শীত কিংবা সভ্যতার কোনো খাতির নেই—বনাতের চাপকান চোগা হুকের উপর উদ্বন্ধনে ঝুলছে। ঘণ্টাও বাজছে না, সসজ্জ খানসামা এসেও সেলাম করছে না—অসভ্যতার অপরিচ্ছন্ন শৈথিল্য ও আরাম উপভোগ করছি। পাখিগুলো ডাকছে এবং তীরে দুটো বড়ো বড়ো বটগাছের পাতা বাতাসে ঝরঝর ক'রে শব্দ করছে—কম্পিত জলের উপরকার রৌদ্রালোক বোটের ভিতরে এসে ঝিকমিক করে উঠছে—বেলাটা

এরকম ঢিলেভাবেই চলেছে। কটকে থাকতে ছেলেদের ইস্কুল ও বি—বাবুর আদালতে যাবার তাড়া দেখে সময়ের দুর্মূল্যতা এবং সভ্য মানবসমাজের ব্যস্ততা খুব অনুভব করা যেত। এখানে সময়ের ছোটো ছোটো নির্দিষ্ট সীমা নেই—কেবল দিন এবং রাত্রি এই দুটি বড়ো বড়ো বিভাগ।

———

শীরন,

মার্চ, ১৮৯৩।

এই মেঘবৃষ্টি পাকা কোঠার মধ্যে অতি ভালো কিন্তু ছোটো বোটটির মধ্যে দুটি রুদ্ধ প্রাণীর পক্ষে মনোরম নয়। একে তো উঠতে বসতে মাথা ঠেকে, তার উপরে আবার যদি মাথায় জল পড়তে থাকে, তাহলে বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হোতেও পারে কিন্তু আমার "দুর্দশার পেয়ালা" একেবারে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে করেছিলুম বৃষ্টি বাদলা একরকম ফুরাল, এখন স্নাত পৃথিবীসুন্দরী কিছুদিন রৌদ্রে পিঠ দিয়ে আপনার ভিজে এলোচুল শুকোবে, আপনার সিক্ত সবুজ সাড়িখানি রৌদ্রে গাছের ডালে টাঙিয়ে দেবে, মাঠের মধ্যে মেলে দেবে,—বসন্তী আঁচলখানি শুকিয়ে ফুরফুরে হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে। কিন্তু রকমটা এখনও সে ভাবের নয়—বাদলার পর বাদলা, এর আর বিরাম নেই। আমি তো দেখেশুনে এই ফাল্গুন মাসের শেষভাগে কটকের এক ব্যক্তির একখানি মেঘদূত ধার ক'রে নিয়ে এসেছি। আমাদের পাণ্ডুয়ার কুঠির সম্মুখবর্তী অবারিত শস্যক্ষেত্রের উপরে আকাশ যেদিন আর্দ্রস্নিগ্ধ সুনীলবর্ণ হয়ে উঠবে সেদিন বারান্দায় বসে আবৃত্তি করা যাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার কিছুই মুখস্থ হয় না—কবিতা ঠিক উপযুক্ত সময়ে মুখস্থ আবৃত্তি ক'রে যাওয়া একটা পরম সুখ, সেটা আমার অদৃষ্টে নেই। যখন

আবশ্যক হয় তখন বই হাৎড়ে সন্ধান ক'রে পড়তে গিয়ে আবশ্যক ফুরিয়ে যায়। মনে করো, ব্যথা লেগে ভারি কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছে তখন যদি দারোয়ান পাঠিয়ে বাথগেটের বাড়ি থেকে শিশি ক'রে চোখের জল আনতে হোত, তাহলে কী মুশকিলই হোত। এই জন্যে মফস্বলে যখন যাই তখন অনেক-গুলো বই সঙ্গে নিতে হয়, তার সবগুলোই যে প্রতিবার পড়ি তা নয়, কিন্তু কখন্ কোন্‌টা দরকার বোধ হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই তাই সমস্ত সরঞ্জাম হাতে রাখতে হয়। মানুষের মনের যদি নির্দিষ্ট ঋতুভেদ থাকত তাহলে অনেক সুবিধে হোত। যেমন শীতের সময় কেবল শীতের কাপড় নিয়ে যাই এবং গরমের সময় বালাপোষ নেবার কোনো দরকার থাকে না, তেমনি যদি জানতুম মনে কখন্ শীত কখন্ বসন্ত আসবে তাহলে আগে থাকতে সেইরকম গদ্য কিংবা পদ্যের যোগাড় করা যেতে পারত। কিন্তু মনের ঋতু আবার ছ-টা নয় একেবারে বাহান্নটা,—এক প্যাকেট তাসের মতো—কখন্ কোন্‌টা হাতে আসে তার কিছু ঠিক নেই—অন্তরে বসে বসে কোন্ খামখেয়ালী খেলোয়াড় যে এই তাস ডীল্ ক'রে এই খামখেয়ালী খেলা খেলে তার পরিচয় জানিনে। সেইজন্য মানুষের আয়োজনের শেষ নেই—তাকে যে কত রকমের কত কী হাতে রাখতে হয় তার ঠিক নেই। সেই-জন্যে আমার সঙ্গে "নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচর" থেকে আরম্ভ ক'রে শেক্সপীয়র পর্যন্ত কত রকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই। এর মধ্যে অধিকাংশ বইই

ছোঁব না কিন্তু কখন্ কী আবশ্যক হবে বলা যায় না। অন্যবার বরাবর আমার বৈষ্ণব কবি এবং সংস্কৃত বই আনি, এবার আনিনি সেইজন্যে ঐ দুটোরই প্রয়োজন বেশি অনুভব হচ্ছে। যখন পুরী খণ্ডগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করছিলুম তখন যদি মেঘদূতটা হাতে থাকত ভারি সুখী হতুম। কিন্তু মেঘদূত ছিল না তার বদলে Caird's Philosophical Essays ছিল।

কটক,

মার্চ, ১৮৯৩।

তার পরে সাহেবের গান শুনলুম, সাহেবকে গান শোনালুম, তালি দিলুম এবং তালি পেলুম। এই যে বাহবাটুকু পাওয়া যায় একি যথার্থ হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। একি কতকটা কৌতূহলপরিতৃপ্তি নয়। সত্যি কি আমার যা ভালো লাগে ওদের তাই ভালো লাগে। এবং ওদের যা ভালো লাগে না তাই বাস্তবিক ভালো নয়? তাই যদি না হয় তবে ঐ করতলের তালিতে আমার এতই কী সুখ হবে। ইংরেজের তালিকে যদি আমরা অতিরিক্ত মূল্য দিতে আরম্ভ করি তাহলে আমাদের দেশের অনেক ভালোকে ত্যাগ করতে হয় এবং ওদের দেশের অনেক মন্দকে গ্রহণ করতে হয়। তাহলে পায়ের মোজাটি খুলে বেরোতে আমাদের হয়তো লজ্জা হবে কিন্তু ওদের নাচের কাপড় পরতে লজ্জা হবে না। আমাদের দেশের শিষ্টাচার সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করতে কিছুই সংকোচ হবে না এবং ওদের দেশের কোনো প্রচলিত অশিষ্টাচারও অম্লান মুখে গ্রহণ করতে পারব। আমাদের দেশের আচকানকে সম্পূর্ণ মনের মতো ভালো দেখতে নয় ব'লে ত্যাগ করব কিন্তু ওদের টুপিকে বদ দেখতে হোলেও শিরোধার্য করব। আমরা জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে ঐ করতালির নির্দেশ মতো আপনার জীবনকে গঠিত করতে

থাকি এবং তাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক'রে ফেলি। আমি নিজেকে সম্বোধন ক'রে বলি—"হে মৃৎপাত্র, ঐ কাংস্যপাত্রের কাছ থেকে দূরে থেকো ;—ও যদি রাগ ক'রে তোমাকে আঘাত করে তাতেও তুমি চূর্ণ হয়ে যাবে, আর ও যদি সোহাগ ক'রে তোমার পিঠে চাপড় মারে তাতেও তুমি ফুটো হয়ে অতলে মগ্ন হয়ে যাবে—অতএব বৃদ্ধ ঈসপের উপদেশ শোনো, তফাৎ থাকাই সার কথা। উনি থাকুন বড়ো ঘরে, আর আমার সামান্য ঘরে সামান্য পাত্রের হয়তো ছোটো খাটো কাজ আছে—কিন্তু সে যদি আপনাকে ভেঙে ফেলে তবে তার বড়ো ঘরও নেই ছোটো ঘরও নেই, তবে সে মাটির সমান হয়ে যাবে। তখন হয়তো আমাদের বড়ো ঘর-ওয়ালা ব্যক্তিটি ঐ খণ্ড জিনিসকে তাঁর ড্রয়িংরুমের ক্যাবিনেটের এক পার্শ্বে সাজিয়ে রাখতে পারেন—সে কিন্তু ক্যুরিয়সিটির স্বরূপে—তার চেয়ে ক্ষুদ্র গ্রামের কুলবধূর কক্ষে বিরাজ ক'রেও গৌরব আছে।"

কটক,

মার্চ, ১৮৯৩।

এক একজন লোক আছে যারা কোনো কিছু না করলেও যেন আশাতীত ফল দান করে—সু—সেই দলের লোক। ও যে খুব পাশ করবে, প্রাইজ পাবে, লিখবে, বড়ো কাজ কিংবা ভালো চাকরি করবে তা যেন তেমন আবশ্যক মনে হয় না—মনে হয় যেন কিছু না করলেও ওর মধ্যে একটা চরিতার্থতা আছে। অধিকাংশ লোককেই অকর্মণ্য হয়ে থাকা শোভা পায় না, তাতে তাদের অপদার্থতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু সু—কিছুই না করলেও ওকে কেউ অযোগ্য ব'লে ঘৃণা করতে পারে না। কাজকর্মের ব্যস্ততা মানুষের পক্ষে একটা আচ্ছাদনের মতো, সমস্ত কমনপ্লেস লোকের সেটা ভারি আবশ্যক—তাতে তাদের দৈন্য তাদের শীর্ণতা ঢাকা পড়ে—কিন্তু যারা স্বভাবতই পরিপূর্ণ প্রকৃতির লোক তারা সমস্ত কর্মাবরণমুক্ত হোলেও একটি শোভা এবং সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারে। সু—র মতন অমন ষোলো আনা শৈথিল্য, আর কোনো ছেলের দেখলে নিশ্চয় অসহ্য বোধ হোত—কিন্তু সু—র কুঁড়েমিতে একটি মাধুর্য আছে। সে আমি ওকে ভালবাসি ব'লে নয়—তার প্রধান কারণ হচ্ছে চুপচাপ বসে থেকেও ওর মনটি বেশ পরিণত হয়ে উঠছে এবং ওর আত্মীয় স্বজনের প্রতি ওর কিছুমাত্র

ঔদাসীন্য নেই। যে কুঁড়েমিতে মূঢ়তা এবং অন্যের প্রতি অবহেলা ক্রমাগত স্ফীত হয়ে গোলগাল তেলচুকচুকে হয়ে উঠতে থাকে সেইটেই যথার্থ ঘৃণ্য। সু—একটি সহৃদয় এবং সুবুদ্ধি আলস্যের দ্বারা যেন মধুর-রস-সিক্ত হয়ে আছে। যে গাছে সুগন্ধ ফুল ফোটে সে গাছে আহার্য ফল না ধরলেও চলে। সু—কে যে সকলে ভালবাসে সে ওর কোনো কাজের দরুণ, ক্ষমতার দরুণ, চেষ্টার দরুণ নয়, ওর প্রকৃতির অন্তর্গত একটি সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্যের দরুণ।

কলিকাতা,

১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৩।

ভ্রমণের গোলমালের মধ্যে হোটেলে বসে এটা পড়ে কী রকম লাগবে সন্দেহ আছে। কোথায় সেই পুরীর সমুদ্র আর কোথায় আগ্রার হোটেল। এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখী ক'রে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায়। পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকে-কার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হোতে থাকত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়। আমার অন্তরসমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেই রকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কী একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠছে। কত অনির্দিষ্ট আশা, অকারণ আশঙ্কা, কত রকমের প্রলয়, কত স্বর্গনরক, কত বিশ্বাস সন্দেহ, কত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি—মানবমনের জড়িত জটিল সহস্র রকমের অপূর্ব অপরিমেয় ব্যাপার। বৃহৎ সমুদ্রের তীরে কিংবা মুক্ত আকাশের নিচে একলা না বসলে সেই আপনার অন্তরের গোপন মহারহস্য ঠিক অনুভব করা

যায় না। কিন্তু তা নিয়ে আমার মাথা খুঁড়ে মরবার দরকার নেই—আমার যা মনে উদয় হয়েছে তাই ব'লে খালাস—তার পরে সমুদ্র সমভাবে তরঙ্গিত হোতে থাকুক আর মানুষ হাঁসফাঁস ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াক।

কলিকাতা,
৩০শে এপ্রিল, ১৮৯৩।

কাল তাই রাত্রি দশটা পর্যন্ত ছাতে পড়ে থাকতে পেরেছিলুম। চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছিল—চমৎকার হাওয়া দিচ্ছিল—ছাতে আর কেউ ছিল না। আমি একলা পড়ে পড়ে আমার সমস্ত জীবনের কথা ভাবছিলুম। এই তেতালার ছাত এই রকম জ্যোৎস্না, এই রকম দক্ষিণের বাতাস জীবনের স্মৃতিতে কত রকমে মিশ্রিত হয়ে আছে। দক্ষিণের বাগানের শিসুগাছের পাতা ঝরঝর শব্দ করছিল, আমি অর্ধেক চোখ বুজে আমার ছেলেবেলাকার মনের ভাবগুলিকে মনে আনবার চেষ্টা করছিলুম। পুরোনো স্মৃতিগুলো মদের মতো ;—যতই বেশি দিন মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে, ততই তার বর্ণ এবং স্বাদ এবং নেশা যেন মধুর হয়ে আসে। আমাদের এই স্মৃতির বোতলগুলি বুড়ো বয়সের জন্যে "In the deep-delved earth" ঠাণ্ডা ক'রে রেখে দেওয়া যাচ্ছে—তখন বোধ হয় ছাতের উপর জ্যোৎস্না রাত্রে এক এক ফোঁটা ক'রে আস্বাদ করতে বেশ লাগবে। অল্প বয়সে মানুষ কেবলমাত্র কল্পনা এবং স্মৃতিতে সন্তুষ্ট থাকে না, কেননা তখন তার রক্তের জোর তার শরীরের তেজ তাকে কিছু একটা কাজে প্রবৃত্ত করতে চায়, কিন্তু বুড়ো বয়সে যখন স্বভাবতই আমরা কাজে অক্ষম, শরীরের যৌবনের অতিরিক্ত

তেজ আমাদের কোনোরকম তাড়না করছে না, তখন স্মৃতি বোধ হয় আমাদের পক্ষে যথেষ্ট—তখন জ্যোৎস্না রাত্রের স্থির জলাশয়ের মতো আমাদের অচঞ্চল মনে পূর্ব স্মৃতির ছায়া এমনি পরিষ্কার স্পষ্টভাবে পড়ে, যে বর্তমান ব্যাপারের সঙ্গে তার প্রভেদ বোঝা শক্ত।

শিলাইদহ,
মে, ১৮৯৩।

এখন আমি বোটে। এই যেন আমার নিজের বাড়ি। এখানে আমিই একমাত্র কর্তা। এখানে আমার উপরে আমার সময়ের উপরে আর কারো কোনো অধিকার নেই। এই বোটটি আমার পুরোনো ড্রেসিং গাউনের মতো—এর মধ্যে প্রবেশ করলে খুব একটি ঢিলে অবসরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি, এবং যত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন মনে এই আকাশপূর্ণ, আলোকপূর্ণ, আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।

এখন প্রথম দিনকতক আমার এই পূর্বপরিচিতের সঙ্গে পুনর্মিলনের নতুন বাধো-বাধো ভাবটা কাটাতেই যাবে। তার পরে নিয়মিত লিখতে পড়তে নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের পুরাতন সখ্য আবার বেশ সহজ হয়ে আসবে। বাস্তবিক, পদ্মাকে আমি বড়ো ভালবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা আমার যথার্থ বাহন—খুব বেশি পোষমানা নয়, কিছু বুনো রকম;—কিন্তু ওর পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে। এখন পদ্মার জল অনেক কমে গেছে—বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে—একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপছিপে মেয়ের

মতো, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভঙ্গীতে চলে যাচ্ছে আর শাড়িটি বেশ গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে। আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো,—অতএব তার কথা যদি কিছু বাহুল্য ক'রে লিখি তবে সে কথাগুলো চিঠিতে লেখবার অযোগ্য মনে করা উচিত হবে না। সেগুলো হচ্ছে এখানকার পার্সোনাল খবরের মধ্যে। এক দিনেই কলকাতার সঙ্গে ভাবের কত তফাৎ হয়ে যায়। কাল বিকেলে সেখানে ছাতে বসেছিলুম সে একরকম, আর আজ এখানে দুপুর বেলায় বোটে বসে আছি এ একরকম। কলকাতার পক্ষে যা সেন্টিমেন্টাল, পোয়েটিকাল, এখানকার পক্ষে তা কতখানি সত্যিকার সত্যি। পাব্লিক নামক গ্যাসালোকজ্বালা স্টেজের উপর আর নাচতে ইচ্ছে করে না—এখানকার এই স্বচ্ছ দিবালোক এবং নিভৃত অবসরের মধ্যে গোপনে আপনার কাজ ক'রে যেতে ইচ্ছে করে। নেপথ্যে এসে রংচংগুলো ধুয়ে মুছে না ফেললে মনের অশান্তি আর যায় না। সাধনা চালানো, সাধারণের উপকার করা এবং হাঁসফাঁস ক'রে মরাটা অনেক অনাবশ্যক ব'লে মনে হয়—তার ভিতরে অনেক জিনিস থাকে যা খাঁটি সোনা নয় যা খাদ—আর, এই প্রসারিত আকাশ আর সুবিস্তীর্ণ শান্তির মধ্যে যদি কারো প্রতি দৃকপাত না ক'রে আপনার গভীর আনন্দে আপনার কাজ করেই যাই তাহলেই যথার্থ কাজ হয়।

শিলাইদহ,
৮ই মে, ১৮৯৩।

কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী—বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক-দত্তা হয়েছিল। তখন থেকে আমাদের পুকুরের ধারে বটের তলা, বাড়িভিতরের বাগান, বাড়িভিতরের একতলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো, এবং সমস্ত বাহিরের জগৎ, এবং দাসী-দের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারি একটা মায়াজগৎ তৈরি করছিল। তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারি শক্ত,—কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি কবিকল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালাবদল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নয়, তা স্বীকার করতে হয়;—আর যাই হোক সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারিনে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন কিন্তু এক এক সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের ক'রে নেন। যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তি স্থাপন ক'রে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস ক'রে বসা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমার অলস জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি যেমনি কবিতা

লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যা কথা বলিনে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।

শিলাইদহ,
১০ই মে, ১৮৯৩।

ইতিমধ্যে দেখছি খুব ফুলো ফুলো বড়ো বড়ো কতকগুলো মেঘ চতুর্দিক থেকে জমে এসেছে—আমার এই চারিদিকের দৃশ্যপট থেকে কাঁচা সোনালি রোদ্দুরটুকু যেন মোটা মোটা ব্লটিংপ্যাড দিয়ে একেবারে চুপসে তুলে নিয়েছে। আবার যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তাহলে ধিক্ ইন্দ্রদেবকে। মেঘগুলোর তেমন ফাঁকা দরিদ্র চেহারা দেখছিনে, বাবুদের মতো দিব্যি সজলশ্যামল টেবোটেবো নধর নন্দন ভাব। এখনি বৃষ্টি আরম্ভ হোলো ব'লে—হাওয়াটাও সেই রকম কাঁদো কাঁদো ভিজে ভিজে ঠেকছে। এখানে এই মেঘ রৌদ্রের যাওয়া আসা ব্যাপারটা যে কতটা গুরুতর, আকাশের দিকে যে কত লোক হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে, সিমলার সেই অভ্রভেদী পর্বতশৃঙ্গে বসে তা ঠিকটি কল্পনা করা শক্ত হবে। আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারি মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায়, তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে—কোনোমতে একটুখানি ক্ষুধা ভাঙলেই আবার তখনি সমস্ত ভুলে যায়। সোশিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীর ধন বিভাগ ক'রে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব

ঠিক জানিনে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগ্য। কেননা পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক্, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখ-মোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে, কোনোকালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যক জিনিসও বণ্টন ক'রে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনামাত্র, কখনই সকল মানুষ খেতে পরতে পাবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথ নেই, তারা ভারি কঠিন কথা বলে। কিন্তু এ সমস্ত সামাজিক সমস্যা এমন কঠিন! বিধাতা আমাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ দীন বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর একদিক ঢাকতে গিয়ে আর একদিক বেরিয়ে পড়ে —দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চলে যায় এবং ধন গেলে সমাজের কত যে শ্রীসৌন্দর্য উন্নতির কারণ চলে যায় তার আর সীমা নেই। কিন্তু আবার এক একবার রোদ্দুর উঠছে—পশ্চিমে মেঘও যথেষ্ট জমে আছে।

———

শিলাইদহ,
১১ই মে, ১৮৯৩।

কাল বিকেলের দিকে খুব ঘনঘটা ক'রে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে আবার পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজ খানকতক দলভ্রষ্ট বিচ্ছিন্ন মেঘ সূর্যালোকে শুভ্র হয়ে খুব নিরীহ নিরপরাধভাবে আকাশের ধারে ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখে তো মনে হয় এদের বর্ষণের অভিপ্রায় কিছুমাত্র নেই। কিন্তু চাণক্য তাঁর সুবিখ্যাত শ্লোকে যাদের যাদের বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন তার মধ্যে দেবতাকেও ধরা উচিত ছিল। আজ সকালবেলাটি বড়ো সুন্দর হয়ে উঠেছে—আকাশ পরিষ্কার নীল, নদীর জলে রেখামাত্র নেই এবং ডাঙার কাছে গড়ানে জায়গায় যে ঘাসগুলি হয়েছে তাতে পূর্বদিনকার বৃষ্টির কণা-গুলি লেগে সেগুলি ঝক্‌ঝক্‌ করছে। এই সমস্ত মিলে সূর্যা-লোকে আজকের প্রকৃতিকে ভারি একটি শুভ্রবসনা মহিমময়ী মহেশ্বরীর মতো দেখাচ্ছে। সকালবেলাটি এমনি নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে। কেন জানিনে নদীতে একটি নৌকো নেই, বোটের নিকটবর্তী ঘাটে কেউ জল নিতে কেউ স্নান করতে আসেনি, নায়েব সকাল সকাল কাজ সেরে চলে গেছে। খানিকটা চুপ ক'রে কান পেতে থাকলে কী একটা ঝাঁ ঝাঁ শব্দ শোনা যায় এবং এই রৌদ্রালোক আর আকাশ আস্তে আস্তে প্রবেশ ক'রে মাথার ভিতরটি একেবারে ভরে ওঠে এবং

সেখানকার সমুদয় ভাব ও চিন্তাগুলিকে একটি নীল সোনালি রঙে রঙিয়ে দেয়। বোটের একপাশে একটা বাঁকা কৌচ আনিয়ে রেখেছি, এই রকম সকালবেলায় তার মধ্যে শরীরটা ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত কাজ ফেলে চুপচাপ ক'রে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে, মনে হয়

—"নাই মোর পূর্বাপর,
যেন আমি একদিনে উঠেছি ফুটিয়া
অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল।"—

যেন আমি এই আকাশের, এই নদীর, এই পুরাতন শ্যামল পৃথিবীর। বোটে আমার এই রকম ক'রে কাটে। প'ড়ে প'ড়ে পরিচিত প্রকৃতির কত রকমের যে ভাবের পরিবর্তন দেখি তার ঠিক নেই। এখানে আমার আর একটি সুখ আছে। এক এক সময় এক একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমনি অকৃত্রিম। বাস্তবিক এর সুন্দর সরলতা এবং আন্তরিক ভক্তিতে এ লোকটি আমার চেয়ে কত বড়ো। আমিই যেন এ ভক্তির অযোগ্য কিন্তু এ ভক্তিটি তো বড়ো সামান্য জিনিস নয়। ছোটো ছেলেদের উপর যে রকম ভালবাসা এই বৃদ্ধ ছেলেদের উপর অনেকটা সেই রকম—কিছু কিছু প্রভেদ আছে। এরা তাদের চেয়েও ছোটো। কেননা তারা বড়ো হবে এরা আর কোনো কালেও বড়ো হবে না—এদের এই জীর্ণ শীর্ণ কুঞ্চিত বলিত বৃদ্ধদেহখানির মধ্যে কী একটি শুভ্র সরল কোমল মন রয়েছে। শিশুদের মনে কেবল সরলতা আছে মাত্র কিন্তু এমন স্থির বিশ্বাসপূর্ণ একাগ্রনিষ্ঠা

নেই। মানুষে মানুষে যদি সত্যি একটা আধ্যাত্মিক যোগ থাকে তাহলে আমার এই অন্তরের মঙ্গল ইচ্ছা ওর হয়তো কিছু কাজে লাগতে পারে। কিন্তু সব প্রজা এরকম নয়— সে রকম প্রত্যাশা করাও যায় না। সব চেয়ে যা ভালো সব চেয়ে তা দুর্লভ।

শিলাইদহ,
১৩ই মে, ১৮৯৩।

আজ টেলিগ্রাম পেলুম যে Missing gown lying Post office, এর ছুটো অর্থ হোতে পারে। এক অর্থ হচ্ছে হারা গাত্রবস্ত্র ডাকঘরে শুয়ে আছেন। আর এক অর্থ হচ্ছে —গাউনটা মিসিং এবং পোস্টঅফিসটা লাইং। দুই অর্থই সম্ভব হোতে পারে—কিন্তু যে পর্যন্ত প্রতিবাদ না শুনি সে পর্যন্ত প্রথম অর্থটাই গ্রহণ করা গেল। কিন্তু মজা হচ্ছে এই—সঙ্গে সঙ্গে যে চিঠিখানি এসেছে তাতে পরিষ্কার ক'রে বলা আছে একটা গাউন যে পাওয়া যায়নি তাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

বেচারা চিঠি। তার জিম্মায় যে কয়টি কথা লেফাফায় পুরে দেওয়া হয়েছে সেই কয়টি কথা কাঁধে ক'রে নিয়ে দীর্ঘ পথ ঢিকতে ঢিকতে চলে আসছে—ইতিমধ্যে যে পৃথিবীতে কত কী হয়ে যাচ্ছে তা সে জানে না, এবং তার ছোটো ভাই যে এক লম্ফে তাকে ডিঙিয়ে তার সমস্ত কথার একটিমাত্র সংক্ষেপ রূঢ় প্রতিবাদ নিয়ে এসে হাজির হোলো তারও সে জবাব দিতে পারে না; সে ভালমানুষের মতো বলে "আমি কিছু জানিনে বাপু, আমাকে সে যা ব'লে দিয়েছে আমি তাই বয়ে এনেছি।" বাস্তবিক এনেছে বটে। একটি কথার এদিক ওদিক হয়নি—সমস্ত পথটি মাড়িয়ে, দীর্ঘ পথের

কত চিহ্ন, আষ্টে-পৃষ্ঠে কত ছাপ নিয়েই বেচারা ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। তা হোক তার খবর ভুল, আমি তাকে ভালবাসি। আর তারে চ'ড়ে চক্ষের পলকে টেলিগ্রাফ এলেন—কোথাও পথশ্রমের কোনো চিহ্ন নাই—লেফাফাখানি একেবারে রাঙা টক টক করছে—হড় বড় তড় বড় ক'রে দুটো কথা বললেন আর ভিতর থেকে আটটা দশটা কথা পড়ে গেছে—তার মধ্যে ব্যাকরণ নেই ভদ্রতা নেই কিছু নেই—একটা সম্বোধন নেই একটা বিদায়ের শিষ্টতাও নেই, আমার প্রতি যেন তার কিছুমাত্র বন্ধুতার ভাব নেই, কেবল কোনোমতে তাড়াতাড়ি কথাটা যেমন তেমন ক'রে ব'লে ফেলে দায় কাটিয়ে চলে যেতে পারলে বাঁচে।

শিলাইদহ,
১৬ই মে, ১৮৯৩।

আমি বিকেলে বেলা সাড়ে ছটার পর স্নান ক'রে ঠাণ্ডা এবং পরিষ্কার হয়ে চরের উপর নদীর ধারে ঘণ্টাখানেক বেড়াই, তার পরে আমাদের নতুন জলিবোটটাকে নদীর মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে বিছানাটা পেতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার অন্ধকারে চিৎ হয়ে চুপচাপ পড়ে থাকি। শ— কাছে বসে নানা কথা বকে যায়। চোখের উপরে আকাশ তারায় একেবারে খচিত হয়ে ওঠে। আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নিচে আবার কি কখনো জন্মগ্রহণ করব। আর কি কখনো এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর বাংলা দেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চন্ত মুগ্ধ মনে জলিবোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাব। হয়তো আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধ্যাবেলা আর কখনো ফিরে পাব না। তখন কোথায় দৃশ্য পরিবর্তন হবে—আর, কিরকম মন নিয়েই বা জন্মাব। এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আমি ঠিক এমনি মানুষটি তখন থাকব। আশ্চর্য এই আমার সব চেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে

গিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কেননা সেখানে সমস্ত চিত্তটিকে এমন উপরের দিকে উদ্‌ঘাটিত রেখে পড়ে থাকবার জো নেই এবং পড়ে থাকাও সকলে ভারি দোষের বিবেচনা করে। হয়তো একটা কারখানায় নয়তো ব্যাঙ্কে নয়তো পার্লামেণ্টে সমস্ত দেহমনপ্রাণ দিয়ে খাটতে হবে। শহরের রাস্তা যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য গাড়িঘোড়া চলবার জন্যে ইঁটে বাঁধানো কঠিন, তেমনি মনটা স্বভাবটা বিজনেস চালাবার উপযোগী পাকা ক'রে বাঁধানো—তাতে একটি কোমল তৃণ একটি অনাবশ্যক লতা গজাবার ছিদ্রটুকু নেই। ভারি ছাঁটাছোঁটা গড়াপেটা আইনে বাঁধা মজবুতরকমের ভাব। কী জানি, তার চেয়ে আমার এই কল্পনাপ্রিয় অকর্মণ্য আত্মনিমগ্ন বিস্তৃত আকাশ-পূর্ণ মনের ভাবটি কিছুমাত্র অগৌরবের বিষয় ব'লে মনে হয় না। জলিবোটে পড়ে পড়ে জগতের সেই কাজের লোকের কাছে আপনাকে কিছুমাত্র খাটো মনে হয় না। বরঞ্চ আমিও যদি কোমর বেঁধে কাজে লাগতুম তাহলে হয়তো সেই সমস্ত বড়ো বড়ো ওক-গাছ-কাটা জোয়ান লোকদের কাছে আপনাকে ভারি যৎসামান্য মনে হোত।

কলকাতা,

২১শে জুন, ১৮৯৩।

এবারকার ডায়ারিটাতে ঠিক প্রকৃতির স্তব নয়—মন নামক একটা সৃষ্টিছাড়া চঞ্চল পদার্থ কোনো গতিকে আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাতে যে কী রকম একটা উৎপাত হয়েছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা গেছে। আসলে, আমরা খাব পরব বেঁচে থাকব এই রকম কথা ছিল—আমরা যে বিশ্বের আদি কারণ অনুসন্ধান করি, ইচ্ছাপূর্বক খুব শক্ত একটা ভাব ব্যক্ত করবার প্রয়াস করি, আবার তার মধ্যে পদে পদে মিল থাকা দরকার মনে করি; আপাদমস্তক ঋণে নিমগ্ন হয়েও মাসে মাসে ঘরের কড়ি খরচ ক'রে সাধনা বের করি, এর কী আবশ্যকতা ছিল। ওদিকে নারায়ণ সিং দেখো ঘি দিয়ে আটা দিয়ে বেশ মোটা মোটা রুটি বানিয়ে তার সঙ্গে দধি সংযোগ করে আনন্দমনে ভোজন পূর্বক দু'এক ছিলিম তামাক টেনে দুপুরবেলাটা কেমন স্বচ্ছন্দে নিদ্রা দিচ্ছে এবং সকালে বিকালে লোকেদের সামান্য দু'চারটে কাজ ক'রে রাত্রে অকাতরে বিশ্রাম লাভ করছে। জীবনটা যে ব্যর্থ হোলো বিফল হোলো এমন কখনো তার স্বপ্নেও মনে হয় না, পৃথিবীর যে যথেষ্ট দ্রুতবেগে উন্নতি হচ্ছে না সেজন্যে সে নিজেকে কখনো দায়িক করে না। জীবনের সফলতা কথাটার কোনো মানে নেই—প্রকৃতির একমাত্র আদেশ হচ্ছে বেঁচে থাকো।

নারায়ণ সিংহ সেই আদেশটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই নিশ্চিন্ত আছে। আর যে হতভাগার বক্ষের মধ্যে মন নামক একটা প্রাণী গর্ত খুঁড়ে বাসা করেছে, তার আর বিশ্রাম নেই, তার পক্ষে কিছুই যথেষ্ট নয়, তার চতুর্দিকবর্তী অবস্থার সঙ্গে সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে গেছে; সে যখন জলে থাকে তখন স্থলের জন্যে লালায়িত হয়, যখন স্থলে থাকে তখন জলে সাঁতার দেবার জন্যে তার "অসীম আকাঙ্ক্ষার" উদ্রেক হয়। এই দুরন্ত অসন্তুষ্ট মনটাকে প্রকৃতির অগাধ শান্তির মধ্যে বিসর্জন ক'রে একটুখানি স্থির হয়ে বসতে পারলে বাঁচা যায়, কথাটা হচ্ছে এই।

শিলাইদহ,

২রা জুলাই, ১৮৯৩।

কোনো জিনিস যথার্থ উপভোগ করতে গেলে তার চতুর্দিকে অবসরের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে হয়—তাকে বেশ অনেকখানি মিলিয়ে দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে চতুর্দিকে বিছিয়ে দিয়ে তবে তাকে ষোলো আনা আয়ত্ত করা যায়। মফস্বলে একলা থাকবার সময় যে বন্ধু বান্ধবদের চিঠিপত্র এত ভালো লাগে তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে—প্রত্যেক অক্ষরটি পর্যন্ত একটি একটি ফোঁটার মতো ক'রে নিঃশেষপূর্বক গ্রহণ করবার অবসর পাওয়া যায়, মনের কল্পনা ওর প্রত্যেক কথায় লতিয়ে লতিয়ে জড়িয়ে ওঠে—বেশ অনেকক্ষণ ধ'রে একটা গতি অনুভব করা যায়। অতি লোভে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সেই থেকে বঞ্চিত হোতে হয়। সুখের ইচ্ছেটা এমনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এগিয়ে চলে যে, অনেক সময়ে সুখটাকেই ডিঙিয়ে চলে যায়, এবং চক্ষের পলকে সমস্ত ফুরিয়ে ফেলে। এই রকম জমিজমা আমলা মামলার মধ্যে কোনো চিঠিকেই যথেষ্ট মনে হয় না—মনে হয় যেন ক্ষুধার যোগ্য অন্ন পাওয়া গেল না। কিন্তু যত বয়স হচ্ছে তত এইটে দেখছি পাওয়াটা নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অন্যে কতটা দিতে পারে তা নিয়ে নালিশ-ফরিয়াদি করা ভুল, আমি কতটা নিতে পারি এইটেই হচ্ছে আসল কথা। যা হাতের কাছে আসে তাকেই

পুরোপুরি হস্তগত ক'রে নেওয়া অনেক শিক্ষা সাধনা এবং সংযমের দ্বারা হয়। সে শিক্ষা লাভ করতে জীবনের প্রায় বারো আনা কাল চলে যায়, তারপরে সে শিক্ষার ফল ভোগ করবার আর বড়ো সময় পাওয়া যায় না। ইতি সুখতত্ত্ব-শাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়।

শিলাইদহ,
৩রা জুলাই, ১৮৯৩।

কাল সমস্ত রাত তীব্র বাতাস পথের কুকুরের মতো হুহু ক'রে কেঁদেছিল—আর বৃষ্টিও অবিশ্রাম চলছে। মাঠের জল ছোটো ছোটো নির্ঝরের মতো নানাদিক থেকে কলকল ক'রে নদীতে এসে পড়ছে—চাষারা ওপারের চর থেকে ধান কেটে আনবার জন্যে কেউবা টোগা মাথায় কেউবা একখানা কচু-পাতা মাথার উপর ধরে ভিজতে ভিজতে খেয়া নৌকায় পার হচ্ছে—বড়ো বড়ো বোঝাই নৌকোর মাথার উপর মাঝি হাল ধ'রে বসে বসে ভিজছে,—আর মাল্লারা গুণ কাঁধে ক'রে ডাঙার উপর ভিজতে ভিজতে চলেছে—এমন দুর্যোগ তবু পৃথিবীর কাজকর্ম বন্ধ থাকবার জো নেই। পাখিরা বিমর্ষ মনে তাদের নীড়ের মধ্যে বসে আছে কিন্তু মানুষের ছেলেরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। আমার বোটের সামনে দুটি রাখাল বালক একপাল গোরু নিয়ে এসে চরাচ্ছে; গোরুগুলি কচর্‌মচর্‌ শব্দ ক'রে এই বর্ষাসতেজ সরসশ্যামল সিক্ত ঘাস-গুলির মধ্যে মুখ ভরে দিয়ে ল্যাজ নেড়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে স্নিগ্ধ শান্ত নেত্রে আহার ক'রে ক'রে বেড়াচ্ছে—তাদের পিঠের উপর বৃষ্টি এবং রাখালবালকের যষ্টি অবিশ্রাম পড়ছে, দুইই তাদের পক্ষে সমান অকারণ, অন্যায় এবং অনাবশ্যক, এবং দুই তারা সহিষ্ণুভাবে বিনা-

সমালোচনায় সয়ে যাচ্ছে এবং কচরমচর ক'রে ঘাস খাচ্ছে। এই গোরুগুলির চোখের দৃষ্টি কেমন বিষণ্ণ শান্ত সুগম্ভীর স্নেহময়—মাঝের থেকে মানুষের কর্মের বোঝা এই বড়ো বড়ো জন্তুগুলোর ঘাড়ের উপর কেন পড়ল। নদীর জল প্রতিদিনই বেড়ে উঠছে। পর্শুদিন বোটের ছাতের উপর থেকে যতখানি দেখা যেত, আজ বোটের জানলায় বসে প্রায় ততটা দেখা যাচ্ছে—প্রতিদিন সকালে উঠে দেখি তটদৃশ্য অল্প অল্প ক'রে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। এতদিন সামনে ঐ দূর গ্রামের গাছপালার মাথাটা সবুজ পল্লবের মেঘের মতো দেখা যেত—আজ সমস্ত বনটা আগাগোড়া আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে। ডাঙা এবং জল দুই লাজুক প্রণয়ীর মতো অল্প অল্প ক'রে পরস্পরের কাছে অগ্রসর হচ্ছে। লজ্জার সীমা উপছে এল ব'লে—প্রায় গলাগলি হয়ে এসেছে। এই ভরা বাদরে ভরা নদীর মধ্যে দিয়ে নৌকো ক'রে যেতে বেশ লাগবে—বাঁধা বোট ছেড়ে দেবার জন্যে মনটা অধীর হয়ে আছে।

শিলাইদহ,
৪ঠা জুলাই, ১৮৯৩।

আজ সকালবেলায় অল্প অল্প রৌদ্রের আভাস দিচ্ছে। কাল বিকেল থেকে বৃষ্টি ধরে গেছে কিন্তু আকাশের ধারে ধারে স্তরে স্তরে এত মেঘ জমে আছে যে বড়ো আশা নেই। ঠিক যেন মেঘের কালো কার্পেটটা সমস্ত আকাশ থেকে গুটিয়ে নিয়ে একপ্রান্তে পাকিয়ে জড়ো করেছে, এখনি একটা ব্যস্তবাগীশ বাতাস এসে আবার সমস্ত আকাশময় বিছিয়ে দিয়ে যাবে, তখন নীলাকাশ এবং সোনালি রৌদ্রের কোনো চিহ্নমাত্র দেখা যাবে না। এবারে এত জলও আকাশে ছিল। আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষারা নৌকো বোঝাই ক'রে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে— আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকো যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি—যখন আর কয়দিন থাকলে ধান পাকৃত তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতেই পারা যায়। যদি ঐ শিষের মধ্যে দুটো চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে এই তাদের আশা। প্রকৃতির কার্যপ্রণালীর মধ্যে দয়া জিনিসটা কোনো এক জায়গায় আছে অবশ্য, নইলে আমরা পেলুম কোথা থেকে—কিন্তু সেটা যে ঠিক কোন্‌খানে আছে খুঁজে পাওয়া শক্ত। এই শতসহস্র নির্দোষ হতভাগ্যের নালিশ কোনো জায়গায় গিয়ে পৌঁচচ্ছে

না, বৃষ্টি যেমনি পড়বার তেমনি পড়ছে, নদী যেমন বাড়বার তেমনি বাড়ছে, বিশ্বসংসারে এ সম্বন্ধে কারো কাছে কোনো দরবার পাবার জো নেই। মনকে বোঝাতে হয় যে কিছু বোঝবার জো নেই—কিন্তু জগতে যে দয়া ন্যায়বিচার আছে এটুকু বোঝা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এ সমস্ত মিথ্যে খুঁতখুঁত মাত্র—কেননা সৃষ্টি কখনই সম্পূর্ণ সুখের হোতে পারে না। যতক্ষণ অপূর্ণতা ততক্ষণ অভাব ততক্ষণ দুঃখ থাকবেই। জগৎ যদি জগৎ না হয়ে ঈশ্বর হোত তাহলেই কোথাও কোনো খুঁত থাকত না—কিন্তু ততটা দূর পর্যন্ত দরবার করতে সাহস হয় না। ভেবে দেখলে সকল কথাই গোড়ায় গিয়ে ঠেকে যে, সৃষ্টি হোলো কেন—কিন্তু সেটা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি যদি না করা যায় তাহলে, জগতে দুঃখ রইল কেন এ নালিশ উত্থাপন করা মিথ্যা। সেইজন্যে বৌদ্ধেরা একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ মারতে চায়; তারা বলে যতক্ষণ অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ দুঃখের সংশোধন হোতে পারে না একেবারে নির্বাণ চাই। খ্রীষ্টানরা বলে দুঃখটা খুব উচ্চ জিনিস, ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হয়ে আমাদের জন্যে দুঃখ বহন করছেন। কিন্তু নৈতিক দুঃখ এক, আর পাকা ধান ডুবে যাওয়ার দুঃখ আর। আমি বলি যা হয়েছে বেশ হয়েছে; এই যে আমি হয়েছি এবং এই আশ্চর্য জগৎ হয়েছে বড়ো তোফা হয়েছে—এমন জিনিসটা নষ্ট না হোলেই ভালো। বুদ্ধদেব তদুত্তরে বলেন, এ জিনিসটা যদি রক্ষা করতে চাও তাহলে দুঃখ সইতে হবে—আমি নরাধম তদুত্তরে বলি ভালো জিনিস এবং প্রিয়

জিনিস রক্ষা করতে যদি দুঃখ সইতে হয় তাহলে দুঃখ সবো—তা আমি থাকি আর আমার জগৎটি থাকুক ; মাঝে মাঝে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, মনঃক্ষোভ, নৈরাশ্য বহন করতে হবে, কিন্তু সে দুঃখের চেয়ে যখন অস্তিত্ব ভালবাসি এবং অস্তিত্বের জন্যই সে দুঃখ বহন করি তখন তো আর কোনো কথা বলা শোভা পায় না।

ইছামতী,

৭ই জুলাই, ১৮৯৩।

কাল সমস্ত দিন বেশ পরিষ্কার ছিল। অনেকদিন পরে মেঘ কেটে রৌদ্রে দশদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; প্রকৃতি যেন স্নানের পর নতুন ধোয়া বাসন্তী রঙের কাপড়টি পরে পরিচ্ছন্ন প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখে ভিজে চুলটি মৃদুমন্দ বাতাসে শুকোচ্ছিলেন। কাজ সেরে বেলা সাড়ে চারটে পাঁচটার সময় যখন বোট ছেড়ে দিলুম তখন পূর্বদিকে খুব একটা গাঢ় মেঘ উঠল। ক্রমশ একটু বাতাস এবং বৃষ্টিও যে হয়নি তা নয়। সেই শাখানদীটার ভিতরে যখন ঢুকলুম বৃষ্টি ধরে গেল। জলে চর ভেসে গেছে—মানুষ-প্রমাণ লম্বা ঘাস এবং ঝাউ বনের ভিতর দিয়ে সর সর শব্দে গুণ টেনে বোট চলতে লাগল। খানিক দূরে গিয়ে অনুকূল বাতাস পাওয়া গেল। পাল তুলে দিতে বললুম, পাল তুলে দিলে। দুদিকে ঢেউ কেটে কল কল শব্দ তুলে বোট সগর্বে চলে যেতে লাগল। আমি বাইরে চৌকি নিয়ে বসলুম। সেই নিবিড় নীল মেঘের অন্তরালে অর্ধনিমগ্ন জলশূন্য চর এবং পরিপূর্ণ দিগন্ত-প্রসারিত নদীর মধ্যে সূর্যাস্ত যে কী জিনিস সে আমি বর্ণনা করতে চেষ্টা করব না। বিশেষত আকাশের অতিদূর প্রান্তে পদ্মার জলরেখার ঠিক উপরেই মেঘের যেখানে ফাঁক পড়েছে সেখানটা এমনি অতিমাত্রায় সূক্ষ্মতম সোনালিতম

হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেই স্বর্ণপটের উপর সারি সারি লম্বা কৃশ গাছগুলির মাথা এমনি সুকোমল সুনীল রেখায় অঙ্কিত হয়েছিল—প্রকৃতি সেখানে যেন আপনার চরম পরিণতিতে পৌঁছে একটা কল্পলোকের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। মাঝি জিজ্ঞাসা করলে বোট চরের কাছারিঘাটে রাখব কি। আমি বললুম, না পদ্মা পেরিয়ে চলো।—মাঝি পাড়ি দিলে,—বাতাস বেগে বইতে লাগল, পদ্মা নৃত্য করতে লাগল, পাল ফুলে উঠল, দিনের আলো মিলিয়ে এল, আকাশের ধারের মেঘ-গুলি ক্রমে আকাশের মাঝখানে ঘনঘটা ক'রে জমে গেল, চারিদিকে পদ্মার উদ্দামচঞ্চল জল করতালি দিচ্ছে—সম্মুখে দূরে নীল মেঘস্তূপের নিচে পদ্মাতটের নীল বনরেখা দেখা যাচ্ছে—নদীর মাঝখানে আমাদের বোট ছাড়া আর একটিও নৌকো নেই—তীরের কাছে দুই একটা জেলে ডিঙি ছোটো ছোটো পাল উড়িয়ে গৃহমুখে চলেছে,—আমি যেন প্রকৃতির রাজার মতো বসে আছি আর আমাকে তার দুরন্ত ফেনিল-মুখ রাজ-অশ্ব সনৃত্যগতিতে বহন ক'রে নিয়ে চলেছে।

সাজাদপুর,
৭ই জুলাই, ১৮৯৩।

ছোটোখাটো গ্রাম, ভাঙা চোরা ঘাট, টিনের ছাতওয়ালা বাজার, বাঁখারির বেড়া দেওয়া গোলাঘর, বাঁশঝাড়, আম কাঁঠাল খেজুর শিমুল আকন্দ ভেরাণ্ডা ওল কচু লতাগুল্ম তৃণের সমষ্টিবদ্ধ ঝোপঝাড় জঙ্গল, ঘাটে বাঁধা মাস্তুলতোলা বৃহদাকার নৌকোর দল, নিমগ্নপ্রায় ধান এবং অর্ধমগ্ন পাটের খেতের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত এঁকে বেঁকে কাল সন্ধ্যের সময় সাজাদপুরে এসে পৌঁচেছি। এখন কিছুদিনের মতো এইখানেই স্থায়ী হওয়া গেল। অনেকদিন বোটে থাকার পর সাজাদপুরের বাড়িটা বেশ লাগে ভালো—একটা যেন নূতন স্বাধীনতা পাওয়া যায়—যতটা খুশি নড়বার চড়বার এবং শরীর প্রসারণ করবার জায়গা পাওয়া মানুষের মানসিক সুখের যে একটা প্রধান অঙ্গ সেটা হঠাৎ আবিষ্কার করা যায়। আজ প্রাতে মাঝে মাঝে বেশ একটুখানি রৌদ্র দেখা দিচ্ছে, বাতাসটি চঞ্চলবেগে বচ্ছে, ঝাউ এবং লিচুগাছ ক্রমাগত সরসর মরমর ক'রে দুলছে, নানাজাতির পাখি নানা ভাষা নানা সুরে ডেকে ডেকে প্রাতঃকালের আরণ্য মজলিস সরগরম ক'রে তুলছে। আমি আমাদের দোতলার এই সঙ্গীহীন প্রশস্ত নির্জন আলোকিত উন্মুক্ত ঘরের মধ্যে বসে জানালা থেকে খালের উপরকার নৌকাশ্রেণী, ওপারের

তরুমধ্যগত গ্রাম এবং ওপারের অনতিদূরবর্তী লোকালয়ে মৃদু কর্মপ্রবাহ নিরীক্ষণ ক'রে বেশ একটুখানি মনের আনন্দে আছি। পাড়াগাঁয়ের কর্মস্রোত খুব বেশি তীব্র নয়, অথচ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নির্জীবও নয়। কাজ এবং বিশ্রাম দুই যেন পাশাপাশি মিলিত হয়ে হাত ধরাধরি ক'রে চলেছে। খেয়া-নৌকো পারাপার করছে, পান্থরা ছাতা হাতে ক'রে খালের ধারের রাস্তা দিয়ে চলেছে, মেয়েরা ধুচুনি ডুবিয়ে চাল ধুচ্ছে, চাষারা আঁটিবাঁধা পাট মাথায় ক'রে হাটে আসছে—দুটো লোক একটা গাছের গুঁড়ি মাটিতে ফেলে কুড়ুল নিয়ে ঠক ঠক শব্দে কাঠ চেলা করছে, একটা ছুতোর অশথ গাছের তলায় জেলেডিঙি উলটে ফেলে বাটারি হাতে মেরামত করছে, গ্রামের কুকুরটা খালের ধারে ধারে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুটিকতক গোরু বর্ষার ঘাস অপর্যাপ্ত পরিমাণে আহারপূর্বক অলসভাবে রৌদ্রে মাটির উপর পড়ে কান এবং লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে, এবং কাক এসে তাদের মেরু-দণ্ডের উপর বসে যখন বড়ো বেশি বিরক্ত করছে তখন একবার পিঠের দিকে মাথাটা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে। এখানকার এই দুই একটা একঘেয়ে ঠক ঠক ঠুক ঠাক শব্দ, উলঙ্গ ছেলেমেয়েদের খেলার কল্লোল, রাখালের করুণ উচ্চ-স্বরে গান, দাঁড়ের ঝুপঝাপ ধ্বনি, কলুর ঘানির তীক্ষ্ণকাতর নিখাদস্বর, সমস্ত কর্মকোলাহল একত্র মিলে এই পাখির ডাক এবং পাতার শব্দের সঙ্গে কিছুমাত্র অসমাঞ্জস্য ঘটাচ্ছে না—সমস্তটাই যেন একটা শান্তিময় স্বপ্নময় করুণামাখা একটা

বড়ো সংগীতের অন্তর্গত—খুব বিস্তৃত বৃহৎ অথচ সংযত মাত্রায় বাঁধা। আমার মাথার মধ্যে সূর্যের আলোক এবং এই সমস্ত শব্দ একেবারে যেন কানায় কানায় ভরে এসেছে অতএব চিঠি বন্ধ ক'রে খানিকক্ষণ পড়ে থাকা যাক।

———

সাজাদপুর,
১০ই জুলাই, ১৮৯৩।

এসব গান যেন একটু নিরালায় গাবার মতো। সুরটা যে মন্দ হয়েছে এমন আমার বিশ্বাস নয়, এমন কি ভালো হয়েছে বললে খুব বেশি অত্যুক্তি হয় না। ও গানটা আমি নাবার ঘরে অনেকদিন একটু একটু ক'রে সুরের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেছিলুম। নাবার ঘরে গান তৈরি করবার ভারি কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমত নিরালা, দ্বিতীয়ত অন্য কোনো কর্তব্যের কোনো দাবি থাকে না। মাথায় এক টিন জল ঢেলে পাঁচমিনিট গুন গুন করলে কর্তব্যজ্ঞানে বিশেষ আঘাত লাগে না—সব চেয়ে সুবিধা হচ্ছে কোনো দর্শক-সম্ভাবনামাত্র না থাকাতে সমস্ত মন খুলে মুখভঙ্গী করা যায়। মুখভঙ্গী না করলে গান তৈরি করবার পুরো অবস্থা কিছুতেই আসে না। ওটা কিনা ঠিক যুক্তিতর্কের কাজ নয়—নিছক ক্ষিপ্তভাব। এ গানটা আমি এখনো সর্বদা গেয়ে থাকি—আজ প্রাতঃকালেও অনেকক্ষণ গুন্ গুন্ করেছি, গাইতে গাইতে গভীর একটা ভাবোন্মাদও জন্মায় অতএব এটা যে আমার একটা প্রিয় গান সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

এখানে আমি একলা খুব মুগ্ধ এবং তদ্গতচিত্তে অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে গেয়ে থাকি এবং জীবন ও পৃথিবীটা একটি

সূর্যকরোজ্জ্বল অতি সূক্ষ্ম অশ্রুবাষ্পে আবৃত হয়ে সাতরঙা ইন্দ্রধনু-রেখায় রঞ্জিত হয়ে দেখা দেয়—প্রতিদিনের সত্যকে চিরদিনের সৌন্দর্যের মধ্যে তর্জমা ক'রে দেওয়া যায়—দুঃখ কষ্টও আভাময় হয়ে ওঠে। অনতিবিলম্বেই খাজাঞ্চি এক ছটাক মাখন, এক পোয়া ঘি ও ছয় পয়সার সর্ষপ তৈলের হিসাব এনে উপস্থিত করে। আমার এখানকার ইতিহাস এই রকম।

সাহাজাদপুর,
৩০শে আষাঢ়, ১৮৯৩।

আজকাল কবিতা লেখাটা আমার পক্ষে যেন একটা গোপননিষিদ্ধ সুখসম্ভোগের মতো হয়ে পড়েছে—এদিকে আগামী মাসের সাধনার জন্যে একটি লাইন লেখা হয়নি, ওদিকে মধ্যে মধ্যে সম্পাদকের তাড়া আসছে, অনতিদূরে আশ্বিন কার্তিকের যুগল সাধনা রিক্ত হস্তে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনা করছে, আর আমি আমার কবিতার অন্তঃপুরে পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি। রোজ মনে করি আজ একটা দিন বৈতো নয়—এমনি ক'রে কত দিন কেটে গেল। আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক এক সময়ে মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারিনে—লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। এক এক সময় মনে হয় আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয় সেগুলো ডায়ারি প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ ক'রে রেখে দেওয়া ভালো বোধ হয় তাতে ফলও আছে আনন্দও আছে। এক এক সময় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা খুব দরকার, যখন আর কেউ করছে না তখন কাজেই আমাকে এই অপ্রিয় কর্তব্যটা গ্রহণ করতে হয়—আবার

এক এক সময় মনে হয় দূর হোকগে ছাই, পৃথিবী আপনার চরকায় আপনি তেল দেবে এখন,—মিল ক'রে ছন্দ গেঁথে ছোটো ছোটো কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই কাজই করা যাক। মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাইনে—কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং হয়তো "দীর্ঘ দৌড়ে" কোনোটিই পরিপূর্ণভাবে আমার আয়ত্ত হয় না। সাহিত্যবিভাগেও কর্তব্যবুদ্ধির অধিকার আছে কিন্তু অন্য বিভাগের কর্তব্য বুদ্ধির সঙ্গে তার একটু প্রভেদ আছে। কোন্‌টাতে পৃথিবীর সব চেয়ে উপকার হবে সাহিত্য কর্তব্যজ্ঞানে সে কথা ভাববার দরকার নেই কিন্তু কোন্‌টা আমি সব চেয়ে ভালো করতে পারি সেইটেই হচ্ছে বিচার্য। বোধ হয় জীবনের সকল বিভাগেই তাই। আমার বুদ্ধিতে যতটা আসে তাতে তো বোধ হয় কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয় এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তাহলে তো মন্দ হয় না—আবার যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই কী, এটাতেও একজন মানুষ

আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন "বাল্য-বিবাহ" কিংবা "শিক্ষার হেরফের" নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয় এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ চিত্রবিদ্যা ব'লে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত ক'রে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চ'লে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকেও সহজে পাবার জো নেই—তাঁর একেবারে ধনুকভাঙা পণ—তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হোলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধে—বোধ হয় যেন উনিই আমাকে সব চেয়ে বেশি ধরা দিয়েছেন—আমার ছেলেবেলাকার আমার বহু-কালের অনুরাগিনী সঙ্গিনী।

নীরব কবি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠেছে সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সরব এবং নীরবের মধ্যে অনুভূতির পরিমাণ সমান থাকতে পারে কিন্তু আসল কবিত্ব জিনিসটা স্বতন্ত্র। কেবল ভাষার ক্ষমতা বলে নয়, গঠন করবার শক্তি। একটা অলক্ষিত অচেতন নৈপুণ্যবলে ভাবগুলি কবির হাতে বিচিত্র আকার ধারণ করে। সেই সৃজন-ক্ষমতাই কবিত্বের মূল। ভাষা, ভাব এবং অনুভাব তার সরঞ্জামমাত্র। কারো বা ভাষা আছে কারো বা অনুভাব আছে, কারো বা ভাষা এবং অনুভাব দুই আছে, কিন্তু আর একটি ব্যক্তি আছে যার ভাষা অনু-

ভাব এবং সৃজনীশক্তি আছে, এই শেষোক্ত লোকটিকে কবি নাম দেওয়া যেতে পারে। প্রথমোক্ত তিনটি লোক নীরবও হোতে পারেন সরবও হোতে পারেন, কিন্তু তাঁরা কবি নন। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে ভাবুক বললেই ঠিক বিশেষণটা প্রয়োগ করা হয়। তাঁরাও জগতে অত্যন্ত দুর্লভ এবং কবির তৃষিত চিত্ত সর্বদাই তাঁদের জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে।

উপরে এই ভূমিকার পরে আমার সেই "জাল-ফেলা" কবিতাটার ব্যাখ্যা একটু সহজ হবে। লেখাটা চোখের সামনে থাকলে তার মানে নিজে একটু ভালো ক'রে বুঝে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারতুম—তবু একটা ঝাপসা রকমের ভাব মনে আছে। মনে করো একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রভাতকালে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছিল; সে সমুদ্রটা তার আপনার মন কিংবা ঐ বাহিরের বিশ্ব কিংবা উভয়ের সীমানা-মধ্যবর্তী একটি ভাবের পারাবার, সে কথা স্পষ্ট ক'রে বলা হয়নি। যাই হোক সেই অপূর্ব সৌন্দর্যময় অগাধ সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকটার মনে হোলো এই রহস্যপাথারের মধ্যে জাল ফেলে দেখা যাক না কী পাওয়া যায়। এই ব'লে তো সে ঘুরিয়ে জাল ফেললে। নানারকমের অপরূপ জিনিস উঠতে লাগল—কোনোটা বা হাসির মতো শুভ্র কোনোটা অশ্রুর মতো উজ্জ্বল, কোনোটা বা লজ্জার মতো রাঙা। মনের উৎসাহে সে সমস্ত দিন ধরে ঐ কাজই কেবল করলে—গভীর তলদেশে যে সকল সুন্দর রহস্য ছিল সেইগুলিকে তীরে এনে রাশিকৃত ক'রে তুললে।

এমনি ক'রে জীবনের সমস্ত দিনটি যাপন করলে। সন্ধ্যার সময় মনে করলে এবারকার মতো যথেষ্ট হয়েছে এখন এই-গুলি নিয়ে তাকে দিয়ে আসা যাকগে। কাকে যে সে কথাটা স্পষ্ট ক'রে বলা হয়নি—হয়তো তার প্রেয়সীকে, হয়তো তার স্বদেশকে। কিন্তু যাকে দেবে সে তো এ সমস্ত অপূর্ব জিনিস কখনো দেখেনি। সে ভাবলে এগুলো কী, এর আবশ্যকতাই বা কী, এতে কি অভাব দূর হবে, দোকানদারের কাছে যাচিয়ে দেখলে এর কতই বা মূল্য হোতে পারবে। এক কথায়, এ বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয় এ কেবল কতকগুলো রঙিন ভাবমাত্র, তারও যে কোন্‌টার কী নাম কী বিবরণ তারও ভালো পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলত সমস্ত দিনের জালফেলা অগাধ সমুদ্রের এই রত্নগুলি যাকে দেওয়া গেল সে বললে এ আবার কী। জেলেরও মনে তখন অনুতাপ হোলো, সত্যি বটে, এ তো বিশেষ কিছু নয়, আমি কেবল জাল ফেলেছি আর তুলেছি; আমি তো হাটেও যাইনি পয়সা কড়িও খরচ করিনি এর জন্যে তো আমাকে কাউকে এক পয়সা খাজনা কিংবা মাশুল দিতে হয়নি। সে তখন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণমুখে লজ্জিতভাবে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের দ্বারে বসে বসে একে একে রাস্তায় ফেলে দিলে। তার পরদিন সকালবেলায় পথিকরা এসে সেই বহুমূল্য জিনিস-গুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে নিয়ে গেল। বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করেছেন

তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারবে না, তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়, অতএব এখনকার মতো এ সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে,তোমরাও অবহেলা করো আমিও অবহেলা করি কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন "পস্টারিটি" এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে।—যাই হোক "পস্টারিটি" যে অভিসারিণী রমণীর মতো দীর্ঘরাত্রি ধরে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হোতেও পারে এ সুখকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারো বোধ হয় আপত্তি না হোতেও পারে।—সেই মন্দিরের কবিতার ঠিক অর্থটা কী ভালো মনে পড়ছে না। বোধ হয় সেটা সত্যিকার মন্দির সম্বন্ধে। অর্থাৎ যখন কোণে ব'সে ব'সে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন ক'রে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র পড়ে, সেই সমস্ত সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায় তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা,সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে তন্ত্রমন্ত্র ধূপধুনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি।

পতিসর,

১১ই আগষ্ট, ১৮৯৩।

অনেকগুলো বড়ো বড়ো বিলের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। এই বিলগুলো ভারি অদ্ভুত—কোনো আকার আয়তন নেই, জলেস্থলে একাকার—পৃথিবী সমুদ্রগর্ভ থেকে নতুন জেগে উঠবার সময় যেমন ছিল। কোথাও কিছু কিনারা নেই—খানিকটা জল খানিকটা মগ্নপ্রায় ধানখেতের মাথা, খানিকটা শেওলা এবং জলজ উদ্ভিদ ভাসছে—পান-কৌড়ি সাঁতার দিচ্ছে—জাল ফেলবার জন্যে বড়ো বড়ো বাঁশ পোতা, তারি উপর কটা রঙের বড়ো বড়ো চিল ব'সে আছে—ভারি একাকার একঘেয়ে রকমের দৃশ্য। দ্বীপের মতো অতিদূরে গ্রামের রেখা দেখা যাচ্ছে—যেতে যেতে হঠাৎ আবার খানিকটা নদী, দুধারে গ্রাম, পাটের খেত এবং বাঁশের ঝাড়, আবার কখন যে সেটা বিস্তৃত বিলের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে বোঝবার জো নেই।

ঠিক সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিলুম, একটা লম্বা নৌকোয় অনেকগুলো ছোকরা ঝপ ঝপ ক'রে দাঁড় ফেলছিল এবং সেই তালে গান গাচ্ছিল—

"যোবতী, ক্যান বা কর মন ভারি।
পাবনা থাক্যে আন্যে দেব ট্যাকা দামের মোটরি।"

স্থানীয় কবিটি যে ভাব অবলম্বন ক'রে সংগীত রচনা করেছেন আমরাও ওভাবের ঢের লিখেছি কিন্তু ইতর বিশেষ আছে।—আমাদের যুবতী মন ভারি করলে তৎক্ষণাৎ জীবনটা কিংবা নন্দনকানন থেকে পারিজাতটা এনে দিতে প্রস্তুত হই—কিন্তু এ অঞ্চলের লোক খুব সুখে আছে বলতে হবে, অল্প ত্যাগ স্বীকারেই যুবতীর মন পায়। মোটরি জিনিসটি কী তা বলা আমার সাধ্য নয়, কিন্তু তার দামটাও নাকি পার্শ্বেই উল্লেখ করা আছে তাতেই বোঝা যাচ্ছে খুব বেশি দুর্মূল্য নয় এবং নিতান্ত অগম্য স্থান থেকেও আনতে হয় না। গানটা শুনে বেশ মজার লাগল—যুবতীর মন ভারি হোলে জগতে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় এই বিলের প্রান্তেও তার একটা সংবাদ পাওয়া গেল। এ গানটি কেবল অস্থানেই হাস্যজনক কিন্তু দেশকাল পাত্রবিশেষে এর যথেষ্ট সৌন্দর্য আছে—আমার অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবিভ্রাতার রচনাগুলি এই গ্রামের লোকের সুখ-দুঃখের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক—আমার গানগুলি সেখানে কম হাস্যজনক নয়।

পতিসর,
১৩ই আগষ্ট, ১৮৯৩।

এবার এই বিলের পথ দিয়ে কালিগ্রামে আসতে আসতে আমার মাথায় একটি ভাব বেশ পরিষ্কাররূপে ফুটে উঠেছে। কথাটা নতুন নয় অনেকদিন থেকে জানি কিন্তু তবু এক-একবার পুরোনো কথা নতুন ক'রে অনুভব করা যায়। দুই দিকে দুই তীর দিয়ে সীমাবদ্ধ না থাকলে জলস্রোতের তেমন শোভা থাকে না—অনির্দিষ্ট অনিয়ন্ত্রিত বিল একঘেয়ে শোভাশূন্য। ভাষার পক্ষে ছন্দের বাঁধন ঐ তীরের কাজ করে। ভাষাকে একটি বিশেষ আকার এবং বিশেষ শোভা দেয়—তার একটি সুন্দর চেহারা ফুটে ওঠে। তীরবদ্ধ নদীগুলির যেমন একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে—তাদের যেমন এক একটি স্বতন্ত্র লোকের মতো মনে হয়, ছন্দের দ্বারা কবিতা সেইরূপ এক একটি মূর্তিমান অস্তিত্বের মতো দাঁড়িয়ে যায়। গদ্যের সেইরকম সুন্দর সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্য নেই—সে একটা বৃহৎ বিশেষত্বহীন বিলের মতো। আবার তটের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতেই নদীর মধ্যে একটা বেগ আছে একটা গতি আছে—কিন্তু প্রবাহহীন বিল কেবল বিস্তৃতভাবে দিগবিদিক গ্রাস

ক'রে পড়ে থাকে। ভাষার মধ্যেও যদি একটা আবেগ একটা গতি দেবার প্রয়োজন হয় তবে তাকে ছন্দের সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে দিতে হয়—নইলে সে কেবল ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে কিন্তু সমস্ত বল নিয়ে একদিকে ধাবিত হোতে পারে না। বিলের জলকে পল্লিগ্রামের লোকেরা বলে বোবা জল—তার কোনো ভাষা নেই, আত্মপ্রকাশ নেই। তটবদ্ধ নদীর মধ্যে সর্বদা একটা কলধ্বনি শোনা যায়; ছন্দের মধ্যে বেঁধে দিলে কথাগুলোও সেই রকম পরস্পরের প্রতি আঘাত সংঘাত ক'রে একটা সংগীতের সৃষ্টি করতে থাকে—সেই জন্যে ছন্দের ভাষা বোবা ভাষা নয়, তার মুখে সর্বদাই কলগান। বাঁধনের মধ্যে থাকাতেই গতির সৌন্দর্য, ধ্বনির সৌন্দর্য এবং আকারের সৌন্দর্য। বাঁধনের মধ্যে থাকাতে যেমন সৌন্দর্য তেমনি শক্তি। কবিতা যে স্বভাবতই ধীরে ধীরে একটি ছন্দের মধ্যে ধরা দিয়ে আপনাকে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছে ওটা একটি কৃত্রিম অভ্যাসজাত সুখ দেবার জন্যে নয়—ওর একটি গভীর স্বাভাবিক সুখ আছে। অনেক মূর্খ মনে করে কবিতার ছন্দোবন্ধ কেবল একটা বাহাদুরি করা; ওতে কেবল সাধারণ লোকের বিস্ময় উৎপাদন ক'রে সুখ দেয়—ও কেবল ভাষার ব্যায়াম মাত্র। কিন্তু সে ভারি ভুল। কবিতার ছন্দ যে নিয়মে উৎপন্ন হয়েছে, বিশ্বজগতের সমস্ত সৌন্দর্যই সেই নিয়মে সৃষ্ট হয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যে দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে মনের মধ্যে আঘাত করে ব'লেই সৌন্দর্যের এমন অনিবার্য শক্তি। আর সুষমার বন্ধন

ছাড়িয়ে গেলেই সব একাকার হয়ে যায় তার আর আঘাত করবার শক্তি থাকে না। বিল ছাড়িয়ে যেমনি নদীতে এবং নদী ছাড়িয়ে যেমনি বিলে গিয়ে পড়ছিলুম অমনি আমার মনে এই তত্ত্বটি দেদীপ্যমান হয়ে জেগে উঠছিল।

পতিসর,
২৬শে শ্রাবণ, ১৮৯৩।

আমি অনেকদিন থেকে ভেবে দেখেছি পুরুষরা কিছু খাপছাড়া আর মেয়েরা বেশ সুসম্পূর্ণ। মেয়েদের কথাবার্তা বেশভূষা, চালচলন, আচারব্যবহার এবং জীবনের কর্তব্যের মধ্যে একটি অখণ্ড সামঞ্জস্য আছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে যুগযুগান্তর থেকে প্রকৃতি তাদের কর্তব্য নিজে নির্দিষ্ট ক'রে দিয়ে তাদের আগাগোড়া সেই ভাবে সেই উদ্দেশ্যে গঠিত ক'রে দিয়েছে। এ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন কোনো রাষ্ট্রবিপ্লব সভ্যতার কোনো ভাঙন-গড়নে তাদের সেই ঐক্য থেকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দেয়নি—তা'রা বরাবর সেবা করেছে, ভালো বেসেছে, আদর করেছে, আর কিছু করেনি। তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ভাষায় ভঙ্গীতে সেই কাজের নৈপুণ্য এবং সৌন্দর্য যেন মিশে এক হয়ে গেছে—তাদের স্বভাব এবং তাদের কাজ যেন পুষ্প এবং পুষ্পের গন্ধের মতো সম্মিলিত হয়ে গেছে—তাদের মধ্যে সেই জন্যে কোনো বিরোধ কোনো ইতস্তত নেই। পুরুষের চরিত্রের মধ্যে বিস্তর উঁচু নিচু, তারা যে নানাকার্যে নানাশক্তি নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তৈরি হয়ে এসেছে তাদের অঙ্গে এবং স্বভাবে তার যেন চিহ্ন রয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই কপালটা হয়তো বৃহৎ উঁচু হয়ে উঠল, মাঝের থেকে হয়তো নাকটা এমনি

ঠেলে উঠল যে, তাকে কার সাধ্য দাবিয়ে রাখে—চোয়াল দুটো হয়তো সুষমার কোনো নিয়ম মানলে না। যদি চিরকাল পুরুষ একভাবে চালিত, এককার্যে শিক্ষিত হয়ে আসত তাহলে তাদেরও মুখে এবং স্বভাবে একটা সামঞ্জস্য দাঁড়িয়ে যেত; একটা ছাঁচ বহুকাল থেকে তৈরি হয়ে যেত; —তাহলে তাদের আর বল প্রকাশ ক'রে বহু চিন্তা ক'রে কাজ করতে হোত না, সকল কাজ সুন্দরভাবে সহজে সম্পন্ন হোত; তাহলে তাদের একটা সহজ নীতিও দাঁড়িয়ে যেত—অর্থাৎ বহুযুগ থেকে অবিচ্ছেদে যে কাজ ক'রে আসছে সেই কাজের কাছে তাদের মন বশ মানত, সেই বহুযুগের অভ্যস্ত কর্তব্য থেকে কোনো সামান্য শক্তি তাদের বিক্ষিপ্ত করতে পারত না। স্ত্রীলোককে প্রকৃতি মা ক'রে দিয়ে তাকে একেবারে ছাঁচে ঢালাই ক'রে ফেলেছে—পুরুষের সেরকম কোনো স্বাভাবিক আদিম বন্ধন নেই, সেইজন্যে একটি ধ্রুবকেন্দ্র আশ্রয়ে পুরুষ সর্বতোভাবে তৈরি হয়ে যায়নি—সে চিরকাল ধ'রে কেবলি বিক্ষিপ্ত হয়ে হয়ে এসেছে—তার শতমুখী উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি তাকে একটি সুন্দর সমগ্রতায় গড়ে তোলেনি। আমি সেদিনকার চিঠিতে বন্ধনকে সৌন্দর্যের কারণ ব'লে অনেকখানি লিখেছিলুম মনে আছে—মেয়েরা সেই রকম একটি স্বাভাবিক ছন্দের বন্ধনে সম্পূর্ণ সুন্দর হয়ে তৈরি হয়ে এসেছে—আর পুরুষরা গদ্যের মতো বন্ধনহীন এবং সৌন্দর্যহীন—তাদের আগাগোড়ার মধ্যে কোনো একটি "ছাঁদ নেই।" মেয়েদের সঙ্গে যে লোকে চিরকাল সংগীতের

কবিতার, লতার, ফুলের, নদীর তুলনা দিয়ে এসেছে এবং কখনো পুরুষের সঙ্গে দেবার কথা তাদের মনেও উদয় হয়নি তা'র কারণই এই। প্রকৃতির সমস্ত সুন্দর জিনিস যেমন সুসম্বদ্ধ সুসম্পূর্ণ সুসংহত সুসংযত মেয়েরাও সেই রকম; তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা কোনো চিন্তা কোনো মন এসে তাদের ছন্দোভঙ্গ ক'রে দিচ্ছে না, কোনো তর্ক এসে তাদের মিল নষ্ট ক'রে দিচ্ছে না।

কলকাতা,

২১শে আগস্ট, ১৮৯৩।

আজ কতকগুলো খবরের কাগজের কাঁচিছাঁটা টুক্‌রো পাওয়া গেল। কোথায় প্যারিসের আর্টিস্ট সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মত্ততা আর কোথায় আমার কালিগ্রামের সরল চাষী প্রজাদের দুঃখদৈন্য নিবেদন। আমার কাছে এই সমস্ত দুঃখপীড়িত অটল বিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত প্রজাদের মুখে বড়ো একটি কোমল মাধুর্য আছে, বাস্তবিক এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে একটা সুখ আছে। এরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্যসহকারে সহ্য করেছে তবু এদের ভালবাসা কিছুতেই ম্লান হয় না। আজ একজন এসে বলছিল, "সে বছর ভালো ধান হয়নি ব'লে চুঁচড়োয় বুড়ো বাপের কাছে এনছাপ নিতে গিয়েছিলুম তা সে বললে আমি তোদের কিছু ছেড়ে দিচ্ছি তোরাও আমাকে কিছু খেতে দিস। তার কাছে দরবার করতে গিয়েছিলুম ব'লে সেই মনোবাদে এখানকার আমিন আমাকে ফেরেবি মকদ্দমা ক'রে তিন মাস জেল খাটিয়েছিল। আমি তখন তোমার মাটিকে সেলাম ক'রে ভিন্ এলাকায় গিয়েছিলুম।"—কিন্তু তবু তার এম্‌নি ভক্তি যে সেই ভিন্ এলাকার জমিদার আমাদের কতক

জমি চুরি ক'রে ভোগ করছিল ব'লে সে এখানকার সেরেস্তায় জানিয়ে যায় সেই রাগে তার নতুন জমিদার তার ধানসুদ্ধ জমি কেড়ে নিয়েছে। সে বলে, "আমি যার মাটিতে বুড়োকাল পর্যন্ত মানুষ হয়েছি তার হিতের কথা তাকে আমি বলতে পাব না?" এই ব'লে সে চোখ থেকে দুই এক ফোঁটা জল মুছে ফেললে। সে যে কেমন সহজে কোনোরকম চাতুরী না ক'রে যেন একটা খবর দিয়ে যাবার মতো সমস্তটা ব'লে গেল তা দেখলে এই ব্যাপারটার যথার্থ গভীরতা বুঝতে পারা যায়। এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয় তা এরা জানে না। কিন্তু তবু প্যারিসের সভ্যতা থেকে কত তফাৎ। সে এর চেয়ে কত কঠিন কত উজ্জ্বল কত সুগঠিত। তবু এখানকার মানুষের মধ্যে যে জিনিসটি আছে সে বড়ো অনাদরের নয়। যতক্ষণ না সভ্যতার মাঝখানে এই স্বচ্ছ সরলতার প্রতিষ্ঠা হয় ততক্ষণ সভ্যতা কখনই সম্পূর্ণ এবং সুন্দর হবে না। সরলতাই মানুষের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়—সে যেন গঙ্গার মতো, তার মধ্যে স্নান ক'রে সংসারের অনেক তাপ দূর হয়ে যায়। আর য়ুরোপ সমস্ত তাপকে যেন লালন ক'রে তুলছে এবং তার উপরে আবার সহস্রবিধ মাদকতার কৃত্রিম উত্তাপে আপনাকে রাত্রিদিন উত্তেজিত ক'রে তুলছে। খবরের কাগজের যে কটি টুকরো এসেছে প্রত্যেকটিতেই এই প্রমাণ দেয়।

পতিসর,

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪।

যে পারে বোট লাগিয়েছি এপারে খুব নির্জন। গ্রাম নেই বসতি নেই চষা মাঠ ধূ ধূ করছে, নদীর ধারে ধারে খানিকটা ক'রে শুকনো ঘাসের মতো আছে সেই ঘাস-গুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গোটাকতক মোষ চরে বেড়াচ্ছে। আর আমাদের দুঠো হাতি আছে তারাও এপারে চরতে আসে। তাদের দেখতে বেশ মজা লাগে। একটা পা উঠিয়ে ঘাসের গোড়ায় দু চার বার একটু একটু ঠোকর মারে, তার পরে শুঁড় দিয়ে টান মারতেই বড়ো বড়ো ঘাসের চাপড়া একেবারে মাটিসুদ্ধ উঠে আসে, সেই চাপড়াগুলো শুঁড়ে ক'রে দুলিয়ে দুলিয়ে ঝাড়ে, তার মাটিগুলো ঝরে ঝরে পড়ে যায়, তার পরে মুখের মধ্যে পুরে' দিয়ে খেয়ে ফেলে। আবার এক এক সময় খেয়াল যায়, খানিকটা ধুলো শুঁড়ে ক'রে নিয়ে ফুঁ দিয়ে নিজের পেটে পিঠে সর্বাঙ্গে হুস ক'রে ছড়িয়ে দেয়—এইরকম তো হাতির প্রসাধন ক্রিয়া। বৃহৎ শরীর, বিপুল বল, শ্রীহীন আয়তন, অত্যন্ত নিরীহ—এই প্রকাণ্ড জন্তুটাকে দেখতে আমার বেশ লাগে। এর এই প্রকাণ্ডত্ব এবং বিশ্রীত্বর জন্যেই যেন এর প্রতি একটা কী বিশেষ স্নেহের উদ্রেক হয়—এর সর্বাঙ্গের অসৌষ্ঠব থেকে একে একটা মস্ত শিশুর মতো মনে হয়। তাছাড়া জন্তুটা বড়ো উদার

প্রকৃতির—শিব ভোলানাথের মতো—যখন খ্যাপে তখন খুব খ্যাপে, যখন ঠাণ্ডা হয়—তখন অগাধ শান্তি। বড়োত্বর সঙ্গে সঙ্গে যে একরকম শ্রীহীনত্ব আছে—তাতে অন্তরকে বিমুখ করে না, বরঞ্চ আকর্ষণ ক'রে আনে। আমার ঘরে যে বেঠোভেনের ছবি আছে অনেক সুন্দর মুখের সঙ্গে তুলনা করলে তাকে দর্শনযোগ্য মনে না হোতে পারে, কিন্তু আমি যখন তার দিকে চাই সে আমাকে খুব টেনে নিয়ে যায়—ঐ উস্কোখুস্কো মাথাটার ভিতরে কতবড়ো একটা শব্দহীন শব্দ-জগৎ। এবং কী একটা বেদনাময় অশান্ত ক্লিষ্ট প্রতিভা, রুদ্ধঝড়ের মতো ঐ লোকটার ভিতরে ঘূর্ণ্যমান হোত।

———

পতিসর,

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪।

মাঝে মাঝে মেঘ করছে—মাঝে মাঝে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে—থেকে থেকে হঠাৎ হূহূ ক'রে একটা হাওয়া এসে আমার বোটের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচিত্র ক্যাঁ কোঁ্যাঃ শব্দে আর্তনাদ তুলছে—আজ দুপুর বেলাটা এমনি ভাবে চলছে।—

এখন বেলা একটা বেজেছে—পাড়াগাঁয়ের মধ্যাহ্নের এই হাঁসের ডাক, কাপড় কাচার শব্দ, নৌকো চলাচলের ছল ছল ধ্বনি, দূরে গোরুর পাল পার করবার হৈ হৈ রব, এবং আপনার মনের ভিতরকার একটা উদাস আলস্যপূর্ণ স্বগত সংগীতস্বর কলকাতার চৌকিটেবিলসমাকীর্ণ বর্ণবৈচিত্র্যবিহীন নিত্যনৈমিত্তিকতার মধ্যে কল্পনাও করতে পারিনে। কলকাতাটা বড়ো ভদ্র এবং বড়ো ভারি, গবর্মেণ্টের আফিসের মতো। জীবনের প্রত্যেক দিনটাই যেন একই আকারে একই ছাপ নিয়ে টাঁকশাল থেকে তকতকে হয়ে কেটে কেটে বেরিয়ে আসছে—নীরস মৃত দিন; কিন্তু খুব ভদ্র এবং সমান ওজনের। এখানে আমি দলছাড়া—এবং এখানকার প্রত্যেক দিন আমার নিজের দিন—নিত্যনিয়মিত দম দেওয়া কলের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার আপনার মনের

ভাবনাগুলি এবং অখণ্ড অবসরটিকে হাতে ক'রে নিয়ে মাঠের মধ্যে বেড়াতে যাই— সময় কিংবা স্থানের মধ্যে কোনো বাধা নেই। সন্ধ্যেটা জলে স্থলে আকাশে ঘনিয়ে আসতে থাকে —আমি মাথাটা নিচু ক'রে আস্তে আস্তে বেড়াতে থাকি।

———

পতিসর,

১৯শে মার্চ, ১৮৯৪।

জ্যোৎস্না প্রতি রাত্রেই অল্প অল্প ক'রে ফুটে উঠছে। আমি তাই আজকাল সন্ধ্যের পরেও অনেকক্ষণ বাইরে বেড়াই। নদীর এপারের মাঠে কোথাও কিছু সীমাচিহ্ন নেই, গাছপালা নেই—চষা মাঠে একটি ঘাসও নেই, কেবল নদীর ধারের ঘাসগুলো প্রখর রৌদ্রে শুকিয়ে হলদে হয়ে এসেছে। জ্যোৎস্নায় এই ধূ ধূ শূন্য মাঠ ভারি অপূর্ব দেখতে হয়।—সমুদ্র এই রকম অসীম ব'লে মনে হয় কিন্তু তার একটা অবিশ্রাম গতি এবং শব্দ আছে—এই মাটির সমুদ্রের কোথাও কিছু গতি নেই শব্দ নেই বৈচিত্র্য নেই প্রাণ নেই—ভারি একটা উদাস মৃত শূন্যতা—চলবার মধ্যে কেবল এক প্রান্তে আমি একটি প্রাণী চলছি এবং আমার পায়ের কাছে একটি ছায়া চলে বেড়াচ্ছে। বহুদূরের মাঠে এক এক জায়গায়—যেখানে গত শস্যের শুকনো গোড়া কিছু অবশিষ্ট ছিল সেই-খানে চাষারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, মাঝে মাঝে কেবল সেই আগুনের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড বিস্তারিত প্রাণহীনতার উপর যখন অস্পষ্ট চাঁদের আলো এসে পড়ে তখন যেন একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদশোকের ভাব মনে আসে—যেন একটি মরুময় বৃহৎ গোরের উপরে একটি সাদা কাপড়পরা মেয়ে উপুড় হয়ে মুখ ঢেকে মূর্ছিতপ্রায় নিস্তব্ধ পড়ে রয়েছে।

পতিসর,

২৫শে মার্চ, ১৮৯৪।

আজকাল আমার সন্ধ্যাভ্রমণের একমাত্র সঙ্গীটির অভাব হয়েছে। সেটি আর কেউ নয় আমাদের শুক্ল পক্ষের চাঁদ। কাল থেকে আর তাঁর দেখা নেই। ভারি অসুবিধে হয়েছে, শীঘ্রই অন্ধকার হয়ে যায়, যথেষ্ট বেড়াবার পক্ষে একটু ব্যাঘাত জন্মায়।

আজকাল ভোরের বেলায় চোখ মেলেই ঠিক আমার খোলা জানলার সামনেই শুকতারা দেখতে পাই—তাকে আমার ভারি মিষ্টি লাগে—সেও আমার দিকে চেয়ে থাকে, যেন বহুকালের আমার আপনার লোক। মনে আছে যখন শিলাইদহে কাছারি ক'রে সন্ধ্যেবেলায় নৌকো ক'রে নদী পার হতুম, এবং রোজ আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেতুম আমার ভারি একটা সান্ত্বনা বোধ হোত। ঠিক মনে হোত আমার নদীটি যেন আমার ঘর সংসার এবং আমার সন্ধ্যাতারাটি আমার এই ঘরের গৃহলক্ষ্মী—আমি কখন কাছারি থেকে ফিরে আসব এই জন্যে সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে বসে আছে। তার কাছ থেকে এমন একটি স্নেহস্পর্শ পেতুম। তখন নদীটি নিস্তব্ধ হয়ে থাকত, বাতাসটি ঠাণ্ডা, কোথাও কিছু শব্দ নেই, ভারি যেন একটা ঘনিষ্ঠতার ভাবে আমার সেই প্রশান্ত সংসারটি পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। আমার সেই

শিলাইদহে প্রতি সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ অন্ধকারে নদী পার হওয়াটা খুব স্পষ্টরূপে প্রায়ই মনে পড়ে। ভোরের বেলায় প্রথম দৃষ্টিপাতেই শুকতারাটি দেখে তাকে আমার একটি বহু-পরিচিত সহাস্য সহচরী না মনে ক'রে থাকতে পারিনে—সে যেন একটি চিরজাগ্রত কল্যাণকামনার মতো ঠিক আমার নিদ্রিত মুখের উপর প্রফুল্ল স্নেহ বিকিরণ করতে থাকে।

আজ বেড়িয়ে বোটে ফিরে এসে দেখি বাতির কাছে এত বেশি পতঙ্গের ভিড় হয়েছে যে টেবিলে বসা অসাধ্য। আজ তাই বাতি নিবিয়ে দিয়ে বাইরে কেদারা নিয়ে অন্ধকারে বসেছিলুম—আকাশের সমস্ত জ্যোতির্জগৎ, অনন্ত রহস্যের অন্তঃপুরবাসিনী সমস্ত মেয়ের দলের মতো উপরের তলার খড়খড়ি থেকে আমাকে দেখছিল, আমি তাদের কিছুই জানিনে এবং কোনোকালেই জানতে পাব কিনা তাও জানিনে—অথচ ঐ জ্যোতির্মগুলীর মধ্যে বিচিত্র জীবনের অনন্ত ইতিহাস প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আজ সন্ধ্যের সময় আর চিঠি লেখা হয়ে ওঠেনি—তাই এখন লিখছি। এখন কত রাত হবে। এগারোটা। যখন চিঠিটা পৌঁছবে তখন দিনের বেলাকার প্রখর আলোকে জগৎটা খুবই সজাগ চঞ্চল, নানান কাজে ব্যস্ত—তখন কোথায় এই সুষুপ্ত নিস্তব্ধ রাত্রি কোথায় ঐ অনন্ত বিশ্বলোকের জ্যোতির্ময় শব্দহীন বার্তা। এত সুতীব্র প্রভেদ। কিছুতে ঠিক ভাবটি আনা যায় না। মানুষের মনের ক্ষমতা এত সামান্য। যে খুবই পরিচিত,

চোখ বুজে তার আকৃতির প্রত্যেক রেখাটি মনে আনা যায় না—এক সময় যা সর্বপ্রধান আর এক সময় তা যথার্থরূপে স্মৃতিগম্য করাও শক্ত হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় রাতকে ভুলি, রাতের বেলায় দিনকে ভুলি। চাঁদের খণ্ড অনেকক্ষণ হোলো উঠেছে—চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ নিদ্রিত—কেবল গ্রামের গোটা দুই কুকুর ওপার থেকে ডাকছে—আমার এই বোটে কেবল একটি বাতি জ্বলছে—আর সব জায়গায় আলো নিবেছে—নদীতে একটু গতিমাত্র নাই, তাতেই মনে হয় মাছগুলো রাত্রিরে ঘুমোয়। জলের ধারে সুপ্ত গ্রাম এবং জলের উপর গ্রামের সুপ্ত ছায়া।

পতিসর,
২২শে মার্চ, ১৮৯৪।

"পশুপ্রীতি" ব'লে ব—একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছে—আজ সমস্ত সকালবেলায় সেইটে নিয়ে পড়েছিলুম। কাল আমি বোটে বসে জানলার বাইরে নদীর দিকে চেয়ে আছি এমন সময় হঠাৎ দেখি—একটা কী পাখি সাঁৎরে তাড়াতাড়ি ওপারের দিকে চলে যাচ্ছে আর তার পিছনে মহা ধর ধর মার মার রব উঠেছে। শেষকালে দেখি একটি মুরগি—তার আসন্ন মৃত্যুকালে বাবুর্চিখানার নৌকো থেকে হঠাৎ কী রকমে ছাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, ঠিক যেই তীরের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে অমনি যমদূত মানুষ কঁ্যাক ক'রে তার গলা টিপে ধ'রে আবার নৌকো ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমি ফটিককে ডেকে বললুম আমার জন্যে আজ মাংস হবে না। এমন সময় ব—র পশুপ্রীতি লেখাটা এসে পৌঁছল—আমি পেয়ে কিছু আশ্চর্য হলুম। আমার তো আর মাংস খেতে রুচি হয় না। আমরা যে কী অন্যায় এবং নিষ্ঠুর কাজ করি তা ভেবে দেখিনে ব'লে মাংস গলাধঃকরণ করতে পারি। পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে যার দূষণীয়তা মানুষের স্বহস্তে গড়া—যার ভালোমন্দ, অভ্যাসপ্রথা দেশাচার সমাজনিয়মের উপর নির্ভর করে কিন্তু নিষ্ঠুরতা সে রকম নয়, এটা একেবারে আদিম দোষ, এর মধ্যে কোনো তর্ক নেই, কোনো দ্বিধা নেই, হৃদয় যদি

আমাদের অসাড় না হয়, হৃদয়কে যদি চোখ বেঁধে অন্ধ ক'রে না রেখে দিই তাহলে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে নিষেধ একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাই—অথচ ওটা আমরা হেসেখেলে সকলে মিলে খুব অনায়াসে আনন্দসহকারে ক'রে থাকি, এমন কি, যে না করে তাকে কিছু অদ্ভুত ব'লে মনে হয়। পাপপুণ্য-সম্বন্ধে মানুষের এমনি একটা কৃত্রিম অপূর্ব ধারণা। আমার বোধ হয় সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সর্বজীবে দয়া। প্রেম হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি। সেদিন একটা ইংরিজি কাগজে পড়লুম, পঞ্চাশ হাজার পৌণ্ড মাংস ইংলণ্ড থেকে আফ্রিকার কোনো এক সেনানিবাসে পাঠানো হয়েছিল—মাংসটা খারাপ হওয়াতে তারা ফিরে পাঠিয়ে দেয়; তার পরে সেই মাংস পোর্ট্স্মথে পাঁচ ছ'শ টাকায় নিলেম হয়ে যায়—ভেবে দেখো দেখি—জীবের জীবনের কী ভয়ানক অপব্যয় এবং কী অল্প মূল্য। আমরা যখন একটা খানা দিই তখন কত প্রাণী কেবলমাত্র ডিশ পূরণের জন্যে আত্মবিসর্জন দেয়, হয়তো কেবল ফিরে ফিরে যায় কেউ পাতে নেয় না। যতক্ষণ আমরা অচেতনভাবে থাকি এবং অচেতনভাবে হিংসা করি ততক্ষণ আমাদের কেউ দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যখন মনে দয়া উদ্রেক হয় তখন যদি সেই দয়াটাকে গলা টিপে মেরে দশজনের সঙ্গে মিশে হিংস্রভাবে কাজ ক'রে যাই তাহলেই যথার্থ আপনার সমস্ত সাধুপ্রকৃতিকে অপমান করা হয়। আমি তো মনে করেছি—আরো একবার নিরামিষ খাওয়া ধরে দেখব।

আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে—আমি লোকে-নের ওখান থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার ক'রে এনেছি—যখনই সময় পাই সেই বইটা উল্‌টে পাল্‌টে দেখি—ঠিক মনে হয় তার সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে কথা কচ্ছি—এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। অনেক বই এর চেয়ে ভালো লেখা আছে এবং এই বইয়ের অনেক দোষ থাকতে পারে কিন্তু এই বইটি আমার মনের মতো। অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয় কোনোটা ঠিক আরামের বোধ হয় না—যেমন রোগের সময় অনেক সময় বিছানায় ঠিক আরামের অবস্থাটি পাওয়া যায় না, নানা রকমে পাশ ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে, কখনো বালিশের উপর বালিশ চাপাই, কখনো বালিশ ফেলে দিই, সেই রকম মানসিক অবস্থায় আমিয়েলের যেখানেই খুলি সেইখানেই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে শরীরটা ঠিক বিশ্রাম পায়। আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু আমিয়েল পশুদের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতাসম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছে—ব—র লেখায় আমি সেইটে সমস্তটা নোট বসিয়ে দিয়েছি। কাদম্বরীর সেই মৃগয়া বর্ণনা থেকে অনেকটা আমি ব—কে তর্জমা করতে ব'লে দিয়েছি। পাখিরাও যে কতকটা আমাদেরি মতো—একটা জায়গায় আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই—এইটে বাণভট্ট আপন করুণ কল্পনাশক্তির দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করেছেন।

পতিসর,

২৮শে মার্চ, ১৮৯৪।

এদিকে গরমটাও বেশ পড়েছে—কিন্তু রৌদ্রের উত্তাপটাকে আমি বড়ো একটা গ্রাহ্য করিনে। তপ্ত বাতাস ধুলোবালি খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে হুহু শব্দ ক'রে ছুটেছে—প্রায়ই হঠাৎ এক এক জায়গায় একটা আজগবি ঘূর্ণিবাতাস দাঁড়িয়ে উঠে শুকনো পাতা এবং ধুলোর ওড়না ঘুরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নেচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—সেটা দেখতে বেশ লাগে। নদীর ধারে বাগান থেকে পাখিগুলো ভারি মিষ্টি ক'রে ডাকছে—মনে হচ্ছে ঠিক বসন্তই বটে, তপ্ত খোলা থেকে একেবারে গরম গরম নাবিয়ে এনেছে—কিন্তু গরমটা পরিমাণে কিঞ্চিৎ বেশি, আর একটুখানি জুড়িয়ে আনলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না। আজ সকাল বেলাটায় হঠাৎ দিব্যি ঠাণ্ডা পড়েছিল—এমন কি, প্রায় শীতকালেরই মতো—স্নান করবার সময় মনে খুব প্রবল উৎসাহ ছিল না। এই প্রকৃতি নামক একটা বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কখন যে কী হচ্ছে তার হিসেব পাওয়া শক্ত—কোথায় তার কোন্ অজ্ঞাত কোণে কী একটা কাণ্ড ঘটছে আর অকস্মাৎ চারদিকের সমস্ত ভাবখানা বদলে যাচ্ছে। আমি কাল ভাবছিলুম মানুষের মনখানাও ঠিক ঐ প্রকাণ্ড প্রকৃতির মতো রহস্যময়। চতুর্দিকে শিরা উপশিরা স্নায়ু মস্তিষ্ক মজ্জার ভিতর কী এক অবিশ্রাম

ইন্দ্রজাল চলছে—হুহুংশব্দে রক্তস্রোত ছুটেছে স্নায়ুগুলো কাঁপছে হৃৎপিণ্ড উঠছে পড়ছে, আর এই রহস্যময়ী মানব-প্রকৃতির মধ্যে ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে। কোথা থেকে কখন কী হাওয়া আসে আমরা কিছুই জানিনে। আজ মনে করলুম জীবনটা দিব্যি চালাতে পারব, বেশ বল আছে, সংসারের দুঃখযন্ত্রণাগুলোকে একেবারে ডিঙিয়ে চলে যাব, এই ভেবে সমস্ত জীবনের প্রোগ্রামটি ছাপিয়ে এনে শক্ত ক'রে বাঁধিয়ে পকেটে রেখে নিশ্চিন্ত আছি; কাল দেখি কোন্ অজ্ঞাত রসাতল থেকে আর একটা হাওয়া দিয়েছে, আকাশের ভাবগতিক সমস্ত বদলে গেছে, তখন আর মনে হয় না এ দুর্যোগ কোনোকালে কাটিয়ে উঠতে পারব। এসবের উৎপত্তি কোন্‌খানে। কোন্ শিরার মধ্যে স্নায়ুর মধ্যে কী একটা নড়চড় হয়ে গেছে মাঝের থেকে আমি আমার সমস্ত বলবুদ্ধি নিয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারিনে। নিজের ভিতর-কার এই অপার রহস্যের কথা মনে করলে ভারি ভয় হয়—কী করতে পারব না পারব কিছুই জোর ক'রে বলতে পারিনে—মনে হয়, কিছুই না জেনে আমি এ কী একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড সর্বদাই স্কন্ধে বহন ক'রে নিয়ে বেড়াই, আয়ত্ত করতে পারিনে অথচ এর হাতও কিছুতেই এড়াতে পারিনে—জানিনে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে আমিই বা একে কোথায় নিয়ে যাব—আমার স্কন্ধে এই ভয়ংকর রহস্য যোজনা ক'রে দেবার কী প্রয়োজন ছিল। বুকের ভিতর কী হয়, শিরার মধ্যে কী চলছে, মস্তিষ্কের মধ্যে কী নড়ছে, কত কী

অসংখ্য কাণ্ড আমাকে অবিশ্রাম আচ্ছন্ন ক'রে ঘটছে, আমি দেখতেও পাচ্ছিনে, আমার সঙ্গে পরামর্শও করছে না, অথচ সবসুদ্ধ নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কর্তাব্যক্তির মতো মুখ ক'রে মনে করছি আমি একজন আমি। তুমি তো ভারি তুমি—তোমার নিজের কতটুকুই বা জানো তার ঠিক নেই। আমি তো অনেক ভেবেচিন্তে এইটুকু ঠিক করেছি আমি নিজেকে কিছুই জানিনে। আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মতো—ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কলবল আছে—কখন কে এসে বাজায় কিছুই জানিনে—কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত—কেবল কী বাজে সেই-টেই জানি—সুখ বাজে কি ব্যথা বাজে, কড়ি বাজে কি কোমল বাজে, তালে বাজে কি বেতালে বাজে এইটুকুই বুঝতে পারি। আর জানি আমার অক্টেভ নিচের দিকেই বা কতদূর উপরের দিকেই বা কতদূর। না—তাও কি ঠিক জানি।

—

পতিসর,

৩০শে মার্চ, ১৮৯৪।

এত অকারণ আশঙ্কা এবং কষ্ট মানুষের অদৃষ্টে থাকে। ছোটো বড়ো এত সহস্র বিষয়ের উপর আমাদের মনের সুখশান্তি নির্ভর করে। অনেক দুঃখ আছে যা আমার নিজ-কৃত এবং যা সবিনয়ে সহিষ্ণুভাবে বহন করা কর্তব্য মনে হয়—কিন্তু চিঠি না পেয়ে যখন আশঙ্কা হয় যে বুঝি একটা কিছু বিপদ কিংবা ব্যামো হয়েছে—তখন কষ্টটাকে শান্ত করবার জন্যে হাতের কাছে কোনো ফিলজফিই পাওয়া যায় না। তখন বুদ্ধিটাও একেবারে কাজের বার হয়ে যায়। কাল সমস্তক্ষণ বেড়াতে বেড়াতে এমন সকল অসম্ভব এবং অসংগত কল্পনা মনে উদয় হচ্ছিল এবং বুদ্ধি তার কোনো প্রতিবাদ করছিল না যে আজ তা স্মরণ ক'রে হাসিও পাচ্ছে লজ্জাও বোধ হচ্ছে—অথচ স্থির নিশ্চয় জানি যে, আসছে বারে, যেদিন এই রকম ঘটনা হবে ঠিক আবার এরই পুনরাবৃত্তি হবে। আমিও অনেকবার বলেছি বুদ্ধিটা মানুষের নিজস্ব জিনিস নয়, ওটা এখনো আমাদের মনের মধ্যে ন্যাচরলাইজ্‌ড হয়ে যায় নি।

যখন মনে করি জীবনের পথ সুদীর্ঘ, দুঃখ কষ্টের কারণ অসংখ্য এবং অবশ্যম্ভাবী তখন এক এক সময় মনের বল রক্ষা করা প্রাণপণ কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় সন্ধ্যের সময়

একলা বসে বসে টেবিলের বাতির আলোর দিকে দৃষ্টি নিবিষ্ট ক'রে মনে করি জীবনটাকে বীরের মতো অবিচলিতভাবে নীরবে এবং বিনা অভিযোগে বহন করব—সেই কল্পনায় মনটা উপস্থিত মতো অনেকখানি স্ফীত হয়ে ওঠে এবং আপনাকে হাতে হাতে একজন মস্ত বীরপুরুষ ব'লে ভ্রম হয়—তার পরে পথ চলতে পায়ে সেই কুশের কাঁটাটি ফোটে অমনি যখন লাফিয়ে উঠি তখন ভবিষ্যতের পক্ষে ভারি সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন আবার জীবনটাকে সুদীর্ঘ এবং আপনাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে হয়। কিন্তু সে যুক্তিটা বোধ হয় ঠিক নয়—বাস্তবিক, বোধ হয় কুশের কাঁটায় বেশি অস্থির করে। মনের ভিতরে একটি গোছালো গিন্নিপনা দেখা যায়—সে দরকার বুঝে ব্যয় করে, সামান্য কারণে বলের অপব্যয় করতে চায় না। সে যেন বড়ো বড়ো সংকট এবং আত্মত্যাগের জন্যে আপনার সমস্ত বল কৃপণের মতো সযত্নে সঞ্চয় ক'রে রাখে। ছোটো ছোটো বেদনায় হাজার কান্নাকাটি করলেও তার রীতিমতো সাহায্য পাওয়া যায় না। কিন্তু যেখানে দুঃখ গভীরতম সেখানে তার আলস্য নাই। এই জন্যে জীবনে একটা প্যারাডক্স প্রায়ই দেখা যায় যে, বড়ো দুঃখের চেয়ে ছোটো দুঃখ যেন বেশি দুঃখকর। তার কারণ, বড়ো দুঃখে হৃদয়ের যেখানটা বিদীর্ণ হয়ে যায় সেইখান থেকেই একটা সান্ত্বনার উৎস উঠতে থাকে, মনের সমস্ত দলবল সমস্ত ধৈর্য-বীর্য এক হয়ে আপনার কাজ করতে থাকে, তখন দুঃখের

মাহাত্ম্যের দ্বারাই তার সহ্য করবার শক্তি বেড়ে যায়। মানুষের হৃদয়ে একদিকে যেমন সুখলাভের ইচ্ছা তেমনি আর একদিকে আত্মত্যাগের ইচ্ছাও আছে; সুখের ইচ্ছা যখন নিষ্ফল হয় তখন আত্মত্যাগের ইচ্ছা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সেই ইচ্ছার চরিতার্থতা সাধন করবার অবসর পেয়ে মনের ভিতরে একটা উদার উৎসাহ সঞ্চার হয়। ছোটো দুঃখের কাছে আমরা কাপুরুষ কিন্তু বড়ো দুঃখ আমাদের বীর ক'রে তোলে, আমাদের যথার্থ মনুষ্যত্বকে জাগ্রত ক'রে দেয়। তার ভিতরে একটা সুখ আছে। দুঃখের সুখ ব'লে একটা কথা অনেকদিন থেকে প্রচলিত আছে সেটা নিতান্ত বাকচাতুরী নয় এবং সুখের অসন্তোষ একটা আছে সেও সত্য। তার মানে বেশি শক্ত নয়। যখন আমরা নিছক সুখ ভোগ করতে থাকি তখন আমাদের মনের একার্ধ অকৃতার্থ থাকে, তখন একটা কিছুর জন্যে দুঃখ ভোগ এবং ত্যাগ স্বীকার করতে ইচ্ছে করে, নইলে আপনাকে অযোগ্য ব'লে মনে হয়—এই কারণেই যে সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত সেই সুখই স্থায়ী এবং সুগভীর, তাতেই যথার্থ আমাদের সমস্ত প্রকৃতির চরিতার্থতা সাধন হয়। কিন্তু সুখ দুঃখের ফিলজফি ক্রমেই বেড়ে চলতে লাগল।

শিলাইদহ,
২৪শে জুন, ১৮৯৪।

সবে দিন চারেক হোলো এখানে এসেছি কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতদিন আছি তার ঠিক নেই—মনে হচ্ছে আজই যদি কলকাতায় যাই তাহলে যেন অনেক বিষয়ে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাব।

আমিই কেবল সময়স্রোতের বাইরে একটি জায়গায় স্থির হয়ে আছি, আর সমস্ত জগৎ আমার অজ্ঞাতে একটু একটু ক'রে ঠাঁই বদল করছে। আসলে, কলকাতা থেকে এখানে এলে সময়টা চতুর্গুণ দীর্ঘ হয়ে আসে, কেবল আপনার মনোরাজ্যে বাস করতে হয়, সেখানে ঘড়ি ঠিক চলে না। ভাবের তীব্রতা অনুসারে মানসিক সময়ের পরিমাপ হয়—কোনো কোনো ক্ষণিক সুখ দুঃখ মনে হয় যেন অনেকক্ষণ ধরে ভোগ করছি। যেখানে বাইরের লোকপ্রবাহ এবং বাইরের ঘটনা এবং দৈনিক কার্যপরম্পরা আমাদের সর্বদা সময় গণনায় নিযুক্ত না রাখে সেখানে, স্বপ্নের মতো, ছোটো মুহূর্ত দীর্ঘকালে এবং দীর্ঘকাল ছোটোমুহূর্তে সর্বদাই পরিবর্তিত হোতে থাকে। তাই আমার মনে হয় খণ্ড কাল এবং খণ্ড আকাশ আমাদের মনের ভ্রম। প্রত্যেক পরমাণু অসীম এবং প্রত্যেক মুহূর্তই অনন্ত। এ সম্বন্ধে পারস্য উপন্যাসে খুব ছেলেবেলায় একটা গল্প পড়েছিলুম সেটা

আমার ভারি ভালো লেগেছিল—এবং তখন যদিও খুব ছোটো ছিলুম তবুও তার ভিতরকার ভাবটা এক রকম ক'রে বুঝতে পেরেছিলুম। কালের পরিমাণটা যে কিছুই নয় সেইটে দেখাবার জন্যে একজন ফকির একটা টবের মধ্যে মন্ত্রঃপূত জল রেখে বাদশাকে বললে তুমি এর মধ্যে ডুব দিয়ে স্নান করো। বাদশা ডুব দেবামাত্র দেখলে সে এক সমুদ্রের ধারে নতুন দেশে উপস্থিত—সেখানে সে দীর্ঘজীবন ধরে নানা ঘটনা নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে নানা সুখ দুঃখ অতিবাহন করলে। তার বিয়ে হোলো, তার একে একে অনেকগুলি ছেলে হোলো, ছেলেরা মরে গেল, স্ত্রী মরে গেল, টাকাকড়ি সব নষ্ট হয়ে গেল এবং সেই শোকে যখন সে একেবারে অধীর হয়ে পড়েছে, এমন সময় হঠাৎ দেখলে সে আপন রাজসভায় জলের টবের মধ্যে। ফকিরের উপর খুব ক্রোধ প্রকাশ করাতে সভাসদরা সকলেই বললে, মহারাজ, আপনি কেবল-মাত্র জলে ডুব দিয়েই মাথা তুলেছেন। আমাদের সমস্ত জীবনটা এবং জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ এই রকম এক মুহূর্তের মধ্যে বদ্ধ; আমরা সেটাকে যতই সুদীর্ঘ এবং সুতীব্র মনে করি যেমনি সংসারের টব থেকে মাথা তুলব, অমনি সমস্তটা মুহূর্তকালের স্বপ্নের মতো ক্ষুদ্র হয়ে যাবে। কালের ছোটো বড়ো কিছুই নেই—আমরাই ছোটো বড়ো।

কাল দিনের বেলাটা বেশ ছিল। আমার এই নদীর জলরেখা, বালির চর এবং ওপারের বনদৃশ্যের উপরে মেঘ এবং রৌদ্রের মুহুর্মুহু নতুন খেলা চলছিল—খোলা জানলায়

ভিতর দিয়ে যে দিকেই চোখ পড়ছিল এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল। কোনো সুন্দর জিনিসকে "স্বপ্নের মতো" কেন বলে ঠিক জানিনে, বোধ হয় নিছক সৌন্দর্যটা প্রকাশ করবার জন্যে। অর্থাৎ ওর মধ্যে যেন Realityর ভারটুকু মাত্র নেই—অর্থাৎ এই শস্যক্ষেত্র থেকে যে আহার সংগ্রহ করতে হয়, এই নদী দিয়ে যে পাটের নৌকো যাবার রাস্তা, এই চর যে জমিদারের সঙ্গে খাজনা দিয়ে বন্দোবস্ত ক'রে নিতে হয় ইত্যাদি শত সহস্র কথা মন থেকে দূর ক'রে দিয়ে কেবলমাত্র হিসাবহীন বিশুদ্ধ আনন্দময় সৌন্দর্যের ছবি যখন আমরা উপভোগ করি তখন আমরা সেটাকে স্বপ্নের মতো বলি। অন্য সময়ে আমরা জগৎকে প্রধানত সত্য ব'লে দেখি তারপরে তাকে আমরা সুন্দর অথবা অন্যরূপে জানি—কিন্তু যে সময়ে তাকে আমরা প্রধানত সুন্দর হিসাবে দেখি, তারপরে সত্য হোক না হোক লক্ষ্য করিনে তখন আমরা তাকে বলি স্বপ্নের মতো।

শিলাইদহ,

২৬শে জুন, ১৮৯৪।

আজ সকালে বিছানা থেকে উঠেই দেখি পাংশুবর্ণ মেঘের ভারে আকাশ অন্ধকার এবং অবনত, বাদলার ভিজে হাওয়া দিচ্ছে, টিপ্ টিপ্ ক'রে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়ছে, নদীতে নৌকো বেশি নেই, ধান কাটবার জন্যে কাস্তে হাতে চাষারা মাথায় টোকা পরে গায়ে চট মুড়ি দিয়ে খেয়ানৌকোয় পার হচ্ছে, মাঠে গোরু চরছে না এবং ঘাটে স্নানার্থিনী জনপদবধূদের বাহুল্য নেই—অন্যদিন এতক্ষণ আমি তাদের উচ্চকণ্ঠে কলধ্বনি এপার থেকে শুনতে পেতুম, আজ সে সমস্ত কাকলী এবং পাখির গান নীরব। যেদিক থেকে বৃষ্টির ছাঁট আসবার সম্ভাবনা সেদিককার জানলা এবং পর্দা ফেলে দিয়ে অন্যদিক-কার জান্‌লা খুলে আমি এতক্ষণ কাজের প্রত্যাশায় বসে ছিলুম। অবশেষে ক্রমেই আমার ধারণা হচ্ছে আজ এ বাদলায় আমলারা ঘরের বার হবে না—হায়, আমিও শ্যাম নই, তারাও রাধিকা নয়,—বর্ষাভিসারের এমন সুযোগ মাঠে মারা গেল। তাছাড়া বাঁশি যদি বাজাতুম এবং রাধিকার যদি কিছুমাত্র সুরবোধ থাকত তাহলে বৃকভানুনন্দিনী বিশেষ "হর্ষিতা" হোত না। যাই হোক, অবস্থাগতিকে যখন রাধিকাও আসছেন না আমলারাও তদ্রূপ এবং আমার "Muse"ও সম্প্রতি আমাকে পরিত্যাগ ক'রে বাপের বাড়ি চলে গেছেন,

তখন বসে বসে একখণ্ড চিঠি লেখা যেতে পারে। আসল হয়েছে কী, এতক্ষণ কোনো কাজ না থাকাতে নদীর দিকে চেয়ে গুন গুন স্বরে ভৈরবী টোরি রামকেলি মিশিয়ে একটা প্রভাতী রাগিণী সৃজন ক'রে আপন-মনে আলাপ করছিলুম, তাতে অকস্মাৎ মনের ভিতরে এমন একটা সুতীব্র অথচ সুমধুর চাঞ্চল্য জেগে উঠল, এমন একটা অনির্বচনীয় ভাবের আবেগ উপস্থিত হোলো, এক মুহূর্তের মধ্যেই আমার এই বাস্তব জীবন এবং বাস্তব জগৎ আগাগোড়া এমন একটি মূর্তি পরিবর্তন ক'রে দেখা দিলে, অস্তিত্বের সমস্ত দুরূহ সমস্যার এমন একটা সংগীতময় ভাবময় অথচ ভাষাহীন অর্থহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে লাগল, এবং সেই সুরের ছিদ্র দিয়ে নদীর উপর বৃষ্টি জলের তরল পতন শব্দ অবিশ্রাম ধ্বনিত হয়ে এমন একটা পুলক সঞ্চার করতে লাগল— জগতের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গীহীন একটিমাত্র প্রাণীকে ঘিরে আষাঢ়ের অশ্রুসজল ঘনঘোর শ্যামল মেঘের মতো "সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা" এমনি স্তরে স্তরে ঘনিয়ে এল যে, হঠাৎ এক সময় বলে উঠতে হোলো, যে, থাক্, আর কাজ নেই, এইবার Criticism on Contemporary thought and thinkers পড়তে বসা যাক।"

শিলাইদা,

২৭শে জুন, ১৮৯৪।

কাল থেকে হঠাৎ আমার মাথায় একটা হ্যাপি থট এসেছে। আমি চিন্তা ক'রে দেখলুম পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না; কিন্তু তার বদলে যেটা করতে পারি সেইটে ক'রে ফেললে অনেক সময় আপনিই পৃথিবীর উপকার হয়, নিদেন যা হোক একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না ক'রে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তাহলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হোতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে, এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং সে পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর

শিকার চলছে, হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু বিন্দু বারিশীকর-বর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম হোলো—তাতে ক'রে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হোলো। তা হোক তবু সে মনের মধ্যে আছে। দিন-যাপনের আজ আর এক রকম উপায় পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে। আজ বসে বসে ছেলেবেলাকার স্মৃতি এবং তখনকার মনের ভাব খুব স্পষ্ট ক'রে মনে আনবার চেষ্টা করছিলুম। যখন পেনেটির বাগানে ছিলুম, যখন পৈতের নেড়া মাথা নিয়ে প্রথমবার বোলপুরের বাগানে গিয়েছিলুম, যখন পশ্চিমের বারান্দার সবশেষের ঘরে আমাদের ইস্কুল ঘর ছিল এবং আমি একটা নীল কাগজের ছেঁড়া খাতায় বাঁকা লাইন কেটে বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে প্রকৃতির বর্ণনা লিখতুম, যখন তোষাখানার ঘরে শীতকালের সকালে চিন্তা ব'লে একটা চাকর গুনগুন স্বরে মধু কানের সুরে গান করতে করতে মাখন দিয়ে রুটি তোষ করত,—তখন আমাদের গায়ে গরম কাপড় ছিল না, একখানা কামিজ প'রে সেই আগুনের কাছে বসে শীত নিবারণ করতুম এবং সেই সশব্দবিগলিতনবনী-সুগন্ধি রুটিখণ্ডের উপরে লুব্ধছুরাশদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে চুপ ক'রে বসে চিন্তার গান শুনতুম—সেই সমস্ত দিনগুলিকে ঠিক বর্তমানের ক'রে দেখছিলুম এবং সেই সমস্ত দিনগুলির সঙ্গে এই রৌদ্রালোকিত পদ্মা এবং পদ্মার চর ভারি এক-রকম সুন্দরভাবে মিশ্রিত হচ্ছিল,—ঠিক যেন আমার সেই

ছেলেবেলাকার খোলা জানলার ধারে বসে এই পদ্মার একটি দৃশ্যখণ্ড দেখছি ব'লে মনে হচ্ছিল। তারপরে আমি ভাবলুম এই তো আমি কোনো উপকরণ না নিয়ে কেবল গল্প লিখে এবং বর্তমানকে দূরকালের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে নিজেকে নিজে সুখী করতে পারি। তার পরেই মনে হোলো, প্রবাদ আছে "Nothing succeeds like success"—"টাকায় টাকা আনে"—তেমনি সুখও সুখ আনে। সুখের সময়েই আমরা মনে করি আমাদের সুখী হবার অসীম ক্ষমতা আছে—তার-পরে দুঃখের সময়ে দেখতে পাই কোনো ক্ষমতাই কোনো কাজ করছে না, সব কলই একেবারে বিগড়ে গেছে। কাল বোধ হয় একটু কিছু সুখের আভাস মনের ভিতর রীরী ক'রে উঠেছিল তাই সমস্ত কলগুলো একেবারে চলতে আরম্ভ করেছিল, জীবনের অতীত স্মৃতি এবং প্রকৃতির বর্তমান শোভা একসঙ্গেই সজীব হয়ে উঠেছিল, তাই সকালে আজ জেগে উঠেই মনে হোলো আমি কবি। যতই কবিত্ব থাক্, যতই ক্ষমতার গর্ব করি মানুষ ভয়ানক পরাধীন। পৃথিবীর উপর থেকে এই কাঙাল জীবগুলো লম্বা হয়ে উঠে খাড়া হয়ে শীর্ণ হয়ে বেড়াচ্ছে,—আস্ত স্বর্গটি চায়, তারপরে টুকরোটাকরা যা পায় তাতেই ক্ষুধানিবৃত্তির চেষ্টা করে, অবশেষে ভিক্ষা-প্রসারিত ঊর্ধ্বগামী দেহ ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুকে স্বর্গপ্রাপ্তি ব'লে রটনা করে। যেটুকু সুখে জীবনের সমস্ত কলগুলো চলে সেইটুকু সুখ যদি চিরকাল ধরে রাখা যায় তাহলে সমস্ত শক্তি বিকশিত সমস্ত কাজ সম্পন্ন ক'রে যাওয়া

যেতে পারে। আজ গিরিবালা অনাহূত এসে উপস্থিত হয়েছেন, কাল বড়ো আবশ্যকের সময় তাঁর দোদুল্যমান বেণীর সূচ্যগ্রভাগটুকুও দেখা যাবে না। কিন্তু সে কথা নিয়ে আজ আন্দোলনের দরকার নেই। শ্রীমতী গিরিবালার তিরোধান সম্ভাবনা থাকে তো থাক্—আজ যখন তাঁর শুভাগমন হয়েছে তখন সেটা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নেই।

এবারকার পত্রে অবগত হওয়া গেল যে আমার ঘরের ক্ষুদ্রতমাটি ক্ষুদ্র ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করতে শিখেছে। আমি সে চিত্র বেশ দেখতে পাচ্ছি। তার সেই নরম-নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্যে আমার মুখটা নাকটা তৃষার্ত হয়ে আছে। সে যেখানে-সেখানে আমাকে মুঠো ক'রে ধরে টলমলে মাথাটা নিয়ে হাম ক'রে খেতে আসত এবং খুদে খুদে আঙুলগুলোর মধ্যে আমার চষমার হারটা জড়িয়ে নিতান্ত নির্বোধ নিশ্চিন্ত গম্ভীরভাবে গাল ফুলিয়ে চেয়ে থাকত সেই কথাটা মনে পড়ছে।

শিলাইদা,

৩০শে জুন, ১৮৯৪।

আমার এই ক্ষুদ্র নির্জনতাটি আমার মনের কারখানা ঘরের মতো; তার নানাবিধ অদৃশ্য যন্ত্রতন্ত্র এবং সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে—কেউ যখন বাইরে থেকে আসেন তখন সেগুলি তাঁর চোখে পড়ে না —কখন কোথায় পা ফেলেন তার ঠিক নেই, দিব্য অজ্ঞানে হাস্যমুখে বিশ্বসংসারের খবর আলোচনা করতে করতে আমার অবসরের তাঁতে চড়ানো অনেক সাধনার সূক্ষ্ম সূত্রগুলি পটপট ক'রে ছিঁড়তে থাকেন। যখন স্টেশনে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আবার একাকী আমার কর্মশালায় ফিরে আসি তখন দেখতে পাই আমার কত লোকসান হয়েছে। অনেক কথা, অনেক কাজ, অনেক আলোচনা আছে যা অন্যের পক্ষে সামান্য এবং জনতার মধ্যে স্বাভাবিক, কিন্তু নির্জন জীবনের পক্ষে আঘাতজনক। কেননা নির্জনে আমাদের সমস্ত গোপন অংশ গভীর অংশ বাহির হয়ে আসে সুতরাং সেই সময়ে মানুষ বড়ো বেশি নিজেরই মতো অর্থাৎ কিছু সৃষ্টিছাড়া গোছের হয়—সে অবস্থায় সে লোকসঙ্ঘের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। বাহ্যপ্রকৃতির একটা গুণ এই যে সে অগ্রসর হয়ে মনের সঙ্গে কোনো বিরোধ করে না; তার নিজের মন ব'লে কোনো বালাই না থাকাতে মানুষের মনকে সে

আপনার সমস্ত জায়গাটি ছেড়ে দিতে রাজি হয়; সে নিয়ত সঙ্গদান করে তবু সঙ্গ আদায় করে না, সে অনন্ত আকাশ অধিকার ক'রে থাকে তবু সে আমার একতিল জায়গা জোড়ে না;—নির্বোধের মতো বকে না, সুবুদ্ধির মতো তর্ক করে না,—আমার শিশু কন্যাটির মতো আকাশের কোলে শুয়ে থাকে,—যখন শান্তভাবে থাকে সেও মিষ্টি লাগে; যখন গর্জন ক'রে হাত পা ছুঁড়তে থাকে সেও মিষ্টি লাগে; বিশেষত যখন তার স্নান পান বেশ পরিবর্তনের বন্দোবস্ত ভার আমার উপর কিছুমাত্র নেই—তখন এই ভাষাহীন মনোহীন বিরাটসুন্দর শিশুটি আমার নির্জনের পক্ষে বেশ। ভাষায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ বুদ্ধিমান বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ লোকালয়ের পক্ষেই উপাদেয়।

———

সাহাজাদপুরের পথ,
জুলাই, ১৮৯৪।

সন্ধ্যাবেলায় পাবনা শহরের একটি খেয়াঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল। ওপার থেকে জনকতক লোক বাঁয়া-তবলার সঙ্গে গান গাচ্ছে, একটা মিশ্রিত কলরব কানে এসে প্রবেশ করছে; রাস্তা দিয়ে স্ত্রী পুরুষ যারা চলছে তাদের ব্যস্তভাব; গাছপালার ভিতর দিয়ে দীপালোকিত কোটাবাড়ি দেখা যাচ্ছে, খেয়াঘাটে নানাশ্রেণী লোকের ভিড়। আকাশে নিবিড় একরঙা মেঘ, সন্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে; ওপারে সারবাঁধা মহাজনী নৌকায় আলো জ্বলে উঠল, পূজাঘর থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজতে লাগল,—বাতি নিবিয়ে দিয়ে বোটের জানলায় বসে আমার মনে ভারি একটা অপূর্ব আবেগ উপস্থিত হোলো। অন্ধকারের আবরণের মধ্যে দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল। এই মেঘলা আকাশের নিচে, নিবিড় সন্ধ্যার মধ্যে, কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্য,—মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি কত শত সহস্রপ্রকারের ঘাত প্রতিঘাত। বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালো-মন্দ সমস্ত সুখদুঃখ এক হয়ে তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষানদীর দুইতীর থেকে একটি সকরুণ সুন্দর সুগম্ভীর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগল। আমার "শৈশব

সন্ধ্যা” কবিতায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম। কথাটা সংক্ষেপে এই যে, মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী, অথচ ভালোমন্দ এবং সুখদুঃখপরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন সুগভীর কলস্বরে চিরদিন চলছে ও চলবে—নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা ও স্বাতন্ত্র্য এই অবিচ্ছিন্ন সুরের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, সবসুদ্ধ খুব একটা বিস্তৃত আদিঅন্তশূন্য প্রশ্নোত্তরহীন মহাসমুদ্রের একতানশব্দের মতো অন্তরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করছে। এক এক সময়ে কোথাকার কোন্ ছিদ্র দিয়ে জগতের বড়ো বড়ো প্রবাহ হৃদয়ের মধ্যে পথ পায়—তার যে একটা ধ্বনি শোনা যায় সেটাকে কথায় তর্জমা করা অসাধ্য।

———

সাহাজাদপুরের পথে,
৭ই জুলাই, ১৮৯৪।

অদৃষ্টক্রমে এ নভেলটা নিতান্তই অপাঠ্য। কেবলমাত্র আরম্ভ করেছিলুম ব'লেই প্রাণপণে শেষ ক'রে ফেললুম। আরম্ভ করেছি ব'লেই যে শেষ করতে হবে এ কর্তব্যবোধের অর্থ বোঝা শক্ত। লোকেন যে বলে আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির একটা অহংকার আছে সেটা কতকটা ঠিক। তারা কেউ সহজে স্বীকার করতে চায় না আমরা সামান্য বা ক্ষণস্থায়ী বাধাতেই পরাভূত, এইজন্যে অনেক সময়ে তারা নিজেকে খুঁইয়ে খুঁইয়ে জাগিয়ে রাখে। আমাদের ইচ্ছাশক্তিরও একটা গর্ব আছে। সে একটা জিনিস নিয়ে আরম্ভ করেছে ব'লেই অবশেষে নিজের প্রতিকূলেও সেটা শেষ করতে চায়। সেই একগুঁয়ে অনাবশ্যক অহংকারবশত একটা বাজে বকুনিভরা অসংলগ্ন প্রকাণ্ড অপাঠ্যগ্রন্থ একটি দীর্ঘ বর্ষাদিনে বদ্ধঘরে বসে শেষ করে ফেললুম—শেষ করবার মহৎ সুখ ছাড়া আর কোনো সুখ পেলুম না।

———

সাহাজাদপুর
১০ই জুলাই, ১৮৯৪।

ভালো ক'রে ভেবে দেখলে হাসি পায় যে, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা থাকলেও ইহজীবনে দুটো মানুষে কতটুকু অংশ রেখায় রেখায় সংলগ্ন। যাকে দশ বছর জানি তাকে দশটা বছরের কত সুদীর্ঘ অংশই জানিনে; বোধ করি আজীবন সম্পর্কেরও জমাখরচ হিসাব করলেও তেমন বড়ো অঙ্ক হাতে থাকে না। সে কথা ভেবে দেখলে সবাইকেই অপরিচিত ব'লে বোধ হয়; তখন বুঝতে পারি খুব বেশি পরিচয় হবার কথা নেই, কেননা দুদিন পরে বিচ্ছিন্ন হোতেই হবে;—আমাদের পূর্বে কোটি কোটি লোক এই সূর্যালোকে নীলাকাশের নিচে জীবনের পান্থশালায় মিলেছে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে বিস্মৃত হয়ে অপসৃত হয়ে গেছে। এ রকম ভেবে দেখলে কোনো কোনো প্রকৃতিতে বৈরাগ্যের উদয় হয় কিন্তু আমার ঠিক উলটোই হয়; আমার আরো বেশি ক'রে দেখতে বেশি ক'রে জানতে ইচ্ছা করে। এই যে আমরা কয়েকজন প্রাণী জড় মহাসমুদ্রের বুদ্বুদের মতো ভেসে এক জায়গায় এসে ঠেকেছি, এই অপূর্ব সংযোগটুকুর মধ্যে যত বিস্ময় যত আনন্দ তা আবার শত যুগে গড়ে উঠবে কিনা সন্দেহ। তাই কবি বসন্ত রায় লিখছেন:—

নিমিষে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।

বাস্তবিক, মানুষের এক নিমিষের মধ্যে শত যুগেরই সংযোগ বিয়োগ তো ঘটে। এবারে চলে আসবার আগে যেদিন একদিন দুপুর বেলায় স—পার্কস্ট্রীটে এসেছিলেন, পিয়ানো বাজছিল, আমি গান গাবার উদ্যোগ করছিলুম, হঠাৎ এক সময়ে সকলের দিকে চেয়ে আমার মনে হোলো অনন্তকালের অসীম ঘটনাপরম্পরার মধ্যে এই একটুখানি আশ্চর্য ব্যাপার। মনে হোলো এর মধ্যে যেটুকু সৌন্দর্য ও আনন্দ আছে এবং এই যে খোলা জান্‌লা দিয়ে মেঘলা আকাশের আলোটুকু আসছে এ একটা অসাধারণ লাভ। প্রাত্যহিক অভ্যাসের জড়ত্ব একদিন কেন যে একটুখানি ছিঁড়ে যায় জানিনে, তখন যেন সদ্যোজাত হৃদয় দিয়ে আপনাকে, সম্মুখবর্তী দৃশ্যকে, এবং বর্তমান ঘটনাকে অনন্ত-কালের চিত্রপটের উপরে প্রতিফলিত দেখতে পাই। অভ্যাসের একটা গুণ আছে যে, চারিদিকের অনেকগুলো জিনিসকে কমিয়ে এনে হালকা ক'রে দেয়, বর্মের মতো আচ্ছন্ন ক'রে বাইরের অতিশয় সংস্পর্শ থেকে মনকে রক্ষা করে—কিন্তু সেই অভ্যাস আমার মনে তেমন ক'রে এঁটে ধরে না—পুরাতনকে বারবার নূতনের মতোই দেখি—সেই জন্যে অন্য লোকের সঙ্গে ক্রমশ আমার মনের Perspective আলাদা হয়ে যায়—ভয়ে ভয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখতে হয় কে কোন্‌খানে আছি।

শিলাইদা,

৫ই আগস্ট, ১৮৯৪।

কাল সমস্ত রাত্রি খুব অজস্রধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ ভোরে যখন উঠলুম তখনো অশ্রান্ত বৃষ্টি। এইমাত্র স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি পশ্চিমদিকে আউষধানের খেতের উপর খুব সজল শ্যামল অবনত মেঘ স্তূপে স্তূপে স্তরে স্তরে জমে রয়েছে এবং পূর্বদক্ষিণ দিকে মেঘ খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে রৌদ্র ওঠবার চেষ্টা করছে—রৌদ্রে বৃষ্টিতে খানিকক্ষণের জন্যে যেন সন্ধি হয়েছে। যেদিকে ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়ে সকালবেলাকার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বেরিয়ে আসছে সেদিকে অপার পদ্মা-দৃশ্যটি বড়ো চমৎকার হয়েছে। জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি স্নানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিঃ-প্রতিমা উদিত হয়ে নীরব মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে; আর ডাঙার উপরে কালো মেঘ স্ফীতকেশর সিংহের মতো ভ্রূকুটি ক'রে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে থাবা মেলে দিয়ে চুপ ক'রে বসে আছে—সে যেন একটি সুন্দরী দিব্যশক্তির কাছে হার মেনেছে কিন্তু এখনো পোষ মানেনি—দিগন্তের এককোণে আপনার সমস্ত রাগ এবং অভিমান গুটিয়ে নিয়ে বসে আছে। এখনি আবার বৃষ্টি হবে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; রীতিমতো শ্রাবণের বর্ষণের উপক্রম হচ্ছে। সুপ্তোত্থিত সহাস্য জ্যোতি-রশ্মি যে মুক্তদ্বারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই দ্বারটি

আবার আস্তে আস্তে রুদ্ধ হয়ে আসছে; পদ্মার ঘোলা জলরাশি ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে; নদীর একতীর থেকে আর এক তীর পর্যন্ত মেঘের সঙ্গে মেঘ আবদ্ধ হয়ে সমস্ত আকাশ অধিকার ক'রে নিয়েছে—খুব নিবিড় রকমের আয়োজনটা হয়েছে।

এতদিনে আউষধান এবং পাটের খেত শূন্যপ্রায় হয়ে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু এবারে দেবতার গতিকে খেতের সমস্ত শস্য খেতেই আন্দোলিত হচ্ছে। দেখতে ভারি সুন্দর হয়েছে। বর্ষার আকাশ সজল মেঘে স্নিগ্ধ, এবং পৃথিবী হিল্লোলিত শ্যামশস্যে কোমলা;—উপরে একটি গাঢ় রং এবং নিচেও একটি গাঢ় রঙের প্রলেপ; মাটি কোথাও অনাবৃত নয়; মাটির রংটি কেবল এই ঘোলা নদীর জলের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। পদ্মা এক একটি দেশপ্রদেশ বহন ক'রে নিয়ে চলেছে—ওর জলের মধ্যেই কত জমিদারের জমিদারী গুলিয়ে রয়েছে। পদ্মা ভীষণ কৌতুকে এক রাজার রাজ্য হরণ ক'রে আপন গেরুয়া আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে অন্য রাজার দরজায় রাতারাতি থুয়ে আসছে—শেষে প্রাতঃকালে রাজায় রাজায় লাঠালাঠি কাটাকাটি।

শিলাইদা,

৮ই আগস্ট, ১৮৯৪।

একটিমাত্র মানুষ কেবলমাত্র সামনে উপস্থিত থাকলেই প্রকৃতির অর্ধেক কথা কানে আসে না। আমি দেখেছি থেকে থেকে টুকরোটুকরো কথাবার্তা কওয়ার চেয়ে মানসিক শক্তির অপব্যয় আর কিছুতে হোতে পারে না। দিনের পর দিন যখন একটি কথা কয়ে কাটে তখন হঠাৎ টের পাওয়া যায় আমাদের চতুর্দিকই কথা কচ্চে। আজ নদীর কল-ধ্বনির প্রত্যেক তরলল-কার আমার সর্বাঙ্গে যেন কোমল আদর বর্ষণ করছে—মনটি আমার আজ অত্যন্ত নির্জন এবং সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ; মেঘমুক্ত আলোকে উজ্জ্বল শস্যহিল্লোলিত জলকল্লোলিত চতুর্দিকটার সঙ্গে মুখোমুখি বিশ্রব্ধ প্রীতি-সম্মিলনের উপযুক্ত একটি নীরব গোপনতা আমার মধ্যে স্থিরভাবে বিরাজ করছে। আমি জানি আজ সন্ধ্যার সময় যখন কেদারা টেনে বোটের ছাতের উপর একলাটি বসব তখন আমার আকাশে আমার সেই সন্ধ্যাতারাটি ঘরের লোকের মতো দেখা দেবে। আমি শীতের সময় যখন এই পদ্মাতীরে আসতুম—কাছারি থেকে ফিরতে অনেক দেরি হোত। বোট ওপারে বালির চরের কাছে বাঁধা থাকত—ছোটো জেলেডিঙি চড়ে নিস্তব্ধ নদীটি পার হতুম—তখন এই সন্ধ্যাটি সুগম্ভীর অথচ সুপ্রসন্নমুখে আমার জন্যে অপেক্ষা

ক'রে থাকত। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক। জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্বদা মৌন এবং সর্বদা গুপ্ত, সেই অংশটি আস্তে আস্তে বের হয়ে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে এবং নির্ভয়ে সঞ্চরণ ক'রে বেড়িয়েছে; —এখানকার দিনগুলো তার সেই অনেক দিনের পদচিহ্নের দ্বারা যেন অঙ্কিত।

শিলাইদা,

৯ই আগস্ট, ১৮৯৪।

নদী একেবারে কানায় কানায় ভরে এসেছে। ওপারটা প্রায় দেখা যায় না। জল এক এক জায়গায় টগবগ ক'রে ফুটছে, আবার এক এক জায়গায় কে যেন অস্থির জলকে দুই হাত দিয়ে চেপে চেপে সমান ক'রে মেলে দিয়ে যাচ্ছে। আজ দেখতে পেলুম ছোটো একটি মৃত পাখি স্রোতে ভেসে আসছে—ওর মৃত্যুর ইতিহাস বেশ বোঝা যাচ্ছে। কোনো এক গ্রামের ধারে বাগানের আম্রশাখায় ওর বাসা ছিল। সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরে এসে সঙ্গীদের নরম নরম গরম ডানাগুলির সঙ্গে পাখা মিলিয়ে শ্রান্তদেহে ঘুমিয়ে ছিল। হঠাৎ রাত্রে পদ্মা একটুখানি পাশ ফিরেছেন অমনি গাছের নিচেকার মাটি ধসে পড়ে গেছে—নীড়চ্যুত পাখি হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যে জেগে উঠল তারপরে আর তাকে জাগতে হোলো না। আমি যখন মফস্বলে থাকি তখন একটি বৃহৎ সর্বগ্রাসী রহস্যময়ী প্রকৃতির কাছে নিজের সঙ্গে অন্য জীবের প্রভেদ অকিঞ্চিৎকর ব'লে উপলব্ধি হয়। শহরে মনুষ্যসমাজ অত্যন্ত প্রধান হয়ে ওঠে—সেখানে সে নিষ্ঠুরভাবে আপনার সুখ-দুঃখের কাছে অন্য কোনো প্রাণীর সুখদুঃখ গণনার মধ্যেই আনে না। য়ুরোপেও মানুষ এত জটিল ও এত প্রধান যে তারা জন্তুকে বড়ো বেশি জন্তু মনে করে। ভারত-

বর্ষীয়েরা মানুষ থেকে জন্তু ও জন্তু থেকে মানুষ হওয়াটাকে কিছুই মনে করে না। এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে সর্বভূতে দয়াটা একটা অসম্ভব আতিশয্য ব'লে পরিত্যক্ত হয়নি। মফস্বলে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে দেহে দেহে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হোলে সেই আমার ভারতবর্ষীয় স্বভাব জেগে ওঠে। একটি পাখির সুকোমল পালকে আবৃত স্পন্দমান ক্ষুদ্র বক্ষটুকুর মধ্যে জীবনের আনন্দ যে কত প্রবল তা আমি অচেতনভাবে ভুলে থাকতে পারিনে।

শিলাইদা,
১০ই আগস্ট, ১৮৯৪।

কাল খানিকরাত্রে জলের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। নদীর মধ্যে হঠাৎ একটা তুমুল কল্লোল এবং প্রবল চঞ্চলতা উপস্থিত হয়েছে। বোধ হয় অকস্মাৎ একটা নতুন জলের স্রোত এসে পড়েছে। রোজই প্রায় এই রকম ব্যাপার ঘটছে। বসে আছি-আছি, হঠাৎ দেখতে পাই নদী ছলছল কলকল ক'রে জেগে উঠেছে, আর সবসুদ্ধ খুব একটা ধুমধাম পড়ে গেছে। বোটের তক্তার উপর পা রাখলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় তার নিচে দিয়ে কতরকমের বিচিত্রশক্তি অবিশ্রাম চলছে; খানিকটা কাঁপছে, খানিকটা টলছে, খানিকটা ফুলছে, খানিকটা আছাড় খেয়ে পড়ছে—ঠিক যেন আমি সমস্ত নদীর নাড়ির স্পন্দন অনুভব করছি। কাল অর্ধেক রাত্রে হঠাৎ একটা চঞ্চল উচ্ছ্বাস এসে নাড়ির নৃত্য অত্যন্ত বেড়ে উঠেছিল। আমি অনেকক্ষণ জানলার ধারে বেঞ্চের উপর বসে রইলুম। খুব একরকম ঝাপসা আলো ছিল—তাতে ক'রে সমস্ত উতলা নদীকে আরো যেন পাগলের মতো দেখাচ্ছিল। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ। একটা খুব জ্বলজ্বলে মস্ত তারার ছায়া দীর্ঘতর হয়ে জলের মধ্যে অনেক

দূর পর্যন্ত একটা জ্বালাময় বিদ্ধ বেদনার মতো থরথর ক'রে কাঁপছিল। নদীর দুই তীর অস্পষ্ট আলোকে এবং গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন অচেতন। মাঝখান দিয়ে একটা নিদ্রাহীন উন্মত্ত অধীরতা ভরপুরবেগে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে চলেছে। অর্ধেক রাত্রে ঐরকম দৃশ্যের মধ্যে জেগে উঠে ব'সে থাকলে আপনাকে এবং জগৎকে কী এক নতুন রকমের মনে হয়—দিনের বেলাকার লোকসংসর্গের জগৎটা মিথ্যা হয়ে যায়। আবার আজ সকালে উঠে আমার সেই গভীর রাত্রের জগৎ স্বপ্নের মতো কত দূরবর্তী এবং লঘু হয়ে গেছে। মানুষের পক্ষে দুটোই সত্য অথচ দুটোই বিষম স্বতন্ত্র। আমার মনে হয় দিনের জগৎটা য়ুরোপীয় সংগীত—সুরে বেসুরে খণ্ডে অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মনির জটলা। আর রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত—একটি বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর অমিশ্ররাগিণী। দুটোই আমাদের বিচলিত করে অথচ দুটোই পরস্পর বিরোধী। কী করা যাবে। প্রকৃতির গোড়ায় একটা দ্বিধা একটা বিরোধ আছে ;—রাজা এবং রানীর মধ্যে সমস্ত বিভক্ত। দিন এবং রাত্রি, বিচিত্র এবং অখণ্ড, পরিব্যক্ত এবং অনাদি। আমরা ভারতবর্ষীয়েরা সেই রাত্রির রাজত্বে থাকি—আমরা অখণ্ড অনাদির দ্বারা অভিভূত। আমাদের নির্জন এককের গান, য়ুরোপের সজন লোকালয়ের সংগীত। আমাদের গানে শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতিদানের সুখদুঃখের সীমা থেকে বের ক'রে নিয়ে নিখিলের মূলে যে একটি সঙ্গীহীন বৈরাগ্যের

দেশ আছে সেইখানে নিয়ে যায়—আর য়ুরোপের সংগীত মনুষ্যের সুখদুঃখের অনন্ত উত্থান-পতনের মধ্যে বিচিত্রভাবে নৃত্য করিয়ে নিয়ে চলে।

শিলাইদা
১৩ই আগস্ট, ১৮৯৪।

অহমিকার প্রভাবেই যে নিজের কথা বলতে চাই তা নয়। যেটা যথার্থ চিন্তা করব, যথার্থ অনুভব করব, যথার্থ প্রাপ্ত হব, যথার্থরূপে তাকে প্রকাশ করে তোলাই তার স্বাভাবিক পরিণাম। ভিতরকার একটা শক্তি ক্রমাগতই সেইদিকে কাজ করছে। অথচ সে শক্তিটা যে আমারই তা মনে হয় না—সে একটা জগৎব্যাপ্ত শক্তি। নিজের কাজের মাঝখানে নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত আর একটি পদার্থ এসে তারই স্বভাবমতো কাজ করে। সেই শক্তির হাতে আত্ম-সমর্পণ করাই জীবনের আনন্দ। সে যে কেবল প্রকাশ করায় তা নয়, সে অনুভব করায়, ভালবাসায়, সেইজন্যে অনুভূতি নিজের কাছে প্রত্যেকবার নূতন ও বিস্ময়জনক। নিজের শিশু কন্যাকে যখন ভালো লাগে তখন সে বিশ্বের মূল রহস্য মূল সৌন্দর্যের অনুবর্তী হয়ে পড়ে—এবং স্নেহ-উচ্ছ্বাস উপাসকের মতো হয়ে আসে। আমার বিশ্বাস আমাদের প্রীতিমাত্রই রহস্যময়ের পূজা; কেবল সেটা আমরা অচেতনভাবে করি। ভালবাসামাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বের অন্তরতম একটি শক্তির সজাগ আবির্ভাব,—যে নিত্য আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি। নইলে ওর কোনো অর্থই থাকে না। বিশ্ব-

জগতে সর্বব্যাপী আকর্ষণশক্তি যেমন—ছোটো বড়ো সর্বত্রই তার যেমন কাজ, অন্তরজগতে সেই রকম একটা বিশ্বব্যাপী আনন্দের আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণেই আমরা বিশ্বের মধ্যে সৌন্দর্য ও হৃদয়ের মধ্যে প্রেম অনুভব করি,—জগতের ভিতরকার সেই অনন্ত আনন্দের ক্রিয়া আমাদের মনের ভিতরেও কার্য করে। আমরা সেটাকে যদি বিচ্ছিন্নভাবে দেখি তবে তার যথার্থ কোনো অর্থ থাকে না। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের মধ্যে আমরা কেন আনন্দ পাই তার একটি মাত্র সদুত্তর হচ্ছে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

শিলাইদা।

১৬ই আগস্ট, ১৮৯৪।

এখন শুক্লপক্ষ কিনা—বেড়াবার সময় চমৎকার জ্যোৎস্না পাই। আমার দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ মাঠ, মাঝে মাঝে আউষ ধান, একপ্রান্ত দিয়ে একটি সংকীর্ণ মেঠো রাস্তা, সম্মুখে পূর্ব দিকে হাটের গোলাঘর, সামনে স্তূপাকার খড় জমা রয়েছে—জ্যোৎস্নায় সমস্ত ছবির মতো দেখাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলাটি আমার মাথার উপর, আমার চোখের সামনে, আমার পায়ের তলায়, আমার চতুর্দিকে এমন সুন্দর, এমন শান্তিময়, এমন মানুষটির মতো নিবিড়ভাবে আমার নিকটবর্তী হয়ে আসে যে, আকাশের নক্ষত্রলোক থেকে আর পদ্মার সুদূর ছায়াময় তীররেখা পর্যন্ত সমস্তটি একটি নিভৃত গোপন গৃহের মতো ছোটো হয়ে ঘিরে দাঁড়ায়—আমার মধ্যে যে দুটি প্রাণী আছে, বাইরের আমি এবং আমার অন্তঃপুরবাসী আত্মা এই দুটিতে মিলে সমস্ত ঘরটি দখল ক'রে ব'সে থাকি—এই দৃশ্যের মধ্যগত সমস্ত পশুপক্ষী প্রাণী আমাদের অন্তর্গত হয়ে যায়—কানে জলের কলশব্দ আসতে থাকে, মুখের উপর মাথার উপর জ্যোৎস্নার শুভ্র হস্ত আদরের স্পর্শ করতে থাকে, আকাশে চকোর পাখি ডেকে চলে যায়, জেলের নৌকো পদ্মার মাঝখানে খরস্রোতের উপর দিয়ে বিনা চেষ্টায় অনায়াসে পিছলে বহে যেতে থাকে, আকাশব্যাপী স্নিগ্ধরাত্রি

আমার রোমে রোমে প্রবেশ ক'রে ধীরে ধীরে উত্তাপ জুড়িয়ে দেয়—চোখ বুজে কান পেতে দেহ প্রসারিত ক'রে প্রকৃতির একমাত্র যত্নের জিনিসের মতো পড়ে থাকি, তার সহস্র সহচরী আমার সেবা করে। মনের কল্পনাও তার দুটি হস্তে থালা সাজিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়—মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে তার কোমল অঙ্গুলির স্পর্শ আমার চুলের মধ্যে অনুভব করি।

শিলাইদা

১৯শে আগস্ট, ১৮৯৪।

এবারে আমার সঙ্গে আমি রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী এনেছি। তাতে গুটি তিনেক সংস্কৃত বেদান্তগ্রন্থ ও তার অনুবাদ আছে। তার থেকে আমার অনেক সাহায্য হয়েছে। বেদান্তপাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদিকারণ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় হয়ে থাকেন কিন্তু আমার সংশয় দূর হয় না। এক হিসাবে অন্য অনেক মত অপেক্ষা বেদান্তমত সরল। সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা কথাটা শুনতে সহজ কিন্তু অমন সমস্যা আর নেই। বেদান্ত তারি একেবারে গর্ড্যন-গ্রন্থি ছেদন ক'রে বসে আছেন—সমস্যাটাকে একেবারে আধখানা ছেঁটেই ফেলেছেন। সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরাও নেই, আছেন কেবল ব্রহ্ম, আর মনে হচ্ছে যেন আমরা আছি। আশ্চর্য এই মানুষ মনে একথা স্থান দিতে পারে, আরও আশ্চর্য এই কথাটা শুনতে যত অসংগত আসলে তা নয়—বস্তুত কিছুই যে আছে সেইটে প্রমাণ করাই শক্ত। যাই হোক আজকাল সন্ধ্যাবেলায় যখন জ্যোৎস্না ওঠে এবং আমি যখন অর্ধনিমীলিত চোখে বোটের বাইরে কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি, স্নিগ্ধ সমীরণ আমার চিন্তাক্লান্ত তপ্ত ললাট স্পর্শ করতে থাকে তখন এই জলস্থল আকাশ, এই নদী-কল্লোল, ডাঙার উপর দিয়ে কদাচিৎ একআধজন পথিক ও

জলের উপর দিয়ে কদাচিৎ একআধখানা জেলেডিঙির গতায়াত, জ্যোৎস্নালোকে অপরিস্ফুট মাঠের প্রান্ত, দূরে অন্ধকারজড়িত বনবেষ্টিত সুপ্তপ্রায় গ্রাম, সমস্তই ছায়ারই মতো মায়ারই মতো বোধ হয় অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশি সত্য হয়ে জীবন মনকে জড়িয়ে ধরে, এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মুক্তি এ কথা কিছুতেই মনে হয় না। দার্শনিক বলতে পারেন, জগৎটাকে সত্য জ্ঞান করাতে দিনের বেলায় যে একটা দৃঢ় বন্ধনজাল থাকে সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত ছায়াময় ও সৌন্দর্যময় হয়ে আসাতে সেই বন্ধন অনেকটা পরিমাণে শিথিল হয়ে আসে। যখন জগৎটাকে একেবারে নিছক মায়া ব'লেই নিশ্চয় জানব তখনি মুক্তির বাধা থাকবে না। এ কথাটা আমি অতি ঈ—ষৎ অনুমান এবং অনুভব করতে পারি—হয়তো কোন্-দিন দেখব বৃদ্ধবয়সের পূর্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে বসে আছি।

কুষ্টিয়ার পথে,
২৪শে আগস্ট, ১৮৯৪।

পদ্মাকে এখন খুব জাঁকালো দেখতে হয়েছে—একেবারে বুক ফুলিয়ে চলেছে—ওপারটা একটিমাত্র কাজলের নীল-রেখার মতো দেখা যায়। আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তাহলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ পশুর মধ্যে যে চলাচল তাতে খানিকটা চলা খানিকটা না চলা, কিন্তু নদীর আগা-গোড়াই চলছে; সেই জন্যে আমাদের মনের সঙ্গে আমাদের চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমাদের শরীর আংশিকভাবে পদচালনা করে, অঙ্গচালনা করে, আমাদের মনটার আগাগোড়াই চলেছে। সেই জন্যে এই ভাদ্রমাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়—সে মনের ইচ্ছার মতো ভাঙছে চুরছে এবং চলেছে,—মনের ইচ্ছার মতো সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসংগীতে নানাপ্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের ইচ্ছার মতো, আর বিচিত্র শস্যশালিনী স্থির ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মতো।

আমাদের বোট ছেড়ে দিয়েছে। তীরটা এখন বামে

পড়েছে। খুব নিবিড় প্রচুর সরস সবুজের উপর খুব ঘননীল সজল মেঘরাশি মাতৃস্নেহের মতো অবনত হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে গুরুগুরু মেঘ ডাকছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষার যমুনা বর্ণনা মনে পড়ে। প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দঝংকার এনে দেয়। তার প্রধান কারণ এই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়—এর মধ্যে একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে—এর মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন। বৈষ্ণব পদাবলীর মর্মের ভিতর যে প্রবেশ করেছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে সে বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।

সাহাজাদপুর,

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

অনেককাল বোটের মধ্যে বাস ক'রে হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়িতে এসে উত্তীর্ণ হোলে বড়ো ভালো লাগে। বড়ো বড়ো জানলা দরজা—চারিদিক থেকে আলো বাতাস আসছে—যে দিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই গাছের সবুজ ডালপালা চোখে পড়ে এবং পাখির ডাক শুনতে পাই; দক্ষিণের বারান্দায় কেবলমাত্র কামিনীফুলের গন্ধে মস্তিষ্কের সমস্ত রন্ধ্র পূর্ণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ বুঝতে পারি এতদিন বৃহৎ আকাশের জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষুধা ছিল সেটা এখানে এসে পেট ভরে পূর্ণ ক'রে নেওয়া গেল। আমি চারিটি বৃহৎ ঘরের একলা মালিক—সমস্ত দরজাগুলি খুলে বসে থাকি। এখানে যেমন আমার মনে লেখবার ভাব ও ইচ্ছা আসে এমন কোথাও না। বাইরের জগতের একটা সজীব প্রভাব ঘরে অবাধে প্রবেশ করে, আলোতে আকাশে বাতাসে শব্দে গন্ধে সবুজ হিল্লোলে এবং আমার মনের নেশায় মিশিয়ে কত গল্পের ছাঁচ তৈরি হয়ে ওঠে। বিশেষত এখানকার দুপুরবেলাকার মধ্যে একটা নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখিদের, বিশেষত, কাকের ডাক, এবং সুন্দর সুদীর্ঘ অবসর—সবসুদ্ধ আমাকে উদাস ক'রে দেয়। কেন জানিনে, মনে হয়, এই রকম সোনালি

রৌদ্রে ভরা দুপুরবেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে—অর্থাৎ সেই পারস্য এবং আরব্য দেশ, দামাস্ক, সমর্‌কন্দ, বুখারা—আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, শিরাজের মদ,—মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার পথিক, ঘনখেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছজলের উৎস,—নগরের মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সংকীর্ণ বাজারের পথ, পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড়-পরা দোকানী খর্মুজ এবং মেওয়া বিক্রি করছে; পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, জানলার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিংখাব বিছানো; জরির চটি, ফুলো পায়জামা এবং রঙিন কাঁচলি পরা আমিনা জোবেদি সুফি, পাশে পায়ের কাছে কুণ্ডলায়িত গুড়গুড়ির নল গড়াচ্ছে, দরজার কাছে জমকালো কাপড়পরা কালো হাব্‌ষি পাহারা দিচ্ছে, এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে, এই ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে, মানুষের হাসি কান্না আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কত শতসহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে। আমার এই সাজাদপুরের দুপুরবেলা গল্পের দুপুরবেলা। মনে আছে ঠিক এই সময়ে এই টেবিলে ব'সে আপনার মনে ভোর হয়ে পোস্টমাস্টার গল্পটা লিখেছিলুম। আমিও লিখছিলুম এবং আমার চারিদিকের আলো বাতাস ও তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ ক'রে দিচ্ছিল। এই রকম চতুর্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে নিজের মনের মতো একটা কিছু রচনা ক'রে যাওয়ার যে সুখ তেমন সুখ জগতে খুব অল্পই আছে।

আজ সকালে ব'সে "ছড়া" সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম—বড়ো ভালো লাগছিল। ছড়ার রাজ্যে আইনকানুন নেই, মেঘরাজ্যের মতো। দুর্ভাগ্যক্রমে যে রাজ্যেই থাকি আইন কানুনের বৈষয়িক রাজ্যকে বাধা দেবার জো নেই; আমার লেখার মাঝখানে তারই একটা উপদ্রব উপস্থিত হোলো—আমার মেঘের ইমারৎ উড়িয়ে দিলে। এই সব ব্যাপারে আহারের সময় এসে পড়ল। দুপুরবেলায় পেট ভ'রে খাওয়ার মতো এমন জড়ত্বজনক আর কিছুই নেই। আমরা বাঙালিরা কসে মধ্যাহ্নভোজন করি ব'লেই মধ্যাহ্ন-টাকে হারাই। দরজা বন্ধ ক'রে তামাক খেতে খেতে পান চিবতে চিবতে পরিতৃপ্ত নিদ্রার আয়োজন হোতে থাকে, তাতেই আমরা বেশ চিক্‌চিকে গোলগাল হয়ে উঠি। অথচ বাংলাদেশের বৈচিত্র্যহীন সুদূর প্রসারিত সমতল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে জনহীন শ্রান্ত মধ্যাহ্ন যেমন গভীরভাবে বৃহৎ ভাবে বিস্তীর্ণ হোতে পারে এমন আর কোথাও না।

পতিসর,

১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

ভাদ্রমাসের দিন বাতাস বেশি নেই; বোটের শিথিল পাল ঝুলে ঝুলে পড়ছে—নৌকাটি আলস্যমন্থরগমনে অত্যন্ত উদাসীনের মতো চলেছে। এই শৈবালবিকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ জলরাজ্যের মধ্যে শরতের উজ্জ্বল রৌদ্রে আমি জানালার কাছে এক চৌকিতে বসে আর এক চৌকির উপরে পা দিয়ে সমস্ত বেলা কেবল গুন গুন ক'রে গান করছি। রামকেলী প্রভৃতি সকালবেলাকার সুরের একটু আভাস লাগাবামাত্র এমন একটি বিশ্বব্যাপী করুণা বিগলিত হয়ে চারিদিককে বাষ্পাকুল করছে যে এই সমস্ত রাগিণীকে সমস্ত আকাশের সমস্ত পৃথিবীর নিজের গান ব'লে মনে হচ্ছে। এ একটা ইন্দ্রজাল, একটা মায়ামন্ত্র। আমার এই গুন গুন গুঞ্জরিত সুরের সঙ্গে কত টুকরো টুকরো কথা যে আমি জুড়ি তার সংখ্যা নেই! এমন এক লাইনের গান সমস্তদিন কত জমছে এবং কত বিসর্জন দিচ্ছি। এই চৌকিটাতে বসে আকাশ থেকে সোনালি রোদ্দুরটুকু চোখ দিয়ে চাখতে চাখতে এবং জলের উপরকার শৈবালের সরস কোমলতার উপর মনটাকে বুলিয়ে চলতে চলতে যতটুকু অনায়াস আলস্যভরে আপনি মাথায় এসে পড়ে তার বেশি চেষ্টা করা আপাতত আমার সাধ্যাতীত। আজ সমস্ত সকাল নিতান্ত সাদাসিধা রাম-

কেলীতে যে গোটা দুই তিন ছত্র বারবার আবৃত্তি করেছিলুম সেটুকু মনে আছে—নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত ক'রে দিলুম ঃ—

ওগো তুমি নবনবরূপে এসো প্রাণে।—(আমার নিত্যনব)
এসো গন্ধেবরনেগানে।
আমি যেদিকে নিরখি তুমি এসোহে
আমার মুগ্ধমুদিত নয়ানে।

———

দিঘাপতিয়া জলপথে,
২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

বড়ো বড়ো গাছ জলের মধ্যে সমস্ত গুঁড়িটি ডুবিয়ে দিয়ে শাখাপ্রশাখা জলের উপর অবনত ক'রে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আম গাছ বটগাছের অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর নৌকা বাঁধা, এবং তারি মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গ্রামের লোকেরা স্নান করছে। এক একটি কুঁড়েঘর স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তার চারপাশের প্রাঙ্গণ জলমগ্ন। ধানের খেতের ভিতর দিয়ে বোট সরসর শব্দে যেতে যেতে হঠাৎ কোনো জলাশয়ের মধ্যে গিয়ে পড়ে—সেখানে নালবনের মধ্যে সাদা সাদা নালফুল ফুটে আছে—পানকৌড়ি জলের ভিতর ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরছে। জল যেখানে সুবিধা পাচ্ছে প্রবেশ করছে—স্থলের এমন পরাভব আর কোথাও দেখা যায় না। আর একটু জল বাড়লেই ঘরের ভিতর জল প্রবেশ করবে, তখন মাচা বেঁধে তার উপর বাস করতে হবে; গোরুগুলো দিনরাত এক হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে; রাজ্যের সাপ জলমগ্ন গর্ত ত্যাগ ক'রে ঘরে আশ্রয় নেবে এবং যেখানকার যত গৃহ-হীন কীটপতঙ্গ সরীসৃপ মানুষের সহবাস গ্রহণ করবে। যখন গ্রামের চারিদিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতালতাগুলো পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারিদিকে ভেসে বেড়ায়, পাট পচানির গন্ধে বাতাস ভারা-

ক্রান্ত, উলঙ্গ পেটমোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলে-মেয়েরা যেখানে সেখানে জলেকাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে—মশার ঝাঁক স্থির জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়; গৃহের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম ক'রে যায় তখন সে দৃশ্য কোনোমতেই ভালো লাগে না। ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরছে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না—এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য, দারিদ্র্য, মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়। সকল রকম শক্তির কাছেই আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। প্রকৃতি উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা উপদ্রব করে তাও সই, শাস্ত্র চিরদিন ধরে যে সকল উপদ্রব ক'রে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না।

বোয়ালিয়ার পথে,

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

যখন ভেবে দেখি এ জীবনে কেবলমাত্র ৩২টি শরৎকাল এসেছে এবং গেছে তখন ভারি আশ্চর্য বোধ হয়। অথচ মনে হয় আমার স্মৃতিপথ ক্রমশই অস্পষ্টতর হয়ে অনাদি-কালের দিকে চলে গেছে এবং এই বৃহৎ মানসরাজ্যের উপর যখন মেঘমুক্ত সুন্দর প্রভাতের রৌদ্রটি এসে পড়ে তখনি আমি যেন আমার এক মায়াঅট্টালিকার বাতায়নে বসে এক সুদূর বিস্তৃত ভাবরাজ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি এবং আমার কপালে যে বাতাসটি এসে লাগতে থাকে সে যেন অতীতের সমস্ত অস্পষ্ট মৃদু গন্ধপ্রবাহ বহন ক'রে আনতে থাকে। আমি আলো ও বাতাস এত ভালবাসি। গেটে মরবার সময় বলেছিলেন—More light—আমার যদি সে সময়ে কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তো আমি বলি More light and more space। অনেকে বাংলা দেশকে সমতলভূমি ব'লে আপত্তি প্রকাশ করে—কিন্তু সেই জন্যেই এ দেশের মাঠের দৃশ্য নদীতীরের দৃশ্য আমার এত বেশি ভালো লাগে। যখন সন্ধ্যার আলোক এবং সন্ধ্যার শান্তি উপর থেকে নামতে থাকে তখন সমস্ত অনবরুদ্ধ আকাশটি একটি নীলকান্তমণির পেয়ালার মতো আগাগোড়া

পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে ; যখন স্তিমিত শান্ত নীরব মধ্যাহ্ন তার সমস্ত সোনার আঁচলটি বিছিয়ে দেয় তখন কোথাও সে বাধা পায় না—চেয়ে চেয়ে দেখবার এবং দেখে দেখে মনটা ভরে নেবার এমন জায়গা আর কোথায় আছে ।

বোয়ালিয়া,

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

আমি অনেক সময় ভেবে দেখেছি সুখী হলুম কি দুঃখী হলুম সেইটে আমার পক্ষে শেষ কথা নয়। আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখদুঃখের ভিতরে নিজের একটা প্রসার অনুভব করতে থাকে। আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরজীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে মাত্র কিন্তু দুটো এক নয় এ আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করি। আমাদের ক্ষণিক জীবনই সুখ-দুঃখ ভোগ করে, আমাদের চিরজীবন সেই সুখ দুঃখ নেয় না, তার থেকে একটা তেজ সঞ্চয় করে। গাছের পাতা, প্রতিদিন রৌদ্রে প্রসারিত হয়ে শুষ্ক হয়ে ঝরে যাচ্ছে, আবার নতুন পাতা গজাচ্ছে; গাছের ক্ষণিক জীবন কেবল রৌদ্র ভোগ করছে এবং সেই উত্তাপেই শুকিয়ে পড়ে যাচ্ছে, আর গাছের চিরজীবন তার ভিতর থেকে দাহহীন চির অগ্নি সঞ্চয় করছে। আমাদেরও প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের পল্লব-রাশি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়ে জগতের সমস্ত প্রবহমান সুখ দুঃখ ভোগ করছে এবং সেই সুখ দুঃখের উত্তাপেই শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের চিরজীবনকে সেই প্রতিমুহূর্তের দাহ স্পর্শ করতে পারছে না, অথচ তার তেজটুকু সে ক্রমাগতই গ্রহণ করছে। যে মানুষের প্রতিমুহূর্তের সুখদুঃখ-ভোগশক্তি সামান্য, তার

দাহও অল্প, তেমনি তার চিরপ্রাণের সঞ্চয়ও অকিঞ্চিৎকর। সুখদুঃখের তাপ থেকে সংরক্ষিত হয়ে তাদের ক্ষণিক জীবনটা অনেকদিন স্থির থাকে, তারা অচেতনতার আবরণে ক্ষণিককে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ক'রে রাখে; দুদিনকে এমনি তাজা রেখে দেয় যে হঠাৎ মনে হয় তা চিরদিনের; সংসারের সামান্য ব্যাপারকে এমনি ক'রে তোলে যেন তা অসামান্য।

বোয়ালিয়া,

২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

আমরা যখন খুব বড়ো রকমের একটা আত্মবিসর্জন করি তখন কেন করি। একটা মহৎ বৃহৎ আবেগে আমাদের ক্ষণিক জীবনটা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার সুখদুঃখ আমাদের আর স্পর্শ করতে পারে না। আমরা হঠাৎ দেখতে পাই আমরা আমাদের সুখদুঃখের চেয়ে বড়ো, আমরা প্রতিদিনের তুচ্ছ বন্ধন থেকে মুক্ত। সুখের চেষ্টা এবং দুঃখের পরিহার, এই আমাদের ক্ষণিকজীবনের প্রধান নিয়ম কিন্তু এক একটা সময় আসে যখন আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে, আমাদের ভিতরে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে সে নিয়ম খাটে না। তখন আমরা আমাদের ক্ষণিক জীবনটাকে পরাভূত করেই একটা আনন্দ পাই, দুঃখকে গলার হার ক'রে নিয়েই মনে উল্লাস জন্মায়। তখন মনে হয় অন্তরের সেই স্বাধীন পুরুষের বলেই সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে চিরকাল আমি আমার প্রকৃতির সফলতা সাধন করব। কিন্তু আবার চারিদিকের সংসারের জনতা, প্রতিদিনের ক্ষুধা তৃষ্ণা, প্রবল হয়ে উঠে সেই অন্তরতম স্বাধীনতার ক্ষেত্রটিকে আমাদের চোখ থেকে ঢেকে ফেলে, তখন আত্মবিসর্জন সুকঠিন হয়ে ওঠে। আমি যখন একলা মফস্বলে থাকি তখন প্রকৃতির ভিতরকার আনন্দ আমার অন্তরের আনন্দ-

নিকেতনের দ্বার খুলে দেয়; গানের সুরের দ্বারা গানের কথাগুলো যেমন অমরতা প্রাপ্ত হয় তেমনি প্রাত্যহিক সংসারটা অন্তরের চিরানন্দরাগিণীর দ্বারা চিরমহিমা লাভ করে; আমাদের সমস্ত স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধ একটি বিনম্র ধর্মোপাসনার ভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে,—দুঃখবেদনার দুঃখত্ব যে চলে যায় তা নয় কিন্তু সে যেন আমার নিজত্বের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম ক'রে এমন সুবৃহৎ আকাশে ব্যাপ্ত হয় যে সেখানে সে একটা সৌন্দর্য বিকিরণ করতে থাকে। এবার বোটে থাকতে আমি অন্তর্যামী নামক একটি কবিতা লিখেছি তাতে আমি আমার অন্তরজীবনের কথা অনেকটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।

———

কলিকাতা,

৫ই অক্টোবর, ১৮৯৪।

আজ সকালের বাতাসে অতি ঈষৎ শীতের সঞ্চার হয়েছে, একটুখানি শিউরে ওঠার মতো। কাল দুর্গোৎসব; আজ তার সুন্দর সূচনা। ঘরে ঘরে দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দ প্রবাহিত হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে আমার ধর্মসংস্কারের বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। পর্শুদিন স—র বাড়ি যাবার সময় দেখেছিলুম রাস্তার দুধারে প্রায় বড়ো বড়ো বাড়ির দালানমাত্রেই প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। দেখে আমার মনে হোলো, দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই হঠাৎ দিনকয়েকের জন্যে ছেলেমানুষ হয়ে উঠে' একটা বড়ো গোছের খেলায় লেগে গেছে। ভেবে দেখতে গেলে আনন্দের আয়োজনমাত্রেই পুতুলখেলা—অর্থাৎ তাতে আনন্দ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই—বাইরে থেকে দেখে মনে হয় সময় নষ্ট। কিন্তু সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে একটা ভাবের আন্দোলন এনে দেয় তা কি কখনো নিষ্ফল হোতে পারে। সমাজের মধ্যে কত লোক আছে যারা নীরস বিষয়ী-লোক—এই উৎসবে তাদেরও মন একটা সর্বব্যাপী ভাবের টানে বিচলিত হয়ে সকলের সঙ্গে মিলে যায়। এমনি ক'রে প্রতি বৎসর কিছুকালের জন্যে মনের এমন একটি অনুকূল আর্দ্র অবস্থা আসে যাতে স্নেহ প্রীতি

দয়া সহজে অঙ্কুরিত হোতে পারে; আগমনী বিজয়ার গান, প্রিয়সম্মিলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা সমস্তটা মিলে মনের মধ্যে আনন্দকাব্য রচনা করে। ছেলেদের যে আনন্দ সেইটেই বিশুদ্ধ আনন্দের আদর্শ। তারা তুচ্ছ উপলক্ষ্যকে নিয়ে নিজের মন দিয়ে ভরে তোলে, সামান্য কদাকার পুতুল নিয়ে তাকে নিজের ভাব দিয়ে সুন্দর ও প্রাণ দিয়ে সজীব ক'রে তোলে। এই ক্ষমতাটা যে লোক বড়ো বয়স পর্যন্ত রাখতে পারে সেইতো ভাবুক। তার কাছে চারিদিকের বস্তু কেবল বস্তু নয়—কেবল দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর নয় কিন্তু ভাবগোচর—তার সমস্ত সংকীর্ণতা এবং অসংকীর্ণতা যে একটি সংগীতের দ্বারা পূর্ণ ক'রে নেয়। দেশের সমস্ত লোক ভাবুক হোতে পারে না কিন্তু এই রকম উৎসবের সময় ভাবস্রোত অধিকাংশ লোকের মনকে অধিকার করে। তখন, যেটাকে দূরে থেকে সামান্য পুতুল ব'লে মনে হয়, কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে তার সে মূর্তি থাকে না।

কলিকাতা,
৭ই অক্টোবর, ১৮৯৪।

আমাদের যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে কেবল নিজের ইচ্ছা অনুসারে দিতে পারিনে। সে আমাদের আয়ত্তের অতীত, তা আমাদের দান বিক্রয়ের ক্ষমতা নেই। মূল্য নিয়ে বিক্রি করতে চেষ্টা করলেই তার উপরকার আবরণটি কেবল পাওয়া যায়, আসল জিনিসটি হাত থেকে সরে যায়। নিজের যা সর্বোৎকৃষ্ট, ক'জনই বা তা নিজে ধরতে বা পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে। আমরা দৈবক্রমে প্রকাশিত হই, ইচ্ছা করলে চেষ্টা করলে প্রকাশিত হোতে পারিনে। চব্বিশ ঘণ্টা যাদের কাছে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। কারো কারো এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, যে অন্যের ভিতরকার সত্যটিকেও সে অত্যন্ত সহজেই টেনে নিতে পারে। সে তার নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে অন্তরের কথা তার চিঠিতে প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে এই বুঝতে হবে যে যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারো একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে।

———

বোলপুর,

১৯শে অক্টোবর, ১৮৯৪।

কাল কেবল বিছানায় উপুড় হয়ে প'ড়ে একখানি ছোটো কবিতা লিখেছি এবং একটি তিব্বত ভ্রমণের বই পড়েছি। এরকম জায়গায় নভেল আমি ছুঁতে পারিনে। এই জনশূন্য মাঠের মধ্যে, শালবনের বেষ্টনে, সমস্ত দরজা খোলা জাজিম-পাতা দোতলার একলা ঘরে, পাখিদের করুণধ্বনিপূর্ণ স্বপ্নাবেশ-ময় শরৎমধ্যাহ্নে বিলাতি-নভেল কোনোমতেই খাপ খায় না। ভ্রমণবৃত্তান্তের একটা মস্ত সুবিধা এই যে তার মধ্যে অবিশ্রাম গতি আছে অথচ প্লটের বন্ধন নেই—মনের একটি অবারিত স্বাধীনতা পাওয়া যায়। এখানকার জনহীন মাঠের মাঝখান দিয়ে একটি রাঙা রাস্তা চলে গেছে; সেই রাস্তা দিয়ে যখন দুইচার জন লোক কিংবা দুটো একটা গোরুর গাড়ি মন্থর গমনে চলতে থাকে তার বড়ো একটা টান আছে;—মাঠ তাতে আরো যেন ধূ ধূ ক'রে ওঠে; মনে হয় এই মানুষগুলো যে কোথায় যাচ্ছে তার যেন কোনো ঠিকানা নেই। ভ্রমণ বৃত্তান্তের বইও আমার এই মানসিক নিরালার মধ্যে সেই রকম একটি গতিপ্রবাহের ক্ষীণ রেখা অঙ্কিত ক'রে দিয়ে চলে যেতে থাকে—তাতে ক'রে আমার মনের সুবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধ নির্জন আকাশটি আরো যেন বেশি ক'রে অনুভব করতে পারি।

বোলপুর,

২৮শে অক্টোবর, ১৮৯৪।

এখনো আটটা বাজেনি তবু মনে হচ্ছে যেন অর্ধরাত্রি। কলকাতার বাড়িতে এখন কে কী করছে কিছুই জানিনে। পৃথিবীতে আমরা যাদের জানি সবাইকেই ফুটকি লাইনে জানি—অর্থাৎ মাঝে মাঝে অনেকখানি ফাঁক—সেই ফাঁক-গুলো নিজের মনে যেমন তেমন ক'রে ভরিয়ে নিতে হয়। যাদের মনে করি সব চেয়ে ভালো জানি তাদেরও পরিচয়ের সঙ্গে বহুল পরিমাণে নিজের কল্পনা মিশিয়ে নিতে হয়। কত জায়গায় ঐক্যধারা ছিন্ন হয়, পথচিহ্ন লুপ্ত হয়, অনিশ্চিত অস্পষ্ট অন্ধকার থেকে যায়। সুপরিচিত লোকও যদি কল্পনার সূত্রে গাঁথা ছিন্ন অংশমাত্র হয় তাহলে কার সঙ্গে কিসের সঙ্গেই বা আমার পরিচয় আছে—আমাকেই বা অবিচ্ছিন্ন রেখায় কে জানে। কিন্তু হয়তো বিচ্ছিন্ন ব'লেই, হয়তো তাদের মধ্যে কল্পনাযোজনার স্থান আছে ব'লেই তারা আমাদের যথার্থ অন্তরঙ্গ। নইলে অপরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-হিসাবে বোধ হয় সকলেই অন্তর্যামী ছাড়া আর সকলের কাছেই দুষ্প্রাপ্য। আমরা নিজেকেও অংশ-অংশ ক'রে জানি—কল্পনা দিয়ে পুরিয়ে নিয়ে একটা স্বরচিত গল্পের নায়ক ক'রে নিই মাত্র। খণ্ড উপকরণ নিয়ে আমরা নিজেকে নিজে সৃষ্টি ক'রে তুলব ব'লেই বিধাতা এই বিচ্ছেদগুলি রেখে দিয়েছেন।

বোলপুর,

৩১শে অক্টোবর, ১৮৯৪।

প্রথম শীতের আরম্ভে সমস্ত দিন ধরে যে একটা উত্তুরে বাতাস দিতে থাকে সেইটে আজ সকাল থেকে শুরু হয়েছে। বাতাসটা হীহী করতে করতে আসছে আমার আমলকি তরু-শ্রেণীর পাতাগুলি হলদে হয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। এখানকার বনরাজ্যের মধ্যে যেন খাজনা আদায়ের পেয়াদা এসেছে—সমস্ত কাঁপছে, ঝরছে এবং দীর্ঘনিশ্বাসে আকুলিত হয়ে উঠছে। দুপুরবেলাকার রৌদ্রক্লান্ত বিশ্রামপূর্ণ বৈরাগ্যে, ঘন আম্রশাখায় ঘুঘুর অবিশ্রামকূজনে এই ছায়ালোকখচিত স্বপ্নাতুর প্রহরগুলোকে যেন বিরহবিধুর ক'রে তুলছে। আমার টেবিলের উপরকার ঘড়ির শব্দটাও এই মধ্যাহ্নের সুরের সঙ্গে যেন তাল রেখে চলেছে, ঘরের ভিতরে সমস্ত দুপুরবেলাটা কাঠবিড়ালীর ছুটাছুটি চলছে। ফুলো ল্যাজ, কালো এবং ধূসর রেখায় অঙ্কিত রোমশ নরম গা, ছোটো দুটি কালো ফোঁটার মতো দুটি চঞ্চল চোখ, নিতান্তই নিরীহ অথচ অত্যন্ত কেজো লোকের মতো ব্যস্ত ভাবটা দেখে আমার বেশ মজা লাগে। এই ঘরের কোণে লোহার জাল দেওয়া আলমারিতে ডাল চাল প্রভৃতি আহার্য সামগ্রী এই সমস্ত লোভীদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়—ঔৎসুক্যব্যগ্র নাসিকাটি নিয়ে তারা

সারাদিন এই আলমারিটার চারিদিকে ছিদ্র খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দু চারটা কণা যা আলমারির বাইরে বিক্ষিপ্ত থাকে সেইগুলিকে সন্ধান ক'রে নিয়ে সামনের গুটিকয়েক ছোটো তীক্ষ্ণ দন্ত দিয়ে কুটকুট ক'রে ভারি তৃপ্তির সঙ্গে তারা আহার করে; মাঝে মাঝে লেজের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে ব'সে সামনের দুটি হাত জোড় ক'রে সেই শস্যকণাগুলিকে মুখের মধ্যে গুছিয়ে গাছিয়ে দ্রুত ক'রে নিতে থাকে,—এমন সময় আমি একটুখানি নড়েছি কি অমনি চকিতের মধ্যে লেজটি পিঠের উপর তুলে দিয়ে দে-দৌড়। যেতে যেতে হঠাৎ একবার অর্ধপথে পাপোষটার উপর থেমে একটা পা তুলে ফস্ ক'রে একটা কান চুলকে নিয়ে আবার এসে উপস্থিত— এমনি সমস্ত বেলাই কুটকাট দুড়দুড় এবং তৈজসপত্রের মধ্যে টুংটাং ঝুনঝুন চলছেই।

———

কলিকাতা,

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

ছেলেবেলা থেকে ঐ ফেরিওয়ালার হাঁকগুলো আমাকে কেমন একটু বিচলিত করে,—নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় চিলের তীক্ষ্ণ ডাকটাও আমাকে যেন উদাস ক'রে দিত। অনেকদিন সেই ডাকটা আমার কানে আসেনি। আজকাল যে চিল ডাকে না তা নয়—আমারই এখন চিন্তা বেশি কাজও ঢের; প্রকৃতির সঙ্গে আর আমার সে রকম ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। এখন সময় ফেলে রাখা চলে না; যদি বা মনের গতিকে কোনো বিশেষ কাজ করতে প্রবৃত্তি না হয় তবু একটা কাজের চেষ্টা করতে হয়, নিদেন অন্যমনস্কভাবেও একটা বই পড়বার ভান না করলে মন সুস্থ থাকে না।—এটা কিন্তু কলকাতায়। মফস্বলে গেলে চুপ ক'রে চেয়ে থাকলেও হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, কাজের অন্ধ দাসত্ব করতে হয় না। কর্তব্য কাজের বিরুদ্ধে কিছু বলতেই সাহস করিনে কিন্তু যখন উপস্থিত কোনো কাজ নেই কিংবা ভালো ক'রে সম্পন্ন করবার শক্তি নেই তখনো কেবল অভ্যাসবশত বা সময় যাপনের তাগিদে যদি কাজ খুঁজে বেড়াতে হয়, তখনো যদি আপনাকে নিয়ে আপনি শান্তি না পাওয়া যায়, তাহলে অবস্থাটা খারাপ হয়েছে বলতে হবে। কাজ একটা উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়মাত্র; মানুষ তো কাজের যন্ত্র নয়, পরিপূর্ণ

তৃপ্তির সঙ্গে বিরামলাভ করবার শক্তিটা একেবারে হারানো তো কিছু নয়, কেননা তার মধ্যেও মনুষ্যত্বের একটা উচ্চ অধিকার আছে। দিন ও রাত্রি কাজ ও বিরামের উপমা। দিনের বেলায় পৃথিবী ছাড়া আর আমাদের কিছুই নেই, রাত্রে পৃথিবীটাই কম, অনন্ত জ্যোতিষ্ক-জগৎটাই বেশি। তেমনি কাজের দিনে যুক্তিতর্কের আলোকে পৃথিবীটাকেই খুব স্পষ্ট ক'রে চোখের সামনে রাখা চাই—কিন্তু যখন বিশ্রামের সন্ধ্যা তখন পৃথিবীটাকে হ্রাস ক'রে দেওয়াই দরকার, তখন বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে বিরাট যোগ আছে সেইটেকেই বড়ো ক'রে দেখা চাই। সকালবেলায় উঠে জানা চাই আমরা পৃথিবীর মানুষ, দিন অবসান হয়ে এলে অনুভব করা চাই আমরা জগৎবাসী।

শিলাইদা,

২৮শে নবেম্বর, ১৮৯৪।

দিগন্তের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বালির চর ধূ ধূ করছে—তাতে না আছে ঘাস, না আছে গাছ, না আছে বাড়িঘর, না আছে কিছু। আকাশের শূন্যতা সমুদ্রের শূন্যতা আমাদের চিরাভ্যস্ত, তার কাছে আমরা আর কিছু দাবি করিনে,—কিন্তু ভূমির শূন্যতাকে সব চেয়ে বেশি শূন্য ব'লে মনে হয়। কোথাও গতি নেই, জীবন নেই, বৈচিত্র্য নেই; যেখানে ফলে শস্যে তৃণে পশুপক্ষীতে ভরে যেতে পারত সেখানে একটি কুশের অঙ্কুর পর্যন্ত নেই,—কেবল একটা উদাস কঠিন নিরবচ্ছিন্ন বৈধব্যের বন্ধ্যাদশা। ঠিক পাশ দিয়ে পদ্মা চলে যাচ্ছে, ওপারে ঘাটে, বাঁধা নৌকা, স্নানরত লোকজন, নারকেল এবং আমের বাগান, অপরাহ্ণে নদীর ধারের হাটে কলধ্বনি—দূরে পাবনার পারে তরুশ্রেণীর ঘননীল রেখা—কোথাও গাঢ়নীল, কোথাও পাণ্ডুনীল, কোথাও সবুজ, কোথাও মাটির ধূসরতা—আর তারই মাঝখানে এই রক্তশূন্য মৃত্যুর মতো ফ্যাকাসে সাদা। সন্ধ্যাবেলা সূর্যাস্তের সময় এই চরের উপর আর কিছুই নেই, কেউ নেই, কেবল আমি একলা।

শিলাইদা,

৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪।

শুক্লসন্ধ্যার চরে যখন একলা বেড়াই, খানিকবাদে শ— প্রায় আসে। কালও সে এসেছিল। কাজকর্মের কথা কওয়ার পরে যেই একটু চুপ করেছি অমনি হঠাৎ দেখলুম অনন্ত জগৎ সেই সন্ধ্যার আকাশে নীরবে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। কানের কাছে একটি মানুষের তুচ্ছ কথায় এই অসীম আকাশ-ভরা একটি আবির্ভাব আবৃত হয়ে গিয়েছিল। যেই মানুষ চুপ করলে অমনি দেখতে দেখতে নিস্তব্ধ নক্ষত্রলোক হতে শান্তি নেমে এসে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ ক'রে তুললে ;—যে সভার মধ্যে অনন্তকোটি জ্যোতিষ্ক নীরবে সমাগত আমিও সেই সভার একপ্রান্তে স্থান পেলুম। অস্তিত্ব নামক এক মহাশ্চর্য ব্যাপারের মধ্যে ওরা এবং আমি এক আসন পেয়েছি।

সকাল সকাল বেড়াতে বেরই। যতক্ষণ না শ—আসে ততক্ষণ মনটাকে শান্তশীতল ক'রে নিই। তারপরে হঠাৎ শ—এসে যখন জিজ্ঞাসা করে, আজ দুধ খেয়ে কেমন ছিলেন, কিংবা আজ কি মাসকাবারি হিসাব দেখা শেষ হয়ে গেছে তখন বড়ো খাপছাড়া শুনতে হয়। আমরা নিত্য এবং অনিত্যের ঠিক এমন মাঝখানে পড়ে দুই দিকের ধাক্কা খেয়ে চলে যেতে থাকি। যখন আধ্যাত্মিক কথা হচ্ছে তখন

গায়ের কাপড় এবং পেটের খিদের কথা আনলে ভারি অসংগত শুনতে হয়, অথচ আত্মা এবং পেটের খিদে চিরকাল একত্রেই যাপন ক'রে এল। যেখানটাতে জ্যোৎস্নালোক পড়ছে সেইখানেই আমার জমিদারি,—অথচ জ্যোৎস্না বলছে তোমার জমিদারি মিথ্যা, জমিদারি বলছে তোমার জ্যোৎস্নাটা আগাগোড়াই ফাঁকি। আমি ব্যক্তি এরি ঠিক মাঝখানে।

শিলাইদা,

১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪।

এই চরগুলো এক সময়ে জলের নিচে ছিল কি না সেই-জন্যে এক এক জায়গায় অনেক দূর পর্যন্ত বালির উপর জলের ঢেউখেলানো পদচিহ্ন পড়ে গেছে। সেই সমস্ত থাকে থাকে ভাঁজ-করা বালির উপর নানারঙের চিকন আভা পড়ে ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড সাপের নানারঙা খোলসের মতো দেখাচ্ছিল। আমি মনে করলুম, পদ্মা তো একটা প্রকাণ্ড নাগিনীই বটে। সে এক সময় এই বৃহৎ চরের উপর বাস করত, এখন সেখানে কেবল তার একটা বৃহৎ খোলস সন্ধ্যার আলোয় পড়ে চিক্‌চিক্‌ করছে। বর্ষার সময় সে আপনার সহস্র ফণা তুলে ডাঙার উপর ছোবল মারতে মারতে গর্জন করতে করতে কেমন ক'রে আপনার প্রকাণ্ড বাঁকা লেজ আছড়াতে আছড়াতে ফুলতে ফুলতে চলত সেই দৃশ্যটাও মনে পড়ল। এখন সে শীতকালের সরীসৃপ বিবরের মধ্যে অর্ধপ্রবিষ্ট হয়ে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় প্রতিদিন ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে।

বেড়াতে বেড়াতে ক্রমে এত বিচিত্র রং কখন্‌ আস্তে আস্তে মিলিয়ে এল—কেবল জ্যোৎস্নার একরঙা শুভ্রতায় জলস্থল মণ্ডিত হয়ে গেল। একসময় যে পূর্বদিকে দিনের উদয় হয়েছিল জগতে কোথাও তার আর কোনো স্মৃতি-চিহ্নই রইল না।

শিলাইদা,

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫।

ইচ্ছা করছে শীতটা ঘুচে গিয়ে প্রাণ খুলে বসন্তের বাতাস দেয়—আচকানের বোতামগুলো খুলে একবার খোলা জালিবোটের উপর পা ছড়িয়ে দিই এবং কর্তব্যের রাস্তা ছেড়ে দিনকতক সম্পূর্ণ অকেজো কাজে মন দিই। বছরের ছমাস আমি এবং ছমাস আর কেউ যদি সাধনার সম্পাদক থাকে তাহলেই ঠিক সুবিধামতো বন্দোবস্ত হয়। কারণ, সংবৎসর খ্যাপামি করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই এবং সংবৎসর অপ্রমত্ততা বজায় রেখে চলা আমার মতো লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। এত বড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দুমাস অন্তর ঋতুপরিবর্তন হচ্ছে—আর আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য বারোমাস সমভাবে ভদ্রতা-রক্ষা ক'রে চলি কী ক'রে। মানুষের মহা মুশকিল এই, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সমাজের আইন অনুসারে তাকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন একভাবেই চলতে হয়। আসলে নিজের মধ্যে যে একটা চিরনূতন চিররহস্য আছে সেটাকে সলজ্জে সভয়ে গোপন ক'রে নিজেকে সর্বসাধারণের কাছে নিতান্ত চিরাভ্যস্ত রুটিন-চালিত যন্ত্রটির মতো দেখাতে হবে। সেই জন্যে থেকে থেকে মানুষ বিগড়ে যায়, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; সেই জন্যে অবাধে আপনাকে উপলব্ধি করতে শিল্প-সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়। সেইজন্যে সাহিত্য

দস্তুরের আঁচলধরা হোলে নিজের উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে। সেই-জন্যে বৈঠকখানা ঘরে শিষ্টালাপে যে সব কথা চলে না সাহিত্যে সেগুলি গভীরতা ও উদারতা লাভ ক'রে অসংকোচে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। এই জন্যই ড্রয়িং রুমের চা-পান সভার সুসভ্য সীমার মধ্যে সাহিত্যকে বদ্ধ করতে গেলে বিরাট বিশ্ব-প্রকৃতিকে ছিটের গাউন পরানোর মতো হয়।

শিলাইদহ

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫।

অদৃষ্টের পরিহাসবশত, ফাল্গুনের এক মধ্যাহ্নে এই নির্জন অবসরে এই নিস্তরঙ্গ পদ্মার উপরে এই নিভৃত নৌকার মধ্যে ব'সে, সমুখে সোনার রৌদ্র এবং সুনীল আকাশ নিয়ে আমাকে একখানা বই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হোতে হচ্ছে। সে বইও কেউ পড়বে না সে সমালোচনাও কেউ মনে রাখবে না মাঝের থেকে এমন দিনটা মাটি করতে হবে। জীবনে এমন দিন কটাই বা আসে। অধিকাংশ দিনই ভাঙাচোরা জোড়াতাড়া; আজকের দিনটি যেন নদীর উপরে সোনার পদ্মফুলের মতো ফুটে উঠেছে, আমার মনটিকে তার মর্মকোষের মধ্যে টেনে নিচ্ছে। আবার হয়েছে কী, একটা হলদে-কোমরবন্ধ পরা স্নিগ্ধ বেগনিরঙের মস্ত ভ্রমর আমার বোটের চারদিকে গুঞ্জনসহকারে চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে। বসন্তকালে ভ্রমরগুঞ্জনে বিরহিণীর বিরহ-বেদনা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এ কথাটাকে আমি বরাবর পরিহাস ক'রে এসেছি, কিন্তু ভ্রমরগুঞ্জনের মর্মটা আমি একদিন দুপুরবেলা বোলপুরে প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম। সেদিন নিষ্কর্মার মতো দক্ষিণের বারান্দায় বেড়াচ্ছিলুম—মধ্যাহ্নটা মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল, গাছের নিবিড় পল্লবগুলির মধ্যে স্তব্ধতা যেন রাশীকৃত হয়ে উঠেছিল। সেই সময়টায় বারান্দার নিকট-

বর্তী একটা মুকুলিত নিমগাছের কাছে ভ্রমরের অলসগুঞ্জন সমস্ত উদাস মধ্যাহ্নের একটা সুর বেঁধে দিচ্ছিল। সেইদিন বেশ বোঝা গেল মধ্যাহ্নের সমস্ত পাঁচমিশালি শ্রান্তসুরের মূল সুরটা হচ্ছে ঐ ভ্রমরের গুঞ্জন—তাতে বিরহিণীর মনটা যে হঠাৎ হাহা ক'রে উঠবে তাতে আশ্চর্য কিছুই নেই। আসল কথাটা হচ্ছে, ঘরের মধ্যে যদি খামখা একটা ভ্রমর এসে প'ড়েই ভোঁভোঁ করতে শুরু করে এবং ক্ষণে ক্ষণে শাসির কাঁচে মাথা ঠুকতে থাকে তবে তাতে ক'রে তার নিজের ছাড়া আর কারো কোনো প্রকার ব্যথা লাগবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ঠিক জায়গাটিতে সে ঠিক সুরই দেয়। আজকের আমার এই সোনার মেখলাপরা ভ্রমরটিও ঠিক সুরটি লাগিয়েছে। নিশ্চয়ই বোধ হচ্ছে কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করছে না—কিন্তু কেন যে আমার নৌকার চারপাশে ঘুরঘুর ক'রে মরছে আমি তো বুঝতে পারছিনে—নিরপেক্ষ বিচারক-মাত্রই তো বলবে আমি শকুন্তলা বা সে জাতীয় কেউ নই।

শিলাইদা
২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪।

সাধনার জন্যে লিখতে লিখতে অন্যমনস্ক হয়ে যাই; নৌকা চলে যায় মুখ তুলে দেখি, খেয়া পারাপার করে তাই দেখতে দেখতে সময় কাটে। ডাঙায় আমার বোটের খুব কাছে মন্থরগতি মোষগুলো তাদের বড়ো বড়ো মুখ তৃণগুল্মের মধ্যে পুরে' দিয়ে সেগুলো নেড়েচেড়ে নিয়ে ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ফেলে কচকচ শব্দ করতে করতে খেতে খেতে ল্যাজের ঝাপটায় পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে চলতে থাকে,—তার পর একটা অতি দুর্বল উলঙ্গপ্রায় মনুষ্যশাবক এসে এই প্রশান্তপ্রকৃতির প্রকাণ্ড জন্তুটার পিঠে পাঁচনির গুঁতো মেরে হঠ্ হঠ্ শব্দ করতে থাকে, জন্তুটা তার বড়ো বড়ো চোখে এক একবার এই ক্ষীণ মানবকটির প্রতি কটাক্ষপাত ক'রে পথের মধ্যে দুই এক গ্রাস ঘাসপাতা ছিঁড়ে নিয়ে অব্যাকুল-চিত্তে মৃদুমন্দগমনে খানিকটা দূর সরে যায়—আর ছেলেটা মনে করে তার রাখালি কর্তব্য সমাধা হোলো। আমি রাখাল-বালকদের মনস্তত্ত্বের এ রহস্যটা এ পর্যন্ত ভেদ ক'রে উঠতে পারলুম না। গোরু কিংবা মোষ যেখানে নিজে ইচ্ছাপূর্বক তৃপ্তভাবে আহার করছে, অকারণে উৎপাত ক'রে সেখান থেকে তাড়িয়ে আর খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ঠিক জানিনে। পোষমানা সবল প্রাণীদের উপর

অনাবশ্যক উৎপীড়ন ক'রে প্রভুগর্ব অনুভব করা বোধ করি মানুষের স্বভাব। ঘন সরস তৃণগুল্মের মধ্যে মোষের এই চ'রে খাওয়া আমার দেখতে বড়ো ভালো লাগে। কী কথা বলতে কী কথা উঠল। আমি বলতে যাচ্ছিলুম আজকাল অতি সামান্য কারণেই আমার সাধনার তপোভঙ্গ হচ্ছে। পূর্বপত্রে বলেছি কদিন ধরে গোটাকয়েক ভ্রমর আমার বোটের ভিতরে বাইরে অত্যন্ত চঞ্চলভাবে ব্যর্থগুঞ্জনে ও বৃথা অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছে—রোজই বেলা নটা দশটার সময় তাদের দেখা যায়,—তাড়াতাড়ি একবার আমার টেবিলের কাছে ডেস্কের নিচে রঙিন শাসির উপরে আমার মাথার চারি ধারে ঘুরে আবার হূস ক'রে বেরিয়ে চলে যায়। আমি অনায়াসে মনে করতে পারি লোকান্তর থেকে কোনো অতৃপ্ত প্রেতাত্মা রোজ সেই একই সময়ে ভ্রমর আকারে একবার ক'রে আমাকে দেখে শুনে প্রদক্ষিণ ক'রে যাচ্ছে। কিন্তু আমি তা মনে করিনে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওটা সত্যকার ভ্রমর, মধুপ, সংস্কৃতভাষায় যাকে কখনো কখনো বলে দ্বিরেফ।

শিলাইদা,

১৬ই ফাল্গুন, ১৮৯৫।

নিজের সেই সুগভীর স্বপ্নাবিষ্ট বাল্যকালের উদ্ভ্রান্ত কল্পনার কথা মনে পড়ছে—খুব বেশি দিনের কথা ব'লে তো মনে হচ্ছে না—অথচ এবারকার মানবজন্মের অর্ধেক দিন তো চলে গেছেই। আমরা প্রত্যেক মুহূর্ত মাড়িয়ে মাড়িয়ে জীবনটা সম্পূর্ণ করি কিন্তু মোটের উপরে সবটা খুবই ছোটো; দুটি ঘণ্টা কালের নির্জন চিন্তার মধ্যে সমস্তটাকে ধারণ করা যেতে পারে। শেলি ত্রিশটা বছর প্রতিদিন সহস্র কাজে সহস্র প্রয়াসে জীবন ধারণ ক'রে দুটিমাত্র ভলুম জীবন-চরিতের সৃষ্টি করেছেন; তার মধ্যেও ডাউডেন সাহেবের বাজে বকুনি বিস্তর আছে। আমার জীবনে ত্রিশটা বছরে বোধ করি একখানা ভলুমও পোরে না। এই তো ব্যাপার, এইটুকু মাত্র কাণ্ড, কিন্তু এরই কত আয়োজন কত দুশ্চেষ্টা। এইটুকুর রসদ জোগাবার জন্যে কত ব্যবসা, কত জমিদারি, কত লোকজন। আছি তো এই দেড় হাত চৌকিতে চুপটি ক'রে ব'সে কিন্তু কত রকমে পৃথিবীর কত জায়গাই জুড়ে আছি,—সেই সমস্ত বাদসাদ পড়ে কেবল বাকি থাকে দুটি ঘণ্টার চিন্তা—তাও বেশি দিনের জন্যে নয়। আজকের আমার এই একলা বোটের দুপুরবেলাকার মনের ভাব, এই

একটা দিনের কুঁড়েমি সেই কয়েকখানা পাতার মধ্যে কোথায় বিলুপ্ত হয়ে থাকবে। এই নিস্তরঙ্গ পদ্মাতীরের নিস্তব্ধ বালুচরের উপরকার নির্জন মধ্যাহ্নটি আমার অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের মধ্যে কি কোথাও একটি অতি ক্ষুদ্র সোনালি রেখার চিহ্ন রেখে দেবে।

শিলাইদা

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫।

আজ আমি এক অনামিকা চিঠি পেয়েছি—তার আরম্ভেই আছে—

পরের পায়ে ধরে প্রাণদান করা
সকল দানের সার।

আমাকে লেখক কখনো দেখেনি; আমার সাধনার লেখা থেকে পরিচয়। লিখেছে:—"তোমার সাধনায় রবিকর পড়িয়াছে, তাই রবি-উপাসক যত ক্ষুদ্র যত দূরে থাকুক তবুও তার জন্যও আজি রবিকর বিকীর্ণ হইতেছে। তুমি জগতের কবি, তবুও সে ভাবিতেছে আজি তুমি তাহারো কবি।" ইত্যাদি। মানুষ প্রীতিদানের জন্য এত ব্যাকুল যে শেষকালে নিজের আইডিয়াকেই ভালবাসতে থাকে। আইডিয়াকে রিয়ালিটির চেয়ে কম সত্য কেন মনে করি। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা পাচ্ছি সেটা বস্তুত যে কী তারই ঠিকানা মিলছে না, আর আইডিয়া দিয়ে যেটা পাই সেই মনের সৃষ্টির প্রকৃত সত্তার প্রতিই বা কেন তার চেয়ে বেশি অনাস্থা করতে যাব। মানুষমাত্রের মধ্যেই একটি আইডিয়াল মানুষ আছে তাকে কেবলমাত্র ভক্তি প্রীতি স্নেহের দ্বারা খানিকটা নাগাল পাওয়া যায়। প্রত্যেক ছেলের মধ্যে যে একটি বৃহৎ আইডিয়াল আছে সে কেবল ছেলের মা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করে,

অন্য ছেলের মধ্যে সেই অনির্বচনীয়টিকে দেখতে পায় না। মা তার ছেলেকে যা মনে ক'রে প্রাণ দেয় সেইটেই কি মায়া আর যা মনে ক'রে আমরা দিতে পারিনে সেইটেই সত্য? প্রত্যেক মানুষই অনন্ত যত্নের ধন, তার মধ্যে সৌন্দর্যের সীমা নেই। কী কথা থেকে কী কথা উঠল। আসল কথাটা হচ্ছে, এক হিসাবে আমি আমার ভক্তটির প্রীতি-উপহার গ্রহণের যোগ্য নই—অর্থাৎ যদি সে আমাকে আমার প্রত্যহের আবরণের মধ্যে দেখত তাহলে এরকম প্রীতি অনুভব করতেই পারত না,—আর এক হিসাবে আমিও এই পরিমাণে, এমন কি, এর চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে প্রীতি পাবার অধিকারী।

শিলাইদা,
৬ই মার্চ, ১৮৯৫।

সৌন্দর্যের চর্চা ও সুবিধার চর্চা এর মধ্যে কোন্‌টাকে প্রাধান্য দিতে হবে তর্কটা যদি এই হয় তবে ছাতা মাথায় দিয়ে ঘোড়ায় চড়ার দৃষ্টান্তটা সে তর্কের মধ্যে ঠিক পড়ে না। কেননা ঘোড়ায় চড়ে ছাতা মাথায় দিলে সেটা যে অসুন্দর হোতেই হবে তা নয়, ওদিকে তাতে ঘোড়া চালাবার অসুবিধাও ঘটতে পারে। আসলে ওটা অসংগত। অসুবিধা, অসৌন্দর্য এবং অসংগতি এই তিনটেকেই আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে—কিন্তু বোধ হয় শেষটাকেই সব চেয়ে বেশি। মেয়েদের মতো শাড়ি পরলে যদি কোনো পুরুষকে সুন্দর দেখতেও হয় তবু সে অদ্ভুত কাজে না যাওয়াই ভালো। সে সম্বন্ধে লজ্জাটা স্বাভাবিক লজ্জা। নিজেকে বেশি ক'রে লোকের চোখে ফেলতে একটা স্বভাবতই সংকোচ হওয়া উচিত কেননা যথার্থ ভদ্রতার স্বভাবই হচ্ছে অপ্রগল্‌ভ। যেমন নিজের সম্বন্ধে সর্বদা অতিমাত্র সচেতন থাকাটা কিছু নয় তেমনি পরের চেতনার উপর নিজেকে প্রবলবেগে আছড়ে ফেলতে বিশেষ একটা অপ্রবৃত্তি থাকাই উচিত। অবশ্য এর একটা সীমা আছে, কিন্তু সে সীমা অনেক দূরে। যখন কোনো প্রচলিত প্রথাকে আমি অন্যায় বা অনিষ্টকর মনে করি তখন সে বিষয়ে সাধারণকে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হোলে চলবে না।

কিন্তু সেই উচ্চ লক্ষ্যটা থাকা চাই। আমাদের দেশে যে মেয়েরা প্রথম জুতা পায়ে এবং ছাতা মাথায় দিয়েছেন নিশ্চয়ই তাঁরা লোকের বিদ্রূপ-চোখেই পড়েছেন—তাই ব'লে এখানে লোকব্যবহারকে খাতির করা চলে না। কিন্তু মোটের উপর, সাধারণ মানুষের মতো চলার সুবিধা এই যে তাতে অন্য লোকেরও চলার সুবিধা হয়। ছোটোখাটো সুবিধা অসুবিধার জন্যও যদি সাধারণের অভ্যাস ও সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ ক'রে চলতে হয় তাহলে সেটা ঠিক মশা মারতে কামান পাতার মতোই অদ্ভুত হয়ে পড়ে,—সেই অদ্ভুত অসংগতির মধ্যে যে হাস্যকরতা ও বিরক্তিজনকতা আছে তাকে অতিক্রম করবার উপযুক্ত কোনো উচ্চ অভিপ্রায় তার মধ্যে পাওয়া যায় না।

শিলাইদা,
৮ই মার্চ, ১৮৯৫।

পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, তার মধ্যে সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে যতটা লাভ করি, চিঠিপত্র দ্বারা তার চেয়ে আরো একটা বেশি কিছু পেয়ে থাকি। চিঠিপত্রে যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি তা নয়, ওর মধ্যে আরও একটু রস আছে যা প্রত্যক্ষ দেখাশোনায় নেই। মানুষ মুখের কথায় আপনাকে যতখানি ও যে রকম ক'রে প্রকাশ করে লেখার কথায় ঠিক ততখানি করে না। আবার লেখায় যতখানি করে মুখের কথায় ততখানি করতে পারে না। এই কারণে, চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরো একটা যেন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয় যারা চিরকাল অবিচ্ছেদে চব্বিশ ঘণ্টা কাছাকাছি আছে, যাদের মধ্যে চিঠি-লেখালেখির অবসর ঘটেনি তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণ ক'রেই জানে। যেমন বাছুর কাছে এলে গোরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ

বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয়, অন্য উপায়ে হবার জো নেই। এই চার পৃষ্ঠা চিঠি মনের ঠিক যে-রস দোহন করতে পারে, কথা কিংবা প্রবন্ধে কখনোই তা পারে না। আমার বোধ হয় ঐ লেফাফার মধ্যে একটি সুন্দর মোহ আছে—লেফাফাটি চিঠির প্রধান অঙ্গ—ওটা একটা মস্ত আবিষ্কার।

কলিকাতা

৯ই এপ্রিল, ১৮৯৫।

ঢং ঢং ক'রে দশটা বাজল। চৈত্র মাসের দশটা নিতান্ত কম বেলা নয়। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠেছে, কাকগুলো কেন যে এত ডাকাডাকি করছে জানিনে, লকেট কমলালেবু এবং কাঁচামিঠে আমওয়ালা চুপড়ি মাথায় উচ্চস্বরে সুর ক'রে আমাদের দেউড়ির কাছ দিয়ে ডেকে যাচ্ছে।

ইচ্ছা করছে কোনো একটা বিদেশে যেতে—বেশ একটি ছবির মতো দেশ—পাহাড় আছে, ঝরনা আছে, পাথরের গায়ে খুব ঘন শৈবাল হয়েছে, দূরে পাহাড়ের ঢালুর উপরে গোরু চরছে, আকাশের নীল রংটি খুব স্নিগ্ধ এবং সুগভীর, পাখি পতঙ্গ পল্লব এবং জলধারার একটা বিচিত্র মৃদু শব্দমিশ্র উঠে মস্তিষ্কের মধ্যে ধীরে ধীরে তরঙ্গাভিঘাত করছে। দূর হোকগে ছাই, আজ আর কিছুতে হাত না দিয়ে দক্ষিণের ঘরে একলাটি হাত পা ছড়িয়ে একটা কোনো ভ্রমণবৃত্তান্তের বই নিয়ে পড়ব মনে করছি—বেশ অনেকগুলো ছবিওয়ালা নতুন-পাতকাটা বই। আলোচনা করবার মতো, মনের উন্নতি সাধন করবার মতো বই পৃথিবীতে অসংখ্য আছে কিন্তু কুঁড়েমি করবার মতো বই ভারি কম; সেই রকম বই লিখতে

অসামান্য ক্ষমতার দরকার। অবকাশের অবকাশত্ব কিছুমাত্র নষ্ট করবে না বরং তাকে রঙিন ও রসালো ক'রে তুলবে, অথচ তাকে মন দিয়ে পড়বারও খোরাক দেবে এই দুই দিক বাঁচিয়ে লেখা শক্ত। স্টীলপেনে লিখে মনের উপর দাগ কেটে দিয়ে যাবে না, পালকের কলমে লিখে লেখাটা মনের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে এমন পুষ্পকরথের সারথী পাওয়া যায় কোথায়।

কলিকাতা
২৪শে এপ্রিল, ১৮৯৫।

এদিকে দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসে গুরগুর ক'রে মেঘ ডাকতে লাগল, এবং মাঝে মাঝে প্রবল বাতাসে দক্ষিণের বাগানের ছোটোবড়ো সমস্ত গাছ-গুলো হুসহাস ক'রে নিশ্বাস ফেলতে লাগল। মধ্যাহ্নটি স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে চারিদিক ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। মনের ভিতরটা একটা অকারণ চঞ্চলতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল—তার হাতে যে কাজটাই দিই সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল।

মনের গতিক আকাশের গতিকের মতো,—কিছুই বলা যায় না। মাসের মধ্যে উনত্রিশ দিন সে ছোটোখাটো উপস্থিত কাজ নিয়ে বেশ চালিয়ে দেয়, কোনো গোল করে না,—হঠাৎ ত্রিশ দিনের দিন সে-সমস্ত কাজে সে পদাঘাত করতে থাকে—বলে আমাকে এমন একটা কিছু দাও যা খুব মস্ত, যাতে আমার সমস্ত দিনরাত্রি, সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ একেবারে গ্রাস ক'রে ফেলতে পারে। তখন হাতের কাছে কোথায় বা কী পাওয়া যায়—কেবল ঘরে ঘরে বারান্দায় বারান্দায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকি। কতকগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন খণ্ডবিখণ্ড দস্তুরবাঁধা কাগজের মধ্যে মনটা যখন লাফ দিয়ে দিয়ে বেড়ায় তখনি তার সুস্থ অবস্থা বলি, আর যখন

সে একটা প্রবল আবেগ একটা বৃহৎ কর্মের মধ্যে একটা অহংবিস্মৃত ঐক্য লাভ করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তখন তাকে বলি পাগলামি। কিন্তু আমি তো মনে করি মানুষের যথার্থ স্বাভাবিক অবস্থাই হচ্ছে সেই একটি প্রবল নিষ্ঠার মধ্যে সমস্ত জীবনটাকে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ করবার ইচ্ছা। এই জন্যেই প্রতিদিন সমাজের মধ্যে থেকে এক একদিন মনে হয়—"আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।"

সাজাদপুর,
২৮ জুন, ১৮৯৫।

বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি—খুব একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু ক'রে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে-সকল দৃশ্য লোক ও ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারিদিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের খেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্যে সজীব ক'রে তুলছে। কিন্তু পাঠকেরা এর অর্ধেক জিনিসও পাবে না। তারা কেবল কাটা শস্যই পায় কিন্তু শস্যক্ষেত্রের আকাশ বাতাস, শিশির এবং শ্যামলতা সমস্তই বাদ পড়ে যায়। আমার গল্পের সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধরৌদ্ররঞ্জিত ছোটো নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া, এবং গ্রামের শান্তিটি এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম তাহলে সবাই তার সত্যটুকু একেবারে সমগ্রভাবে একমুহূর্তে বুঝে নিতে পারত। অনেকটা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়, সবটা পাঠককে দেওয়া যায় না। যা নিজের আছে তাও পরকে দেবার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে সম্পূর্ণ দেননি।

সাজাদপুর,
২রা জুলাই, ১৮৯৫।

কাজ করতে করতে কোনো একদিকে মুখ ফেরালেই দেখতে পাই নীল আকাশের সঙ্গে মিশ্রিত সবুজ পৃথিবীর একটা অংশ একেবারে আমাদের ঘরের লাগাও হাজির— যেন প্রকৃতিসুন্দরী কুতূহলী পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মতো আমার জানলা দরজার কাছে উঁকি মারছে; আমার ঘরের এবং মনের, আমার কাজের এবং অবসরের চারিদিকে নবীন ও সুন্দর হয়ে আছে। এই বর্ষণমুক্ত আকাশের আলোকে এই গ্রাম এবং জলের রেখা, এপার এবং ওপার, খোলা মাঠ এবং ভাঙা রাস্তা একটা স্বর্গীয় কবিতায় এপলোদেবের স্বর্ণবীণাধ্বনিতে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি! আকাশ আমার সাকি, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা উপুড় ক'রে ধরেছে—সোনার আলো মদের মতো আমার সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান ক'রে দিচ্ছে। যেখানে আমার এই সাকির মুখ প্রসন্ন এবং উন্মুক্ত যেখানে আমার এই সোনার মদ সব চেয়ে সোনালি ও স্বচ্ছ সেইখানে আমি কবি, সেইখানে আমি রাজা, সেইখানে আমার সঙ্গে বরাবর ঐ সুনীল নির্মল জ্যোতির্ময় অসীমতার এই রকম প্রত্যক্ষ অব্যবহিত যোগ থাকবে।

পাবনা পথে,
৯ জুলাই, ১৮৯৫।

এই আঁকাবাঁকা ইছামতী নদীর ভিতর দিয়ে চলেছি। এই ছোটো খামখেয়ালী বর্ষাকালের নদীটি, এই যে দুইধারে সবুজ ঢালুঘাট, দীর্ঘ ঘন কাশবন, পাটের খেত, আখের খেত আর সারিসারি গ্রাম—এ যেন একই কবিতার কয়েকটা লাইন, আমি বারবার আবৃত্তি ক'রে যাচ্ছি এবং বারবারই ভালো লাগছে। পদ্মার মতো বড়ো নদী এতই বড়ো যে সে যেন ঠিক মুখস্থ ক'রে নেওয়া যায় না—আর এই কেবল ক'টি বর্ষামাসের দ্বারা অক্ষরগোনা ছোটো বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ ক'রে আমার হয়ে যাচ্ছে।

পদ্মানদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ কিন্তু ইছামতী মানুষ-ঘেঁসা নদী ;—তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের কর্মপ্রবাহের স্রোত মিশে যাচ্ছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী। স্নানের সময় মেয়েরা যে সমস্ত গল্পগুজব নিয়ে আসে সেগুলি এই নদীটির হাস্যময় কলধ্বনির সঙ্গে একসুরে মিলে যায়। আশ্বিন মাসে মেনকার ঘরের পার্বতী যেমন কৈলাস শিখর ছেড়ে একবার তাঁর বাপের বাড়ি দেখে শুনে যান ইছামতী তেমনি সংবৎসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েকমাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির

তত্ত্ব নিতে আসে। তারপরে ঘাটে ঘাটে মেয়েদের কাছে প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত নূতন খবর শুনে নিয়ে, তাদের সঙ্গে মাখামাখি সখীত্ব ক'রে আবার চলে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আকাশ মেঘে অন্ধকার; গুরুগুরু মেঘ ডাকছে, এবং ঝোড়ো হাওয়ায় তীরের বনঝাউগুলো দুলে উঠছে। বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঘন কালীর মতো অন্ধকার এবং জলের উপর গোধূলির একটা বিবর্ণ ধূসর আলো পড়ে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মতো দেখতে হয়েছে। আমি ক্ষীণালোকে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে চিঠি লিখছি—উচ্ছৃঙ্খল বাতাসে টেবিলের সমস্ত কাগজ পত্র উড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলবার উপক্রম করছে। ছোটো নদীটির উপরে ঘনবর্ষার সমারোহের মধ্যে একটি চিঠি লিখতে ইচ্ছা করছে—মেঘলা গোধূলিতে নিরালা ঘরে মৃদুমন্দস্বরে গল্প ক'রে যাবার মতো চিঠি। কিন্তু এটা একটা ইচ্ছামাত্র। মনের এই রকম সহজ ইচ্ছাগুলিই দুঃসাধ্য। সেগুলি হয় আপনি পূর্ণ হয়, নয় কিছুতে পূর্ণ হয় না—তাই অনেক সময় যুদ্ধ জমানো সহজ, গল্প জমানো সহজ নয়।

শিলাইদা,
১৪ই আগস্ট, ১৮৯৫।

যত বিচিত্র রকমের কাজ হাতে নিচ্ছি ততই কাজ জিনিস-টার পরে আমার শ্রদ্ধা বাড়ছে। কর্ম যে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ সেটা কেবল পুঁথির উপদেশরূপেই জানতুম। এখন জীবনেই অনুভব করছি কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা; কাজের মধ্য দিয়েই জিনিস চিনি, মানুষ চিনি, বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে মুখামুখি পরিচয় ঘটে। দেশদেশান্তরের লোক যেখানে বহুদূরে থেকেও মিলেছে সেইখানে আজ আমি নেমেছি; মানুষের পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ এই একটা প্রয়োজনের চিরসম্বন্ধ, কর্মের এই সুদূরপ্রসারিত ঔদার্য আমার প্রত্যক্ষ-গোচর হয়েছে। কাজের একটা মাহাত্ম্য এই যে কাজের খাতিরে নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে অবজ্ঞা ক'রে যথোচিত সংক্ষিপ্ত ক'রে চলতে হয়। মনে আছে সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরি ক'রে আসাতে আমি রাগ করেছিলুম; সে এসে তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি ক'রে ঈষৎ অবরুদ্ধকণ্ঠে বললে কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে। এই ব'লে ঝাড়নটি কাঁধে ক'রে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোঁছ করতে গেল। কঠিন কর্মক্ষেত্রে মর্মান্তিক শোকেরও অবসর নেই। অবসরটা নিয়েই বা ফল কী। কর্ম যদি মানুষকে বৃথা অনুশোচনার

বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে সম্মুখের পথে প্রবাহিত ক'রে নিয়ে যেতে পারে তবে ভালোই তো। যা হবার নয় সে তো চুকেছে, যা হোতে পারে তা হাতের কাছে প্রস্তুত। যে মেয়ে মরে গেছে তার জন্যে শোক ছাড়া আর কিছুই করতে পারিনে— যে ছেলে বেঁচে আছে তার জন্যে ছোটো বড়ো সব কাজই তাকিয়ে আছে। কাজের সংসারের দিকে চেয়ে দেখি—কেউ চাকরি করছে, কেউ ব্যবসা করছে, কেউ চাষ করছে, কেউ মজুরি করছে—অথবা এই প্রকাণ্ড কর্মক্ষেত্রের ঠিক নিচে দিয়েই প্রত্যহ কত মৃত্যু কত দুঃখ গোপনে অন্তঃশীলা বহে যাচ্ছে, তার আবরু নষ্ট হোতে পারছে না—যদি সে অসংযত হয়ে বেরিয়ে আসত তাহলে কর্মচক্র একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত। ব্যক্তিগত শোকদুঃখটা নিচে দিয়ে ছোটে আর উপরে অত্যন্ত কঠিন পাথরের ব্রিজ বাঁধা—সেই ব্রিজের উপর দিয়ে লক্ষলোকপূর্ণ কর্মের রেলগাড়ি আপন লৌহপথে হুহুঃ শব্দে চলে যায়, নির্দিষ্ট স্টেশনটি ছাড়া আর কোথাও কারো খাতিরে মুহূর্তের জন্যে থামে না। কর্মের এই নিষ্ঠুরতায় মানুষের কঠোর সান্ত্বনা।

শিলাইদা,

৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫।

একটা ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আসন্ন হওয়াতেই আজকের এই নিভৃত নিস্তব্ধ উপভোগটি মনের মধ্যে এমন নিবিড়তর হয়ে এসেছে। যেন আমার কাছে আমার এই অভিমানিনী প্রবাসসঙ্গিনী করুণ অনিমেষ নেত্রে বিদায় নিতে এসেছে; আমাকে যেন বলছে, কিসের তোমার ঘরকরনা, এবং আত্মীয়-তার বন্ধন—আমি যে তোমার চিরদিনের সাধনা, তোমার সহস্র জন্মপূর্বের প্রিয়তমা,অনন্ত জীবনের অসংখ্য খণ্ড পরিচয়ের মধ্যে তোমার একমাত্র চিরপরিচিতা। কিন্তু বর্তমানের কর্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সংসারে এ সব কথা অলীক শোনাবে। তা হোক, এই শরতের অপর্যাপ্ত শান্তির মধ্যে আমার আত্মাকে স্তরে স্তরে সিক্ত ক'রে নেওয়া আমার পক্ষে কম ব্যাপার নয়। এ জীবনে আমার যা-কিছু গভীরতম তৃপ্তি ও প্রীতি সে কেবল এই রকম নির্জন সুন্দর মুহূর্তে পুঞ্জীভূতভাবে আমার কাছে ধরা দেয়। আমার জীবনের অন্তস্তলে ক্রমশই যেন একটা নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্ছে; কেবল তার আভাস পাই, যে, আমার পক্ষে সে একটা স্থায়ী নিত্য সম্বল, আমার সমস্ত জীবন-খনিজ-গলা নো খাঁটি সোনাটুকু,আমার সমস্ত দুঃখ-

কষ্টের তুষের ভিতরকার অমৃত শস্যকণা ; সেটাকে যদি কখনো পরিস্ফুট ক'রে পাই তাহলে সে আমার টাকাকড়ি খ্যাতি প্রতিপত্তি সব চেয়ে বেশি হয়—যদি সম্পূর্ণ নাও পাই তবু সেই দিকে চিত্তের অনিবার্য স্বাভাবিক প্রবাহ সেও একটা পরম লাভ।

কুষ্টিয়া,
৫ই অক্টোবর, ১৮৯৫।

কে আমাকে গভীর গম্ভীরভাবে সমস্ত জিনিস দেখতে বলছে—কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে—বাইরের সঙ্গে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম এবং প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন ক'রে তুলছে। হৃদয়ের প্রাত্যহিক পরিতৃপ্তির প্রাচুর্যে মানুষের কোনো ভালো হয় না—তাতে প্রচুর উপকরণের অপব্যয় হয়ে কেবল অল্পই সুখ উৎপন্ন করে এবং কেবল আয়োজনেই সময় কেটে গিয়ে উপভোগের অবসরমাত্র থাকে না। কিন্তু ব্রতযাপনের মতো জীবনযাপন করলে দেখা যায় অল্প সুখই প্রচুর সুখ এবং সুখই একমাত্র সুখকর নয়। চিত্তের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মননশক্তিকে যদি সচেতন রাখতে হয়—যা কিছু পাওয়া যায় তাকেই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করবার শক্তিকে যদি উজ্জ্বল রাখতে হয় তাহলে নিজেকে অতি-প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত করা চাই। Goetheর একটি কথা আমি মনে ক'রে রেখেছি সেটা শুনতে সাদাসিধা কিন্তু বড়োই গভীর—

Entbehren sollst du, sollst entbehren.

Thou must do without, must do without.

কেবল হৃদয়ের অতিভোগ নয়, বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য

জিনিসপত্রও আমাদের অসাড় ক'রে দেয়। বাইরের সমস্ত যখন বিরল তখনি নিজেকে ভালোরকমে পাই।

* * * *

আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত ক'রে তোলাই মানুষের চির জীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয় তারপরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি। যা মুখে বলছি, যা লোকের মুখে শুনে প্রত্যহ আবৃত্তি করছি তা যে আমার পক্ষে কতই মিথ্যা তা আমরা বুঝতেই পারিনে। এদিকে আমাদের জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইঁট নিয়ে গড়ে তুলছে। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে দেখি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারিনে—প্রত্যেক পদটা বানান ক'রে পড়তে হোলে যেমন সমস্ত বাক্যটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না সেই রকম। কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজন ব্যাপারের অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সর্জ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি। বুঝতে পারি যেমন গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে

একটা সৃজন চলছে—আমার সুখদুঃখ বাসনা বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করছে—এর থেকে কী যে হয়ে উঠছে তা আমরা স্পষ্ট জানিনে কারণ আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানিনে। কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনকে যখন নিজের বাহিরে নিখিলের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই—আমি আছি, আমি চলছি, আমি হয়ে উঠছি এইটেকেই একটা বিরাট ব্যাপার ব'লে বুঝতে পারি। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সমস্তই আছে—আমাকে ছেড়ে কোথাও একটি অণুপরমাণুও থাকতে পারে না; এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে এই জ্যোতির্ময় শূন্যের সঙ্গে আমার আত্মহারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যোগ; অনন্ত জগৎ-প্রাণের সঙ্গে আমার এই যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধেরই প্রত্যক্ষ ভাষা এই সমস্ত বর্ণগন্ধগীত। চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমার মনকে লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে, কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে। এই যে আমার অন্তরের সঙ্গে বাহিরের কথাবার্তা আনাগোনা আদানপ্রদান—আমার যা কিছু পাওয়া সম্ভব তা কেবলমাত্র এর থেকেই পেতে পারি, তা অল্পই হোক আর বেশিই হোক; শাস্ত্র থেকে যা পাই তা এইখানে একবার যাচাই ক'রে না নিলে তা পাওয়াই হয় না। এই আমার অন্তর বাহিরের মিলনে যা নিরন্তর ঘটে উঠছে আমার ক্ষুদ্রতা তার মধ্যে বিকার ও বাধার সঞ্চার ক'রে তাকে যেন আচ্ছন্ন না

করে—আমার জীবন যেন এই পরিপূর্ণ মিলনের অনুকূল হয়, নিখিলকে আমার মধ্যে যেন আমি বাধা না দিই। কৃত্রিম জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি একে একে উন্মুক্ত হয়ে যাক, মুগ্ধ সংস্কারের এক একটি বন্ধন কঠিন বেদনার দ্বারা একান্ত ছিন্ন হোক, নিবিড় নিভৃত অন্তরতম সান্ত্বনার মধ্যে অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত উত্তাপ একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মুক্তিলাভ করুক এবং জগতের সঙ্গে সরল সহজ সম্বন্ধের মধ্যে অনায়াসে দাঁড়িয়ে যেন বলতে পারি আমি ধন্য।

যেতুম তাহলেও সে আমার সেই ক্ষুদ্র বাতির ব্যঙ্গের কিছুমাত্র প্রতিবাদ না ক'রে নীরবেই নিলীন হয়ে যেত। যদি ইহজীবনে নিমেষের জন্যও তাকে না দেখতে পেতুম এবং শেষরাত্রের অন্ধকারে শেষবারের মতো শুতে যেতুম তাহলেও সেই বাতির আলোরই জিত থেকে যেত অথচ সে বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে সেই রকম নীরবে সেই রকম মধুর মুখেই হাস্য করত—আপনাকে গোপন করত না, আপনাকে প্রকাশও করত না।

নাগর নদীর ঘাট,
১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫।

কাল অনেকদিন পরে সূর্যাস্তের পর ওপারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখলুম, আকাশের আদিঅন্ত নেই—জনহীন মাঠ দিগদিগন্ত ব্যাপ্ত ক'রে হাহা করছে—কোথায় দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম কোথায় একপ্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা। কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলিপরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগযুগান্তর কাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে, মৌনমুখে, শ্রান্ত-পদে প্রদক্ষিণ ক'রে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে। কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ।

ভানুসিংহের পত্রাবলী

পত্রধারা—২

ভানুসিংহের পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বভারতী-গ্রন্থন-বিভাগ
২১০ নং কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা।

ভানুসিংহের পত্রাবলী

প্রথম সংস্করণ চৈত্র, ১৩৩৬ সাল।

মূল্য—এক টাকা।

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

এই পত্রগুলি দিয়ে যে পত্রপুট গাঁথা হ'য়েচে
তা'র মধ্যে রাণুর প্রতি ভানুদাদার
আশীর্ব্বাদ পূর্ণ রইলো।

ভানুসিংহের পত্রাবলী

১

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠির জবাব দেবো ব'লে চিঠিখানি যত্নসহকারে রেখেছিলুম, কিন্তু কোথায় রেখেছিলুম সে কথা ভুলে যাওয়াতে এতদিন দেরি হ'য়ে গেল। আজ হঠাৎ খুঁজ্‌তেই ডেস্কের ভিতর হ'তে আপনিই বেরিয়ে পড়্‌লো।

কবি-শেখরের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেচো। রাজকন্যার সঙ্গে নিশ্চয় তার বিয়ে হ'তো, কিন্তু তা'র পূর্ব্বেই সে ম'রে গিয়েছিলো। মরাটা তার অত্যন্ত ভুল হয়েছিলো, কিন্তু সে আর এখন শোধ্‌রাবার উপায়

নেই। যে-খরচে রাজা তার বিয়ে দিত সেই খরচে খুব ধুম ক'রে তার অন্ত্যেষ্টি সৎকার হয়েছিলো।

ক্ষুধিত পাষাণে ইরাণী বাঁদির কথা জান্‌বার জন্যে আমারও খুব ইচ্ছে আছে কিন্তু যে-লোকটা বল্‌তে পারতো আজ পর্য্যন্ত তা'র ঠিকানা পাওয়া গেল না।

তোমার নিমন্ত্রণ আমি ভুলব না—হয়তো তোমাদের বাড়িতে একদিন যাবো, কিন্তু তা'র আগে তুমি যদি আর-কোনো বাড়িতে চলে যাও? সংসারে এই রকম ক'রেই গল্প ঠিক জায়গায় সম্পূর্ণ হয় না।

এই দেখো না কেন, খুব শীঘ্রই তোমার চিঠির জবাব দেবো ব'লে ইচ্ছা ক'রেছিলুম, কিন্তু এমন হ'তে পার্‌তো তোমার চিঠি আমার ডেস্কের কোণেই লুকিয়ে থাক্‌তো, এবং কোনোদিনই তোমার ঠিকানা খুঁজে পেতুম না।

যেদিন বড়ো হ'য়ে তুমি আমার সব বই প'ড়ে বুঝ্‌তে পার্‌বে তা'র আগেই তোমার নিমন্ত্রণ সেরে আস্‌তে চাই। কেননা যখন সব বুঝ্‌বে তখন হয়তো সব ভালো লাগ্‌বে না—তখন যে-ঘরে তোমার ভাঙা পুতুল থাকে সেই ঘরে রবিবাবুকে স্থান দেবে।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি—৩রা ভাদ্র ১৩২৪।

২

কলিকাতা

আমার একদিন ছিল যখন আমি ছোটো ছিলুম—তখন আমি ঘন ঘন এবং বড়ো বড়ো চিঠি লিখ্‌তুম। তুমি যদি তা'র আগে জন্মাতে, যদি অনর্থক এত দেরি না ক'র্‌তে, তাহ'লে আমার চিঠির উত্তরের জন্য একদিনও সবুর ক'র্‌তে হ'তো না। আজ আর চিঠি লেখ্‌বার সময় পাই নে। তোমার বয়স আমার যখন ছিল তখন নিজের ইচ্ছেয় চিঠি লিখ্‌তুম, এখন অন্যের ইচ্ছেয় এত বেশি লিখ্‌তে হয় যে, নিজের ইচ্ছেটা মারাই গেল! তারপরে আবার ভয়ানক কুঁড়ে হ'য়ে গেছি। যত বেশি কাজ কর্‌তে হচ্চে ততই কুঁড়েমি আরো বেড়ে যাচ্চে। এখন লিখে যাওয়ার চেয়ে ব'কে যাওয়া ঢের বেশি সহজ মনে হয়। যদি তেমন সুবিধে হ'তো তো দেখিয়ে দিতুম বকুনিতে তুমি কখনো আমার সঙ্গে পেরে উঠ্‌তে না। সেটা তোমার ভালো লাগ্‌তো কিনা বল্‌তে পারিনে। কেননা তোমার যতগুলি পুতুল আছে তা'রা কেউ তোমার কথার জবাব করে না। তুমি যা বলো তাই তা'রা চুপ ক'রে শুনে

যায়। আমার দ্বারা কিন্তু সেটা হবার জো নেই—অন্যের কথা শোনার চেয়ে অন্যকে কথা শোনানো আমার অভ্যেস হ'য়ে গেছে। আমার বড়ো মেয়ে যখন ছোটো ছিল তখন বকুনিতে তা'র সঙ্গে পারতুম না, কিন্তু এখন সে বড়ো হ'য়ে শ্বশুরবাড়ি চ'লে গেছে। তারপর থেকে আমার সমকক্ষ কাউকে পাইনি। তোমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে আমার খুব ইচ্ছে রইলো। একদিন হয়তো তোমাদের সহরে যাবো। তুমি লিখেচো আমাকে গাড়িতে ক'রে নিয়ে যাবে। কিন্তু আগে থাক্‌তে ব'লে রাখি আমাকে দেখ্‌তে নারদমুনির মতো—মস্ত বড়ো পাকা দাড়ি। ভয় ক'রো না, আমি তা'র মতোই ঝগড়াটেও বটে, কিন্তু ছোটো মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করা আমার স্বভাব নয়। তোমার কাছে খুব ভালো মানুষটির মতো থাক্‌বার আমি খুব চেষ্টা কর্‌বো—এমন কি কবিশেখরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়েতে যদি তোমার মত থাকে আমি স্বয়ং তা'র ঘটকালি ক'রে দিতে রাজি আছি। ইতি—২১শে ভাদ্র, ১৩২৪।

৩

কলিকাতা

তোমার সঙ্গে চিঠি লিখে জিততে পারবো না এ আমি আগে থাক্‌তে ব'লে রাখ্‌চি। তোমার মতো বাসন্তী রঙের কাগজ আমি খুঁজে পেলুম না। সামান্য শাদা কাগজই সব সময়ে খুঁজে পাইনে। তোমাকে তো আগেই ব'লেচি, আমি কুঁড়ে। তারপরে, আমি ভারি এলোমেলো,—কোথায় কী রাখি তা'র কোনো ঠিকানা পাইনে। এমন আমার আরো অনেক দোষ আছে। এই তো চিঠির কাগজের কথা। তারপরে ভেবেছিলুম ছবি এঁকে তোমার সচিত্র চিঠির উপযুক্ত জবাব দেবো—চেষ্টা ক'র্‌তে গিয়ে দেখ্‌লুম অহঙ্কার বজায় থাক্‌বে না। এ বয়সে নতুন ক'রে হাঁস আঁক্‌তে বসা আমার পক্ষে চ'ল্‌বে না। গ—অক্ষরের পেটের নীচে খণ্ড ত জুড়েও সুবিধে ক'র্‌তে পার্‌লুম না—সেটা এই রকম বিশ্রী দেখতে হ'লো। অনেক সময় পদ্মার চরে কাটিয়েচি; সেখানে হাঁসের দল ছাড়া আমার আর সঙ্গী ছিল না। তাদের প্রতি আমার মনের কৃতজ্ঞতা থাকাতেই আমাকে আজ থেমে যেতে হ'লো—এবার-

কার মতো তোমার হাঁসেরই জিৎ রইলো। এই তো গেল ছবি, তারপরে সময়। তাতেও তোমার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। তাই ভয় হ'চ্চে শেষকালে তুমি রাগ ক'রে আর-কোনো গল্প-লিখিয়ে গ্রন্থকারের সঙ্গে ভাব ক'র্‌বে—কিন্তু নিমন্ত্রণ আমার পাকা রইলো।

৪

কলিকাতা

তুমি দেরি ক'রে আমার চিঠির উত্তর দিয়েছিলে এতে আমার রাগ করাই উচিত ছিল, কিন্তু রাগ ক'র্‌তে সাহস হয় না—কেননা আমার স্বভাবে অনেক দোষ আছে—দেরি ক'রে উত্তর দেওয়া তা'র মধ্যে একটি। আমি জানি তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি অনেক সহ্য ক'র্‌তে পারো; আমার কুঁড়েমি, আমার ভোলা-স্বভাব, আমার এই সাতান্ন বছর বয়সের যত রকম শৈথিল্য সব তোমাকে সহ্য ক'র্‌তে হবে। আমার মতো অন্যমনস্ক অকেজো মানুষের সঙ্গে ভাব রাখ্‌তে হ'লে খুব সহিষ্ণুতা থাকা চাই—চিঠির উত্তর যত পাবে তার চেয়ে বেশি চিঠি লেখ্‌বার মতো শক্তি যদি তোমার না থাকে,

দেনাপাওনা সম্বন্ধে তোমার হিসাব যদি খুব বেশি কড়াক্কড় হয় তাহ'লে একদিন আমার সঙ্গে হয়তো ঝগড়া হ'তেও পারে, এই কথা মনে ক'রে ভয়ে ভয়ে আছি। কিন্তু এ কথা আমি জোর ক'রে ব'ল্‌চি যে, ঝগড়া যদি কোনো দিন বাধে তা'র অপরাধটা আমার দিকে ঘটতে পারে, কিন্তু রাগটা তোমার দিকেই হবে। আর যা'হোক্ আমি রাগী নই। তার কারণ এ নয় যে, আমি খুব ভালোমানুষ, তার কারণ এই যে, আমার স্মরণশক্তি ভারি কম। রাগ কর্‌বার কারণ কী ঘটেচে সে আমি কিছুতেই মনে রাখ্‌তে পারিনে। তুমি মনে ক'রো না কেবল পরের সম্বন্ধেই আমার এই দশা, নিজের দোষের কথা আমি আরো বেশি ভুলি। চিঠির জবাব দিতে যখন ভুলে যাই তখন মনেও থাকে না যে ভুলে গেছি; কর্ত্তব্য ক'র্‌তে ভুলি, ভুল সংশোধন ক'র্‌তেও ভুলি, সংশোধন ক'র্‌তে ভুলেচি তাও ভুলি। এমন অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব করো এবং সে বন্ধুত্ব যদি স্থায়ী রাখ্‌তে চাও তাহ'লে তোমাকেও অনেক ভুল্‌তে হবে, বিশেষত চিঠির হিসাবটা।

পদ্মার ধারের হাঁসেদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হ'লো কী ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রেচো। বোধ হয় তা'র কারণ

এই যে, বোবার শত্রু নেই। ওরা যখন খুব দল বেঁধে চেঁচামেচি করে আমি চুপ ক'রে শুনি, একটিও জবাব দিইনে। আমি এত বেশি শান্ত হ'য়ে থাকি যে, ওরা আমাকে মানুষ ব'লেই গণ্যই করে না—আমাকে বোধ হয় পাখীর অধম ব'লেই জানে—কেননা আমার দুই পা আছে বটে কিন্তু ডানা নেই। আর যাই হোক্ ওদের সঙ্গে আমার চিঠিপত্র চলে না—যদি চ'ল্‌তো তাহ'লে আমাকেই হার মান্‌তে হ'তো—কেননা ওদের ডানা-ভরা কলম আছে, আর ওদের সময়ের টানাটানি খুব কম।

তোমাকে-যে এত বড়ো চিঠি লিখ্‌লুম আমার ভয় হ'চ্চে পাছে বিশ্বাস না করো যে আমার সময় কম। অনেক কাজ প'ড়ে আছে—কাজ ফাঁকি দিয়েই তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি—কাজ যদি না থাক্‌তো তাহ'লে কাজ ফাঁকি দেওয়াও চল্‌তো না।

বেলা অনেক হ'য়ে গেছে—অনেক আগে স্নান ক'র্‌তে যাওয়া উচিত ছিল—হাঁসেদের কথায় হঠাৎ স্নানের কথাটা মনে প'ড়ে গেল—তা'হ'লে আজ চল্লুম। আজ রাত্রে বোলপুর যেতে হবে। ইতি—
৬ই কার্ত্তিক, ১৩২৪।

৫

শান্তিনিকেতন

তোমাদের বইয়ে বোধ হয় প'ড়ে থাক্‌বে, পাখীরা মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ওপারে চ'লে যায়। আমি হচ্চি সেই-জাতের পাখী। মাঝে মাঝে দূর পার থেকে ডাক আসে, আমার পাখা ধড়ফড় ক'রে ওঠে। আমি এই বৈশাখ মাসের শেষ দিকে জাহাজে চ'ড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেবো ব'লে আয়োজন ক'র্‌চি। যদি কোনো বাধা না ঘটে তাহ'লে বেরিয়ে প'ড়্‌বো। পশ্চিম দিকের সমুদ্র-পথ আজকাল যুদ্ধের দিনে সকল সময়ে পারের দিকে পৌঁছিয়ে দেয় না, তলার দিকেই টানে। পূর্ব্ব দিকের সমুদ্রপথ এখনো খোলা আছে—কোন্‌দিন হয়তো দেখ্‌ব সেখানেও যুদ্ধের ঝড় এসে পৌঁছেচে। যাই হোক্‌ তোমার কাশীর নিমন্ত্রণ-যে ভুলেচি তা মনে ক'রো না; তুমি আয়োজন ঠিক ক'রে রেখো, আমি কেবল একবার পথের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দুটো চারটে জায়গায় নিমন্ত্রণ চট্‌ ক'রে সেরে নিয়ে তারপরে তোমার ওখানে গিয়ে বেশ আরাম ক'রে ব'স্‌বো—আমার জন্যে

কিন্তু ছাতু কিম্বা রুটি, অড়রের ডাল এবং চাটনির বন্দোবস্ত ক'র্‌লে চল্‌বে না; তোমাদের মহারাজ নিশ্চয়ই খুব ভাল রাঁধে, কিন্তু তুমি যদি নিজে স্বহস্তে শুক্‌তানি থেকে আরম্ভ ক'রে পায়স পর্য্যন্ত রেঁধে না খাওয়াও তাহ'লে সেই মুহূর্ত্তেই আমি—কী ক'র্‌বো এখনো তা ঠিক করিনি—ভাব্‌ছিলুম না খেয়েই সেই মুহূর্ত্তেই আবার অষ্ট্রেলিয়া চ'লে যাবো—কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পার্‌বো কিনা একটু সন্দেহ আছে সেইজন্যেই এখন কিছু বল্লুম না। কিন্তু রান্না অভ্যাস হয়নি বুঝি? তাই বলো। কেবলি পড়া মুখস্থ ক'রেচো? আচ্ছা, অন্ততঃ এক বছর সময় দিলুম—এর মধ্যেই মার কাছে শিখে নিয়ো। তাহ'লে সেই কথা রইলো, আপাতত আমাকে ক'ল্‌কাতায় যেতে হবে, বাক্সগুলো গুছিয়ে ফেলা চাই। আমি খুব ভালো গোছাতে পারি। কেবল আমার একটু যৎসামান্য দোষ আছে—প্রধান-প্রধান দরকারী জিনিষগুলো প্যাক ক'র্‌তে প্রায়ই ভুলে যাই—যখন তাদের দরকার হয় ঠিক সেই সময় দেখি তাদের আনা হয়নি। এতে বিষম অসুবিধা হয় বটে কিন্তু গোছাবার ভারি সুবিধে—কেননা বাক্সের মধ্যে যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায়, আর বোঝা কম হওয়াতে

রেলভাড়া জাহাজভাড়া অনেক কম লাগে। দরকারী জিনিষ না নিয়ে অদরকারী জিনিষ সঙ্গে নেবার আর-একটা মস্ত সুবিধে হচ্চে এই যে—সেগুলো বারবার বের-করাকরির দরকার হয় না, বেশ গোছানোই থেকে যায়; আর যদি হারিয়ে যায় কিম্বা চুরি যায় তাহ'লেও কাজের বিশেষ ব্যাঘাত কিম্বা মনের অশান্তি ঘটে না। আজ আর বেশি লেখ্‌বার সময় নেই, কেননা আজ তিনটের গাড়িতেই রওনা হ'তে হবে। গাড়ি ফেল কর্‌বার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু সে ক্ষমতাটা আজকে আমার পক্ষে সুবিধার হবে না; অতএব তোমাকে নববর্ষের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে আমি টিকিট কিন্‌তে দৌড়লুম। ইতি—২রা বৈশাখ, ১৩২৫।

৬

শান্তিনিকেতন

কাল সন্ধ্যাবেলায় স্তরে স্তরে গাঢ় নীল মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল—তখন নীচের সেই পূবদিকের বারান্দায় সাহেবে আমাতে মিলে খাচ্ছিলুম—আমার আর-সব খাওয়া হ'য়ে গিয়ে যখন চিঁড়েভাজা খেতে

আরম্ভ ক'রেচি এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে সোঁ সোঁ ক'রে হাওয়া এসে সমস্ত কালো মেঘ আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বিছিয়ে দিলে। কতদিন পরে ঐ সজল মেঘ দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। যদি আমি তোমাদের কাশীর হিন্দুস্থানী মেয়ে হ'তুম তাহ'লে কাজ্‌রী গাইতে গাইতে শিরীষ-গাছের দোলাটাতে দুল্‌তে যেতুম। কিন্তু এণ্ড্রুজ্‌ কিম্বা আমি, আমাদের দু-জনের কারো হিন্দুস্থানী মেয়ের মতো আকৃতি প্রকৃতি কিম্বা চালচলন নয়, তা ছাড়া সে কাজ্‌রী গান জানে না, আমিও যা জানতুম ভুলে গেচি। তাই দু-জনে মিলে উপরে আমার ছাদের সাম্‌নেকার বারান্দায় এসে ব'স্‌লুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘনবৃষ্টি নেমে এলো—জলে বাতাসে মিলে আকাশময় তোলপাড় ক'রে বেড়াতে লাগ্‌লো। আমার ছাদের সাম্‌নেকার পেঁপে গাছটার লম্বা পাতাগুলোকে ধ'রে ঠিক যেন কানমলা দিতে লাগ্‌লো। শেষকালে বৃষ্টি প্রবল হ'য়ে গায়ে যখন ছাঁট লাগ্‌তে আরম্ভ হ'লো, তখন আমার সেই কোণটাতে এসে আশ্রয় নিলুম। এমন সময় চোখ ধাঁদিয়ে কড়কড় শব্দে প্রকাণ্ড একটা বাজ প'ড়্‌লো। আমাদের মনে

হ'লো বাগানের মধ্যেই কোথাও পড়েচে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে দেখি হরিচরণ পণ্ডিতের বাসার দিকে ছেলেরা ছুট্‌চে। সেই বাড়িতেই বাজ প'ড়েছিলো। তখন তাঁর বড়ো মেয়ে উনানে দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন, তিনি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়লেন। ছেলেরা দূর থেকে দেখ্‌তে পেলে চালের উপর থেকে ধোঁয়া উঠ্‌তে আরম্ভ হ'য়েচে। তা'রা তো সব চালের উপর চ'ড়ে 'জল জল' ক'রে চীৎকার ক'র্‌তে লাগ্‌লো। ছেলেরা কুয়ো থেকে জল ভ'রে এনে চালের উপর আগুন নিবিয়ে ফেল্লে। ভাগ্যে, হরিচরণের বাড়ির কাউকে আঘাত লাগে নি। কেবল হরিচরণের মেয়ের হাত একটু পুড়ে ফোস্‌কা পড়েছিলো। কিন্তু সব চেয়ে ভালো লেগেছিলো আমার ছেলেদের উদ্যোগ দেখে। তাদের না আছে ভয়, না আছে ক্লান্তি। নির্ভয়ে হাতে ক'রে ক'রে চালের খড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতে লাগ্‌লো। আর দূরের কুয়ো থেকে দৌড়ে দৌড়ে সার বেঁধে জলভরা ঘড়া এনে উপস্থিত ক'র্‌তে লাগলো। ওরা যদি না দেখ্‌তো এবং না এসে জুট্‌তো তাহ'লে মস্ত একটা অগ্নিকাণ্ড হ'তো। এমনি ক'রে কাল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঝড়-বাদল হ'য়ে আজ অনেকটা ঠাণ্ডা

আছে। আকাশ এখনো মেঘে লেপে আছে, হয়তো আজও বিকেলে একচোট বৃষ্টি সুরু হবে! ইতি—৫ই শ্রাবণ, ১৩২৫।

৭

শান্তিনিকেতন

তুমি আজকাল খুব পড়ায় লেগে গেছো, কিন্তু আমি-যে চুপচাপ ক'রে ব'সে থাকি তা মনে ক'রো না। আমার কাজ চ'ল্‌চে। সকালে তুমি তো জানো সেই আমার তিন ক্লাশের পড়ানো আছে। তা'রপরে স্নান ক'রে খেয়ে, যেদিন চিঠি লেখ্‌বার থাকে চিঠি লিখি। তারপরে বিকেলে খাবার খবর দেবার আগে পর্য্যন্ত ছেলেদের যা পড়াতে হয় তাই তৈরি ক'রে রাখি। তারপরে সন্ধ্যার সময় ছাতে চুপচাপ ব'সে থাকি—কিন্তু এক-একদিন ছেলেরা আমার কাছে কবিতা শুন্‌তে আসে। তা'রপরে অন্ধকার হ'য়ে আসে—তারাগুলিতে আকাশ ছেয়ে যায়—দিনুর ঘর থেকে ছেলেদের গলা শুন্‌তে পাই—তা'রা গান শেখে—তা'রপরে গান বন্ধ হ'য়ে যায়। তখন

আন্তবিভাগের ছেলেদের ঘর থেকে হারমোনিয়ম্ এবং বাঁশির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গানের ধ্বনি উঠ্তে থাকে। ক্রমে রাত্রি আরো গভীর হয়, তখন ছেলেদের ঘরের গানও বন্ধ হ'য়ে যায়, আর দূরে গ্রামের রাস্তার ভিতর দিয়ে তুই একটা আলো চ'ল্চে দেখ্তে পাই। তা'র-পরে সে আলোও থাকে না, কেবলমাত্র আকাশজোড়া তারার আলো। তা'রপরে ব'সে থাক্তে থাক্তে ঘুম পেয়ে আসে, তখন আস্তে আস্তে উঠে শুতে যাই। তা'রপরে কখন এক সময়ে আমার পূর্ব্বদিকের দরজার সম্মুখে আকাশের অন্ধকার অল্প অল্প ফিকে হ'য়ে আসে, তুটো একটা শালিকপাখী উস্খুস্ ক'রে ওঠে, মেঘের গায়ে গায়ে সোনালি আভা ফোটে, খানিক বাদেই সাড়ে চারটার সময় আন্তবিভাগে ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজ্তে থাকে, অম্নি আমি উঠে পড়ি। মুখ ধুয়ে এসে আমার সেই পূর্ব্বদিকের বারান্দায় পাথরের চৌকির উপর আসন পেতে উপাসনায় বসি। সূর্য্য ধীরে ধীরে উঠে তা'র আলোকের স্পর্শে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে। আজকাল সকাল সকাল খেতে যেতে হয়, কেননা সাড়ে ছটার সময় আশ্রমের সকল বালকবৃন্দ আমরা বিদ্যালয়ের সাম্নের মাঠে একত্র হই,

একটি কোনো গান হ'য়ে তা'র পরে আমাদের স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়। ঠিক প্রথম ঘণ্টায় আমার ক্লাশ নেই। কিন্তু সেই সময়ে আমি আমার কোণটাতে এসে একবার আমার পড়াবার বই ও খাতাপত্র দেখে শুনে ঠিক ক'রে নিই—তা'রপরে আমার কাজ। এই আমার দিনরাতের হিসাব তোমার কাছে দিলুম। কেমন শান্তিতে দিন চ'লে যায়। ঐ ছেলেদের কাজ ক'র্‌তে আমার খুব ভালো লাগে। কেননা ওরা জানে না যে, আমরা ওদের জন্য যে-কাজ করি তা'র কোনো মূল্য আছে। ওরা যেমন অনায়াসে সূর্য্যের কাছ থেকে তা'র আলো নেয় আমাদের হাত থেকে তেমনি অনায়াসে সেবা নেয়। হাটে দোকানদারদের কাছ থেকে যেমন দরদস্তুর ক'রে জিনিষ কিন্‌তে হয় তেমন ক'রে নয়। এরা যখন বড়ো হবে, যখন সংসারের কাজে প্রবেশ ক'র্‌বে, তখন হয়তো মনে প'ড়বে—এই আশ্রমের প্রান্তর, এখানকার শালের বীথিকা, এখানকার আকাশের উদার আলো এবং উন্মুক্ত সমীরণ এবং প্রতিদিন সকালে বিকালে এখানে আকাশতলে নীরবে ব'সে ঠাকুরকে প্রণাম। ইতি—
১২ই শ্রাবণ, ১৩২৫।

৮

শান্তিনিকেতন

দিনগুলো আজকাল শরৎকালের মতো সুন্দর হ'য়ে উঠেচে। আকাশে ছিন্ন মেঘগুলো উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। আমলকীগাছের পাতা-গুলিকে ঝর্‌ঝরিয়ে দিয়ে বাতাস ব'য়ে যাচ্চে, তা'র মধ্যে একটা আলস্যের সুর বাজ্‌চে, আর বৃষ্টিতে-ধোওয়া রোদ্দুরটি যেন সরস্বতীর বীণার তারগুলো থেকে বেজে-ওঠা গানের মতো সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেচে। আমার ঠিক চোখের উপরেই সন্তোষবাবুর বাড়ির সাম্‌নেকার সবুজ ক্ষেত রৌদ্রে ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠেচে; আর তা'রই একপাশ দিয়ে বোলপুর যাবার রাঙা রাস্তাটা চ'লে গেচে—ঠিক যেন একটি সোনালী সবুজ সাড়ির রাঙা পাড়ের মতো। খুব ছেলেবেলা থেকেই এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার গলাগলি ভাব—তাই আমার জীবনের কত কালই নদীর নির্জ্জন চরে কাটিয়েচি। তা'রপরে কতদিন গেচে এখানকার নির্জ্জন প্রান্তরে। তখন এখানে বিদ্যালয় ছিল না, তখন শান্তিনিকেতনের বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় ব'সে

খুব বৃহৎ একটি নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যেতে পারতুম ; —রাত্রে ঐ বারান্দায় যখন শুয়ে থাক্‌তুম তখন আকাশের সমস্ত তারা যেন আমার পাড়াপড়শির মতো তাদের জান্‌লা থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে কী ব'ল্‌তো, তাদের কথা শোনা যেতো না, কিন্তু তাদের মুখ-চোখের হাসি আমাকে এসে স্পর্শ ক'রতো। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ভাব করার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, সে আনন্দ দেয়, কিন্তু কিছু দাবী করে না ; সে তা'র বন্ধুত্বকে ফাঁসের মতো বেঁধে ফেল্‌তে চেষ্টা করে না, সে মানুষকে মুক্তি দেয়, তাকে দখল ক'রে নিতে চায় না। ১৮ই শ্রাবণ, ১৩২৫।

৯

শান্তিনিকেতন

আজ সকাল থেকে ঘন ঘোর মেঘ ক'রে প্রবল বেগে বর্ষণ চল্‌চে, সকালে কোনো মাষ্টার তাই ক্লাশ নেন্‌নি। কিন্তু থার্ড ক্লাশের ছেলেদের আমি ছুটি দিতে পার্‌লুম না—তাদের পড়া খুব শক্ত, মাঝে মাঝে ফাঁক প'ড়্‌লে সমস্ত আল্‌গা হ'য়ে যাবে, তাই সেই

বৃষ্টির মধ্যেও তাদের সংগ্রহ ক'রে আনা গেল। পড়াতে পড়াতে বৃষ্টির বেগ বেড়ে উঠ্‌লো, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। আমার শোবার ঘরে ক্লাশ হয়—ঘরে ছাঁট আস্‌তে লাগ্‌লো। সার্সি বন্ধ ক'রে দিলুম—পাঠ্য শেষ হ'য়ে গেল, কিন্তু বৃষ্টি শেষ হয় না—এই বৃষ্টিতে তাদের তো ছেড়ে দিতে পারিনে। শেষকালে ওরা আমাকে ধ'রে প'ড়্‌লো, মুখে মুখে একটা গল্প বানিয়ে ওদের শোনাতে। কিন্তু ভেবে দেখো আমার বয়স এখন সাতান্ন বছর হ'য়েচে, এখন কি ইচ্ছা ক'রলেই অনর্গল গল্প ব'ল্‌তে পারি? শেষকালে আমি কর্‌লুম কী, একটা গল্পের কেবল গোড়া ধরিয়ে দিয়ে ওদের বল্লুম সেইটে এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ ক'রে লিখে আন্‌তে। ওরা তো উৎসাহের সঙ্গে রাজী হ'লো, কিন্তু ওদের গল্প যে কী রকম হবে তা কল্পনা ক'রে আমার মনে কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ হ'চ্চে না। যাক্‌গে, ওরা তো সেই গল্প মাথায় নিয়ে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে চেঁচাতে চেঁচাতে ওদের ঘরে চ'লে গেল—আমি গেলুম স্নান ক'র্‌তে। স্নান ক'রে খেয়ে এসে আজ তাকিয়ায় একটু হেলান দিয়ে প'ড়েছিলুম। কিন্তু সমস্ত দিন তো কুঁড়েমি ক'রে কাটাতে পারিনে। অন্য দিন হ'লে উঠে আমার

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ক্লাশের জন্য পড়ার বই লিখ্‌তে ব'স্‌তুম, কিন্তু আজ বাদ্‌লার দিনে সেটা ভালো লাগ্‌লো না, তাই "বিদায়-অভিশাপ"টা ইংরেজিতে তর্জ্জমা ক'র্‌তে ব'সে গিয়েছিলুম। বেশ ভালোই লাগ্‌ছিলো; পাতা দুয়েক যখন শেষ হ'য়ে গেচে, এমন সময় চিঠি হাতে ক'রে এক হরকরার প্রবেশ। কাজেই এখন কিছুক্ষণের জন্য দেবযানীকে অপেক্ষা ক'র্‌তে হ'চ্চে। বৃষ্টি থেমে গেচে কিন্তু জলভারাবনত মেঘে আকাশ ভরা। এতদিন শ্রাবণের দেখা ছিল না, যেই বিশে একুশে হ'য়েচে অম্‌নি যেন কোনোমতে ছুট্‌তে ছুট্‌তে শেষ ট্রেণটা ধ'রে হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। কম হাঁপাচ্চে না,—তা'র হাঁপানির বেগে আমাদের শালবন বিচলিত, আম্‌লকিবন কম্পান্বিত, তালবন মর্ম্মরিত, বাঁধের জল কল্লোলিত, কচি ধানের ক্ষেত হিল্লোলিত, আর আমার এই জান্‌লার খড়খড়িগুলো ক্ষণে ক্ষণে খড়খড়ায়িত। ইতি—২১শে শ্রাবণ, ১৩২৫।

১০

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠি আজ এইমাত্র পেলুম। এইমাত্র ব'ল্‌তে কী বোঝায় বলি। দুপুর বেলাকার খাওয়া হ'য়ে গেচে। সেই কোণটাতে তাকিয়া ঠেশান দিয়ে ব'সেছিলুম। আকাশ ঘন মেঘে অন্ধকার হ'য়ে গেচে —পশ্চিম দিক থেকে মাঝে মাঝে সোঁ সোঁ ক'রে ঝোড়ো বাতাস বইচে। ইন্দ্রের ঐরাবতের বাচ্চাগুলোর মতো মোটা মোটা কালো মেঘ আকাশময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। মাঝে মাঝে গুরু গুরু গর্জ্জন শোনা যায়। সাম্‌নে সবুজ মাঠের উপরে মেঘ্‌লা দিনের ছায়া, নিবিড় স্নিগ্ধতার মধ্যে চোখ ডুবে গেচে। তোমাকে লিখ্‌তে লিখ্‌তে বৃষ্টি নেমে এলো—বৃষ্টি একটুমাত্র দেখা দিলেই আমার এই বারান্দায় তা'র পায়ের শব্দ তখনি শোনা যায়। দূরে ভুবনডাঙার দিকে বাঁধের কাছে যে ঘন বনশ্রেণী দেখা যায়, বৃষ্টির ধারায় সেটা একটু ঝাপ্‌সা হ'য়ে এসেচে—বনলক্ষ্মী যেন তা'র পাত্‌লা ওড়্‌নাটাকে মুখের উপর ঘোম্‌টা টেনে দিয়েচে। ক-টা বেজেচে, ঠিক ব'ল্‌তে পারিনে। আমার সামনের দেয়ালে যে-

ঘড়িটা ছিল তাকে নির্ব্বাসিত ক'রে দিয়েচি। ইদানীং তা'র ব্যবহারে এমন হ'য়ে এসেছিল-যে, তাকে বিশ্বাস করার জো ছিল না—সে চ'ল্‌তোও ভুল ব'ল্‌তোও ভুল, তা'র পরামর্শমতো খেতে শুতে গিয়ে আমি অনেকবার ঠ'কেচি। তবু উপযুক্ত উপায়ে তাকে-যে সংশোধন করা যেতো না তা ব'ল্‌তে পারিনে—কিন্তু সময়ের জন্যই ঘড়ি, ঘড়ির জন্য সময় নষ্ট করা আমার পোষায় না। যাই হোক আন্দাজে মনে হ'চ্চে একটা দেড়টা হ'য়ে গেচে। আর একটু বাদেই আমাকে একটা ক্লাশ পড়াতে হবে। আজকাল প্রায় জন পনেরো গুজ্‌রাটি ছেলে এসেচে, কী ক'রে তাদের বাংলা পড়াতে হবে সেইটে আজ আমি দেখিয়ে দেবো—বৌমা আর শৈল ওদের দুপুর বেলায় একঘণ্টা ক'রে বাংলা পড়াতে রাজি হয়েচেন।

ইতিমধ্যে এণ্ড্রুজ্ সাহেবের খুব অসুখ ক'রেছিলো। আমাদের ভাবনা হ'য়েছিলো। একদিন তো রাত্রে তাঁর নিজের মনে হ'লো তাঁর ওলাউঠা হ'য়েচে। সেই রাত্রি এক্‌টার সময় বর্দ্ধমানে ডাক্তার ডাক্‌তে লোক পাঠিয়ে দিলুম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ওষুধ খেয়ে এতটা ভালো হ'য়ে উঠ্‌লেন-যে, ভোরের বেলায় আবার

টেলিগ্রাফ ক'রে ডাক্তার আনা বন্ধ ক'রে দিলুম। তুমি তো জানোই আমার হাতের রেখায় লেখা আছে—আমি ডাক্তারি ক'র্‌তে পারি। যাই হোক্, এখন সাহেব আবার সেরে উঠে পূর্ব্বের মতোই চারিদিকে দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্চেন। কিন্তু তিনি সেই-যে জাপানি ঝোলা কাপড়টা প'রতেন সেটা আজকাল আর দেখ্‌তে পাইনে।

বৃষ্টি একটুখানি হ'য়েই থেমে গেল। বাতাসটাও বন্ধ হ'য়েচে। কিন্তু পূবের দিকে খুব একটা ঘন নীল মেঘ ভ্রূকুটি ক'রে থ'ম্‌কে দাঁড়িয়ে র'য়েচে—এখনি বোধ হয় বরুণ-বাণ বর্ষণ ক'র্‌তে লেগে যাবে। আমরা আশ্রমে অনেক নতুন গাছ লাগিয়েচি, ভালো ক'রে বৃষ্টি হ'লে ভালোই হয়। কিন্তু আজকাল শরৎকালের মতো হ'য়েচে—রৌদ্রে বৃষ্টিতে মিলে ক্ষণে ক্ষণে খেলা সুরু হ'য়ে গেচে। তোমরা গান-বাজ্‌না শিখ্‌তে সুরু ক'রেচো শুনে খুব সুখী হলুম। আজ আমার আর সময়ও নেই, কাগজও ফুরোলো, পাড়া জুড়োলো, বর্গি এলো ক্লাসে।

১১

শান্তিনিকেতন

আজ বুধবার। কদিন খুব বৃষ্টি-বাদলের পর আজ সকালের আকাশে সূর্য্যের আলো নির্ম্মল হ'য়ে ফুটে উঠেচে। শিশু যেমন দোলায় শুয়ে শুয়ে অকারণ আনন্দে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎ হ'য়ে শুয়ে কলহাস্য ক'র্‌তে থাকে, তেমনি ক'রে আশ্রমের গাছপালাগুলি আজ তাদের ডালপালা তুলিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলি ঝিল্‌মিল্ ক'রে উঠ্‌চে। এখন সকাল বেলা—স্নিগ্ধ বাতাস বইচে, পাখীর ডাকে এখানকার শালবন এবং আমবাগান মুখরিত। আমাদের মন্দিরের উপাসনা হ'য়ে গেচে। তারপরে এতক্ষণ আমার জান্‌লার ধারের সেই কোণ্‌টিতে শুয়েছিলুম। প্রতি বুধবারে উপাসনার পরে এণ্ড্রুজ্ একবার এসে, আমি কী ব'লেচি, আমার কাছে ইংরেজিতে তাই বুঝিয়ে নেন। বুঝিয়ে নিয়ে খুসী হ'য়ে তিনি চ'লে গেচেন। আমি কী বলেছিলুম জানো? এই সৃষ্টির দিকে প্রথম তাকালে কী দেখ্‌তে পাই? এর আগা-গোড়া সমস্ত নিয়মে বাঁধা, এর সমস্ত অণুপরমাণুর

মধ্যে নিয়মের ফাঁক এতটুকুও নেই। কেমন জানো? যেমন একটি সহস্র-তারবাঁধা বীণাযন্ত্র। এই বীণার প্রত্যেক তারটি খুব খাঁটি হিসাব ক'রে বাঁধা, অর্থাৎ এই বীণাটির তুম্বী থেকে আরম্ভ ক'রে এর সূক্ষ্মতম তারটি পর্য্যন্ত সমস্তই সত্য। কিন্তু না-হয় সত্যই হ'লো, তাতে আমার কী? বীণার তার বাঁধার খাঁটি নিয়ম নিয়ে আমি কী ক'র্‌বো? তেমনি এই জগতে সূর্য্যচন্দ্রগ্রহ অণু-পরমাণু সমস্তই ঠিক সময় রেখে ঠিক নিয়ম রেখে চ'ল্‌চে—এই কথাটা যত বড়ো কথাই হোক্ না, কেবল তাতে আমাদের মন ভরে না। আমরা এই কথা বলি, শুধু বীণার নিয়ম চাইনে, বীণার সঙ্গীত চাই। সঙ্গীতটি যখন শুন্‌তে পাই, তখনি ঐ বীণাযন্ত্রের শেষ অর্থটি পাই—তা নইলে ও কেবল খানিকটা কাঠ এবং পিতল। জগতের এই বীণাযন্ত্রে আমরা সঙ্গীতও শুনেচি; শুধু কেবল নিয়ম নয়। সকাল বেলার আলোতে আমরা শুধু কেবল মাটিজল, শুধু কেবল কতকগুলো জিনিষ দেখ্‌তে পাই, তা নয়। সকাল বেলার শান্তি, স্নিগ্ধতা, সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা সে তো কেবল বস্তু নয়, সেই হ'চ্চে সকালের বীণাযন্ত্রের সঙ্গীত। তা'রই সুরে আমাদের হৃদয় পাখীর সঙ্গে

মিলে গান গাইতে চায়। যেখানে বীণা শুধু বীণা, সেখানে সে বস্তুমাত্র—কিন্তু যেখানে বীণায় সঙ্গীত ওঠে, সেখানে বীণার পিছনে আমাদের ওস্তাদ্‌জি আছেন। সেই ওস্তাদ্‌জির আনন্দই গানের ভিতর দিয়ে আমাদের আনন্দ দেয়। সৃষ্টির বীণা তো ওস্তাদ্‌জি বাজিয়ে চ'লেচেন, কিন্তু আমাদের নিজের চিত্তের বীণাও যদি সুরে না বাজে তাহ'লে আমাদের হৃদয়বীণার ওস্তাদ-জিকে চিন্‌বো কী ক'রে? তাঁর আনন্দরূপ দেখ্‌বো কী ক'রে? না যদি দেখি তাহ'লে কেবল বেসুর, কেবল ঝগড়া-বিবাদ, কেবল ঈর্ষা-বিদ্বেষ, কেবল কৃপণতা, স্বার্থ-পরতা, কেবল লোভ এবং ভোগের লালসা। আমাদের জীবনের মধ্যে যখন সঙ্গীত বাজে তখন নিজেকে ভুলে যাই। আমাদের জীবনযন্ত্রের ওস্তাদ্‌জিকেই দেখ্‌তে পাই। তখন দুঃখ আমাদের অভিভূত করে না, ক্ষতি আমাদের দরিদ্র ক'রে দেয় না, তখন ওস্তাদ্‌জির আনন্দের মধ্যে আমাদের জীবনের শেষ অর্থটি দেখ্‌তে পাই। সেইটি দেখ্‌তে পাওয়াই মুক্তি। সেইজন্যই তো চিত্তবীণায় সত্যসুরে তার বাঁধ্‌তে চাই, সেইজন্যে কঠিন চেষ্টায় মনকে বশ ক'র্‌তে চাই, চৈতন্যকে নির্ম্মল ক'রে তুল্‌তে চাই—সেইজন্যে নিজের স্বার্থ নিজের ক্ষুদ্র

আকাঙ্ক্ষা ভুলে হৃদয়কে স্তব্ধ ক'র্‌তে চাই—তা হ'লেই আমার সুরবাঁধা যন্ত্র ওস্তাদের হাতে বেজে উঠ্‌বে; আমাদের প্রার্থনা হ'চ্চে এই :—"তব অমল পরশ রস অন্তরে দাও।" তাঁর সেই স্পর্শের রসই হ'চ্চে আমাদের অন্তরের সঙ্গীত। তুমিও জানো, আমি সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই গান করি—

বীণা বাজাও হে, মম অন্তরে।
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে
আনন্দিত তান শুনাও হে, মম অন্তরে।

দুপুর বেলা খেতে গিয়ে দেখি, খাবার টেবিলে তোমার চিঠি আর সেই হিন্দী খবরের কাগজ র'য়েচে। তোমরা আলমোড়ায় যাচ্চো। ওখানে আমি অনেকদিন ছিলুম। তোমাদের ঠিকানা পেলে সেই ঠিকানায় লিখ্‌বো। আমি ভেবেছিলুম, তোমাদের স্কুলের ছুটির আগে তোমরা কোথাও যাবে না। কিন্তু দেখ্‌চি আমার ছেলেবেলাকার হাওয়া তোমাদের লেগেচে—তখন আমি কেবলি ইস্কুল পালিয়েচি। কিন্তু সাবধান আমার মতো মূর্খ হ'লে চ'ল্‌বে না—নাম্‌তা মনে থাকা চাই, আব সাইবীরিয়ার রাস্তা ভুল্‌লে কষ্ট পাবে।

১২

শান্তিনিকেতন

তুমি বোধ হয় এই প্রথম হিমালয়ে যাচ্চো। আমিও প্রায় তোমার বয়সে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ে গিয়েছিলুম। তা'র আগে ভূগোলে প'ড়েছিলুম, পৃথিবীতে হিমালয়ের চেয়ে উঁচু জিনিষ আর কিছু নেই, তাই হিমালয় সম্বন্ধে মনে মনে কত কী-যে কল্পনা ক'রেছিলুম তা'র ঠিক নেই। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মনটা একেবারে তোলপাড় ক'রেছিলো। অমৃতসর হ'য়ে ডাকের গাড়ি চ'ড়ে প্রথমে পাঠানকোটে গিয়ে প'ড়লুম। সেখানে পাহাড়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। তুমি কাঠ-গোদাম দিয়ে উপরে উঠেচো,—পাঠানকোট সেই রকম কাঠগোদামের মতো। সেখানকার ছোটো ছোটো পাহাড়গুলো, "কর, খল" "জল পড়ে, পাতা নড়ে",—এর বেশি আর নয়। তা'রপরে ক্রমে ক্রমে যখন উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম, তখন কেবল এই কথাই মনে হ'তে লাগ্‌লো, হিমালয় যত বড়োই হোক্ না, আমার কল্পনা তা'র চেয়ে তাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েচে; মানুষের প্রত্যাশার কাছে হিমালয় পাহাড়ই বা লাগে কোথায়?

আসল কথা, পাহাড়টা থাকে-থাকে উপরে উঠেচে ব'লে, ডাণ্ডি ক'রে চ'ড়তে চ'ড়তে, পর্ব্বতরাজের রাজমহিমা ক্রমে ক্রমে মনের মধ্যে স'য়ে আসে। যে-জিনিষটা খুব বড়ো, আমরা একেবারে তা'র সমস্তটা তো দেখ্‌তে পাইনে—পর্ব্বত ক্রমে ক্রমে দেখি, সমুদ্র ক্রমে ক্রমে দেখি—এমন কি, যে-মানুষ আমার চেয়ে বয়সে অনেক বেশি তা'র সেই বড়ো বয়সের সুদীর্ঘ বিস্তারটা এক সঙ্গে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এই জন্যে তফাৎ জিনিষটা কল্পনায় যত বড়ো, প্রত্যক্ষে তত বড়ো নয়। অর্থাৎ বড়ো হ'লেও বড়ো দেখা যায় না। আমাদের যে-ঠাকুরকে আমরা প্রণাম করি, তিনি যত বড়ো তা'র সমস্তটা যদি সম্পূর্ণ আমাদের সাম্‌নে আস্‌তো, তা-হ'লে সে আমরা সইতেই পারতুম না। কিন্তু হিমালয় পাহাড়ের মতো আমরা তাঁর বুকের উপর দিয়ে ক্রমে ক্রমে উঠি। যতই উঠি না কেন, তিনি আমাদের একেবারে ছাড়িয়ে যান না,—বরাবর আমাদের সঙ্গী হ'য়ে তিনি আমাদের আপনি উঠিয়ে নিতে থাকেন; বুদ্ধিতে বুঝ্‌তে পারি তিনি আমাদের ছাড়িয়ে আছেন, কিন্তু ব্যবহারে বরাবর তা'র সঙ্গে আমাদের সহজ আনাগোনা চ'ল্‌তে থাকে। তাই তো তাঁকে বন্ধু ব'ল্‌তে আমাদের কিছু ঠেকে না—

তিনিও তাঁর উপরের থেকে হেসে আমাদের বন্ধু বলেন। এত উপরে চ'ড়ে যান না-যে, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া দায় হ'য়ে ওঠে। তুমি যত জোরের সঙ্গে আমাকে সাতাশ বছরের ক'রে নিয়েচো, আমরা তা'র চেয়ে ঢের বেশি জোরে তাঁকে সাতও ক'র্‌তে পারি সাতাশও ক'র্‌তে পারি—আবার সাতাশ কোটি ক'র্‌লেও চলে; তিনি-যে আমাদের জন্য সবই হ'তে পারেন, তা নইলে তাঁকে দিয়ে আমাদের চ'ল্‌তোই না। তোমার পাহাড় কেমন লাগ্‌লো, আমাকে লিখো। হিমালয়ে আলমোড়া-পাহাড়ের চেয়ে ভালো পাহাড় ঢের আছে, আলমোড়া ভারি নেড়া পাহাড়; ওর গাছপালা নেই আর ওখানে থেকে হিমালয়ের তুষার-দৃশ্য তেমন ভালো ক'রে দেখা যায় না। ইতি ১লা ভাদ্র, ১৩২৫।

১৩

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি পেলুম। তখন তো আমার সময় থাকে না, তাই এখন খাওয়ার পরে লিখ্‌তে ব'সেচি। আর খানিক পরে ম্যাট্রিক্‌-ক্লাসের

ছেলেরা দল বেঁধে খাতাপত্র নিয়ে হাজির হবে। তুমি যে-নিয়ম ক'রে দিয়ে গিয়েছিলে, আজকাল সে আর পালন করা হ'য়ে ওঠে না ; খাওয়ার পরে দুপুর-বেলায় শোওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েচি—সেই ডেস্কের সাম্‌নে সেই চৌকি নিয়ে আমার দিন কাটে। সে জন্যে আমার নালিশ নেই, কাজের দরকার প'ড়লেই কাজ ক'র্‌তে হবে। পৃথিবীতে ঢের লোক আমার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করে—সেও আবার অফিসের কাজ—অর্থাৎ সে-কাজ পেটের দায়ে, মনের আনন্দে নয়। আমি-যে ছেলেদের পড়াই, সে তো দায়ে প'ড়ে নয়, সে নিজের ইচ্ছায়—অতএব এ রকম কাজ ক'র্‌তে পারা তো সৌভাগ্য। কিন্তু তবু এক একবার দরজার ফাঁকের ভিতর দিয়ে এই সবুজ পৃথিবীর একটা আভাস যখন দেখ্‌তে পাই তখন মনটা উতলা হ'য়ে ওঠে। আমি যে জন্মকুঁড়ে। যেমন বাঁশির ফাঁকের ভিতর দিয়ে সুর বেরোয়, তেমনি আমার কুঁড়েমির ভিতর থেকেই আমার যেটি আসল কাজ সেইটি জেগে ওঠে। আমার সেই আসল কাজই হ'চ্চে বাণীর কাজ। সময়টাকে কর্ত্তব্য দিয়ে ভরাট ক'রে একেবারে নিরেট ক'রে দিলে বাণী চাপা প'ড়ে যায়। সেই জন্যই আমাকে কেবল

কাজ থেকে নয়, সংসারের নানা জটিল বন্ধন থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাক্‌তে হয়। কাজই হোক্, আর মানুষই হোক্, আমাকে একেবারে চাপা দিলে বা বেঁধে ফেল্লে আমার জীবন ব্যর্থ হ'তে থাকে। আমার মন ওড়্‌বার জন্যে শূন্যকে চায়। তাকে খাঁচায় বাঁধ্‌বার আয়োজন যতবার হ'য়েচে, সেই আয়োজনের শিকল ছিন্ন হ'য়ে প'ড়ে গেচে। হঠাৎ একদিন দেখ্‌তে পাবে আমার কাজকর্ম্মের দাঁড়খানা তা'র শিকল নিয়ে কোথায় প'ড়ে আছে, আর আমি অত্যুচ্চ অবকাশের আগ্‌ডালের উপর অসীম ফাঁকার মধ্যে এক্‌লা ব'সে গান জুড়ে দিয়েচি। তাই ব'ল্‌চি—দরজা-জান্‌লার আড়াল থেকে ঐ নীলে-সবুজে-সোনালিতে মেশানো ফাঁকার একটা অংশ যেম্‌নি দেখ্‌তে পাই, অম্‌নি আমার মন ডেস্কের ধার থেকে ব'লে ওঠে—ঐখানেই তো আমার জায়গা, ঐ ফাঁকাটাকে-যে আমার আনন্দ দিয়ে, গান দিয়ে ভ'রে তুল্‌তে হবে। পুকুর আছে মাটির বাঁধ দিয়ে ঘেরা—সেইখানেই তা'র কাজ, কেউবা স্নান ক'র্‌চে, কেউবা জল তুল্‌চে, কেউবা বাসন মাজ্‌চে। কিন্তু আমি হ'চ্চি মেঘের মতো; আমাকে তো তটের ঘের দিলে চ'ল্‌বে না, আমাকে বাঁধ্‌তে গেলে

তো বাঁধা প'ড়বো না!—আমাকে-যে ঐ শূন্যের ভিতর দিয়ে বর্ষণ ক'র্‌তে হবে। সব সময়েই-যে বৃষ্টি ভ'রে আসে তা নয়, অনেক সময়ে অলস-স্বপ্নের মতো সূর্য্যের আলোতে রঙিয়ে উঠে কিছুই না ক'রে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু এই কুঁড়েমিটুকু উপর থেকে আমার জন্যে বরাদ্দ হ'য়ে গেচে, এজন্যে আমি কারো কাছে দায়িক নই। সবই তো বুঝ্‌লুম, কিন্তু কুঁড়েমি করি কখন বলো তো? তুমি তো দেখেই গেচো কাজের আর অন্ত নেই। ঘোড়াকে বিধাতা বাতাসের মতো দ্রুতগামী এবং মুক্ত ক'রে সৃষ্টি ক'রেছিলেন, কিন্তু সেই ঘোড়াকেই মানুষ জিনে লাগামে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলে। আমারও সেই দশা। বিধাতার ইচ্ছা ছিল—আমি ভরপূর কুঁড়েমি ক'রে কাটাই, কিন্তু যে-গ্রহের হাতে প'ড়েচি, সে আমাকে ক'ষে খাটিয়ে নিচ্চে। বয়স যখন অল্প ছিল, তখন খাটুনি এড়িয়ে, ইস্কুল পালিয়ে পদ্মার নির্জ্জন চরে বোটের মধ্যে লুকিয়ে বেশ চালাচ্ছিলুম—কিন্তু যখন থেকে তোমার পঞ্জিকা অনুসারে আমার 'সাতাশ' বছর বয়স হ'য়েচে, তখন থেকেই কাজের টানে আপনি ধরা দিয়ে কেটে বেরোবার আর পথ পাইনে। নইলে আগেকার মতো হ'লে আমার পক্ষে আলমোড়ায় যেতে

কতক্ষণ লাগ্‌তো বলো ? তবু তোমরা সেই পাহাড়ের উপরে মুক্ত হাওয়ায় স্বাস্থ্য এবং আনন্দ ভোগ ক'র্‌চো এ কথা মনে ক'রে ভালো লাগ্‌চে ; তোমার চিঠি সেখানকার লাল ফুলের পাপ্‌ড়িতে রাগ-রক্ত হ'য়ে আমার হাতে এসে পৌঁচচ্চে। সেখানকার ফুলে যে-রক্তিমা দেখ্‌তে পাচ্চি, তোমার গালে সেই রক্তিমা সংগ্রহ ক'রে আন্‌বে—এই আশা ক'রে আছি। আজ আর সময় নেই—অতএব ইতি। ১১ই ভাদ্র, ১৩২৫।

১৪

শান্তিনিকেতন

আমাদের এখানে প্রায়ই খুব বৃষ্টি হ'চ্চে। এক একদিন বিষম জোরে বাতাস দেয় আর বৃষ্টির ধারা-গুলো বেঁকে একেবারে তীরের মতো সিধে ঘরের মধ্যে চ'লে আসে। এখানে গরম নেই ব'ল্লেই হয়—আর চারিদিকের মাঠ একেবারে ঘন সবুজ হ'য়ে উঠেচে। বোলপুরকে এত সবুজ আমি আর কখনোই দেখিনি। গাছগুলো নিবিড় পাতার ভারে থাকে-থাকে ফুলে উঠেচে—ঠিক যেন সবুজ মেঘের ঘটার মতো। আমাদের

বিদ্যালয়ের কুয়োগুলো প্রায় কানায় কানায় ভরা। এবারে চারিদিকে অনেক গাছ পুঁতে দিয়েচি। সে-গুলো যখন বড়ো হ'য়ে উঠ্‌বে, তখন আমাদের আশ্রম আরও সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌বে। কিন্তু এখানকার শুক্‌নো বেলেমাটিতে গাছপালা ভারি দেরিতে বেড়ে ওঠে—আমি আটাশ বছরে পড়বার আগে এ সব গাছে ফুলধরা দেখ্‌তে পাবো না। তুমি যদি নবেম্বরে আমাদের আশ্রমে আসো, তা হ'লে ততদিনে এখানে অনেক বদল দেখ্‌তে পাবে। এ বৎসরটা আমাদের আশ্রমের পক্ষে খুব তেজের বৎসর ;—যেমন ঘন ঘন বৃষ্টিতে গাছপালা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌চে, তেম্‌নি এখানকার কাজের দিকেও খুব একটা উৎসাহ প'ড়ে গেচে। পড়াশুনো কাজকর্ম্ম যেন নতুন জোর পেয়েচে ; সেই জন্যে ছেলেদের মধ্যেও খুব একটা আনন্দ জেগে উঠেচে। আমি-যে আমেরিকায় যাবার টিকিট কিনেও গেলুম না, এখানে থেকে গেলুম, তা'র পুরস্কার পেয়েচি। আমাদের আশ্রম-লক্ষ্মী বোধ হয় আমার অদৃষ্টের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে আমার বিদেশে-যাওয়া কাটিয়ে দিয়েচেন। খুব ভালোই হ'য়েচে। আমি "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" ইংরেজিতে তর্জ্জমা ক'রেচি, তা

জানো ; এণ্ড্রুজ্ সে-টা প'ড়ে খুব হেসেচেন, আর খুব লাফালাফি ক'রেচেন ; ইতি ১৬ই ভাদ্র, ১৩২৫।

১৫

শান্তিনিকেতন

কাল রাত্রি থেকে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন—মাঝে মাঝে প্রবল জোরে বর্ষণ নেমে আস্‌চে—অম্‌নি দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত মাঠ জলে ছল্ ছল্ ক'রে উঠ্‌চে—থেকে থেকে অশান্ত বাতাস সোঁ সোঁ ক'রে হুহু ক'রে আমাদের শালবনের ডালপালাগুলোর মধ্যে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে লুটিয়ে প'ড়্‌চে—ঠিক যেন আকাশের অনেক দিনের একটা চাপা বেদনা কিছুতেই আর চাপা থাক্‌চে না। ওদিকে দিগন্তের কোণে কোণে রাগী-রকমের ভ্রূকুটি দেখা দিয়েচে—আর তা'র মধ্য দিয়ে একটা ফ্যাকাশে আলো দারুণ হাসির মতো। সবশুদ্ধ জলে-স্থলে একটা ক্ষ্যাপাটে রকমের ভাব। মনে হ'চ্চে যেন ছুটন্ত উচ্চৈশ্রবার উপরে চ'ড়ে ইন্দ্রদেব একটা ঘূর্ণাঝড়ের চক্র পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে মেরেচেন। বাতাসের আর্ত্তনাদ আর তা'র বেগ ক্রমেই বেড়ে

উঠ্‌চে—একটা রীতিমতো ঝড়ের আয়োজন ব'লেই বোধ হ'চ্চে। আমার এই দোতালার কোণটি ঝড়ের পক্ষে খুব-যে ভালো আশ্রয়—তা নয়। আধুনিক কালের যুদ্ধক্ষেত্রের trench-এর মতো যথেষ্ট প্রকাশ্যও নয়, যথেষ্ট প্রচ্ছন্নও নয়—ভালো ক'রে ঝড়টা দেখ্‌তে পাচ্চিনে, অথচ ঝড়ের ঝাপট থেকে ভালো ক'রে রক্ষাও পাচ্চিনে। সিঁড়ির সাম্‌নের দরজাটা বন্ধ ক'র্‌তে হ'য়েচে, ঘরের দরজাও সব বন্ধ—অন্ধকার, কোথা থেকে বেঁকেচুরে একটু বৃষ্টির ঝাপটও আস্‌চে। রুদ্রদেবের তাণ্ডবনৃত্যের এই ডমরু-ধ্বনির মধ্যে ব'সে তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি।

সেদিন তুমি আমাকে লিখেছিলে-যে, তুমি আমার অনেক নতুন নতুন নাম ঠিক ক'রে রেখেচো। ক্রমে একে একে বোধ হয় শুন্‌তে পাবো, কিন্তু আমার আসল নামটা যেন একেবারে চাপা না প'ড়ে যায়,—কেন না, ঐ নামটা নিয়ে এতদিন একরকম কাজ চালিয়ে এসেচি। তা ছাড়া ওর একটা মস্ত সুবিধা এই-যে, কবির সঙ্গে রবির একটা মিল আছে;—এর পরে যারা আমার নামে কবিতা লিখ্‌বে, তাদের অনেকটা কষ্ট বাঁচ্‌বে। ইতি—২০শে ভাদ্র, ১৩২৫।

১৬

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি এইমাত্র পেলুম। আজ আমার চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্গের পুরাতন পড়ার দিন, আজ সন্তোষের হাতে তাদের ভার; এইজন্যে আমার সকালের কাজের প্রথম দুই ভাগ আমার ছুটি, তাই এখনি তোমার চিঠির জবাব দিতে বস্‌বার সময় পেলুম। সেদিন যখন তোমাকে লিখ্‌ছিলুম, তখন আকাশ জুড়ে মেঘের হাঁক্‌ডাক্ এবং মাঠে-বনে পাগ্‌লা হাওয়ার দৌরাত্ম্য চ'ল্‌ছিলো; আজ সকালে তা'র আর কোনো চিহ্ন নেই, আজ শরৎকালের প্রসন্ন মূর্ত্তি প্রকাশ পেয়েচে—শিবের জটা ছাপিয়ে যেন গঙ্গা ঝ'রে প'ড়্‌চে, —আকাশে তেম্‌নি আজ আলোকের নির্ম্মল ধারা ঢেলে দিয়েচে, পৃথিবী আজ মাথা নত ক'রে তা'র অশ্রু-আর্দ্র হৃদয়খানি মেলে দিয়েচে, আর আকাশের কোন্ তরুণ দেবতা হাসিমুখে তা'র উপরে এসে দাঁড়িয়েচেন। জলস্থল শূন্যতল আজ একটি জ্যোতির্ম্ময় মহিমায় পূর্ণ হ'য়ে উঠেচে। সেই পরিপূর্ণতায় চারিদিক শান্ত স্তব্ধ, অথচ গোলমাল-যে কিছু নেই, তা নয়। জাগ্রত

প্রভাতের কাজকর্ম্মের কলধ্বনি উঠেচে। আমার ঠিক সাম্‌নেই 'দিনুবাবুর' ঘরের দোতালায় রাজমিস্ত্রী ও মজুরের দল নানারকম ডাক্‌হাঁক্ এবং ঠুক্‌ঠাক্ লাগিয়ে দিয়েচে। দূরে থেকে ছেলেদের কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্চে, পূবদিকের সদর রাস্তা দিয়ে সার-বাঁধা গোরুর গাড়ি ইটের বোঝা নিয়ে আস্‌চে, তা'রই অনিচ্ছুক চাকার আর্ত্তনাদ এবং গাড়োয়ানের তর্জ্জন-ধ্বনির বিরাম নেই, তা'র উপরে ঠিক আমার পিছনের জানালার বাইরে সুধাকান্তর ঘরের চালের উপরে ব'সে একদল চড়ুই-পাখী কিচিমিচি ক'রে কী-যে বিষম তর্ক বাধিয়ে দিয়েচে, তা'র একবর্ণ বোঝ্‌বার জো নেই,—প্রায় ন্যায়শাস্ত্রেরই তর্কের মতো। কিন্তু তবু আজ আলোকে অভিষিক্ত আকাশের এই অন্তরতর স্তব্ধতা কিছুতেই যেন ভাঙ্‌তে পারচে না। গায়ের উপর দিয়ে হাজার হাজার যে-সব ঝরণা ঝ'রে প'ড়্‌চে, তাতে যেমন হিমালয়ের অভ্রভেদী স্তব্ধতাকে বিচলিত করে না, এও ঠিক সেই রকম। একটি তপঃ-প্রদীপ্ত অপরিমেয় মৌনকে বেষ্টন ক'রে এই সমস্ত ছোটো ছোটো শব্দের দল খেলা ক'রে চ'লেচে—তাতে তপস্যার গভীরতা আরো বড়ো হ'য়ে প্রকাশ পাচ্চে, নষ্ট হ'চ্চে না। শরতের

বনতল যেমন নিঃশব্দে-ঝ'রে-পড়া শিউলিফুলে আকীর্ণ হ'য়ে ওঠে, তেম্‌নি ক'রেই আমার মনের মধ্যে আজ শরৎ-আকাশের এই আলো শুভ্র শান্তি বর্ষণ ক'র্‌চে। ইতি ২৪শে ভাদ্র, ১৩২৫।

১৭

শান্তিনিকেতন

গেল বুধবারে সকালে আমি মন্দিরে কী ব'লেছিলুম, শুন্‌বে? আমি ব'লেছিলুম, মানুষের ছোটো আর বড়ো—ছুই-ই আছে। সেই ছোটো মানুষটি জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে কয়দিনের জন্যে আপনার একটি ছোটো সংসার পেতেচে—সেইখানে তা'র যত খেলার পুতুল সাজানো—সেইখানে তা'র প্রতিদিনের আহরণ জমা হ'চ্চে আর ক্ষয় হ'চ্চে। কিন্তু মানুষের ভিতরকার বড়োটি জন্ম-মৃত্যুর বেড়া ডিঙিয়ে চিরদিনের পথে চ'লেচে, এই চল্‌বার পথে তা'র কত সুখ-দুঃখ, কত লাভ-ক্ষতি ঝ'রে প'ড়ে মিলিয়ে যাচ্চে। পৃথিবীর ছুটি আবর্ত্তন আছে,—একটি আহ্নিক, একটি বার্ষিক। একটি আবর্ত্তনে সে আপনাকেই ঘুর্‌চে, আর একটিতে সে

নিজের চিরপথের কেন্দ্রস্থিত আলোকের উৎসকে প্রদক্ষিণ ক'র্‌চে। নিজেকে ঘোরবার সময় সূর্য্যের দিকে পিঠ ফেরাতেই দেখ্‌তে পায়-যে, তা'র নিজের কোনো আলো নেই, তা'র নিজের দিকে অন্ধতা, ভয়, জড়তা,—কিন্তু নিজের সেই অন্ধকারটুকুকে না জান্‌লে সূর্য্যের সঙ্গে তা'র সম্বন্ধের পূর্ণ পরিচয় সে পেতো না। আমরাও আমাদের ছোটো আবর্ত্তনে নিজেকে ঘুরি ; এ ঘোরাতেই জান্‌তে পারি, আমার দিকে অন্ধকার, বিভীষিকা, মোহ, আমার দিকে ক্ষুদ্রতা ; কিন্তু সেই জানার সঙ্গে সঙ্গেই যখন সেই অমৃতের উৎসকে জানি, তখন অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে আমরা যেতে থাকি। এইজন্যে আপনাকে আর তাঁকে দুইকেই একসঙ্গে জান্‌তে থাক্‌লে তবেই আমরা আমাদের বন্ধনকে নিয়ত অতিক্রম ক'র্‌তে ক'র্‌তে, মুক্তির স্বাদ পেতে পেতে, অমৃতের পাথেয় সংগ্রহ ক'র্‌তে ক'র্‌তে চিরদিনের পথে চ'ল্‌তে পারি। আমাদের ক্ষুদ্র-প্রতিদিন আমাদের বৃহৎ-চিরদিনকে প্রণাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'ল্‌তে থাক্‌বে, আমাদের ক্ষুদ্র-প্রতিদিন তা'র সমস্ত আহরণ-গুলিকে বৃহৎ-চিরদিনের চরণে সমর্পণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে

চ'ল্‌বে। কিন্তু ক্ষুদ্র প্রতিদিন যদি এমন কথা ব'লে বসে-যে, আমি যা পাই, যা আনি, সব আমি নিজে জমাবো, তা হ'লেই বিপদ বাধে,—কেন না, তা'র জমাবার জায়গা কোথায়? তা'র মধ্যে এত ধরে কোথায়? তা'র এমন অক্ষয় পাত্র আছে কোন্‌খানে? পৃথিবী যেমন তা'র সোনায়-ভরা সকালটিকে এবং সোনায়-ভরা সন্ধ্যাটিকে নিজে জমিয়ে রেখে দেয় না, পূজার স্বর্ণ-কমলের মতো আপন সূর্য্য-প্রদক্ষিণের পথে প্রত্যহ প্রণাম ক'রে উৎসর্গ ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'লেচে, আমাদেরও তেম্‌নি এই ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ ভালোবাসাকে চিরদিনের চল্‌বার পথে চিরদিনের দেবতাকে উৎসর্গ ক'র্‌তে ক'র্‌তে যেতে হবে :—তা হ'লেই ছোটো-আমির সঙ্গে বড়ো-আমির মিল হবে, তা' হ'লেই আমাদেব ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হবে; আপনার দিকে সমস্ত টান্‌তে গেলেই সে-টান টেকে না, সেই বিদ্রোহে ছোটো-আমিকে একদিন পরাস্ত হ'তেই হয়। এইজন্য ছোটো-আমি জোড়হাতে প্রার্থনা ক'র্‌চে নমস্তেঽস্তু,—বড়োকে আমার নমস্কার সত্য হোক্, নিজের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পাই। ইতি ২৯শে ভাদ্র, ১৩২৫।

১৮

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি পেয়েছিলুম, কিন্তু তখনি তা'র জবাব দেবার সময় পাইনি। দুপুর বেলাতেও খাবার পরে কিছু কাজ ছিল, তাই এখন বিকেলে তোমাকে তাড়াতাড়ি লিখ্‌তে ব'সেচি—ডাক যাবার আগে শেষ ক'রে ফেল্‌তে হবে। আজকাল আর বৃষ্টির কোনো লক্ষণ নেই—আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেচে। আমার সেই লেখ্‌বার কোণটা তো তুমি জানো—সেটা হ'চ্চে পশ্চিমের বারান্দা; সেখানে বিকেলের দিকে হেলে-পড়া সূর্য্যের সমস্ত কিরণ বন্ধ-দরজার উপরে ঘা দিতে থাকে—সশরীরে ঢুক্‌তে পায় না বটে, কিন্তু তা'র প্রতাপ অনুভব ক'র্‌তে পারি। তুমি এখন যেখানে আছো, সেখান থেকে আমার পিঠের দিকের বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক আন্দাজ ক'র্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু আমার আকাশের মিতাটি আমার সঙ্গে যেম্‌নি ব্যবহার করুন, তাঁর সঙ্গে আমার কখনই বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয়নি। আমি চিরদিন আলো ভালোবাসি। গাজিপুরে, পশ্চিমের গরমেও, আমি দুপুর বেলায়

আমার ঘরের দরজা বন্ধ করিনি। অনেক দিন বর্ষার আচ্ছাদনের পর সেই আলো পেয়েচি,—সেই আলো আজ আমার দেহের মধ্যে, মগজের মধ্যে, মনের মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌চে। আমার সাম্‌নে পূর্ব্বদিকের ঐ খোলা দরজা দিয়ে ঐ আলো নীল আকাশ থেকে আমার ললাটে এসে প'ড়েচে, আর সবুজ ক্ষেতের উপর দিয়ে এসে আমার দুই চোখের সঙ্গে সঙ্গে যেন কানে-কানে কথা ব'ল্‌চে। পৃথিবীর ইতিহাসে কত হানাহানি কাটাকাটি হ'য়ে গেল, মানুষের ঘরে-ঘরে কত সুখ-দুঃখ, কত মিলন-বিচ্ছেদ, কত যাওয়া-আসার বিচিত্র লীলা প্রতিদিন বিস্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে গেল, কিন্তু এই শরতের সবুজটি পৃথিবীর প্রসারিত অঞ্চলের উপরে যুগে-যুগে বর্ষে-বর্ষে আপন আসন অধিকার ক'রেচে,—কিছুতেই এই সুগভীর শান্তি সৌন্দর্য্যের পরে, এই রসপরিপূর্ণ নির্ম্মলতার উপরে, কোনো আঘাত ক'র্‌তে পারেনি। সেই কথা যখন মনে করি, তখন সাম্‌নের ঐ আকাশের দিকে চেয়ে যুগযুগান্তরের সেই শান্তি আমার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত ক্ষোভকে আপন অসীমতার মধ্যে মিশিয়ে নেয়।

আমি বুধবারে কী বলি তাই তুমি শুন্‌তে

চেয়েচো। যা বলি তা আমার ভালো মনে থাকে না। এণ্ড্রুজ্ উপাসনার পরেই আমার কাছে এসে একবার ইংরেজিতে তা'র ভাবখানা শুনে নেন, তাই খানিকটা মনে পড়ে। এবারে ব'লেছিলুম, জগতে একটা খুব বড়ো শক্তি হ'চ্চে প্রাণ, অথচ সেই শক্তি বাইরের দিক থেকে কত ছোটো, কত সুকুমার, একটু আঘাতেই ম্লান হ'য়ে যায়। এমন জিনিষটা প্রতি মুহূর্ত্তে বিপুল জড়-বিশ্বের ভারাকর্ষণের সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তে লড়াই ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্চে।

বালক অভিমন্যু যেমন সপ্তরথীর ব্যূহে ঢুকে লড়াই ক'রেছিলো, আমাদের সুকুমার প্রাণ তেম্‌নি অসংখ্য মৃত্যুর সৈন্যদলের মধ্যে দিয়ে অহর্নিশি লড়াই ক'রে চ'লেচে। বস্তুর দিক থেকে দেখ্‌লে দেখা যায়, এই প্রাণের উপকরণ অতি তুচ্ছ,—খানিকটা জল, খানিকটা কয়লা, খানিকটা ছাই, খানিকটা ঐ রকম সামান্য কিছু, অথচ প্রাণ আপনার ঐ বস্তুর পরিমাণকে বহু পরিমাণে অতিক্রম ক'রে আছে। মৃত-দেহে সজীব-দেহে বস্তু-পিণ্ডের পরিমাণের তফাৎ নেই, অথচ উভয়ের মধ্যকার তফাৎ অপরিসীম। শুধু তাই নয়, সজীব বীজের বর্ত্তমান আবরণের মধ্যে মহারণ্য লুকিয়ে আছে।

ছোটোর মধ্যে এই-যে বড়োর প্রকাশ, এই হ'চ্চে আশ্চর্য্য। আরেক শক্তি হ'চ্চে, মনের শক্তি। এই মনটি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় নিয়ে এই অসীম জগতের রহস্য আবিষ্কার ক'র্‌তে বেরিয়েচে। সেই ইন্দ্রিয়গুলি নিতান্ত দুর্ব্বল। চোখ কতটুকুই দেখে, কান কতটুকুই শোনে, স্পর্শ কতটুকুই বোধ করে। কিন্তু মন এই আপন ক্ষুদ্রতাকে কেবলি ছাড়িয়ে যাচ্চে —অর্থাৎ সে যা, সে তা'র চেয়ে অনেক বড়ো। তা'র উপকরণ সামান্য হ'লেও সে অতি-ক্ষুদ্র এবং অতি-বৃহৎ অতি-নিকট এবং অতি-দূরকে কেবলি অধিকার ক'র্‌চে। তা ছাড়া, তা'র মধ্যে যে-ভবিষ্যৎ প্রচ্ছন্ন, সেও অপরিমেয়। একটি ছোটো শিশুর মনের মধ্যেই নিউটনের, সেক্‌স্‌পীয়ারের মন লুকিয়ে ছিল। বর্ব্বরতার যে-মন পাঁচের বেশি গণনা ক'র্‌তে পার্‌তো না, তারি মধ্যে আজকের সভ্যতার মন জ্ঞানের সাধনায় অভাবনীয় সিদ্ধিলাভ ক'রেচে। শুধু তাই নয়, আরো ভবিষ্যতে সে-যে আরো কী আশ্চর্য্য চরিতার্থতা লাভ ক'র্‌বে, আজ আমরা তা কোনোমতেই কল্পনা ক'র্‌তে পারিনে। তা হ'লেই দেখা যাচ্চে, আমাদের এই-যে মন, যা এক দিকে খুব ছোটো, খুব দুর্ব্বল দেখ্‌তে, আর একদিকে

তা'র মধ্যে যে-ভূমা আছে, হিমালয়-পর্ব্বতের প্রকাণ্ড আয়তনের মধ্যে তা নেই। তেম্‌নি আমাদের আত্মা ছোটো-দেহ, ছোটো-মন, ছোটো-সব প্রবৃত্তি দিয়ে ঘেরা, অনেক সময় তাকে যেন দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না। কিন্তু তবু তা'র মধ্যেই সেই ভূমা আছেন। সেইজন্যেই তো এক দিকে আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আমাদের রাগ-বিরাগ যখন আমাদের কাছে অন্ন-বস্ত্র ও অন্য হাজার-রকম বাসনার জিনিষের জন্যে দরবার ক'র্‌চে, সেই মুহূর্ত্তেই এই প্রবৃত্তির দাস, এই বাসনার বন্দী, বিশ্বের সমস্ত সম্পদ পায়ের নীচে ফেলে, উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা ক'রেচে,—অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, যা অসীম একেবারে তাকেই চাই। এত বড়ো চাওয়ার জোর এতটুকুর মধ্যে আছে কোথায়? সে-জোর যদি না থাক্‌তো, তবে এত বড়ো কথা তা'র মুখ দিয়ে বেরোতো কেমন ক'রে? এ-কথার কোনো মানে সে বুঝ্‌তো কী ক'রে? আশ্চর্য্য ব্যাপার হ'চ্চে এই-যে, মানবের আত্মা যা নিয়ে দেখ্‌চে, শুন্‌চে, ছুঁচ্চে, খাওয়া-পরা ক'র্‌চে, তাকেই চরম সত্য ব'ল্‌তে চাচ্চে না;—যাকে চোখে দেখ্‌লো না, হাতে পেলো না, তাকেই ব'ল্‌চে সত্য। তা'র একটি মাত্র কারণ, ছোটোর মধ্যেই

বড়ো আছেন, সেই বড়োই ছোটোর ভিতর থেকে মানুষের আত্মাকে কেবলি মুক্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্চেন—তাই মানুষের আশার অন্ত নেই। এখন প্রত্যেক মানুষের কাজ হচ্চে কী? নিজের কথায়, চিন্তায়, ব্যবহারে এইটেই যেন প্রকাশ করি-যে, আমাদের মধ্যে সেই বড়োই সত্য। তা না ক'রে যদি মানুষের ছোটোটার উপরেই ঝোঁক দিই,—যে-সব বাসনা তা'র শিকল, তা'র গণ্ডী, যাতে তাকে খর্ব্ব করে, আচ্ছন্ন করে, তাকেই যদি কেবল প্রশ্রয় দিই,—তা হ'লে মানুষকে তা'র সত্য পরিচয় থেকে ভোলাই। আত্মা-যে অমর, আত্মা-যে অভয়, আত্মা-যে সমস্ত সুখ-দুঃখ, ক্ষতি-লাভের চেয়ে বড়ো, অসীমের মধ্যেই-যে আত্মার আনন্দনিকেতন, এই কথাটি প্রকাশ করাই হ'চ্চে মানুষের সমস্ত জীবনের অর্থ; এই জন্যেই আমরা এত শক্তি নিয়ে এত বড়ো জগতে জন্মেচি,—আমরা ছোটোখাটো এটা-ওটা-সেটা নিয়ে ভেবে কেঁদে ম'র্‌তে আসিনি। ইতি, ৪ঠা আশ্বিন, ১৩২৫।

১৯

শান্তিনিকেতন

তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেচো, "রবিদাদা" না ব'লে আমাকে আর একটা কোনো নামে সম্ভাষণ ক'র্‌তে পারো কিনা? মহাভারতের সময়ে মানুষের এক-একজনের দশ-বিশটা ক'রে নাম থাক্‌তো, যার যেটা পছন্দ বেছে নিতে পার্‌তো। কিম্বা যে-ছন্দে যেটা মেলাবার সুবিধে, লাগিয়ে দিতো। অর্জ্জুনের কত নাম-যে ছিল, তা অর্জ্জুনকে রোজ বোধ হয় নাম্‌তা মুখস্থ করার মতো মুখস্থ ক'র্‌তে হ'তো। আমার-যে আকাশের মিতাটি আছেন, তাঁরও নামের অভাব নেই। যদি তাঁর দুটো-একটা নাম ধার ক'রে নিতে চাও, তা হ'লে বোধ হয় তাঁর বিশেষ কিছু লোকসান হবে না। কিন্তু যখন নামকরণ ক'র্‌বে, তখন আমার সম্মতি নিলে ভালো হয়। প্রথম যখন আমার নামকরণ হয়, তখন কেউ আমার সম্মতি নেয়নি, তবু দেখ্‌তে পাচ্চি নামটা মন্দ হয়নি,—কিন্তু হঠাৎ যদি তোমার মার্ত্তণ্ড নামটাই পছন্দ হয়, তা হ'লে কিন্তু আমি আপত্তি ক'র্‌বো। 'ভানু' নামটা যদিচ খুব সুশ্রাব্য নয়, তবু ওটা আমি একবার

৪

নিজেই গ্রহণ ক'রেছিলুম। আর এক হ'তে পারে, যদি "কবিদাদা" বলো। নামটা ঠিক সঙ্গত হোক্ বা না হোক্, ওটা আমার নিজের কাজের সঙ্গে মেলে—

এক-যে ছিল রবি,
সে গুণের মধ্যে কবি।

কিন্তু একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি, "প্রিয় কবিদাদা" ব'ল্লে চ'ল্‌বে না। প্রথম কারণ হ'চ্চে এই—যে, তোমার প্রিয় কবি-যে কে, তা আমি ঠিক জানিনে। খুব সম্ভব যে-লোকটা সেই আশ্চর্য্য হিন্দী দোঁহা লিখেছিলো সেই হবে। তা'র সঙ্গে ছ-অক্ষরের অনুপ্রাসে আমি-যে কোনোদিন পাল্লা দিতে পার্‌বো, এমন শক্তি বা আশা আমার নেই। দ্বিতীয় কারণ হ'চ্চে এই-যে, ইংরেজিতে 'প্রিয়' বলে না এমন মানুষই নেই—সে অমানুষ হ'লেও তাকে বলে,—এমন কি সে যদি দোঁহা না লিখ্‌তে পারে তবুও। আমার মত হ'চ্চে এই-যে, রাস্তা-ঘাটের সবাইকেই যদি 'প্রিয়' ব'ল্‌তে হবে এমন নিয়ম থাকে, তবে তুই-এক জায়গায় সে-নিয়মটা বাদ দেওয়া দরকার। অতএব আমাকে যদি শুধু "রবিদাদা" বলো, তা হ'লে আমি বারণ ক'র্‌বো না। এমন কি, যদি তোমার মার্ত্তণ্ড নামটাই পছন্দ হয়, তা হ'লে "প্রিয়

মার্ত্তণ্ড দাদা” লিখো না। তা হ’লে বরঞ্চ লিখো, “মার্ত্তণ্ডদাদা, প্রচণ্ড প্রতাপেষু।” যদি কোনোদিন তোমার সঙ্গে রাগারাগি করি, তা হ’লে ঐ নামে ডাক্‌লেই হবে।

আমাদের আশ্রমের আকাশে শারদোৎসব আরম্ভ হ’য়েচে—শিউলিবন সাড়া দিয়েচে, মালতীলতার পাতায় পাতায় শুভ্রফুলের অসংখ্য অনুপ্রাস, কিন্তু রাত্রে চাঁদের আলোয় আকাশ-জোড়া একখানি মাত্র শুভ্রতা। আমাদের লাল রাস্তার দুইধারে কাশের গুচ্ছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বাতাসে মাথা নত ক’রে ক’রে পথিকদের শারদ-সঙ্গীত শুনিয়ে দিচ্চে। সমস্ত সবুজ মাঠে, সমস্ত শিশির-সিক্ত বাতাসে উৎসবের আনন্দ-হিল্লোল ব’য়ে যাচ্চে। অন্তরে বাইরে ছুটি, ছুটি, ছুটি—এই রব উঠেচে। ছুটিরও আর কেবল দুই সপ্তাহ বাকি আছে। আমাদের যখন ছুটি আরম্ভ, তখন তোমাদের শৈলপ্রবাস বোধ হয় সাঙ্গ হবে। পার্ব্বতী যখন হিমালয়ে তাঁর পিতৃভবনে যাবেন, তখন তোমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সেখানে থাক্‌বে না। কিন্তু হিমালয়ের খবর আমরা রাখিনে, কৈলাসের তো নয়ই; আমরা তো এই স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি, স্বর্ণকিরণচ্ছটায় শারদা

আমাদেরই ঘর উজ্জ্বল ক'রে দাঁড়িয়েচেন। গোটা-কতক মেঘ দিগন্তের কোণে মাঝে মাঝে জটলা করে; কিন্তু তাদের নন্দী-ভৃঙ্গীর মতো কালো চেহারা নয়, তা'রাও শ্বেতকিরণের মালা প'রেচে, শ্বেত চন্দনের ছাপ লাগিয়েচে—ললাটে ভ্রূকুটির লেশ নেই। ইতি, ৬ই আশ্বিন, ১৩২৫।

২০

শান্তিনিকেতন

প্রথম যখন তোমার চিঠি পেয়েছিলুম, তোমার চিঠিতে "প্রিয় রবিবাবু" প'ড়ে ভারি মজা লেগেছিলো। ভাব্‌লুম রবিবাবু আবার "প্রিয়" হবে কেমন ক'রে? যদি হ'তো "প্রিয় মিষ্টার ট্যাগোর", তা হ'লে তেমন বেমানান হ'তো না; কেন না রবিবাবু প্রিয়ও হ'তে পারে, অপ্রিয়ও হ'তে পারে, এবং প্রিয় অপ্রিয় দুইয়ের বাহিরও হ'তে পারে। তুমি যখন চিঠি লিখেছিলে, তখন রবিবাবু প্রিয়ও ছিল না, অপ্রিয়ও ছিল না, নিতান্ত কেবলমাত্র রবিবাবুই ছিল। কিন্তু চিঠির ভাষায় মিষ্টার ট্যাগোরের 'প্রিয়' ছাড়া আর কিছু

হবার জো নেই, তা আমার সঙ্গে তোমার ঝগ্‌ড়াই থাক্ আর ভাবই থাক্। আজকাল রবিবাবু পরীক্ষায় একেবারে দু-তিন ক্লাশ উঠে “রবিদাদা” হ’য়েচে, কিন্তু যদি “প্রিয় রবিদাদা” লেখো, তবে তোমার সঙ্গে আমার ঝগ্‌ড়া হবে। আর যদি বিশুদ্ধ বাংলামতে ‘প্রিয়’ লেখা হয়, তা হ’লে আপত্তি নেই বটে, তবু যখন আমি “রবিদাদা” তখন ওটা বাদ দিলেও চলে— ও যেন সকালবেলায় বাতি জ্বালানো, যেন, যার ফাঁসি হ’য়েচে, তাকে কুড়ি বৎসর দ্বীপান্তর দেওয়া। অতএব আমি যেন থানধুতি-পরা ঠাকুরদাদা, আমার কোনো পাড় নেই, আমি নিতান্তই যেন সাদা “রবিদাদা,” কী বলো?

তোমরা মুক্তেশ্বরে গেচো শুনে সুখী হ’লুম। আমি ভ্রমণ ক’র্‌তে ভালোবাসি, কিন্তু ভ্রমণের কল্পনা ক’র্‌তে আমার আরো ভালো লাগে। কেন না, কল্পনার বেলায় রেলগাড়ি ঘটর ঘটর করে না, বেরেলিতে তিন চার ঘণ্টা ব’সে থাক্‌তে হয় না, ডাণ্ডি অতি অনায়াসে এবং ঠিক সময়েই মেলে। তুমি তোমার নবীন দৃষ্টি নিয়ে নতুন নতুন দৃশ্য দেখ্‌চো, তোমার সেই আনন্দ আমি মনে মনে অনুভব ক’র্‌চি। আমি আমার এই

খোলা ছাদে লম্বা কেদারায় শুয়ে শুয়ে, গিরিতটে তোমার দেবদারুবনে ভ্রমণের সুখ মনে মনে সঞ্চয় করি। আমিও প্রায় তোমার বয়সেই হিমালয়ে গিয়েছিলুম,—ড্যাল্‌হৌসীতে বক্রোটা শিখরের উপরে থাক্‌তুম। এক একদিন আমাদের বাড়ির খানিক নীচে এক দেবদারুবনে সকালে একলা বেড়াতে যেতুম। আমি ছিলুম ছোট্ট (তখন লম্বায় ছ-ফুট ছিলাম না), তাই গাছগুলোকে এত প্রকাণ্ড বড়ো মনে হ'তো—সে আর কী ব'ল্‌বো? সেই সব গাছের সুদীর্ঘ ছায়ার মধ্যে নিজেকে দৈত্যলোকের অতি ক্ষুদ্র এক অতিথি ব'লে মনে হ'তো। কিন্তু সেই আমার ছেলেবেলাকার পর্ব্বত, ছেলেবেলাকার বন এখন আর পাবো কোথায়? এখন আমার মনটা এই জগতের পথে এত নিজের সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে চলে-যে, নিজের চলার ধুলোয় এবং নিজের রথের ছায়ায় জগৎটা বারো আনা ঢাকা প'ড়ে যায়—বাজে ভাবনার ঝোঁকের মধ্য দিয়ে জগৎটাকে আর তেমন ক'রে দেখা যায় না। তাই আজ তুমি যে-পাহাড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চো, মনে হ'চ্চে সে আমার সেই অল্প বয়সের পৃথিবীর পাহাড়, আমার সেই ৪৫।৪৬ বৎসরের আগেকার।

আমরা পুরাণো হ'য়ে উঠে নিজের হাজার রকম চিন্তায় এই পৃথিবীটাকে যতই জীর্ণ ক'রে দিই না কেন, মানুষ আবার ছেলেমানুষ হ'য়ে, নূতন হ'য়ে, চিরনূতন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। শুধু একদল মানুষ যদি চিরকালই বৃদ্ধ হ'তে হ'তে পৃথিবীতে বাস ক'র্‌তো, তা হ'লে বিধাতার এই পৃথিবী তাদের নস্যে, তামাকের ধোঁয়ায়, তাদের পাকা বুদ্ধির আওতায়, একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে যেতো, স্বয়ং বিধাতা তাঁর নিজের সৃষ্টি ঐ পৃথিবীকে চিন্‌তে পার্‌তেন না। কিন্তু জগতে শিশুর ধারা কেবলি আস্‌চে। নবীন চোখ, নবীন স্পর্শ, নবীন আনন্দ ফিরে ফিরে মানুষের ঘরে অবতীর্ণ হ'চ্চে। তাই প্রাচীনদের অসাড়তার আবর্জ্জনা দিনে-দিনে, বারে-বারে, ধুয়ে-মুছে পৃথিবীর চিররহস্যময় নবীন রূপকে উজ্জ্বল ক'রে রাখ্‌চে। অন্য মানুষের সঙ্গে কবিদের তফাৎ কী, জানো? বিধাতার নিজের হাতে তৈরী শৈশব কবিদের মন থেকে কিছুতে ঘোচে না। কোনোদিন তাদের চোখ বুড়ো হয় না, মন বুড়ো হয় না। তাই চিরনবীন এই পৃথিবীর সঙ্গে তাদের চিরদিনের বন্ধুত্ব থেকে যায়, তাই চিরদিনই তা'রা ছোটোদের সমবয়সী হ'য়ে থাকে। সংসারে

বিষয়ের মধ্যে যারা বুড়ো হ'য়ে গেচে, তা'রা চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ তারার চেয়ে বয়সে বড়ো হ'য়ে ওঠে, তা'রা হিমালয়ের চেয়ে বড়োবয়সের। কিন্তু কবিরা সূর্য্য, চন্দ্র, তারার ন্যায় চিরদিনই কাঁচাবয়সী—হিমালয়ের মতোই তা'রা সবুজ থাকে, ছেলেমানুষীর ঝরণাধারা কোনোদিনই তাদের শুকোয় না; লোকালয়ে বিশ্ব-জগতের নবীনতার বার্ত্তা এবং সঙ্গীত চিরদিন তাজা রাখ্‌বার জন্যেই কবিদের দরকার—নইলে তা'রা আর সকল বিষয়েই অদরকারী।

উচ্চ-হাসে সকৌতুকে চির-প্রাচীন গিরির বুকে
ঝ'রে পড়ে চির-নূতন ঝর্‌ণা;
নৃত্য করে তালে তালে প্রাচীন বটের ডালে ডালে
নবীন পাতা ঘন-শ্যামল-বর্ণা।
পুরাণো সেই শিবের প্রেমে নূতন হ'য়ে এলো নেমে
দক্ষসুতা ধরি' উমার অঙ্গ,
এম্‌নি ক'রে সারাবেলা চ'ল্‌চে লুকোচুরি খেলা
নূতন পুরাতনের চিররঙ্গ।

ইতি, ১৪ই আশ্বিন, ১৩২৫।

২১

শান্তিনিকেতন।

আচ্ছা বেশ, রাজি। ভানুদাদা নামই বহাল হ'লো। এ নামে আজ পর্য্যন্ত আমাকে কেউ ডাকেনি, আর কেউ যদি ডাকে তবে তা'র উত্তর দেবো না। সিণ্ডারেলার গল্প জানো তো? তা'র এক-পাটি জুতো নিয়ে রাজার ছেলে পা মেপে বেড়াতে লাগ্‌লো। আমার ভানু নামটা সেই রকম একপাটি; যদি কেউ ব্যবহার ক'র্‌তে যায়, আমি তখন ব'ল্‌তে পার্‌বো—আচ্ছা আগে নিজের নামের পাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যার নাম সুরবালা, সে ব'ল্‌বে সুরো সুরু সুরি—কিছুতেই ভানুর সঙ্গে মিল্‌বে না, যার নাম মাতঙ্গিনী সে ব'ল্‌বে মাতু, মাতি, মাতো—কিছুতেই মিল্‌বে না, তিনকড়িরও সেই দশা, কাত্যায়নীরও তাই; জগদম্বা, পীতাম্বরী, গুরুদাসী, শঙ্খেশ্বরী, নগেন্দ্র-মোহিনী, কারোই কাছে ঘেঁষবার জো নেই। ভারি সুবিধে হ'য়েচে। কেবল আমার মনে ভারি ভয় র'য়ে গেল, পাছে কারো নাম থাকে "কানু

বিলাসিনী”। তবে তাকে কী ব'লে ঠেকাবো? তুমি ভেবে রেখে দিয়ো।

ছুটির দিন এলো—পর্শু ছুটি, তারপরে কী ক'র্‌বো? তখন কেবল শিউলিবন, শিশির-ভেজা ঘাস, আর দিগন্ত-প্রসারিত মাঠ আমার মুখ তাকিয়ে থাক্‌বে। তা'রা তো আমার কাছে ইংরেজি শিখ্‌তে চায় না—তা'রা চায় আমার মনের মধ্যে যে আনন্দের সোনার কাটি আছে সেইটে ছুঁইয়ে দিয়ে তাদের জাগিয়ে তুল্‌বো এবং আমার চেতনার সঙ্গে তাদের সৌন্দর্য্যকে মিলিয়ে দেবো। আমার জাগরণের ছোঁয়াচ্ না লাগ্‌লে পরে প্রকৃতি জাগ্‌বে কী ক'রে? নীলাকাশের কিরণ-কমলের উপরে শারদলক্ষ্মী আসন-গ্রহণ করেন, কিন্তু আমার আনন্দ-দৃষ্টি না প'ড়্‌লে পরে সে-পদ্মই ফোটে না।

আজ বুধবার। আজ মন্দিরে ছুটির ঠাকুরের কথা ব'লেচি। যখন আমরা কাজ ক'র্‌তে থাকি, তখন শক্তির সমুদ্র থেকে আমাদের মধ্যে জোয়ার আসে, তখন আমরা মনে করি এ শক্তি আমারই এবং এই শক্তির জোরেই আমরা বিশ্বজয় ক'র্‌বো। কিন্তু শক্তিকে বরাবর খাটাতে তো পারিনে—সন্ধ্যা যখন আসে

তখন তো কাজ বন্ধ হয়, তখন তো আর গাণ্ডীব তুল্‌তে পারিনে। তাই জোয়ার ভাঁটার ছন্দকে জীবের মেনে চলা চাই। একবার আমি, একবার তুমি। সেই তুমিকে বাদ দিয়ে যখন মনে করি আমিই কর্ত্তা, তখনই জগতে মারামারি বেধে যায়—রক্তে ধরণী পঙ্কিল হ'য়ে ওঠে। মা তাঁর মেয়েকে ডেকে বলেন, সংসারের কাজে তুমি আমার সঙ্গে লেগে যাও, মেয়ে তখন কোমর বেঁধে লাগে, কিন্তু সে যখন ভুলে যায়-যে, এই কাজ তা'র মায়ের সংসারেরই কাজ, যখন অহঙ্কার ক'রে ভাবে 'আমি যেমন ইচ্ছা তাই ক'র্‌বো', তখন সে সংসারের ব্যবস্থাকে উলট্ পালট্ ক'রে জঞ্জাল জমিয়ে তোলে—অবশেষে এমন হয়-যে, মা ঝাঁটা হাতে নিয়ে সমস্ত আবর্জ্জনা ঝেঁটিয়ে ফেলেন। মেয়ের সেই কাজটুকুর উপরে ঝাঁটা পড়ে না—যখন সে-কাজ মায়ের সংসার-ব্যবস্থার সঙ্গে মেলে। সংসার-স্থিতির সঙ্গে এই-যে মিলিয়ে কাজ করা, এতে আমাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে—অর্থাৎ মিল রেখেও আমরা তা'র মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য রাখ্‌তে পারি—তাতেই সৃষ্টির বৈচিত্র্য। মেয়ের হাতের কাজটুকু মায়ের অভিপ্রায়কে প্রকাশ ক'রেও নিজেকে বিশিষ্টভাবে প্রকাশ ক'র্‌তে

পারে। যখন তাই সে করে তখন তা'র সেই সৃষ্টি মায়ের সৃষ্টির সঙ্গে মিলে স্থিতি লাভ করে। বিশ্বকর্ম্মার কাজে আমরা যখন যোগ দিই তখন যে-পরিমাণে তাঁ'র সঙ্গে মিল রেখে, ছন্দ রেখে চলি সেই পরিমাণে আমাদের কাজ অক্ষয়কীর্ত্তি হ'য়ে ওঠে,—যে-পরিমাণে বাধা দিই সেই পরিমাণে আমরা প্রলয়কে ডেকে আনি। নিজের জীবনকে এই প্রলয় থেকে যদি বাঁচাতে চাই তা হ'লে প্রতিদিনই আমি-তুমির ছন্দ মিলিয়ে চ'ল্‌তে হবে—সেই ছন্দেই মানুষের সৃষ্টি, মানুষের ইতিহাস অমরতা লাভ করে। দেখ্‌চো তো, মা আজ পশ্চিমের ঘরে কী রকম প্রলয়ের সম্মার্জ্জনী নিয়ে বেরিয়েচেন। পশ্চিমের সভ্যতা মনে ক'র্‌ছিলো, তা'র শক্তি তা'র নিজেরই ভোগ নিজেরই সমৃদ্ধির জন্যে। সে আমি-তুমির ছন্দকে একেবারে মানেনি। কিছুদূর পর্য্যন্ত সে বেড়ে উঠ্‌লো। মনে ক'র্‌লো সে বেড়েই চ'ল্‌বে—এমন সময়ে ছন্দের অমিল ঘোচাবার জন্যে হঠাৎ এক-মুহূর্ত্তেই মায়ের প্রলয় অনুচর এসে হাজির। এখন কান্না, আর বক্ষে করাঘাত। ইতি ১৬ই আশ্বিন, ১৩২৫।

২২

শান্তিনিকেতন

মাদ্রাজের দিকে যে-দিন যাত্রা ক'রেছিলুম সে-দিন শনিবার এবং সপ্তমী, অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই মতো দিনক্ষণের বিদ্যা আমার জানা নেই। ব'ল্‌তে পারিনে আমার যাত্রার সময় লক্ষকোটি যোজন দূরে গ্রহনক্ষত্রের বিরাট্‌ সভায় আমার এই ক্ষুদ্র মাদ্রাজ ভ্রমণ সম্বন্ধে কী রকম আলোচনা হ'য়েছিলো, কিন্তু তা'র ফলের থেকে বোঝা যাচ্চে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে ঘোরতর মতভেদ হ'য়েছিলো। সেই জন্যে আমার ভ্রমণ-পথের হাজার মাইলের মধ্যে ছ-শো মাইল পর্য্যন্ত আমি সবেগে সগর্ব্বে এগোতে পেরেছিলুম। কিন্তু বিরুদ্ধ জ্যোতিষ্কের দল কোমর বেঁধে এম্‌নি অ্যাজিটেশন্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌লো-যে, বাকি চারশো মাইলটুকু আর পেরোতে পারা গেল না। জ্যোতিষ্ক-সভায় কেবলমাত্র আমারই যাত্রা সম্বন্ধেই-যে বিচার হ'য়েছিলো তা নয়—বেঙ্গল-নাগপুর রেলোয়ে লাইনের যে-এঞ্জিনটা আমার গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে, মঙ্গল, শনি এবং অন্যান্য ঝগ্‌ড়াটে গ্রহেরা তা'র সম্বন্ধেও প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছিলো—

যদি বলো সে-সভায় তো আমাদের খবরের কাগজের কোনো রিপোর্টার উপস্থিত ছিল না তবে আমি খবর পেলুম কোথা থেকে, তবে তা'র উত্তর হ'চ্চে এই যে, আইনকর্ত্তারা তাঁদের মন্ত্রণা-সভায় কী আইন পাশ ক'রেচেন তা তাঁদের পেয়াদার গুঁতো খেলেই সব চেয়ে পরিষ্কার বোঝা যায়। যে-মুহূর্ত্তে হাওড়া ষ্টেশনে আমার রেলের এঞ্জিন বাঁশি বাজালে, সে-বাঁশির আওয়াজে কত তেজ, কত দর্প। আর রবীন্দ্রনাথ ওরফে ভানুদাদা নামক যে-ব্যক্তি তোরঙ্গ বাক্স ব্যাগ বিছানা গাড়িতে বোঝাই ক'রে তা'র তক্তর উপরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ইলেক্‌ট্রিক্ পাখার চলচ্চক্র-গুঞ্জন-মুখর রথকক্ষে একাধিপত্য বিস্তার ক'র্‌লেন, তা'রই বা কত আশ্বস্ততা। তা'র পরে কত গড়্ গড়্, খড়্ খড়্, ঝর্ ঝর্, ভোঁ ভোঁ, ঢং ঢং, ষ্টেশনে ষ্টেশনে কত হাঁক্-ডাক্, হাঁস্‌ফাঁস্, হন্ হন্, হট্ হট্, আমাদের গাড়ির দক্ষিণে বামে কত মাঠ বাট বন জঙ্গল নদী নালা গ্রাম সহর মন্দির মস্‌জিদ কুটীর ইমারত—যেন বাঘে তাড়া করা গোরুর পালের মতো ঊর্দ্ধশ্বাসে আমাদের বিপরীত দিকে ছুটে পালাতে লাগ্‌লো। এম্‌নি ভাবে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে যখন পিঠাপুরমে পৌছ্‌তে মাঝে কেবল একটা

ষ্টেশন মাত্র আছে, এমন সময় এঞ্জিনটার উপরে নক্ষত্র-সভার অদৃশ্য পেয়াদা তা'র অদৃশ্য পরোয়ানা হাতে নিয়ে নেবে প'ড়্লো, আর অম্‌নি কোথায় গেল তা'র চাকার ঘুর্‌নি, তা'র বাঁশির ডাক, তা'র ধূমোদ্গার, তা'র পাথুরে কয়লার ভোজ! পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, বিশ মিনিট যায়, এক ঘণ্টা যায়, ষ্টেশন থেকে গাড়ি আর নড়েই না! সাড়ে পাঁচটায় পিঠাপুরমে পৌঁছ্‌বার কথা কিন্তু সাড়ে ছ-টা, সাড়ে সাতটা বাজে তবু এমনি সমস্ত স্থির হ'য়ে রইলো-যে, "চরাচরমিদং সর্ব্বং"-যে চঞ্চল, এ কথাটা মিথ্যা ব'লে বোধ হ'লো। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ধক্ ধক্ ধুক্ ধুক্ ক'র্‌তে ক'র্‌তে আর একটা এঞ্জিন এসে হাজির। তা'র পরে রাত্রি সাড়ে আট্‌টার সময় আমি যখন পিঠাপুরমে রাজবাড়িতে গিয়ে উঠ্‌লুম তখন আমার মনের অবস্থাটা দেখি ঠিক সেই এঞ্জিনেরই মতো। মনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, "কেমন হে, মান্দ্রাজে যাচ্চো তো? সেখান থেকে কাঞ্চি মদ্র অন্ধ্র পৌণ্ড্র প্রভৃতি কত দেশ দেশান্তর দেখ্‌বার আছে, কত মন্দির কত গুহা, কত তীর্থ ইত্যাদি ইত্যাদি",—আমার মন সেই এঞ্জিনটার মতো চুপ ক'রে গম্ভীর হ'য়ে রইলো, সাড়াই

দেয় না। স্পষ্ট বোঝা গেল, দক্ষিণের দিকে সে আর এক পাও বাড়াবে না। মনের সঙ্গে বেঙ্গল-নাগপুরের এঞ্জিনের একটা মস্ত প্রভেদ এই-যে, এঞ্জিন বিগ্‌ড়ে গেলে আর একটা এঞ্জিন টেলিফোন্ ক'রে আনিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু মন বিগ্‌ড়োলে সুবিধামতো আর একটা মন পাই কোথা থেকে? সুতরাং মান্দ্রাজ চারশো মাইল দূরে প'ড়ে রইলো আর আমি গতকল্য শনিবার মধ্যাহ্নে সেই হাবড়ায় ফিরে এলুম। যে-শনিবার একদা তা'র কৌতুক-হাস্য গোপন ক'রে আমাকে মান্দ্রাজের গাড়িতে চড়িয়ে দিয়েছিলো সেই শনিবারই আর একদিন আমাকে হাওড়ায় নামিয়ে দিয়ে তা'র নিঃশব্দ অট্টহাস্যে মধ্যাহ্ন আকাশ প্রতপ্ত ক'রে তুল্‌লে। এই তো গেল আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। কিন্তু তুমি যখন হিমালয়-যাত্রায় বেরিয়েছিলে তখন নক্ষত্র-সভায় তোমার সম্বন্ধেও তো ভালো রেজো-ল্যুশন্ পাস্ হয়নি। আমরা সবাই স্থির ক'র্‌লুম, গিরিরাজের শুশ্রূষায় তুমি সেরে আস্‌বে। কিন্তু তারাগুলো কেন কুমন্ত্রণা ক'র্‌তে লাগ্‌লো। আমার বিশ্বাস কী জানো, অনেকগুলো ঈর্ষাপরায়ণ তারা আছে, তা'রা তোমার ভানুদাদাকে একেবারেই পছন্দ

করে না। প্রথমত, আমার নামটাই তাদের অসহ্য বোধ হয় এই জন্যে বদ্‌নাম কর্‌বার সুবিধা পেলে ছাড়ে না। তা'রপরে দেখেচে আমার সঙ্গে আকাশের মিতার খুব ভাব আছে সেইজন্যে নক্ষত্রগুলো আমাকে তাদের শত্রুপক্ষ ব'লে ঠিক ক'রেচে। যাই হোক্, আমি ওদের কাছে হার মান্‌বার ছেলে নই। ওরা যা কর্‌বার করুক্, আমি দিনের আলোর দলে রইলুম। তোমাকে কিন্তু কুচক্রী নক্ষত্রগুলোর উপরে টেক্কা দিতে হবে। বেশ শরীরটাকে সেরে নিয়ে, মনটাকে প্রফুল্ল ক'রে হৃদয়টাকে শান্ত করো, জীবনটাকে পূর্ণ করো। তা'রপরে লক্ষ্যকে ঊর্দ্ধে রেখে অপরাজিত চিত্তে সংসারের সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে চ'লে যাও—কল্যাণ লাভ করো এবং কল্যাণ দান করো। নিজের বাসনাকে উদ্দাম ক'রে না তুলে মঙ্গলময়ের শুভ-ইচ্ছাকে নিজের অন্তরে বাহিরে সার্থক করো। ইতি ২০ অক্টোবর, ১৯১৮।

২৩

শান্তিনিকেতন

আমার ভ্রমণ শেষ হ'লো। যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ ক'রেছিলুম সেইখানেই আবার এসে ফিরেচি।

সকলেই পরামর্শ দিয়ে থাকে, ছুটি পেলেই স্থান এবং বায়ু পরিবর্ত্তন করা দরকার কিন্তু দেখা গেল, সেটা-যে অনাবশ্যক এবং ক্লেশকর—সেইটে ভালো ক'রে বুঝে দেখ্‌বার জন্যেই কেবল পরিবর্ত্তনের দরকার। আসল দরকার, যেখানে আছি সেইখানেই মনটাকে সম্পূর্ণ এবং সচেতন ভাবে ঢেলে দেওয়া। এই-যে মাঠ আমার চোখে প'ড়্‌চে এর কি দেখ্‌বার যোগ্য রস ফুরিয়ে গেচে? আর এই-যে শিশিরার্দ্র সকালবেলাটি তা'র কিরণ-দলের মাঝখানে আমার মনকে মধুপানরত স্তব্ধ ভ্রমরের মতো স্থান দিয়েচে, এ কি কোনোকালে এর বৃন্ত থেকে ঝ'রে প'ড়্‌বে? আসল কথা, মনটা অসাড় হ'লেই তাকে সাড়া দেবার জন্যে নাড়া দিতে হয়। তাই আমাদের সাধনা হওয়া উচিত, কী ক'র্‌লে আমাদের মন অসাড় না হয় তা হ'লেই নিজের মধ্যে নিজের সম্পদ লাভ ক'র্‌তে পারি, কেবলি বাইরের জন্যে ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে হয় না। আমাদের যা-কিছু সবচেয়ে বড়ো সম্পদ, সবচেয়ে বড়ো আনন্দ—তা'র ভাণ্ডার যদি বাইরে থাকে তা হ'লে আমাদের ভারি মুস্কিল, কেন না, বাইরের পথে বাধা ঘ'টবেই, বাইরের দরজা মাঝে মাঝে বন্ধ হবেই। বাইরের কাছ

থেকে ভিক্ষা চাওয়ার অভ্যাস আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের ইচ্ছা বাইরের দিকে বাধা পেলেও আমরা যেন অন্তরের মধ্যে পূর্ণতা অনুভব ক'রে শান্তি পেতে পারি। নইলে, নিজেও অশান্ত হই—চারিদিককেও অশান্ত ক'রে তুলি। এই সংসার থেকে যে-প্রীতি, যে-কল্যাণ আমরা অন্তরের মধ্যে পেয়েচি সেই আমাদের অন্তরতম লাভের জন্যে যেন আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ হই। বাইরের দিকে যে-কিছু জিনিষ পাইনি, সে-দিক থেকে যা-কিছু বাধা আস্‌চে, তা'রই ফর্দ্দটাকে লম্বা ক'রে তুলে যদি খুঁৎখুঁৎ করি, ছট্‌ফট্ ক'র্‌তে থাকি তা হ'লে অকৃতজ্ঞতা হয় এবং সেই চঞ্চলতা নিতান্তই বৃথা নিজের অন্তর-বাহিরকে আবৃত করে মাত্র। স্থির হবো, প্রশান্ত হবো, মনকে প্রসন্ন রাখবো তা হ'লেই আমাদের মন এমন একটি স্বচ্ছ আকাশে বাস ক'র্‌বে যাতে ক'রে অমৃতলোক থেকে আনন্দ-জ্যোতি আমাদের মনকে স্পর্শ ক'র্‌তে বাধা পাবে না। তোমার প্রতি তোমার ভানুদাদার এই আশীর্ব্বাদ-যে, তুমি আপনার ইচ্ছাকে একান্ত তীব্র ক'রে চিত্তকে কাঙাল-বৃত্তিতে দীক্ষিত ক'রো না—বিধাতার কাছ থেকে যা-কিছু দান পেয়েচো

তাকে অন্তরের মধ্যে নম্র-ভাবে গ্রহণ এবং অবিচলিত-ভাবে রক্ষা ক'রো! শান্তি হ'চ্চে সত্য উপলব্ধি কর্‌বার সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা—সংসারের অনিবার্য্য আঘাতে, ব্যাঘাতে, ইচ্ছার অনিবার্য্য নিষ্ফলতায় সেই সুস্নিগ্ধ শান্তি যেন তোমার মধ্যে বিক্ষুব্ধ না হয়। ইতি ১০ই কার্ত্তিক, ১৩২৫।

২৪

শান্তিনিকেতন

এতক্ষণ তুমি রেলগাড়িতে ধক্ ধক্ ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'লেচো, কত ষ্টেশন পার হ'য়ে চ'লে গিয়েচো—আমাদের এই লাল মাটির, এই তালগাছের দেশ হয় তো ছাড়িয়ে গেচো বা। আমার পূবদিকের দরজার সাম্‌নে সেই মাঠে রৌদ্র ধূ ধূ ক'র্‌চে এবং সেই রৌদ্রে নানা রঙের গোরুর পাল চ'রে বেড়াচ্চে। এক-একটা তালগাছ তাদের ঝাঁক্‌ড়া মাথা নিয়ে পাগ্‌লার মতো দাঁড়িয়ে আছে। আজ দিনে আমার সেই বড়ো চৌকিতে বসা হ'লো না—খাওয়ার পর এণ্ড্রুজ্ সাহেব এসে আমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের ভূত-ভবিষ্যৎ-

বর্ত্তমানসম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা ক'র্লেন তাতে অনেকটা সময় চ'লে গেল। তা'রপরে নগেনবাবু নামক এখানকার একজন মাষ্টার তাঁর এক মস্ত তর্জ্জমা নিয়ে আমার কাছে সংশোধন কর্বার জন্যে আন্লেন, তাতেও অনেকটা সময় চ'লে গেল। সুতরাং বেলা তিনটে বেজে গেচে তবু আমি আমার সেই ডেস্কে ব'সে আছি। বই, কাগজ, খাতা, দোয়াত, কলম, ওষুধের শিশি এবং অন্য হাজার রকম জবড়জঙ্গ্ জিনিসে আমার ডেস্ক পরিপূর্ণ। তা'র মধ্যে এমন অনেক আবর্জ্জনা আছে, যা এখনি টেনে ফেলে দিলেই চলে; কিন্তু কুঁড়ে মানুষের মুস্কিল এই-যে, আবশ্যকের জিনিস সে খুঁজে পায় না আর অনাবশ্যক জিনিস না খুঁজলেও তা'র সঙ্গে লেগেই থাকে। এমন অনেক ছেঁড়া লেফাফা কাগজ চাপা দিয়ে জমানো র'য়েচে যার ভিতরকার চিঠিরই কোনোও উদ্দেশ পাওয়া যায় না। মনে আছে, আমাকে তোমার রূপকথা পাঠিয়ে দিতে হবে সেই অলাবু-নন্দিনীর "কাহিনী" আর সেই "চম্‌কিলা" "সোনেকিতরহ" চুলওয়ালী রাজকুমারীর কথা। তা ছাড়া, আর একটি কথা মনে রাখ্‌তে হবে, মন খারাপ ক'রো না—লক্ষ্মী মেয়ে হ'য়ে প্রসন্ন হাসি

হেসে ঘর উজ্জ্বল ক'রে থাক্‌বে। সকলেই ব'ল্‌বে, তুমি এমন সোনেকিতরহ হাসি পেয়েচো কোন্ পারিজাতের গন্ধ থেকে, কোন্ নন্দন-বীণার ঝঙ্কার থেকে, কোন প্রভাত-তারার আলোক থেকে, কোন্ সুর-সুন্দরীর সুখস্বপ্ন থেকে, কোন্ মন্দাকিনীর চলোর্ম্মি-কল্লোল থেকে, কোন্—কিন্তু আর দরকার নেই, এখনকার মতো এই ক-টাতেই চ'লে যাবে—কেন না কাগজ ফুরিয়ে এসেচে, দিনও অবসন্ন-প্রায়, অপরাহ্নের ক্লান্ত রবির আলোক ম্লান হ'য়ে এসেচে।

২ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

২৫

শান্তিনিকেতন

কাল তোমার চিঠি পেয়েচি, আমার চিঠিও নিশ্চয় তুমি পেয়েচো। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বেশ হাসিমুখে সেই বাংলা মহাভারত এবং চারুপাঠ প'ড়চো। যে তোমাকে দেখ্‌চে, সেই মনে ক'র্‌চে—চারুপাঠের মধ্যে খুব মনোহর গল্প এবং তোমার শিশু-মহাভারতের মধ্যে খুব মজার কথা কিছু বুঝি আছে। কিন্তু তা'রা

জানে না, প্রায় দু-শো ক্রোশ তফাৎ থেকে ভানুদাদা তোমাকে খুসি পাঠিয়ে দিচ্চে—এত খুসি-যে, কার সাধ্য তোমাকে বিরক্ত করে, বা রাগায়, বা দুঃখ দেয়। আমি প্রায়সন্ধ্যাবেলায় সেই-যে গান গাই,—"বীণা বাজাও মম অন্তরে" সেই গানটি তোমার মনের মধ্যে বরাবরকার মতো স্বরলিপি ক'রে লিখে রেখে দেবার ইচ্ছা আছে—মনটি গানের সুরে এমনি বোঝাই হ'য়ে থাক্‌বে-যে, বাহিরের তুফানে তোমাকে নাড়া দিতে পার্‌বে না। শুধু তোমাকে ব'ল্‌চিনে, আমারও ভারি ইচ্ছে, নিজের ভরা মনটির মাঝখানে বেশ নিবিষ্ট হ'য়ে ব'সে বাইরের সমস্ত যাওয়া-আসা কাঁদা-হাসার অনেক উপরে স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পারি। আপনার ভিতরে আপনার চেয়ে বড়ো কাউকে যদি ধ'রে রাখা যায় তা হ'লেই সেই ভিতরের গৌরবে বাহিরের ধাক্কাকে একটুও কেয়ার না কর্‌বার শক্তি আপনিই আসে। সেই ভিতরের ধনকে ভিতরে পেয়ে ভিতরে ধ'রে রাখ্‌বার জন্যেই আকাঙ্ক্ষা ক'র্‌চি। বাইরের কাছে যখনই কাঙালপনা ক'র্‌তে যাই তখনই সে পেয়ে বসে, তা'র আর দৌরাত্ম্যের অন্ত থাকে না—সে যতটুকু দেয় তা'র চেয়ে দাবী ঢের বেশি করে—

সে এমন মহাজন-যে, শতকরা পাঁচশো টাকা সুদ আদায় ক'র্‌তে চায়। সে শাইলক্, সামান্য টাকা দেয় কিন্তু ছুরি বসিয়ে রক্তে মাংসে তা'র শোধ নেবার দাবী করে। তাই ইচ্ছে করি, বাহিরটাকে ধার দেবো কিন্তু ওর কাছ থেকে সিকি পয়সা ধার নেবো না। এই আমার মৎলবের কথাটা তোমার কাছে ব'লে রাখ্‌লুম। তোমার গণনামতে আমার যখন আটাশ বৎসর বয়স হবে ততদিনে যদি মৎলব সিদ্ধি হয় তা হ'লে বেশ মজা হবে। এখানকার খবর সব ভালো, সাহেব গেচে বাঁকিপুরে, দিনু, কমল এসেচে আমার ঘরের একতলায়, আমি সেই অনুবাদের কাজে ভূতের মতো খাট্‌চি; কিন্তু ভূত-যে খুব বেশি খাটে—এ অখ্যাতি তা'র কেন হ'লো বলো দেখি? কথাটা সত্য হ'লে তো ম'রেও শান্তি নেই।

২৬

শান্তিনিকেতন

এখনও আমার কাজের ভিড় কিছুই কমেনি: সবাই মনে করে—আমি কবি মানুষ,দিনরাত্রি আকাশের

দিকে তাকিয়ে মেঘের খেলা দেখি, হাওয়ার গান শুনি, চাঁদের আলোয় ডুব দিই, ফুলের গন্ধে মাতাল হই, পল্লব-মর্ম্মরে থর্ থর্ ক'রে কাঁপি, ভ্রমর-গুঞ্জনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে যাই ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব হ'লো হিংসের কথা। তা'রা জাঁক ক'রে ব'ল্‌তে চায়-যে, তা'রা কবিতা লেখে না বটে কিন্তু হপ্তায় সাতদিন ক'রে আফিসে যায়, আদালত করে, খবরের কাগজ চালায়, বক্তৃতা দেয়, ব্যবসা করে, তা'রা এত বড়ো ভয়ঙ্কর কাজের লোক। আফিসের ছুটি নিয়ে তা'রা একবার এসে দেখে যাক্—আমি কাজ করি কিনা। আচ্ছা, তা'রা খুব কাজ ক'র্‌তে পারে—আমি না হয় মেনে নিলুম, কিন্তু খুব কাজ না ক'র্‌তে পারে এমন শক্তি কি তাদের আছে? যেই তাদের হাতে কাজ না থাকে অম্‌নি তা'রা হয় ঘুমোয়, নয় তাস খেলে, নয় মদ খায়, নয় পরের নিন্দে করে, কী ক'রে-যে সময় কাটাবে, ভেবেই পায় না। আমার সুবিধা এই-যে, যখন কাজ থাকে তখন রীতিমতো কাজ করি, আবার, যখন কাজ না থাকে তখন খুব ক'ষে কাজ না ক'র্‌তে পারি—তা'র কাছে কোথায় লাগে তোমার বাবার কমিটি-মীটিং। যখন কাজ না-করার ভিড় পড়ে তখন

তা'র চাপে আমাকে একেবারে রোগা ক'রে দেয়। সম্প্রতি কিন্তু কাজ করাটাই আমার ঘাড়ে চেপেচে, তাই সেই নাটকটা আর এক অক্ষরও লিখ্‌তে পারিনি। এই গোলমালের মধ্যে যদি লিখ্‌তে যাই আর যদি তাতে গান বসাই তবে তা'র ছন্দ আর মিল অনেকটা তোমার শিশু-মহাভারতেরই মতো হ'য়ে উঠ্‌বে। চিঠিতে যে-ছবি এঁকেচো—খুব ভালো হ'য়েচে। মেয়েটিকে দেখে বোধ হ'চ্চে—ওর ইস্কুলে যাবার তাড়া নেই, ঘরকন্নার কাজের ভিড়ও বেশি আছে ব'লে মনে হ'চ্চে না; ওর চুলের সমস্ত কাঁটা রাস্তায় প'ড়ে গেচে, আর "গহনা ওয়ছনা" "চুনারি উনারি"র কোনোও ঠিকানা নেই। "কচু"র ভিতর থেকে-যে "ছলহীন" বেরিয়ে এসেছিলো এ মেয়ে বোধ হয় সে নয়, এর নাম কী লিখে পাঠিয়ো। ইতি ৯ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

২৭

শান্তিনিকেতন

আজকের তোমাকে সব খবরগুলি দেওয়া যাক্। অনেক দিন পরে আজ আমার ইস্কুল খুলেচে, আজ

থেকে ইস্কুল-মাষ্টারি ফের সুরু হ'লো। আজ সকালে তিনটে ক্লাস নিয়েচি। কিন্তু ছেলেরা সব আসেনি, খুব কম এসেচে। বোধ হয়, ব্যামোর ভয়ে আস্‌চে না। আমার বৌমা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেচেন, জিজ্ঞাসা ক'রেচো। তিনি পাড়াতেই আছেন। আমি যে-ঘরে থাকি—তা'র সাম্‌নে এক লাল রাস্তা আছে, তা'র ঠিক ওধারেই এক দোতলা ইমারৎ তৈরি হচ্চে—তা'রই একতলা ঘরে তিনি বাস করেন। শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরী তাঁকে অচ্ছী অচ্ছী কাহিনী শুনাতী হৈ, কিন্তু আমি সেটা আন্দাজে ব'ল্‌চি। কিছুকাল থেকে তা'র কণ্ঠস্বরও শুনিনি, তাকে দেখ্‌তেও পাইনি—তাই আশঙ্কা হ'চ্চে সে হয় তো তা'র সেই রূপকথার "কতু"র মধ্যে ঢুকে প'ড়েচে। যাই হোক্‌, পাড়াব সমস্ত খবর রাখ্‌বার সময় আমি পাইনে, আমি কখনও বা আমার সেই কোণের ডেস্কে কখনও বা সেই লাইব্রেরি ঘরের টেবিলে ঘাড় হেঁট ক'রে কলম চালিয়ে দিনযাপন ক'র্‌চি। সাম্‌নেকার খাতা-পত্রের বাইরে যে-একটি প্রকাণ্ড জগৎ আছে, তা'র প্রতি ভালো ক'রে চোখ তুলে—যে দেখা, সে আর দিনের আলো থাক্‌তে ঘ'টে উঠ্‌চে না। সন্ধ্যার পরে সেই নীচের বারান্দায় খাবার

টেবিলটা ঘিরেই বৈঠক হয়, সেখানে তর্ক হয় বিতর্ক হয় এবং মাঝে মাঝে গানও হ'য়ে থাকে। কারণ— আজকাল ফের আবার দুটি একটি ক'রে গান জ'ম্‌চে। সন্ধ্যার পরে সেই আমার কোণের বিছানায় তাকিয়া ঠেস্‌ দিয়ে কেরোসিনের আলোয় মৃদুমন্দস্বরে খাতা পেন্‌সিল হাতে গান করি আর পশ্চিমের উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে—তুমি ভাব্‌চো সেই বাতায়ন থেকে স্বর্গের অপ্সরীরা আমার গান শুন্‌তে আসেন—ঠিক তা নয়—সেই উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে কীট-পতঙ্গ আস্‌তে থাকে,—তাও যদি তা'রা আমার গান শুনে মুগ্ধ হ'য়ে আস্‌তো তা হ'লেও আমি মনে মনে একটু অহঙ্কার ক'র্‌তে পার্‌তুম,—তা'রা আসে ঐ ডীট্‌জ্‌ লণ্ঠনের কেরোসিন আলোটা লক্ষ্য ক'রে। উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে হঠাৎ এক-একবার—আন্দাজ ক'রে বলো দেখি কী শুন্‌তে পাই? তুমি ভাব্‌চো, নক্ষত্র-লোক থেকে অনাহত বীণার অশ্রুত গীত-ধ্বনি? তা নয়;— এক সঙ্গে ভোঁদা, দামু, টম, রঞ্জু এবং এ মুল্লুকের যত দিশি কুকুরের তুমুল চীৎকার-শব্দ। যদি এরা আমার গান শুনে বাহবা দেবার জন্যে এই আওয়াজ ক'র্‌তো তা হ'লেও বুঝ্‌তুম—কবির গানে চতুষ্পদ জন্তুরা পর্য্যন্ত

মুগ্ধ—কিন্তু তা নয়, তা'রা স্বজাতি আগন্তুকের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ ক'রে স্বর্গ-মর্ত্ত্যকে চঞ্চল ক'রে তোলে—কবির গানে তা'রা কর্ণপাতও করে না। যাই হোক্, ভূতলের কুকুর থেকে আকাশের তারা পর্য্যন্ত সবাই যদিচ উদাসীন তবুও ছুটো একটা ক'রে গান জ'মচে। ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

২৮

শান্তিনিকেতন

আজ ছুপুরবেলায় যখন খেতে ব'সেচি, এমন সময় —রোসো, আগে ব'লেনি কী খাচ্ছিলুম—খুব প্রকাণ্ড মোটা একটা রুটি—কিন্তু মনে ক'রো না তা'র সবটাই আমি খাচ্ছিলুম। রুটিটাকে যদি পূর্ণিমার চাঁদ ব'লে ধ'রে নেও তা হ'লে আমার টুক্‌রোটি দ্বিতীয়ার চাঁদের চেয়ে বড়ো হবে না। সেই রুটির সঙ্গে কিছু ডাল ছিল, আর ছিল চাট্‌নি আর একটা তরকারিও ছিল। যা হোক্, ব'সে ব'সে রুটি চিবোচ্চি, এমন সময়—রোসো, আগে ব'লে নিই রুটি, ডাল, চাট্‌নি এলো কোথা থেকে। —তুমি বোধ হয় জানো, আমার এখানে প্রায় পঁচিশজন

গুজরাটি ছেলে আছে—আমাকে খাওয়াবে ব'লে তাদের হঠাৎ ইচ্ছা হ'য়েছিলো। তাই আজ সকালে আমার লেখা সেরে স্নানের ঘরের দিকে যখন চ'লেচি, এমন সময় দেখি, একটি গুজরাটি ছেলে থালা হাতে ক'রে আমার দ্বারে এসে হাজির। যা হোক্, নীচের ঘরে টেবিলে ব'সে ব'সে রুটির টুক্‌রো ভাঙ্‌চি আর খাচ্চি, আর তা'র সঙ্গে একটু একটু চাট্‌নিও মুখে দিচ্চি, এমন সময়—রোসো, আগে ব'লে নিই, খাবার কী রকম হ'য়েছিলো। রুটিটা বেশ শক্ত-গোছের ছিল; যদি আমাকে সম্পূর্ণ চিবিয়ে সবটা খেতে হ'তো তা হ'লে আমার একলার শক্তিতে কুলিয়ে উঠ্‌তো না, মজুর ডাক্‌তে হ'তো। কিন্তু ছিঁড়্‌তে যত শক্ত মুখের মধ্যে ততটা নয়। আবার রুটিটা মিষ্টি ছিল; ডাল তরকারি দিয়ে মিষ্টি রুটি খাওয়া আমাদের আইনে লেখে না, কিন্তু খেয়ে দেখা গেল-যে, খেলে-যে বিশেষ অপরাধ হয় তা নয়। সেই রুটি খাচ্চি, এমন সময়—রোসো, ওর মধ্যে একটা কথা ব'ল্‌তে একেবারেই ভুলে গেচি, দুটো পাঁপর-ভাজাও ছিল; সে-দুটো, আমি যাকে ব'লে থাকি সুশ্রাব্য—অর্থাৎ খেতে বেশ ভালো লাগে। শুনে তুমি হয় তো আশ্চর্য্য হবে এবং আমাকে

হয় তো মনে মনে পেটুক ঠাউরে রেখে দেবে—এবং যখন আমি কাশীতে যাবো তখন হয় তো সকালে বিকালে আমাকে চাট্‌নি দিয়ে কেবলি পাঁপর-ভাজা খাওয়াবে। তবু সত্য গোপন ক'র্‌বো না, দুখানা পাঁপর-ভাজা সম্পূর্ণই খেয়েছিলুম। যা হোক্, সেই পাঁপর মচ্ মচ্ শব্দে খাচ্চি, এমন সময়—রোসো, মনে ক'রে দেখি সে-সময়ে কে উপস্থিত ছিল। তুমি ভাব্‌চো, তোমার বউমা তোমার ভানুদাদার পাঁপর-ভাজা খাওয়া দেখে অবাক্ হ'য়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে টেবিলের এক কোণে ব'সে মনে মনে ঠাকুর-দেবতার নাম ক'র্‌ছিলেন, তা নয়—তিনি তখন কোথায় আমি জানিনে। আর কমল? সেও-যে তখন কোথায় ব'সে রোদ পোয়াচ্ছিলো তা আমি জানিনে। তা হ'লে দেখ্‌চি টেবিলে আমি এক্‌লা ছাড়া কেউই ছিল না। যাই হো'ক্, দুখানা পাঁপর-ভাজার পরে প্রায় সিকিটুক্‌রো রুটির পৌনে চার আনা যখন শেষ ক'রেচি, এমন সময় —হাঁ, হাঁ, একটা কথা ব'ল্‌তে ভুলে গেচি—আমি লিখেচি খাবার সময়ে কেউ ছিল না, কথাটা সত্য নয়। ভোঁদা কুকুরটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে লালায়িত জিহ্বায় চিন্তা ক'র্‌ছিলো-যে, আমি

যদি মানুষ হতুম তা হ'লে সকাল থেকে রাত্তির পর্য্যন্ত ঐ রকম মুচ্‌মুচ্‌ মুচ্‌মুচ্‌ মুচ্‌মুচ্‌ ক'রে কেবলি পাঁপর-ভাজা খেতুম; ইতিহাসও প'ড়্‌তুম না, ভূগোলও প'ড়্‌তুম না—শিশু মহাভারত, চারুপাঠের কোনো ধার ধার্‌তুম না। যা হোক্, যখন দুখানা পাঁপর-ভাজা এবং কিছু রুটি ও চাট্‌নি খেয়েচি, এমন সময়—কিন্তু ডালটা খাইনি, সেটা নার্‌কোল দিয়ে এবং অনেকখানি কুয়োর জল দিয়ে তৈরি করেছিলো তাতে ডালের চেয়ে কুয়োর জলের স্বাদটাই বেশি ছিল, আর তরকারিটাও খাইনি —কেন না, আমি মোটের উপর তরকারি প্রভৃতি বড়ো বেশি খাইনে। যাই হোক্, যখন রুটি এবং পাঁপর-ভাজা খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়েচে, এমন সময়ে ডাক-হরকরা আমার হাতে কাশীর ছাপমারা একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

২৯

শান্তিনিকেতন

দেরি ক'রে তোমার চিঠির উত্তর দিয়েচি—তুমি আমাকে এত বড়ো অপবাদ দেবে আর আমি তাই

যে নীরবে সহ্য ক'রে যাবো, এতবড়ো কাপুরুষ আমাকে পাওনি। কখ্‌খনো দেরি করিনি,—এ আমি তোমার মুখের সাম্‌নে ব'ল্‌চি। এতে তুমি রাগই করো আর যাই করো। দেরি ক'রিনি, দেরি ক'রিনি, দেরি ক'রিনি,—এই তিনবার খুব চেঁচিয়েই ব'লে রাখ্‌লুম—দেখি, তুমি এর জবাব কী দাও। যত দোষ সব আমার, আর তোমার অগস্ত্যকুণ্ডের পোষ্টমাষ্টারটি বুঝি আটত্রিশটা গুণের আধার? ভালো কথা মনে প'ড়্‌লো, তোমাকে শেষবারে চিঠি লেখার পর আমি খোঁজ নিয়ে শুন্‌লুম—শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরীকে বৌমা বিদায় ক'রে দিয়েচেন। কী অন্যায় দেখো দেখি! তা'র অপরাধটা কী?—না, সে যতটা কাজ করে তা'র চেয়ে কথা কয় বেশি। তাই যদি হয়, তা হ'লে তোমার ভানুদাদার কী হবে বলো তো? আমি তো জন্মকাল থেকে কেবল কথাই ক'য়ে আস্‌চি, তুলসীমঞ্জরী যেটুকু কাজ ক'রেচে—আমি তাও ক'রিনি। বৌমা তাই রেগেমেগে হঠাৎ যদি আমার খোরাকি বন্ধ ক'রে দেন তা হ'লে আমার কী দশা হবে? যাই হোক্, এই কথাটা নিয়ে এখন থেকে ভাবনা ক'রে কোনোও লাভ নেই—সময় যখন উপস্থিত হবে তখন তোমাকে

খবর দেওয়া যাবে, আমার যা কপালে থাকে তাই হবে। কিন্তু তোমার গুরুমা তোমাকে যে-ছাঁদে বাংলা-চিঠি লেখাতে চান, আমাকে সেই ছাঁদে লিখ্‌লে চ'ল্‌বে না—তা আমার নামের আগে শুধু না-হয় একটা মাত্র "শ্রী"-ই দেবে কিম্বা "শ্রী" নাই বা দিলে। আমার বিলেত যাবার একটা কথা উঠ্‌চে কিন্তু শুধু কথায় যদি বিলেত যাওয়া যেতো তা হ'লে আমার ভাবনা ছিল না; কথা একূলা যদি না জোটাতে পারতুম তা হ'লে তুলসীমঞ্জরীকে ডেকে পাঠাতুম। কিন্তু মুস্কিল হ'চ্চে এই-যে, বিলেত যেতে জাহাজের দরকার করে, যুদ্ধের উৎপাতে সেই জাহাজের সংখ্যা ক'মে গেচে অথচ যাবার লোকের সংখ্যা বেড়ে গেচে—তাই এখন—

"ঘাটে ব'সে আছি আনমনা,
যেতেচে বহিয়া সুসময়।"

এদিকে রোজ আমার একটা ক'রে নতুন গান বেড়েই চ'লেচে। গানের সুবিধা এই-যে তা'র জন্যে জাহাজের দরকার হয় না, কথাতেই অনেকটা কাজ হয়। প্রায় পনেরোটা গান শেষ হ'য়ে গেল। তুমি দেরি ক'রে যদি আসো তা হ'লে ততদিনে এত

গান জ'মে উঠ্‌বে-যে, শুন্‌তে শুন্‌তে তোমার চারুপাঠ তৃতীয়ভাগ আর পড়া হবে না—তোমার শিশু-মহাভারত বৃদ্ধ-মহাভারত হ'য়ে উঠ্‌বে। তুমি হয় তো এম্ এ পাশ করার সময় পাবে না। ইতি ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

৩০

শান্তিনিকেতন

তুমি ভাব্‌চো—মজা কেবল তোমাদেরই হ'য়েচে তাই তোমাদের ইস্কুলের প্রাইজের মজার ফর্দ্দ আমাকে লিখে পাঠিয়েচো, কিন্তু এত সহজে আমাকে হার মানাতে পার্‌চো না। মজা আমাদের এখানেও হয় এবং যথেষ্ট বেশি ক'রেই হয়। আচ্ছা, তোমাদের প্রাইজে কত লোক জ'মেছিলো?—পঞ্চাশ জন? কিন্তু আমাদের এখানে মেলায় অন্ততঃ দশ হাজার লোক তো হ'য়েইছিলো। তুমি লিখেচো, একটি ছোটো মেয়ে তা'র দিদির কাছে গিয়ে খুব চীৎকার ক'রে তোমাদের সভা খুব জমিয়ে তুলেছিলো—আমাদের এখানকার মাঠে যা-চীৎকার হ'য়েছিলো তাতে কত রকমেরই

আওয়াজ মিলেছিলো, তা'র কি সংখ্যা ছিল? ছোটো ছেলের কান্না, বড়োদের হাঁক্‌ডাক, ডুগ্‌ডুগির বাদ্য, গোরুর গাড়ির ক্যাঁচ্‌কোঁচ্, যাত্রার দলের চীৎকার, তুবড়ীবাজির সোঁ সোঁ, পট্‌কার ফুট্‌ফাট্, পুলিশ-চৌকিদারের হৈ হৈ,—হাসি, কান্না, গান, চেঁচামেচি, ঝগ্‌ড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। ৭ই পৌষে মাঠে খুব বড়ো হাট ব'সেছিলো—তাতে গালার খেল্‌না, ফলের মোরব্বা, মাটির পুতুল, তেলে-ভাজা ফুলুরি, চিনে-বাদাম ভাজা প্রভৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস বিক্রী হ'লো। এক-এক পয়সা দিয়ে ছেলেমেয়েরা সব নাগরদোলায় ঢুল্‌লো; চাঁদোয়ার নীচে নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের কংসবধ যাত্রার পালা গান হ'চ্ছিলো—সেইখানে একেবারে ঠেলাঠেলি ভিড়। তা'রপরে ৯ই পৌষে আমাদের মেয়েরা আবার এক মেলা ক'রেছিলেন—তাতে সিঙারা, আলুর-দমের দোকান ব'সিয়েছিলেন—এক-একটা আলুর-দম এক-এক পয়সায় বিক্রী হ'লো। সুকেশী বউমা চিনে-বাদামের পুতুল গ'ড়েছিলেন, তা'র এক-একটা ছ-আনা দামে বিক্রী হ'য়ে গেল। কমল কাদা দিয়ে একটা ঘর বানিয়েছিলো—তা'র খড়ের চাল, চারিদিকে মাটির

পাঁচিল, আঙিনায় শিব-স্থাপন করা আছে—সেটা কেউ কিনতে চায় না, তাই কমল আমাকে সেটা জোর ক'রে তিন টাকায় বিক্রী ক'রেচে। ভেবে দেখো—কী রকম ভয়ানক মজা! ছোটো মেয়েরা একটুক্‌রো নেক্‌ড়া ছিঁড়ে তা'র চারিদিকে পাড় সেলাই ক'রে আমার কাছে এনে ব'ল্লে, "এটা রুমাল, এর দাম আটআনা, আপনাকে নিতেই হবে"—ব'লে সেটা আমার পকেটে পুরে দিলে—এমন ভয়ানক মজা! ওঁদের বাজারে এইরকম শ্রেণীর সব ভয়ানক মজা হ'য়ে গেচে—তোমরা যে-সব প্রাইজ পেয়েচো, সে এর কাছে কোথায় লাগে! তা'রপরে মজা,—মেলা যখন ভেঙে গেল, সমস্ত রাত ধ'রে চেঁচাতে চেঁচাতে বেসুরো গান গাইতে গাইতে দলে দলে লোক ঠিক আমার শোবার ঘরের সাম্‌নের রাস্তা দিয়েই যেতে লাগ্‌লো—মজায় একটুও ঘুম হ'লো না—নীচে যতগুলো কুকুর ছিল, সবাই মিলে ঊর্দ্ধশ্বাসে চেঁচাতে লাগ্‌লো, এমন মজা! তা'রপরে ক'ল্‌কাতার অনেক মেয়ে তাঁদের ছোটো ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছিলেন—তাঁদের কারো কাশী, কারো জ্বর। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রাইজে এমন ধুমধাম, গোলমাল, কাশী-সর্দ্দি, অসুখ-

বিস্মুখ আটআনায় রুমাল বেচা প্রভৃতি হয়নি—অতএব আমারই জিৎ রইলো।

৩১

শান্তিনিকেতন।

নাঃ, তোমার সঙ্গে পার্‌লুম না—হার মান্‌লুম। তুমি-যে ইস্কুলে যেতে যেতে একেবারে রাস্তার মাঝখানে গাড়ি সুদ্ধ, একগাড়ি মেয়ে সুদ্ধ, তোমাদের মোটা দিদিমণি সুদ্ধ একেবারে উল্টে কাৎ হ'য়ে প'ড়্‌বে,—এত বড়ো ভয়ঙ্কর মজা ক'রবে, এ কী ক'রে জান্‌বো, বলো? তা'রপরে আর-এক ভদ্রলোককে বেচারার এক্কা-গাড়ি থেকে নামিয়ে তা'র গাড়িতে চ'ড়ে ব'স্‌বে; এত মজাতেও সন্তুষ্ট নও, আবার এক-পাটি জুতো রাস্তার মাঝখানে ফেলে আস্‌বে আর সেই জুতোর পিছনে কাশীবাসী ভদ্রলোকটিকে দৌড় করাবে—তারো উপরে আবার ইস্কুলে পৌঁচে কান্না—কি মজা! যদি সেই জুতো-শিকারী বেচারা ভদ্রলোকটি কাঁদতো তা হ'লেও বুঝ্‌তুম—কিন্তু তুমি! বিনা ভাড়ায় পরের এক্কাগাড়িতে চ'ড়ে, বিনা আয়াসে পরকে

দিয়ে হারানো চটিজুতো খুঁজিয়ে নিয়ে—তা'রপরে কিনা কান্না! একেই না বলে লঙ্কাকাণ্ডের পরেও আবার উত্তরকাণ্ড! তুমি লিখেচো, আমিও যদি তোমাদের গাড়ির মধ্যে থাক্‌তুম আর হাত, পা, মাথা, বুদ্ধি-সুদ্ধি সমস্ত একেবারে উল্টে-পাল্টে যেতো তা হ'লে তোমাদের মতোই বাবারে ম'র্‌লুমরে ক'রে চীৎকার ক'র্‌তুম। এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার ক'র্‌বো না—নিশ্চয়ই পা ছুটো উপরে আর মাথাটা নীচে ক'রে আমি তানা-নানা শব্দে কানাড়া রাগিণীতে গান ধ'র্‌তুম।

হায়রে হায়, সারে গামা পাধা নিসা।
(আমার) গাড়ির হ'লো উল্টো মতি,
কোথায় হবে আমার গতি—
খুঁজে আমি না পাই দিশা!
সারে গামা পাধা নিসা।

যখন কাশীতে যাবো, আমার গাড়িটা উল্টে দিয়ে বরঞ্চ পরীক্ষা ক'রে দেখো। ইস্কুলে গিয়ে কাঁদ্‌বো না, তোমার মাথার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে তান লাগিয়ে দেবো—

যদিও আঘাত গায়ে লাগেনি
তবুও করুণ সুরে,

দেবো আমি গান জুড়ে'
ঝাঁপতালে ভৈরবী রাগিণী।
শোনো সবে দিদিমণি, মামা,
সারে সারে সারে গারে গামা!

এই তো গেল মজার কথা! এইবার কাজের কথা। পরশু চল্লুম মৈসুরে, মাদ্রাজে, মাদুরায় এবং মদনা-পল্লীতে। ফির্‌তে বোধ হয় জানুয়ারি কাবার হ'য়ে ফেব্রুয়ারি সুরু হবে—ইতিমধ্যে ঐ দুটো গানের সুর বসিয়ে এস্‌রাজে অভ্যাস ক'রে নিয়ো। আবার যদি বিশ্বেশ্বরের গোরু, গাড়ি উল্টে দিয়ে নন্দী-ভৃঙ্গীর গোয়ালের দিকে দৌড় মারে তা হ'লে পথের মাঝখানে কাজে লাগাতে পার্‌বে। আর যে-ব্যক্তি তোমার একপাটি চটিজুতো নিয়ে আস্‌বে তাকে উচ্চৈঃস্বরে তানে, মানে, লয়ে চমৎকৃত ক'রে দিতে পার্‌বে। ততদিন কিন্তু ডাকঘরের পালা বন্ধ। আমার চিঠি ফুরোলো, নটে শাকটি মুড়োলো ইত্যাদি। ১৯শে পৌষ, ১৩২৫।

৩২

শান্তিনিকেতন

তোমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এইমাত্র পাওয়া গেল। আমি ভাব্‌চি, তোমার এমন চিঠির বেশ সমান ওজনের জবাবটি দিই কী ক'রে? তুমি চলিষ্ণু, আমি স্তব্ধ; তুমি আকাশের পাখী, আমি বনান্তের অশথগাছ; কাজেই তোমার গানে আর আমার মর্ম্মরে ঠিক সমকক্ষ হ'তে পারে না। এক জায়গায় তোমার সঙ্গে আমার মিলেচে; তুমিও গেচো হাওয়া বদল ক'র্‌তে, আমিও এসেচি হাওয়া বদল ক'র্‌তে। তুমি গেচো কাশী থেকে সোলনে, আমি এসেচি আমার লেখ্‌বার ডেস্ক থেকে আমার জান্‌লার ধারের লম্বা কেদারায়। খুব বদল,—তোমাদের বিশ্বেশ্বরের মন্দির থেকে আর তাঁর শ্বশুরবাড়ি যত বদল তা'র চেয়ে অনেক বেশি। আমি যে-হাওয়ায় ছিলুম, এ হাওয়া তা'র থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ। তবে কিনা, তোমার ভ্রমণে আমার ভ্রমণে একটি মূলগত প্রভেদ আছে, তুমি নিজে চ'লে চ'লে ভ্রমণ ক'র্‌চো কিন্তু আমি নিজে থাকি স্থির আর আমার সাম্‌নে যা-কিছু চ'ল্‌চে, তাদের চলায় আমার

চলা। এই হ'চ্চে রাজার উপযুক্ত ভ্রমণ—অর্থাৎ আমার হ'য়ে অন্যে ভ্রমণ ক'র্‌চে, চল্‌বার জন্যে আমার নিজেকে চ'ল্‌তে হ'চ্চে না। ঐ দেখো না, আজ রবিবার হাটবার, সাম্‌নে দিয়ে গোরুর গাড়ি চ'লেচে—আমার দুই চক্ষু সেই গোরুর গাড়িতে সওয়ার হ'য়ে ব'স্‌লো। ঐ চ'লেচে সাঁওতালের মেয়েরা মাথায় খড়ের আঁটি, ঐ চ'লেচে মোষের দল তাড়িয়ে সন্তোষ বাবুর গোষ্ঠের রাখাল। ঐ চ'লেচে ইষ্টেশনের দিক থেকে গোয়ালপাড়ার দিকে কা'রা এবং কিসের জন্যে—তা কিছুই জানিনে; একজনের হাতে ঝুল্‌চে এক থেলোহুঁকো, একজনের মাথায় ছেঁড়া ছাতি, একজনের কাঁধে চ'ড়ে ব'সেচে একটা উলঙ্গ ছেলে। ঐ আস্‌চে ভুবনডাঙ্গার গ্রাম থেকে কলসী-কাঁখে মেয়ের দল, তা'রা শান্তিনিকেতনের কুয়ো থেকে জল নিয়ে যাবে। ঐ সব চলার স্রোতের মধ্যে আমার মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে আমি চুপ ক'রে ব'সে আছি। আকাশ দিয়ে মেঘ চ'লেচে, কাল রাত্রিবেলাকার ঝড়-বৃষ্টির ভগ্ন-পাইকের দল—অত্যন্ত ছেঁড়া খোঁড়া রকমের চেহারা।

এরাই দেখ্‌বো আজ সন্ধ্যেবেলায় নীল, লাল, সোনালি, বেগ্‌নি, উর্দ্দি প'রে কালবৈশাখীর নকিবের

মতো গুরু গুরু দামামা বাজাতে বাজাতে উত্তর-পশ্চিম থেকে কুচ্-কাওয়াজ ক'রে আস্‌তে থাক্‌বে—তখন আর এমনতর ভালোমানুষি চেহারা থাক্‌বে না।

আমাদের বিদ্যালয় বন্ধ, এখন আশ্রমে যা-কিছু আসর জমিয়ে রেখেচে শালিখ-পাখীর দল, আরো অনেক রকমের পাখী জুটেচে—বটের ফল পেকেচে তাই সব অনাহূতের দল জমেচে। বনলক্ষ্মী হাসিমুখে সবার জন্যেই পাত পেড়ে দিয়েচেন। ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।

৩৩

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠিতে যে-রকম ঠাণ্ডা এবং মেঘ্‌লা দিনের বর্ণনা ক'রেচো তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে, তুমি তোমার ভানুদাদার এলাকার অনেক তফাতে চ'লে গেচো। বেশি না হোক, অন্তত দু-তিন ডিগ্রির মতোও ঠাণ্ডা যদি ডাকযোগে এখানে পাঠাতে পারো তা হ'লে তোমাদেরও আরাম, আমাদেরও আরাম। বেয়ারিং পোষ্টে পাঠালেও আপত্তি ক'র্‌বো না.এমন কি ভ্যালু-

পেবলেও রাজি আছি। আসল কথা, ক-দিন থেকে এখানে রীতিমতো খোট্টাই ফেশানের গরম প'ড়েচে। সমস্ত আকাশটা যেন তৃষ্ণার্ত্ত কুকুরের মতো জিব বের ক'রে হাঃ-হাঃ ক'রে হাঁপাচ্চে। আর এই-যে তুপুর-বেলাকার হাওয়া, এ-যে কী রকম—সে তোমাকে বেশি বোঝাতে হবে না—এই ব'ল্‌লেই বুঝ্‌বে-যে, এ প্রায় বেনারসি হাওয়া, আগুনের লক্‌লকে জরির সূতো দিয়ে আগাগোড়া ঠাস বুনোনি;—দিক-লক্ষ্মীরা প'রেচেন, তাঁরা দেবতার মেয়ে ব'লেই সইতে পারেন, কিন্তু ওর আঁচ্‌লা যখন মাঝে মাঝে উড়ে আমাদের গায়ে এসে পড়ে তখন নিজেকে মর্ত্ত্যের ছেলে ব'লেই খুব বুঝ্‌তে পারি। আমি কিন্তু আমার ঐ আকাশের ভানুদাদার দূতগুলিকে ভয় করিনে; এই তুপুরে দেখ্‌বে, ঘরে ঘরে তুয়ার বন্ধ কিন্তু আমার ঘরের সব দরজা-জান্‌লা খোলা। তপ্ত হাওয়া হু-হু ক'রে ঘরে ঢুকে আমাকে আগা-গোড়া আণ ক'রে যাচ্চে,—এমনি তা'র আণ-যে, আণেন অর্দ্ধভোজনং। গরমের ঝাঁজে আকাশ ঝাপ্‌সা হ'য়ে আছে—কেমন যেন ঘোলা নীল—ঠিক যেন মূর্চ্ছিত মানুষের ঘোলা চোখ্‌টার মতো। সকলেই থেকে থেকে ব'লে ব'লে উঠ্‌চে, "উঃ, আঃ,—কী গরম!" আমি

তাতে আপত্তি ক'রে ব'লচি, গরম তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তা'র সঙ্গে আবার ওই তোমার উঃ আঃ জুড়ে দিলে কেন? যাই হোক্, আকাশের এই প্রতাপ আমি এক-রকম ক'রে সইতে পারি কিন্তু মর্ত্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবে আছো, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে। ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিলো তাই অনেক মার খেতে হ'চ্চে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হ'য়ে উঠেচে। তাই কতশত বৎসর ধ'রে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইচে কিন্তু আজও শিক্ষা শেষ হয়নি। ইতি, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।

৬৪

কলিকাতা

মাঝে তোমার একটা চিঠির জবাব দিতে পারিনি, ক'লকাতায় এসেচি। কেন এসেচি, হয় তো খবরের কাগজ থেকে ইতিমধ্যে কতকটা জান্‌তে পার্‌বে। তবু একটু খোলসা ক'রে বলি। তোমার লেফাফায়

তুমি যখন আমার ঠিকানা লেখো, আমি ভাব্‌লুম ঐ পদবীটা তোমার পছন্দ নয়। তাই ক'ল্‌কাতায় এসে বড়োলাটকে চিঠি লিখেচি—আমার ঐ ছার পদবীটা ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু চিঠিতে আসল কারণটা দিইনি—তোমার নামের একটুও উল্লেখ করিনি। বানিয়ে বানিয়ে অন্য নানাকথা লিখেচি। আমি ব'লেচি, বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জ'মে উঠেছিলো, তা'রই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠেচে—তাই ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন ক'র্‌তে পার্‌চি নে; তাই ওটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা ক'র্‌চি। যাক্‌, এ সব কথা আর ব'ল্‌তে ইচ্ছা করে না—আবার অন্য কথাও ভাব্‌তে পারিনে।
১লা জুন, ১৯১৯।

৩৫

শান্তিনিকেতন

কাল ছিলুম ক'ল্‌কাতায়, আজ বোলপুরে। এসে দেখি, তোমার একখানি চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে। আর দেখি, আকাশে ঘন ঘোর মেঘ,—

বর্ষার আয়োজন সমস্তই র'য়েচে কেবল আমি আসিনি ব'লেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়নি। বর্ষার মেঘের ইচ্ছা ছিল, আমাকে তা'র কাজরী গান শুনিয়ে দেবে—তা'রপরে আমিও তাকে আমার গানে জবাব দেবো। তাই এতক্ষণ পরে আমি দুপুরবেলায় যখন খেয়ে এসে ব'স্‌লুম তখন বৃষ্টি সুরু ক'রে দিয়েচে এক মাঠ থেকে আর-এক মাঠে। আর তা'র কল-সঙ্গীতে আকাশে কোথাও যেন ফাঁক রইলো না। নববর্ষাব জল-স্থলের আনন্দ-উৎসব দেখ্‌তে চাও তা হ'লে এসো আমাদের মাঠের ধারে, বসো এই জান্‌লাটিতে চুপ ক'রে। পাহাড়ে বর্ষার চেহারা স্পষ্ট দেখ্‌বার জো নেই, সেখানে পাহাড়েতে মেঘেতে ঘেঁষাঘেঁষি মেশামেশি একাকার কাণ্ড। সমস্ত আকাশটা বুজে যায়; সৃষ্টিটা যেন সর্দ্দিতে, কাশীতে জবুস্থবু হ'য়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে প'ড়ে থাকে। পাহাড় আমার কেন ভালো লাগে না বলি,—সেখানে গেলে মনে হয়, আকাশটাকে যেন আড়-কোলা ক'রে ধ'রে একদল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্মা ক'রে দেওয়া হ'য়েচে, সে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আমরা মর্ত্ত্যবাসী মানুষ—সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটা দেখ্‌তে পাই—সেই

আকাশটাকেই যদি তোমার হিমালয় পাহাড় একপাল মহিষের মতো শিং গুঁতিয়ে মার্‌তে চায় তা হ'লে সেটা আমি সইতে পারিনে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত,—সেই জন্যে বাংলাদেশের বড়ো বড়ো দিল্‌-দরাজ্‌ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তা'র কাছে আমার গানের গলা সেধে এসেচি, এই কারণেই দূর হ'তে তোমাদের সোলন পর্ব্বতকে নমস্কার করি। যা হোক্‌, বর্ষা বিদায় হবার পূর্ব্বেই তোমরা আমার প্রান্তরে আতিথ্য নেবে শুনে আমি খুসি হ'য়েচি। তোমাদের জন্যে কিছু গান সংগ্রহ ক'রে রাখ্‌বো,—আর পাকা জাম, আর কেয়াফুল, আর পদ্মবন থেকে শ্বেতপদ্ম, আর যদি পারি গোটা কতক আষাঢ়ে গল্প। অতএব খুব বেশি দেরি ক'রো না, পর্ব্বত থেকে ঝর্‌ণা যেমন নেমে আসে তেমনি দ্রুতপদে নেমে এসো। ইতি—আষাঢ়স্য তৃতীয় দিবসে, ১৩২৬।

৩৬

শান্তিনিকেতন

তোমার আজকের চিঠি পেয়ে বড়ো লজ্জা পেলুম। কেন ব'ল্‌বো? এর আগে তোমার একখানি চিঠি

পেয়েছিলুম—তা'র জবাব দেবো-দেবো ক'র্‌চি, এমন সময় তোমার এই চিঠি, আজ তোমার কাছে আমার হার মান্‌তে হ'লো। আমি এত বড়ো লেখক, বড়ো বড়ো পাঁচ ভলুম কাব্যগ্রন্থ লিখেচি,—এহেন-যে আমি —যার উপাধিসমেত নাম হওয়া উচিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ শর্ম্মা রচনা-লবণাম্বুধি কিম্বা সাহিত্য-অজগর কিম্বা বাগক্ষৌহিণীনায়ক কিম্বা রচনা-মহামহোপদ্রব কিম্বা কাব্যকলাকল্পদ্রুম কিম্বা—ফস্‌ ক'রে এখন মনে প'ড়্‌চে না, পরে ভেবে ব'ল্‌বো—একরত্তি মেয়ে, "সাতাশ" বছর বয়স লাভ ক'র্‌তে যাকে অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বছর সাধনা ক'র্‌তে হবে, তা'রই কাছে পরাভব—Two goals to nil! তা'রপরে আবার তুমি যে-সব বিপজ্জনক ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখ্‌চো, আমার এই ডেস্কে ব'সে তা'র সঙ্গে পাল্লা দিই কী ক'রে? আজ সকালে তাই ভাব্‌ছিলুম, পারুলবনের সাম্‌নে দিয়ে যে-রেলের রাস্তা আছে সেখানে গিয়ে রাত্রে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো— তা'রপরে বুকের উপর দিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেন্‌টা চ'লে গেলে পর যদি তখনো হাত চলে তা হ'লে সেই মুহূর্ত্তে সেইখানে ব'সে তোমাকে যদি চিঠি লিখ্‌তে পারি তবে তোমাকে টেক্কা দিতে পার্‌বো। এ সম্বন্ধে

এখনো বউমার সঙ্গে পরামর্শ করিনি, এণ্ড্রুজ্ সাহেবকেও জানাইনি। আমার কেমন মনে মনে সন্দেহ হ'চ্চে, ওঁরা হয় তো কেউ সম্মতি দেবেন না, তা ছাড়া আমার নিজের মনেও একটা কেমন ধোঁকা লাগ্‌চে; মনে হ'চ্চে যদি গাড়িটার চাপে বুড়ো আঙুলটা কিছু জখম করে তা হ'লে হয় তো লেখা ঘ'টেই উঠ্‌বে না। আর যদি না ঘটে তা হ'লে অনন্ত-কালের মতো ঐ ত্নু-খানা চিঠির জিৎ তোমার র'য়েই যাবে, অতএব থাক্।

অল্পদিনের মধ্যে আমাদের এখানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার একটাও ঘটেনি। ঝড়-বৃষ্টি অল্প স্বল্প হ'য়েচে কিন্তু তাতে আমাদের বাড়ির ছাদ ভাঙেনি, আমাদের কারো মাথায়-যে সামান্য একটা বজ্র প'ড়্‌বে তাও প'ড়্‌লো না। বন্দুক নিয়ে, ছোরাছুরি নিয়ে দেশের নানা জায়গায় ডাকাতি হ'চ্চে; কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট এমনি মন্দ-যে, আজ পর্য্যন্ত অবজ্ঞা ক'রে আমাদের আশ্রমে তা'রা কিম্বা তাদের দূর-সম্পর্কের কেউ পদার্পণ ক'র্‌লে না। না, না, ভুল ব'ল্‌চি। একটা রোমহর্ষণ ঘটনা অল্পদিন হ'লো ঘ'টেচে। সেটা বলি। আমাদের আশ্রমের সাম্‌নে দিয়ে নির্জ্জন প্রান্তরের প্রান্ত বেয়ে একটি দীর্ঘ

পথ বোলপুর-ষ্টেশন পর্য্যন্ত চ'লে গেছে। সেই পথের পশ্চিমে একটি দোতলা ইমারত। সেই ইমারতের একতলায় একটি বঙ্গ-রমণী একাকিনী বাস করেন। সঙ্গে কেবল কয়েকটি দাসদাসী, বেহারা, গোয়ালা, পাচক-ব্রাহ্মণ এবং উপরের তলায় এণ্ড্রুজ্ সাহেব নামক একটি ইংরেজ থাকেন। সমস্ত বাড়িটাতে এ ছাড়া আর জন-প্রাণী নেই। সেদিন মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি, মেঘের আড়াল থেকে চন্দ্র ম্লান কিরণ বিকীর্ণ ক'র্চেন। এমন সময় রাত্রি যখন সাড়ে এগারোটা, যখন কেবলমাত্র দশবারো জন লোক নিয়ে একাকিনী রমণী বিশ্রাম ক'র্চেন, এমন সময়ে ঘরের মধ্যে কে ঐ পুরুষ প্রবেশ ক'র্লে? কোন্ অপরিচিত যুবক? কোথায় ওর বাড়ি, কী ওর অভিসন্ধি? হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ নিদ্রিত ঘরের নিঃশব্দতা সচকিত ক'রে তুলে সে জিজ্ঞাসা ক'র্লে,—"ইস্কুল কোথায়?" অকস্মাৎ জাগরণে উক্ত রমণীর ঘন ঘন হৃৎ-কম্প হ'তে লাগ্লো; রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে ব'ল্লেন, "ইস্কুল ঐ পশ্চিম দিকে।" তখন যুবক জিজ্ঞাসা ক'র্লে, "হেড্মাষ্টারের ঘর কোথায়?" রমণী ব'ল্লেন, "জানিনে।"

তা'রপরে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ঐ যুবক সেই ম্লান

জ্যোৎস্নালোকে সেই ঝিল্লি-মুখরিত মধ্যরাত্রে আবার আশ্রমের কঙ্কর-বিকীর্ণ পথে আশ্রম কুক্কুরবৃন্দের তার-তিরস্কার শব্দ উপেক্ষা ক'রে দ্বিতীয় একটি নিঃসহায়া অবলার গৃহের মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌লে। সেই ঘরে তৎকালে উক্ত রমণীব পূর্ণবয়স্ক একটি স্বামীমাত্র ছিল, আর জন-প্রাণীও না। সেখানেও পূর্ব্ববৎ সেই দুটি মাত্র প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের শব্দে স্তিমিত-দীপালোকিত সেই নির্জ্জনপ্রায় কক্ষটি আতঙ্কে নিস্তব্ধ হ'য়ে রইলো। লোকটা বহুদূর দেশ থেকে হেড্‌ মাষ্টারকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে কেন এখানে এলো? তা'র সঙ্গে কিসের শত্রুতা? সেই রাত্রে স্বামীসনাথা ঐ একটি রমণী এবং স্বামীদূরগতা অন্য অবলা না জানি তাদের সরল কোমল হৃদয়ে কী আশঙ্কা বহন ক'রে ঘুমিয়ে প'ড়্‌লো! পরদিন প্রভাতে হেড-মাষ্টারের মাষ্টার বাদ দিয়ে বাকি ছিন্ন অংশ কি কোথাও পাওয়া যাবে—তাঁরা আশঙ্কা ক'রেছিলেন?

তা'রপরে তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পরদিন প্রথমা নারীটি আমাকে ব'ল্‌লেন, "তাত, মধ্যরাত্রে একটি যুবক—ইত্যাদি।" শুনে আমার পাঠিকা বিস্মিতা হবেন না-যে, আমি আশ্রম ছেড়ে পালাইনি; এমন কি, আমি

তরবারিও কোষোন্মুক্ত ক'র্‌লুম না। কর্‌বার ইচ্ছে থাক্‌লেও তরবারি ছিল না, থাক্‌বার মধ্যে একটা কাগজ-কাটা ছুরি ছিল। সঙ্গে কোনো পদাতিক বা অশ্বারোহী না নিয়েই আমি সন্ধান ক'র্‌তে বেরোলুম, কোন্ অপরিচিত যুবা কাল নিশীথে "হেড্‌মাষ্টার কোথায়" ব'লে অবলা রমণীর নিদ্রা ভঙ্গ ক'রেচে?

তা'রপরে উপসংহার। যুবককে দেখা গেল, তাকে প্রশ্ন করা গেল। উত্তরে জানা গেল—এখানে তা'র কোনো একটি আত্মীয়-বালককে সে ভর্ত্তি ক'রে দিতে চায়। ইতি সমাপ্ত। ২৬ আষাঢ়, ১৩২৬।

৩০

আমার জ্যোতিষ্ক-মিতাটি আকাশ নইলে বিচরণ ক'র্‌তে পারেন না—তাঁরি নামধারী আমি অবকাশ নইলে টিক্‌তে পারিনে। আমার যদি কোনো আলো থাকে তবে সেই আলো প্রচুর অবকাশের মধ্যেই প্রকাশ পায়; সেই জন্যেই আমি ছুটির দরবার করি—কেন না, ছুটিতেই আমার যথার্থ কাজ। তাই লোক-সমাগম দেখে আমি আশ্রম ছেড়ে দৌড় দিয়েচি।

অথচ এই সময়ই উজ্জ্বল সূর্য্যের আলোয়, রঙীন মেঘের ঘটায়, ঘাসে ঘাসে মেঠো ফুলের প্রাচুর্য্যে, হাওয়ায় হাওয়ায় দিকে দিকে কাশ-মঞ্জরীর উল্লাস-হাস্য-হিল্লোলে আশ্রম খুব রমণীয় হ'য়ে উঠেছিলো। ষ্টেশনের দিকে যখন গাড়ি চ'লেছিলো তখন পিছনের দিকে মন টান্‌ছিলো। কিন্তু ষ্টেশনে ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজ্‌লো আর রেলগাড়িটা আমাদের আশ্রমকে যেন টিট্‌কারী দিয়ে পোঁ ক'রে বাঁশি বাজিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চ'লে এলো। রাত এগারোটায় হাওড়ায় উপস্থিত। এসে শুনি, হাওড়ার ব্রিজ্‌ খুলে দিয়েচে। নৌকায় গঙ্গা পার হ'তে হবে। মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে ঘাটে গেলেম। সবে জোয়ার এসেচে—ডিঙ্গি নৌকো ঘাট থেকে একটু তফাতে। একটা মাল্লা এসে আমাকে আড়কোলা ক'রে তুলে নিয়ে চ'ল্‌লো। নৌকোর কাছাকাছি এসে আমাকে সুদ্ধ ঝপাস্‌ ক'রে প'ড়ে গেল। আমার সেই ঝোলা-কাপড় নিয়ে সেইখানে জলে কাদায় লুটোপুটি ব্যাপার। গঙ্গামৃত্তিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হ'য়ে নিশীথ রাত্রে বাড়ি এসে পৌঁচানো গেল। গঙ্গাতীরে বাস তবু ইচ্ছে ক'রে বহুকাল গঙ্গাস্নান করিনি—ভীষ্ম-জননী ভাগীরথী সেই রাত্রে তা'র শোধ

তুল্‌লেন। আজ বিকেলের গাড়িতে শিলং-পাহাড় যাত্রা ক'র্‌বো; আশা করি এবারকার যাত্রাটা গতবারের গঙ্গাযাত্রার মতো হবে না। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হ'য়েচে আর ঘন মেঘের আবরণে দিগঙ্গনার মুখ অবগুণ্ঠিত। পূর্ণিমা আশ্বিন, ১৩২৬।

৫৮

ব্রুক্‌সাইড্‌
শিলং

কাল এসে পৌঁচেচি শিলং-পর্ব্বতে, পথে কত-যে বিঘ্ন ঘ'ট্‌লো তা'র ঠিক নেই। মনে আছে—বোলপুর থেকে আসবার সময় মা-গঙ্গা আমাকে জল-কাদার মধ্যে হিঁচ্‌ড়ে এনে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন? কিন্তু মান্‌লুম না, বৃহস্পতিবারের বারবেলায় কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথিতে রেলে চ'ড়ে ব'স্‌লুম। দুদিন আগে রথী আমাদের একখানা মোটরগাড়ি গৌহাটি-ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ইচ্ছা ছিল—সেই গাড়িতে ক'রে পাহাড়ে চ'ড়্‌বো। সঙ্গে আমাদের আছেন দিনুবাবু এবং কমলবোঠান, এবং আছেন সাধুচরণ, এবং আছে

বাক্স তোরঙ্গ নানা আকার ও আয়তনের এবং সঙ্গে সঙ্গে চ'লেচেন আমাদের ভাগ্যদেবতা ; তাঁকে টিকিট কিন্‌তে হয়নি। সান্তাহার ষ্টেশনে আসাম মেলে চ'ড়্‌লুম, এম্‌নি ক'সে ঝাঁকানি দিতে লাগ্‌লো-যে, দেহের রস-রক্ত যদি হ'তো দই, তা হ'লে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রাণটা তা'র থেকে মাখন হ'য়ে ছেড়ে বেরিয়ে আস্‌তো। 'অর্দ্ধেক রাত্রে বজ্রনাদ সহকারে মুষল-ধারে বৃষ্টি হ'তে লাগ্‌লো। গৌহাটির নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে যখন খেয়া-জাহাজে ব্রহ্মপুত্রে ওঠা গেল তখন আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন কিন্তু বৃষ্টি নেই। ওপারে গিয়েই মোটরগাড়িতে চ'ড়্‌বো ব'লে খেয়ে-দেয়ে সেজে-গুজে গুছিয়ে-গাছিয়ে ব'সে আছি—গিয়ে শুনি, ব্রহ্মপুত্রে বন্যা এসেচে ব'লে এখনো ঘাটে মোটর নামাতে পারেনি। এদিকে বলে, ছুটোর পরে মোটর ছাড়্‌তে দেয় না। অনেক বকাবকি দাপাদাপি ছুটোছুটি হাঁকডাক ক'রে বেলা আড়াইটের সময় গাড়ি এলো। কিন্তু সময় গেল। তীরের কাছে একটা শূন্য জাহাজ বাঁধা ছিল, সেইটেতে উঠে মুটের সাহায্যে কয়েক বাল্‌তি ব্রহ্মপুত্রের জল তুলিয়ে আনা গেল ;—স্নান কর্‌বার ইচ্ছা। ভূগোলে পড়া গেচে—পৃথিবীর তিন

ভাগ জল এক ভাগ স্থল, কিন্তু বন্যার ব্রহ্মপুত্রের ঘোলা স্রোতে সেদিন তিনভাগ স্থল একভাগ জল। তাতে দেহ স্নিগ্ধ হ'লো বটে কিন্তু নির্ম্মল হ'লো ব'ল্‌তে পারিনে। বোলপুর থেকে রাত্রি এগারোটার সময় হাওড়ার তীরে কাদার মধ্যে প'ড়ে যেমন গঙ্গাস্নান হ'য়েছিলো, সেদিন ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নানটাও তেম্‌নি পঙ্কিল। তা হোক্‌, এবার আমার ভাগ্য আমাকে ঘাড়ে ধ'রে পুণ্যতীর্থোদকে স্নান করিয়ে দিলেন। কোথায় রাত্রি যাপন ক'র্‌তে হবে তারি সন্ধানে আমাদের মোটরে চ'ড়ে গৌহাটি সহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া গেল। কিছু দূরে গিয়ে দেখি, আমাদের গাড়িটা হঠাৎ ন যযৌ ন তস্থৌ। বোঝা গেল, আমাদের ভাগ্যদেবতা বিনা অনুমতিতে আমাদের এ গাড়িতেও চ'ড়ে ব'সেচেন, তিনিই আমাদের কলের প্রতি কটাক্ষপাত ক'র্‌তেই সে বিকল হ'য়েচে। অনেক যত্নে যখন তাকে একটা মোটরগাড়ির কারখানায় নিয়ে যাওয়া গেল তখন সূর্য্যদেব অস্তমিত। কারখানার লোকেরা ব'ল্‌লে, "আজ কিছু করা অসম্ভব, কাল চেষ্টা দেখা যাবে।" আমরা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, "রাত্রে আশ্রয় পাই কোথায়?" তা'রা ব'ল্‌লে, "ডাকবাংলায়।"

ডাকবাংলায় গিয়ে দেখি, সেখানে লোকের ভিড়—একটিমাত্র ছোটো ঘর খালি, তাতে আমাদের পাঁচ-জনকে পুর্‌লে পঞ্চত্ব সুনিশ্চিত। সেখান থেকে সন্ধান ক'রে অবশেষে গোয়ালন্দগামী ষ্টীমার-ঘাটে একটা জাহাজে আশ্রয় নেওয়া গেল। সেখানে প্রায় সমস্ত রাত বৌমা এবং কমলের ঘোরতর কাশি আর হাঁপানি। রাতটা এই রকম দুঃখে কাট্‌লো। পরদিনে প্রভাতে আকাশে ঘন মেঘ ক'রে বৃষ্টি হ'তে লাগ্‌লো। কথা আছে সকাল সাড়ে সাতটার সময় মোটর-কোম্পানীর একটি মোটরগাড়ি এসে আমাদের বহন ক'রে পাহাড়ে নিয়ে যাবে; সে-গাড়িখানা আর-একজন আর-এক জায়গায় নিয়ে যাবে ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছিলো। সেখানা না পেলে দুঃখ আরো নিবিড়তর হবে—তাই রথী গিয়ে নানা লোকের কাছে নানা কাকুতি মিনতি ক'রে সেটা ঠিক ক'রে এসেচেন। ভাড়া লাগ্‌বে একশো পঁচিশ টাকা—আমাদের সেই হাতী-কেনার চেয়ে বেশি। যা হোক্, পৌনে আটটার সময় গাড়ি এলো—তখন বৃষ্টি থেমেচে। গাড়ি তো বায়ু বেগে চ'ল্‌লো, কিছুদূর গিয়ে দেখি, একখানা বড়ো মোটরের মালগাড়ি ভগ্ন অবস্থায় পথপার্শ্বে নিশ্চল হ'য়ে আছে। পূর্ব্বদিনে

আমাদের জিনিসপত্র এবং সাধুচরণকে নিয়ে এই গাড়ি রওনা হ'য়েছিলো; এই পর্য্যন্ত এসে তিনি স্তব্ধ হ'য়েচেন। জিনিস তা'র মধ্যেই আছে, সাধু ভাগ্যক্রমে একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি পেয়ে চ'লে গেচে। জিনিস রইলো প'ড়ে, আমরা এগিয়ে চ'ল্লুম। বিদেশে, বিশেষত শীতের দেশে, জিনিসে-মানুষে বিচ্ছেদ সুখকর নয়। সইতে হ'লো। যা হোক্, শিলং-পাহাড়ে এসে দেখি, পাহাড়টা ঠিক আছে; আমাদের গ্রহ-বৈগুণ্যে বাঁকেনি, চোরেনি, ন'ড়ে যায়নি; আমাদের জিওগ্রাফিতে তা'র যেখানে স্থান ঠিক সেই জায়গাটিতে সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। দেখে আশ্চর্য্য বোধ হ'লো, এখনো পাহাড়টা ঠিক আছে; তাই তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি কিন্তু আর বেশি লিখ্‌লে ডাক পাওয়া যাবে না। অতএব ইতি—কৃষ্ণা তৃতীয়া, ১৩২৬।

৩৯

ব্রুক্‌সাইড্

শিলং

আমি যেদিন এখানে এসে পৌঁচলুম সেদিন থেকেই বৃষ্টি-বাদ্‌লা কেটে গিয়েচে। আজ এই সকালে উজ্জ্বল

রৌদ্রালোকে চারিদিক প্রসন্ন ; মোটা মোটা গোটাকতক মেঘ পাহাড়ের গা আঁক্‌ড়ে ধ’রে চুপ্‌চাপ রোদ পোয়াচ্চে ; তাদের এম্‌নি বেজায় কুঁড়ে রকমের চেহারা-যে, শীঘ্র তা’রা বৃষ্টি বর্ষণে লাগ্‌বে এমন মনেই হয় না।

আমার এখানকার লেখ্‌বার ঘরের সঙ্গে শান্তি-নিকেতনের সেই কোণটার কোনো তুলনাই হয় না। বেশ বড়ো ঘর—নানা রকমের চৌকি, টেবিল, সোফা, আরামকেদারায় আকীর্ণ। জান্‌লাগুলো সমস্তই শার্সির, তা’র ভিতর থেকে দেখ্‌তে পাচ্চি, দেওদার গাছগুলো লম্বা হ’য়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাতাসে মাথা নেড়ে নেড়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে ইসারায় কথা বল্‌বার চেষ্টা ক’র্‌চে। বাগানের ফুলগাছের চান্‌কায় কত রঙ-বেরঙের ফুল-যে ফুটেচে তা’র ঠিক নেই,—কত চামেলি কত চন্দ্রমল্লিকা, কত গোলাপ,—আরো কত অজ্ঞাত-কুলশীল ফুল। আমি ভোরে সূর্য্য ওঠ্‌বার আগেই রাস্তার দুইধারের সেই সব ফোটা ফুলের মাঝখান দিয়ে পায়চারি ক’রে বেড়াই—তা’রা আমার পাকা দাড়ি আর লম্বা জোব্বা দেখে একটুও ভয় পায় না—হাসাহাসি করে।

এই পর্য্যন্ত লিখেচি, এমন সময়ে সাধু এসে খবর

দিলে, স্নানের জল তৈরি। অমনি কলম রেখে চৌকি ছেড়ে রবিঠাকুর দ্রুতপদবিক্ষেপে স্নানযাত্রায় গমন ক'র্‌লেন। স্নান ক'রে বেরিয়ে এসে খবর পাওয়া গেল—কী খবর বলো দেখি? আন্দাজ ক'রে দেখো। খবর পাওয়া গেল-যে, রবিঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত—শ্রীযুক্ত তুলসী নামক উৎকলবাসী পাচকের স্বহস্তে পাক-করা। আহার সমাধা ক'রে এই আস্‌চি—সুতরাং চিঠির ওভাগে পূর্ব্বাহ্ণ ছিল, এ ভাগে অপরাহ্ণ প'ড়েচে—এখন ঘড়ির কাঁটা বেলা একটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'র্‌চে। সেই মোটা মেঘগুলো শাদা-কালো রঙের কাবুলি বেড়ালের মতো এখনো অলস-ভাবে স্তব্ধ হ'য়ে রৌদ্রে পিঠ লাগিয়ে প'ড়ে আছে। পাখী ডাক্‌চে আর জানালার ভিতর দিয়ে চামেলি ফুলের গন্ধ আস্‌চে।

ঐ মেঘগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে একটা লম্বা কেদারা আশ্রয় ক'রে নিস্তব্ধভাবে জানালার কাছে যদি ব'স্‌তে পার্‌তুম তা হ'লে সুখী হতুম কিন্তু অনেক চিঠি লিখ্‌তে বাকি আছে। অতএব গিরি-শিখরে এই শরতের অপরাহ্ণ আমার চিঠি লিখেই কাট্‌বে। তুমি ছবি আঁক্‌চো কি না লিখো; আর সেই এস্‌রাজের উপর

তোমার ছড়ি চ'ল্‌বে কিনা তাও জানতে চাই। ইতি ২৮শে আশ্বিন, ১৩২৬ (তারিখ ভুল করিনি—পাঁজি দেখে লিখেচি)।

৪০

শান্তিনিকেতন

তুমি এত দেরিতে কেন আমার চিঠি পেয়েচো, ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। আজ তোমার চিঠি পেতে দেরি হ'লো দেখে ভাব্‌লুম হয় তো অমৃতসর কংগ্রেসে তোমাকে ডেলিগেট ক'রেচে কিম্বা হাওয়া-জাহাজে কাপ্তেন রসের সঙ্গে তুমি অষ্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েচো। কিম্বা হিমালয়ের পর্ব্বত-শৃঙ্গে কোনো পওহারী বাবার শিষ্য হ'য়ে মাটির নীচে ব'সে একমনে নিজের নাকের ডগা নিরীক্ষণ ক'র্‌চো কিম্বা লয়েড্‌ জর্জ্জের প্রাইভেট্‌ সেক্রেটারীর সর্দ্দি হ'য়েচে খবর পেয়েই তুমি সেই পদের জন্য দরখাস্ত ক'র্‌তে ইংলণ্ডে চ'লে গিয়েচো। আমি পার্লামেণ্টে লয়েড্‌ জর্জ্জকে টেলিগ্রাফ ক'র্‌তে যাচ্চি ঠিক এমন সময়ে তোমার চিঠি পেলুম। প'ড়ে

দেখি, তুমি ঝর্ণার ধারে কোথায় বেড়াতে গিয়ে আর একটু হ'লেই কুয়োর মধ্যে প'ড়ে গিয়েছিলে। আশ্চর্য্য —দেখো, কাল সন্ধ্যাবেলায় আমারো প্রায় সেই রকম দুর্ঘটনা ঘটেছিলো। তখন রাত্তির ন-টা। মুখ ধুয়ে বিছানায় শুতে যাচ্চি, এমন সময় কী বলো দেখি? কুয়ো? সেই রকমই বটে। এক কপি নৌকাডুবি ব'লে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এক গল্পের বই,—হঠাৎ তারি মধ্যে একবার হুঁচট্ খেয়ে প'ড়ে গেলুম। একেবারে শেষ পাতা পর্য্যন্ত তলিয়ে গেলুম। এত বড়ো বিপদ ঘটবার কারণ হ'চ্চে, বিলাত থেকে একজন ইংরেজ ঐ বইটা তর্জ্জমা কর্‌বার অনুমতি নিয়েছিলেন। আবার সেদিন আর-একজন ইংরেজ ঐটে তর্জ্জমা ক'র্‌তে চেয়ে আমাকে চিঠি লিখেচেন। তাতেই আমার দেখ্‌বার ইচ্ছা হ'লো, ওটার মধ্যে কী আছে। কিন্তু সেই ইচ্ছেটা রাত ন-টার সময় হঠাৎ উদয় হওয়া কোনো শুভগ্রহের প্রভাবে নয়। কারণ এই কুয়োটা থেকে উদ্ধার হ'তে রাত তিনটা বেজে গেল। তা'র মানে আমার পরমায়ু থেকে একটা রাতের বারো আনার ঘুম গেল অনন্তকালের মতো হারিয়ে। আজ সকালবেলা আমার মুখ-চোখ দেখে সি, আই, ডি

পুলিশ সন্দেহ ক'র্‌চে কাল রাত্রে আমি কোথায় সিঁধ কাট্‌তে গিয়েছিলুম।

ঐ-যে ডাক-হরকরা আস্‌চে। একরাশ চিঠি দিয়ে গেল। তোমার বাবার হাতের লেখা এক লেফাফা দেখ্‌তে পাচ্চি,—তা'র মধ্যে তোমাদের আধুনিক ইতিহাস কিছু পাওয়া যাবে। ওদিকে আবার কাল রাত্রে এক ইংরেজ অতিথি এসেচেন—আজ সমস্ত দিন তিনি বিদ্যালয় পর্য্যবেক্ষণ ক'র্‌বেন, সেই সঙ্গে আমাকেও পর্য্যবেক্ষণ ক'র্‌বেন ব'লে বোধ হচ্চে। যখন ক'র্‌বেন তখন হয় তো ঢুল্‌বো—আর তিনি তাঁর নোটবুকে লিখে নিয়ে যাবেন-যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমস্ত দিন ধ'রে কেবল ঢোলেন। এম্‌নি ক'রেই জীবন-চরিত লেখা হয়। সাহেব যখন আমার জীবন-চরিতে এই কথা লিখ্‌বেন তখন তুমি খুব জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ ক'রো,—ব'লো, আমার অনেক দোষ থাক্‌তে পারে, দিনে ঢোলা অভ্যাস একেবারেই নেই। যাই হোক্‌, তুমি লয়েড্‌ জর্জ্জের প্রাইভেট্‌ সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করোনি, এইটাতে আমার মন অনেকটা আশ্বস্ত হ'য়েচে। ইতি ২৮শে পৌষ, ১৩২৬।

৪১

সাম্‌নে তোমার পরীক্ষা—এখন দিনরাত তোমার মাথায় সেই ভাবনা লেগে আছে। অ্যালজেব্রা নিয়ে প'ড়ে থাক্‌বে, তোমার ভয় হবে—আমার কাছে থাক্‌লে পাছে তোমার নাম্‌তা ভুল হ'য়ে যায়, আর পাছে Animal বানান ক'র্‌তে গিয়ে Annie mull লিখে বসো। এই কথা মনে ক'রেই আমি উদাস হ'য়ে একেবারে অজন্তা-গুহার মধ্যে চ'লে যাচ্ছিলুম। তুমি যদি আমাকে আট্‌কে রাখ্‌তে চাও, তা হ'লে কিন্তু অ্যালজেব্রার বইখানা তোমার ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রাখ্‌তে হবে।

দেখো, এবারকার চিঠিতে তোমাকে একটুও ঠাট্টা করিনি—ভয়ঙ্কর গম্ভীর ভাষায় তোমাকে লিখ্‌লুম। তুমি পরীক্ষা দিতে যাচ্চো, আমি কোনো দিন পরীক্ষা দিইনি—এইজন্যে ভয়ে, সম্ভ্রমে, ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় আমার মুখ থেকে একটিও ঠাট্টার কথা বেরোতে চাচ্চে না—আমি নতশিরে এই কথাই কেবল আবৃত্তি ক'র্‌চি—

যা দেবী পাঠ্যগ্রন্থেষু ছাত্রীরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

ইতি ১লা আশ্বিন, ১৩২৮।

৪২

একটা বিষয়ে আমার মনে বড়ো খট্‌কা লেগেচে, তুমি চিঠিতে লিখেচো—আমি নিশ্চয়ই তোমার দিদির চেয়ে বেশি ইংরেজি জানি। এটা কি উচিৎ? তোমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা, কলেজে পড়ে, তা'র ইংরেজি জ্ঞানের প্রতি এত বড়ো অবজ্ঞা প্রকাশ কি ভালো হ'য়েচে? সে যদি জান্‌তে পারে তা হ'লে তা'র মনে কত বড়ো আঘাত লাগ্‌বে—একবার ভেবে দেখো দেখি। আমার চিঠি পেয়েই তা'র কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা ক'রো।

তা'র মতো আমি যদি ইংরেজিতে পরীক্ষা পাশ ক'র্‌তে পার্‌তুম তা হ'লে কি এমন বেকার ব'সে থাক্‌তুম? তা হ'লে অন্ততঃ পুলিশের দারোগাগিরি জোগাড় ক'র্‌তে পার্‌তুম। চিরদিন স্কুল পালিয়ে কাটালুম, কুঁড়েমি ক'রেই এমন মানবজন্মের সাতাশটা বছর * বৃথা নষ্ট ক'র্‌লুম—এইজন্যে পাছে আমার

* ভানুসিংহের বয়স-যে সাতাশ বছরে এসে চিরকালের মতো ঠেকে গেচে, বালিকার এই একটি স্বরচিত বয়ঃপঞ্জীর বিধান ছিল।

কুদৃষ্টিতে তোমাদের হঠাৎ বানান-ভুলে পেয়ে বসে তাই তো সহর ছেড়ে তোমাদের কাছে থেকে দূরে দূরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। এবারকার মতো যা হবার তা হ'লো, আর জন্মে ম্যাট্রিকুলেশন যদি বা না পারি তো অন্ততঃ মাইনর্ ইস্কুলের ছাত্রবৃত্তি নিয়ে তবে ছাড়্বো। কিছু না হোক্, অন্ততঃ ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত অঙ্ক ক'ষবোই, আর ফার্ষ্ট সেকেণ্ড দুটো রীডার যদি শেষ ক'র্‌তে পারি তা হ'লে গাঁয়ের প্রাইমারি ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টারি ক'র্‌তে পার্‌বো, আর তারি সঙ্গে সঙ্গে মাসিক সাড়ে আট টাকা বেতনে ব্রাঞ্চ পোষ্ট-আফিসের পোষ্টমাষ্টারি-পদটাও জোগাড় ক'রে নেবার চেষ্টা ক'র্‌বো। নেহাৎ না পাই যদি, তবে জমিদারবাবুর কনিষ্ঠ ছেলেটির প্রাইভেট টিউটরের কাজটা নিশ্চয় জুটবে, ইতি ৭ই আশ্বিন, ১৩২৮।

৪৩

আজ বুধবার—আজ ছুটির দিনে আমার বারান্দার সেই কোণটায় ব'সে তোমাকে লিখ্‌চি। মাঘের দুপুরবেলাকার রৌদ্রে আমার ঐ আমলকী-বীথিকার মধ্যে দিনটি রমণীয় লাগ্‌চে। এইরকম দিনে কাজ ক'র্‌তে

ইচ্ছে করে না—আমার সমস্ত মনটি ঐ ডালের উপরে বসা ফিঙে পাখীটির মতো চুপ ক'রে রোদ পোহায়। আজ উত্তরে-হাওয়া থেকে থেকে উতলা হ'য়ে উঠ্‌চে—শালবনের পাতায় পাতায় কাঁপুনি ধ'রেচে—একটা মস্ত কালো ভ্রমর মাঝে মাঝে অকারণ আমার কাছে এসে গুন্‌গুনিয়ে আবার বেরিয়ে চ'লে যাচ্চে—একটা কাঠবিড়ালি এই বারান্দার কাঠের খুঁটি বেয়ে চালের কাছে উঠে কিসের ব্যর্থসন্ধানে চঞ্চল চক্ষে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার তখনি পিঠের ওপর ল্যাজ তুলে ছুড় ছুড় ক'রে নেমে যাচ্চে। এই শীতের মধ্যাহ্নে যেন আজ কারো কিছু কাজ নেই।

আমি সমস্ত সপ্তাহ ধ'রে একটা নাটক লিখ্‌ছিলুম—শেষ হ'য়ে গেচে তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা "প্রায়শ্চিত্ত" নয়, এর নাম "পথ"। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত-নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই—সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে এতে পাবে না।

তুমি পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছো—আমার এই কুঁড়েমির চিঠিতে পাছে তোমার জিওমেট্রির ধ্যান ভঙ্গ করে, এই ভয় আছে। ৪ঠা মাঘ, ১৩২৮।

৪৪

তুমি রোজ দুটো ক'রে ডিম খেয়ে একটিমাত্র ক্লাসে প'ড়্‌চো খবর পেয়েই খুসী হ'য়ে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে ব'সেচি। আমিও ঠিক দুটি ক'রে ডিম খাই আর একটি মাত্র ক্লাসেও পড়িনে। সেইটেতে আমার মুস্কিল বেধেচে, কেন না, যদি আমার ক্লাস থাক্‌তো, যদি আমাকে নামতা মুখস্ত ক'র্‌তে হ'তো তা হ'লে সর্ব্ব সময়ই আমার কাছে লোক আনাগোনা ক'রতে পার্‌তো না ; আমি ব'ল্‌তে পার্‌তুম, আমার সময় নেই, আমাকে এক্‌জামিন্ দিতে হবে। তোমার ভারি সুবিধে—তোমার কাছে কইম্বাটুর থেকে ত্রিম্বাকুটু থেকে কাঞ্জিভ্যারাম থেকে কামস্কাট্‌া থেকে মক্কা থেকে মদিনা মস্কট থেকে যখন-তখন নানালোক মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে আসেন না—তাঁরা জানেন-যে, মার্চ্চ মাসে তোমাকে ম্যাট্রিকুলেশন্ দিতে হবে। আমি তাই এক-একবার মনে করি—আমি ম্যাট্রিকুলেশন দেবো—দিলে নিশ্চয়ই ফেল্ ক'র্‌বো—ফেল করার সুবিধে এই-যে, ফি-বৎসরেই ম্যাট্রিকুলেশন্ দেওয়া যায় আর তা হ'লে ত্রিম্বাকুটু থেকে নিজনি-

নবগরড থেকে বেচুয়ানাল্যাণ্ড থেকে সদাসর্ব্বদা লোক-আসা বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে।

লেভি সাহেব আমার বন্ধু হ'য়েও তোমার কাছে হেমনলিনীর কথাটা ফাঁস ক'রে দিয়েচেন, এতে আমি মনে বড়ো দুঃখ পেয়েচি—এ কথা সত্য-যে, আমি তা'রই সাধনায় প্রবৃত্ত আছি। কিন্তু সেই স্বর্ণ-শতদলের পাপ্‌ড়িগুলি হ'চ্চে bank notes। সাধনায় বিশেষ-যে সিদ্ধিলাভ ক'র্‌তে পেরেচি—তা মনেও ক'রো না, তোমরা কামনা ক'রো এই হেমনলিনী যেন আমার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু কপালক্রমে আমার পঞ্জিকায় অকাল প'ড়েচে—শুভলগ্ন আর আসেই না, তাই গান গাচ্চি—

ওগো হেমনলিনী

আমার দুঃখের কথা কারো কাছে বলিনি।
লক্ষ্মীর চরণতলে ফুটে আছো শতদলে
সে-পথ করিয়া লক্ষ্য কেন আমি চলিনি ?

ইতি ১০ ফাল্গুন, ১৩২৮।

৪৫

আমি নদী-পথে কয়েকদিন কাটিয়ে এলুম—কাল রাত্রে ফিরে এসেচি। আজ সকালে দেখি, এখানে তোমার চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা ক'র্‌ছিলো। তুমি জানো—আমি নদী ভালোবাসি। কেন, ব'ল্‌বো? আমরা যে-ডাঙার উপরে বাস করি, সে-ডাঙা তো নড়ে না, স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে থাকে, কিন্তু নদীর জল দিনরাত্রি চলে, তা'র একটা বাণী আছে। তা'র ছন্দের সঙ্গে আমাদের রক্ত-চলাচলের ছন্দ মেলে, আমাদের মনে নিরন্তর যে-চিন্তাস্রোত ব'য়ে যাচ্চে সেই স্রোতের সঙ্গে তা'র সাদৃশ্য আছে—এই জন্যে নদীর সঙ্গে আমার এত ভাব। বয়স যখন আরো কম ছিল, তখন কতকাল নৌকায় কাটিয়েচি, কোনো জনমানব আমার কাছেও থাক্‌তো না, পদ্মার চরের উপরকার আকাশে সন্ধ্যাতারা আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাক্‌তো; প্রতিবেশী ছিল চক্রবাকের দল; তাদের কলালাপ থেকে আর কিছু বুঝি বা না বুঝি, এটুকু জান্‌তুম আমার সম্বন্ধে কোনো জনরব তা'রা রটাতো না—এমন কি, আমার জয়-পরাজয় নামক

গল্পের নায়ক-নায়িকার পরিণাম সম্বন্ধে তা'রা লেশমাত্র কৌতূহল প্রকাশ ক'র্তো না।

যা হোক, তেহি নো দিবস গতাঃ,—এখন বোলপুরের শুষ্ক ধূসর মাঠের মধ্যে ব'সে ইস্কুল-মাষ্টারি ক'র্চি; ছেলেগুলোর কলরব চক্রবাকের কল-কোলাহলকে ছাড়িয়ে গেচে। তুমি মনে ক'রো না, এখানে কোনো স্রোত নেই; এখানে অনেকগুলি জীবনের ধারা মিলে একটি সৃষ্টির স্রোত চ'লেচে; তা'র ঢেউ প্রতি মুহূর্ত্তে উঠ্‌চে, তা'র বাণীর অন্ত নেই। সেই স্রোতের দোলায় আমার জীবন আন্দোলিত হ'চ্চে, আপনার পথ সে কাট্‌চে, দুইতটকে গ'ড়ে তুল্‌চে। সে কোন্‌-এক অলক্ষ্য মহাসমুদ্রের দিকে চ'লেচে, দূর থেকে আমরা তা'র বার্ত্তার আভাস পাই মাত্র। ইতি ২২শে পৌষ, ১৩২৮।

৪৬

শিলাইদা·

তুমি আমাকে চিঠি লিখেচো শান্তিনিকেতনে, আমি সেটি পেলুম এখানে অর্থাৎ শিলাইদহে।

তুমি কখনো এখানে আসোনি, সুতরাং জান্‌তে পারবে না—জায়গাটা কী রকম। বোলপুরের সঙ্গে এখানকার চেহারার কিছুমাত্র মিল নেই। সেখানকার রৌদ্র বিরহীর মতো, মাঠের মধ্যে একা ব'সে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেল্‌চে, সেই তপ্ত নিশ্বাসে সেখানকার ঘাসগুলো শুকিয়ে হ'ল্‌দে হ'য়ে উঠেচে। এখানে সেই রৌদ্র তা'র সহচরী ছায়ার সঙ্গে মিলেচে; তাই চারিদিকে এত সরসতা। আমাদের বাড়ির সাম্‌নে সিসু-বীথিকায় তাই দিনরাত মর্ম্মরধ্বনি শুন্‌চি, আর কনকচাঁপার গন্ধে বাতাস বিহ্বল, কয়েৎবেলের শাখায় প্রশাখায় নতুন চিকণ পাতাগুলি ঝিল্‌মিল্‌ ক'রচে, আর ঐ বেণুবনের মধ্যে চঞ্চলতার বিরাম নেই। সন্ধ্যার সময় টুকরো চাঁদ যখন ধীরে ধীরে আকাশে উঠ্‌তে থাকে তখন সুপুরিগাছের শাখাগুলি ঠিক যেন ছোটো ছেলের হাত নাড়ার মতো চাঁদমামাকে টী দিয়ে যাবার জন্যে ইসারা ক'রে ডাক্‌তে থাকে। এখন চৈত্রমাসের ফসল সমস্ত উঠে গিয়েচে, ছাদের থেকে দেখ্‌তে পাচ্চি, চষা মাঠ দিক-প্রান্ত ছড়িয়ে প'ড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কিছু বৃষ্টির জন্যে। মাঠের যে-অংশে বাব্‌লাবনের নীচে চাষ পড়েনি

সেখানে ঘাসে ঘাসে একটুখানি স্নিগ্ধ সবুজের প্রলেপ, আর সেইখানে গ্রামের গরুগুলো চ'র্‌চে। এই উদার-বিস্তৃত চষা মাঠের মাঝে মাঝে ছায়াবগুণ্ঠিত এক-একটি পল্লী—সেইখান থেকে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ বেয়ে গ্রামের মেয়েরা ঝকঝকে পিতলের কলসী নিয়ে দুটি তিনটি ক'রে সার বেঁধে প্রায় সমস্ত বেলাই জলাশয় থেকে জল নিতে চ'লেচে। আগে পদ্মা কাছে ছিল—এখন নদী বহুদূরে স'রে গেচে—আমার তেতালা ঘরের জানালা দিয়ে তা'র একটুখানি আভাস যেন আন্দাজ ক'রে বুঝতে পারি, অথচ একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল। শিলাইদহে যখনই আস্‌তুম তখন দিনরাত্রির ঐ নদীর সঙ্গেই আমার আলাপ চ'ল্‌তো; রাত্রে আমার স্বপ্নের সঙ্গে ঐ নদীর কলধ্বনি মিশে যেতো আর নদীর কলস্বরে আমার জাগরণের প্রথম অভ্যর্থনা শুন্‌তে পেতেম। তা'রপরে কত বৎসর বোলপুরের মাঠে মাঠে কাট্‌লো, কতকাল সমুদ্রের এপারে ওপারে পাড়ি দিলুম—এখন এসে দেখি সে-নদী যেন আমাকে চেনে না। ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল,

সবশেষে উত্তর-দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতর পাড়ের মতো একটি বনরেখা দেখা যায়। সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ-যে একটি ঝাপ্‌সা বাষ্পলেখাটির মতো দেখ্‌তে পাচ্চি, জানি ঐ আমার সেই পদ্মা। আজ সে আমার কাছে অনুমানের বিষয় হ'য়েচে। এই তো মানুষের জীবন। ক্রমাগতই কাছের জিনিস দূরে চ'লে যায়, জানা জিনিস ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে, আর যে-স্রোত বন্যার মতো প্রাণমনকে প্লাবিত ক'রেচে, সেই স্রোত একদিন অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মতো জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে।

এখন বেলা ফুরিয়ে এসেচে, অল্প একটুখানি মেঘেতে আকাশ ঢাকা, দিনাবসানেও বাগানে পাখীর ডাকে একটুও ক্লান্তি দেখ্‌চিনে। দুই কোকিলে কেবলি জবাব চ'লেচে, কেউ হার মান্‌তে চাচ্চে না—তা ছাড়া আরও অনেক পাখী ডাক্‌চে, তাদের ডাক স্পষ্ট ক'রে চেনা যায় না। সকলের ডাক মিশিয়ে জড়িয়ে গেচে, অন্য দিনের মতো বাতাস আজ দুরন্ত নয়, ঝাউগাছগুলি স্তব্ধ এবং নিঃশব্দ হ'য়ে গেচে। আজ অষ্টমীর চাঁদ দেখ্‌চি মেঘের পর্দ্দার আড়ালে রাত্রিযাপন ক'র্‌বে।

আমার ঘরের দক্ষিণদিকে ঐ ছাদে একটি কেদারা পাতা আছে—ঐখানে সন্ধ্যার সময় আমি গিয়ে বসি। এ কয়দিন দ্বিতীয়ার চাঁদ থেকে আরম্ভ ক'রে অষ্টমীর চাঁদ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই উদয়কালে এই কবির সঙ্গে মুকাবিলা ক'রেচে। ঐ চাঁদ হ'চ্চে আমার জন্মদিনের অধিপতি। আমি যখন ছাদে বসি তখন আমার বামে পূর্ব্ব আকাশ থেকে বৃহস্পতি আমার মুখের দিকে তাকায় আর পশ্চিম আকাশ থেকে চন্দ্রমা। —এইবার ক্রমে একটু অন্ধকার হ'য়ে আস্‌চে—ঘরের মধ্যকার এই ঘোলা আলোয় আর দৃষ্টি চ'ল্‌চে না, বাইরে গিয়ে বস্‌বার সময় হ'লো।

তুমি আমার কাছে বড়ো চিঠি চেয়েছিলে, বড়ো চিঠিই লিখ্‌লুম। লিখ্‌তে পার্‌লুম, তা'র কারণ এখানে অবকাশ আছে। কিন্তু এই চিঠি যখন ডাকে দেবো, অর্থাৎ কাল বৃহস্পতিবারে,—ক'ল্‌কাতায় রওনা হবো। সেখানে ট্রাম আছে, মোটর আছে, ইলেক্‌ট্রিক্‌-পাখা আছে ; সময় নেই। তা'রপরে বোলপুরে যাবো, —সেখানে শালের বনে ফুল ফুটেচে, আমবাগানে ফল ধ'রেচে ; সেখানে মাঠ আছে বিস্তীর্ণ, আকাশ আছে অবারিত, কিন্তু সেখানেও অবকাশ নেই।

চিঠি জিনিসটা ছোট্ট, মালতী-ফুলের মতো, কিন্তু সেই চিঠি যে-আকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে সেই আকাশ মালতী-লতারই মতো বড়ো। আমাদের যত কেজো লোকের অবকাশ টবের গাছ, তা'র থেকে যে-সব পত্রোদ্গম হয় সে তো পোষ্টকার্ডের চেয়ে বড়ো হ'তে চায় না। ইতি ২২ চৈত্র, ১৩২৮।

৪৭

শান্তিনিকেতন

এতদিনে তুমি কাশী পৌঁছেচো, পথের মধ্যে ভিড় পাওনি তো? এখন কেমন আছো—লিখো। তোমার যাবার পরদিন থেকেই বিদ্যালয়ের কাজ রীতিমতো আরম্ভ হ'য়ে গেচে, রোজই কমিটি, মিটিং এবং ক্লাসের কাজও চ'ল্‌চে। ছেলেরা অনাবৃষ্টির পরে আষাঢ়ের ধারার মতো কলরব ক'র্‌তে ক'র্‌তে এখানকার শূন্য ঘর সব পূর্ণ ক'রে দিয়েচে। এখন আমার কাজের আর অন্ত নেই।

মেয়েরা সকলেই পরশুরাম হ'য়ে উঠেচে—কুড়ুল দিয়ে ঠকাঠক্ গাছ কাট্‌তে লেগে গেচে। তা'রা আছে

ভালো। এদিকে আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি সুরু হ'য়েচে, আর বৃষ্টিস্নাত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রোদ্দুর তা'র পরশপাথর ঠেকিয়ে সমস্ত আকাশকে সোনা ক'রে তুলেচে। আমি আমার সাম্‌নের খোলা জান্‌লা দিয়ে ঐ শাল, তাল, শিরীষ, মহুয়া, ছাতিমের দল-বাঁধা বনের দিকে প্রায় তাকিয়ে থাকি। এখন আমার ঘড়িতে সাড়ে দুপুর, অর্থাৎ সাধারণ ঘড়িতে দুপুর। ছেলেরা তাদের মধ্যাহ্নভোজন শেষ ক'রে দলে দলে কুয়োতলায় মুখ ধুতে আস্‌চে—দীর্ঘ ছুটির দুঃখ-দিনের পরে কাকগুলো এঁটো শালপাতার উপর শ্রাদ্ধবাড়ির ভিখিরীর পালের মতো এসে প'ড়েচে। বাতাসটি মধুর হ'য়ে বইচে, জাম গাছের চিকণ পাতার ঘনিমার উপর রৌদ্র ঝিল্‌মিল্ ক'রে উঠ্‌চে, পাটল রঙের দুটো গরু ল্যাজ দিয়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে ধীর মন্দ গমনে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্চে—আমি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চি আর ভাব্‌চি। ইতি ১ জুলাই ১৩২৯।

৪৮

ক'ল্‌কাতা

ক'ল্‌কাতা সহরটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে—মনে হয় যেন ইঁট-কাঠের একটা মস্ত জন্তু আমাকে একেবারে গিলে ফেলেচে। তা'র উপরে আবার আকাশ মেঘে লেপা, রাত্তির থেকে টিপ্‌টিপ্ ক'রে বৃষ্টি প'ড়্‌চে। শান্তিনিকেতনের মাঠে যখন বৃষ্টি নামে তখন তা'র ছায়ায় আকাশের আলো করুণ হ'য়ে আসে, ঘাসে ঘাসে পুলক লাগে, গাছগুলি যেন কথা কইতে চায়, আমার মনের মধ্যে গান জেগে ওঠে আর তা'র সুর গিয়ে পৌঁছোয় দিনুর ঘরে। আর এখানে নববর্ষা বাড়ির ছাদে ঠোকর খেতে খেতে খোঁড়া হ'য়ে পড়ে,—কোথায় তা'র নৃত্য, কোথায় তা'র গান, কোথায় তা'র সবুজ রঙের উত্তরীয়, কোথায় তা'র পুবে বাতাসে উড়ে-পড়া জটাজাল।

কথা হ'চ্চে, এবার শ্রাবণ মাসে আর বছরের মতো ক'ল্‌কাতায় বর্ষামঙ্গল গান হবে। কিন্তু যে-গান শান্তিনিকেতনের মাঠে তৈরি সে-গান কি ক'ল্‌কাতা সহরের হাটে জ'ম্‌বে? এখানে অনুরোধে প'ড়ে কখনো

কখনো আমার নতুন বর্ষার গান গাইতে হ'য়েচে। কিন্তু এখানকার বৈঠকখানায় সেই গানের সুর ঠিক মতো বাজে না। তোমাদের ওখানে এতদিনে বোধ হয় বর্ষা নেমেচে, অতএব তোমার নতুন শেখা বর্ষার গান কখনো কখনো গুন্‌গুন্ স্বরে গাইতে পার্‌বে, কখনো বা এস্‌রাজে বাজিয়ে তুল্‌বে। তুমি যাওয়ার পর আরো কিছু কিছু নতুন গান আমার সেই খাতায় জ'মে উঠেচে, ক'ল্‌কাতায় না এলে আরো জ'ম্‌তো। এদিকে দিনুবাবুও দাঁত তোলাবার জন্যে দু-তিন দিন হ'লো ক'ল্‌কাতায় এসেচেন;—আষাঢ় মাসের বর্ষাকে এ সহরে যেমন মানায় না, দিনুবাবুকেও তেমনি। আজ সকালেই সে পালাবে স্থির ক'রেচে।—ইতি ২৯ আষাঢ়, ১৩২৯।

৪৯

আত্রাই নামক একটি নদীর উপর বোটে ক'রে ভেসে চ'লেচি। বর্ষার মেঘ ঘন হ'য়ে আকাশ আচ্ছন্ন ক'রেচে, একটু ঝোড়ো বাতাসের মতো বইচে, পাল তুলে দিয়েচে। নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ, স্রোত,

খরতর, দলে দলে শৈবাল ভেসে আস্‌চে। পল্লীর আঙিনার কাছ পর্য্যন্ত জল উঠেচে; ঘন বাঁশের ঝাড়; আম কাঁঠাল তেঁতুল কুল শিমুল নিবিড় হ'য়ে উঠে গ্রামগুলিকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেচে; মাঝে মাঝে নদীর তীরে তীরে কাঁচা ধানের ক্ষেতে জল উঠেচে, কচি ধানের মাথা জলের উপর জেগে আছে। দুই তটে স্তরে স্তরে সবুজ রঙের ঘনিমা ফুলে ফুলে উঠেচে, তারি মাঝখান দিয়ে বর্ষার খোলা নদীটি তা'র গেরুয়া রঙের ধারা বহন ক'রে ব্যস্ত হ'য়ে চ'লেচে, সমস্তটার উপর বাদল-সায়াহ্নের ছায়া। বৃষ্টি নেমে এলো—দূরে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যাস্তের একটা ম্লান আভা এই বৃষ্টিধারার আবেগের উপর যেন সান্ত্বনার ক্ষীণ প্রয়াসের মতো এসে প'ড়েচে;

আমার এই বোট ছাড়া নদীতে আর নৌকা নেই। এই জলস্থল আকাশের ছায়াবিষ্ট নিভৃত শ্যামলতার সঙ্গে মিল ক'রে একটি গান তৈরি ক'র্‌তে ইচ্ছে ক'র্‌চে, কিন্তু হয় তো হ'য়ে উঠ্‌বে না। আমার দুই চক্ষু এখন বাইরের দিকে চেয়ে থাক্‌তে চায়,—খাতার দিকে চোখ রাখ্‌বার এখন সময় নয়। অনেক দিন বোলপুরে শুক্‌নো ডাঙায় কাটিয়ে এসেচি, এখন এই

নদীর উপর এসে মনে হ'চ্চে,—পৃথিবীর যেন মনের কথাটি শুন্‌তে পাওয়া যাচ্চে। নদী আমি ভারি ভালোবাসি; আর ভালোবাসি আকাশ। নদীতে আকাশে চমৎকার মিলন, রঙে রঙে, আলোয় ছায়ায়,—ঠিক যেন আকাশের প্রতিধ্বনির মতো। আকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায় না এই জলের উপর ছাড়া।

আজ রাত্রের গাড়িতেই ক'ল্‌কাতায় যাবো মনে ক'রে ভালো লাগ্‌চে না। ইতি ২ শ্রাবণ, ১৩২৯।

৫০

আজ বুধবারে সকালে মন্দিরের কাজ শেষ ক'রে যেই আমার কুটীরের সাম্‌নে উত্তরদিকের বারান্দায় ব'সেচি অম্‌নি নানাবিধ চিঠি ও খবরের কাগজের সঙ্গে তোমার চিঠি এসে পৌঁচলো। এর আগে দু-এক দিন খুব ঘন বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছিলো, আজও স্তূপাকার কালো মেঘ আকাশক্ষেত্রের এদিকে ওদিকে ভ্রূকুটি ক'রে ব'সে আছে; এখনি তা'রা বৃষ্টিবাণ বর্ষণ ক'র্‌বে ব'লে ভয় দেখাচ্চে। কিন্তু আজ প্রথম সকালের মেঘের ফাঁক

দিয়ে অরুণোদয় খুব সুন্দর হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো। আমি তখন পূবদিকের বারান্দায় ব'সেছিলুম, আমার মনের সঙ্গে যেন তা'র মুখোমুখি কথা চ'ল্‌ছিলো। মন যেদিন তা'র চোখ মেলে, সেদিন প্রত্যেক সকাল-বেলাটিই তা'র কাছে অপূর্ব্ব হ'য়ে দেখা দেয়। বিশ্বলক্ষ্মী তাঁর অন্দরের দ্বারের কাছে রোজই দাঁড়িয়ে থাকেন, যেদিন আমরা প্রস্তুত হ'য়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাতি, সেদিন তাঁর দান মুঠো ভ'রে পেয়ে থাকি। পৃথিবী থেকে যাবার সময় আমি এই কথা ব'লে যেতে পার্‌বো-যে, এমন দান আমি অনেক পেয়েচি।

সেপ্টেম্বরের আরম্ভে আমার বোম্বাই যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কেন না, সেপ্টেম্বরের ১৫ই তারিখে ক'ল্‌কাতায় আমাদের শারদোৎসবের পালা ব'স্‌বে—আমাকে সাজ্‌তে হবে সন্ন্যাসী। আমার এই সন্ন্যাসী সাজ্‌বার আর কোনো অর্থ নেই—অর্থ-সংগ্রহ ছাড়া। শুনে তোমরা বিস্মিত হ'য়ো না, তোমাদের বারাণসী-ধামে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা সন্ন্যাসী সেজেচেন অর্থের প্রত্যাশায়, আর যাঁদের প্রত্যাশা নিরর্থক হয়নি।

এল্‌ম্‌হার্ষ্ট সাহেব এসেচেন। তাঁর কাছে শুন্‌লুম

তুমিও নাকি আসক্তি-বন্ধন ছেদন ক'রে সন্ন্যাসিনী হবার চেষ্টায় আছো। সেইজন্যেই কি লজিক-পড়া সুরু ক'রেচো? কিন্তু লজিক জিনিসটা হ'চ্চে কাঁটা-গাছের বেড়া, তা'তে ক'রে মানসক্ষেত্রের ফসলকে নির্ব্বোধ গরু-বাছুরের উৎপাত থেকে রক্ষা করা চলে; কিন্তু আকাশ থেকে যে-সব বর্ষণ হয়, রৌদ্রই বলো, বৃষ্টিই বলো, তা'র থেকে নিরাপদ হবার উপায় তোমার ঐ ন্যায়শাস্ত্রের বেড়া নয়। তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েচো-যে, এবার আমার সঙ্গে দেখা হ'লে তুমি আমার লজিকের পরীক্ষা নেবে। আমি আগে থাক্‌তেই হার মেনে রাখ্‌চি। পৃথিবীতে দুই জাতের মানুষ আছে। একদলকে লজিকের নিয়ম পদে পদে মিলিয়ে চ'ল্‌তে হয়, কেন না তা'রা পায়ে হেঁটে চলে,—আর একদল ন্যায়শাস্ত্রের উপর দিয়ে চ'লে যায়, উনপঞ্চাশ বায়ু তাদের বাহন, তা'রা এপক্ষ ওপক্ষের বিরোধ খণ্ডন ক'র্‌তে ক'র্‌তে নিজের পথ খুঁজে মরে না,—তা'রা এককালে নিজেরই দুই পক্ষ বিস্তার ক'রে সেই পথ দিয়ে চ'লে যায়, যে-পথ হ'চ্চে রবি-কিরণের পথ।

এই প্রসঙ্গে, এই পত্র-লেখক কোন্ জাতের লোক তা'র একটু আভাসমাত্র যদি দিই তা হ'লে তুমি ব'লে

ব'স্‌বে—তিনি ভারি অহঙ্কারী। যারা লজিকের অহঙ্কার ক'রে তাল ঠুকে বেড়ায়, তা'রাই নন্‌লজিক্যাল্‌দের ব্যোমপথ-যাত্রার পক্ষ-বিধূননের মাহাত্ম্য খর্ব্ব কর্‌বার চেষ্টা করে। কিন্তু সে-মহিমা তো যুক্তির দ্বারা আত্ম-সমর্থনের অপেক্ষা করে না;—সে আপন অচিহ্নিত পথে আপন গতিবেগের দ্বারাই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

আজ এইখানেই ইতি। ১৩ই ভাদ্র, ১৩২৯।

৫১

তুমি-যে তোমার লজিকের খাতার পাতা ছিঁড়ে আমাকে চিঠি লিখেচো তা'তে বুঝ্‌তে পার্‌চি, লজিক সম্বন্ধে আলোচনা প'ড়ে তোমার উপকার হ'য়েচে। লজিক যেমনি পড়া হ'য়ে যায় অম্‌নি তা'র আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। যে-কলাপাতায় খাওয়া হ'য়ে যায়, সে-কলাপাতা ফেলে দিলে ক্ষতি হয় না; কিন্তু যে-তালপাতার উপর মেঘদূত লেখা হ'য়েচে সেটা ফেল্‌বার জিনিস নয়।

আমরা এবার দু-তিন দিন ধ'রে বর্ষামঙ্গল ক'রেচি।

তা'র ফল কী হ'য়েচে, একবার দেখো। আজ ভাদ্রমাসের আঠারই তারিখ, অর্থাৎ শরৎকালের আরম্ভ, কিন্তু বর্ষার আয়োজন এখনো ভরপুর র'য়েচে। আকাশ ঘন মেঘে কালো হ'য়ে আছে,—থেকে থেকে ঝমাঝম্ বৃষ্টি হ'চ্চে। আমার কবিত্বের এই আশ্চর্য্য প্রভাব দেখে আমি নিজেই অবাক্ হ'য়ে গেচি। এমন কি, শুন্‌তে পাই, আমার এই বর্ষামঙ্গলের জোর কাশী পর্য্যন্ত পৌঁচেচে। সেখানেও বৃষ্টি চ'ল্‌চে। বোধ হ'চ্চে, আমরা যখন শারদোৎসব ক'র্‌বো তা'রপর থেকেই শরতের আরম্ভ হবে। শারদোৎসবের রিহার্সালে আমাকে অস্থির ক'রেচে। রোজ দুপুরবেলায় বিভূতি এসে একবার ক'রে আমার কাছ থেকে আগাগোড়া পাঠ নিয়ে যায়; ছোটো ছেলেরা যে-রকম পড়া মুখস্থ করে আমাকে তাই ক'র্‌তে হয়। কিন্তু এমনি আমার বুদ্ধি, তবু রিহার্সালের সময় কেবল ভুলি—ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত হাসে—এত অপমান সে আর কী ব'ল্‌বো।

যাই হোক্, যদি তুমি আমার শারদোৎসব দেখ্‌তে আসো তা হ'লে বোধ হয় দেখ্‌বে, ঠিক ঠিক মুখস্থ ব'লে যাচ্চি। তোমার বাবাকে শারদোৎসব দেখ্‌বার জন্যে

আস্‌তে ব'লে দিয়েচি। কিন্তু যে-রকম ব্যস্ত মানুষ, তাঁর মনে থাক্‌লে হয়। ঐ বিভূতি এলো—এইবার আমার পড়া দিইগে যাই। ১৮ই ভাদ্র, ১৩২৯।

৫২

কলিকাতা

ক'ল্‌কাতায় সব দলবল নিয়ে উপস্থিত হ'য়েচি। আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ি একতলা থেকে তিনতলা পর্য্যন্ত কলরবে মুখরিত হ'য়ে উঠেচে; পা ফেল্‌তে সাবধান হ'তে হয়, পাছে একটা না একটা ছেলেকে মাড়িয়ে দিই, এমনি ভিড়। আমি অন্যমনস্ক মানুষ, কোন্ দিকে তাকিয়ে চলি তা'র ঠিক নেই। ওরা যখন-তখন কোনো খবর না দিয়ে আমার পায়ের কাছে এসে প'ড়ে প্রণাম করে। কখন্ তাদের মাটির সঙ্গে চ্যাপ্টা ক'রে দিয়ে তাদের উপর দিয়ে চ'লে যাবো এই ভয়ে এই ক-দিন ধুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে চ'ল্‌চি।

মেয়ের দলও এবার নেহাৎ কম নয়। নুটু থেকে আরম্ভ ক'রে অতি সূক্ষ্ম অতি ক্ষুদ্র লতিকা পর্য্যন্ত। ননীবালা তাদের দিনরাত সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে হয়রাণ

হ'য়ে প'ড়েচে। কিন্তু আমাকে দেখ্‌বার লোক কেউ নেই; স্বয়ং এণ্ড্রুজ সাহেব পাঞ্জাবে আকালীদের নাকাল সম্বন্ধে তদন্ত ক'র্‌তে অমৃতসরে চ'লে গেচেন। লেভি সাহেবেরা গেচেন বোম্বাই; বৌমা আছেন শান্তিনিকেতনে। সুতরাং আমাকে ঠিকমতো শাসনে রাখ্‌তে পারে এমন অভিভাবক কেউ না থাকাতে আমি হয় তো উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে যেতে পারি এমন আশঙ্কা আছে। আপাততঃ যা-তা বই প'ড়্‌তে আরম্ভ ক'রেচি, কেউ নেই আমাকে ঠেকায়। তা'র মধ্যে লজিকের বই একখানাও নেই। এমনি ক'রে পড়া ফাঁকি দিয়ে বাজে পড়া প'ড়ে সাতাশ বছর কেটে গেল, এখন চেতনা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা'র কোনো লক্ষণ নেই।

আমি ভেবেছিলুম—সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তোমাদের ছুটি; তা যখন নেই তখন শারদোৎসব দেখা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব; কারণ ওটা হ'চ্চে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েচে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েচে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র হ'চ্চে—"বিনা কাজে বাজিয়ে

বাঁশী কাট্‌বে সকল বেলা।” ওর মধ্যে একটা উপনন্দ কাজ ক’র্‌চে, কিন্তু সেও তা’র ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ।

তোমরা যখন ছুটি পাবে, আমরা তখন বোম্বাই অভিমুখে রেলপথে ছুট্‌চি। কিন্তু সে-পথ মোগলসরাই দিয়ে যায় না, সে হ’চ্চে বেঙ্গল নাগপুর লাইন। তা’রপরে বোম্বাই হ’য়ে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ হ’য়ে মালাবার, মালাবার হ’য়ে সিংহল, সিংহল হ’য়ে পুনশ্চ বোম্বাই। এমনি বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খেতে খেতে অবশেষে একদিন নভেম্বর মাসের কোন্ তারিখে শান্তিনিকেতনে এসে একখানা লম্বা কেদারার উপর চিৎ হ’য়ে প’ড়্‌বো। তা’রপরেই আবার স্থুরু হবে সাতই পৌষের পালা। তা’রপরে আরো কত কী আছে তা’র ঠিক নেই। ছুটির নাটক লিখ্‌লেই কি ছুটি পাওয়া যায়? আমি ইস্কুল পালিয়েও ছুটি পেলুম না, ইস্কুলের আবর্ত্তের মধ্যে লাটিমের মতো ঘুর্‌তে লাগ্‌লুম। অঙ্ক ক’ষতে ঢিলেমি ক’র্‌লুম, আজ চাঁদার অঙ্কের ধ্যান ক’র্‌তে ক’র্‌তে আহার নিদ্রা বন্ধ। ইংরেজি প্রবাদে এই রকম ব্যাপারকেই ব’লে থাকে ভাগ্যের বিদ্রূপ।

এতদিন পরে আমাদের এখানে রৌদ্রোজ্জ্বল চেহারা দেখা দিয়েচে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ'চ্চে কিন্তু সে শরতের ক্ষণিক বৃষ্টি। দিন সুন্দর, রাত্রি নির্ম্মল, মেঘ রঙিন, বাতাস শিশির-স্নিগ্ধ। এ হেন কালে অতলস্পর্শ অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে ডুবে থাকাই ছিল বিধির বিধি, কিন্তু ভাগ্যের লিখন বিধির বিধিকেও অতিক্রম করে, এই কথা স্মরণ ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এই পত্র সমাপন করি। ইতি, ২৪ ভাদ্র, ১৩২৯।

৫২

শান্তিনিকেতন

ইতিমধ্যে আমার দৈনিক কার্য্যকলাপের একটু-খানি scene ব'দলে গেচে। সেই বড়ো ঘরটা ছেড়ে দিয়েচি, সেটা রাস্তার ধারে থাকাতে যখন-তখন যে-সে এসে উৎপাত ক'র্‌তো। এখন এসেচি দক্ষিণের বারান্দার পূর্ব্ব কোণে, না'বার ঘরটার ঠিক বিপরীত প্রান্তে, একটি ছোটো ঘরে। এ ঘরটার গোড়াপত্তন তুমি বোধ হয় দেখেছিলে। আমার সেই কালো শ্লেট-বাঁধানো লেখ্‌বার টেবিলে ঘরের প্রায় সমস্ত

জায়গা জুড়ে গিয়েচে, কেবল আর-একটিমাত্র চৌকি আছে। ঘরের মধ্যে লোকের ভিড় হবার জায়গা রাখিনি।

এখন মধ্যাহ্ন, ক-টা বেজেচে ঠিক ব'ল্‌তে পারিনে, কারণ আমার ঘড়ি বন্ধ। বন্ধ না থাক্‌লেও-যে ঠিক সময় পাওয়া যেতো তা নয়; তুমি আমার সেই ঘড়ির পরিচয় জানো। এইটুকু ব'ল্‌তে পারি, কিছু পূর্ব্বেই একখানা পরোটা ডাল ও তরকারী সংযোগে আহার ক'রে লিখ্‌তে ব'সেচি।

রৌদ্র প্রখর, শরতের শাদা মেঘ স্তরে স্তরে আকাশের যেখানে-সেখানে স্ফীত হ'য়ে প'ড়ে আছে, বাইরে থেকে শালিখ পাখীর ডাক শুনতে পাচ্চি, বামের রাস্তা দিয়ে কঁ্যাচ কঁ্যাচ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মন্দগমনে গোরুর গাড়ি চ'লেচে, আমার ডানদিকের দক্ষিণের জানালা দিয়ে কচি ধানের ক্ষেতের প্রান্তে সুদূর তালগাছের সার দেখা যাচ্চে, তন্দ্রালস ধরণীর দীর্ঘনিশ্বাসটি নিয়ে আতপ্ত হাওয়া ধীরে ধীরে আমার পিঠে এসে লাগ্‌চে।

এ রকম দিনে কাজ ক'র্‌তে ইচ্ছে করে না, এই মেঘগুলোর মতোই অকেজো হাওয়ায় মনটা বিনা

কারণে দিগন্ত পার হ'য়ে ভেসে যেতে চায়। জানলার বাইরে মাঝে মাঝে যখন চোখ ফেরাই তখন মনে হয় যেন সুর-বালকেরা স্বর্গের পাঠশালা থেকে গুরুমহাশয়কে না ব'লে পালিয়ে এসেচে। আকাশের এ-কোণ ও-কোণ থেকে সবুজ পৃথিবীর দিকে তা'রা উঁকি মারচে। হাওয়ায় হাওয়ায় তাদের কানাকানি শুনে আমার মনটাও উতলা হ'য়ে দৌড় মার্‌বার চেষ্টা ক'রচে।

কিন্তু আমরা-যে পৃথিবীর ভারাকর্ষণের টানে বাঁধা; মাটি আমাদের পা জড়িয়ে থাকে, কিছুতেই ছাড়্‌তে চায় না। অতএব মনের একটা ভাগ জানালার বাইরে দিয়ে যতই উড়্‌তে থাক্‌, আর-একটা ভাগ ডেস্কের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে পত্ররচনায় ব্যস্ত। দূরে কোথাও যদি যাবার ব্যবস্থা হয়, মনটাকে রেলভাড়ার কথা ভাব্‌তে হয়; দেবতার মতো শরতের মেঘের উপর চ'ড়ে মালতী-সুগন্ধী হাওয়ার হিল্লোলে বেণুবনের পাতায় পাতায় দোল খেয়ে খেয়ে বিনা ব্যয়ে ভ্রমণ ক'রে বেড়াতে পারে না। ইতি, ৩১ ভাদ্র, ১৩৩০।

৫৪

মাদ্রাজ

এইমাত্র মাদ্রাজে এসে পৌঁচেচি। আজ রাত্রে কলম্বো রওয়ানা হবো। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও নানা ঘূর্ণিপাকের আঘাতে দেহ মন ভেঙে ছিঁড়ে বেঁকে চুরে গিয়েছিলো, ক্লান্তি ও অবসাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এসে বেরিয়েছিলুম।

গাড়ি যখন সবুজ প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে চ'লছিলো তখন মনে হ'চ্ছিলো যেন নিজের কাছ থেকে নিজে দৌড়ে ছুটে পালাচ্চি। একদিন আমার বয়স অল্প ছিল; আমি ছিলুম বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মাঝখানে; নীল আকাশ আর শ্যামল পৃথিবী আমার জীবন-পাত্রে প্রতিদিন নানা রঙের অমৃত রস ঢেলে দিত; কল্পলোকের অমরাবতীতে আমি দেবশিশুর মতোই আমার বাঁশী হাতে বিহার ক'র্‌তুম।

সেই শিশু সেই কবি আজ ক্লিষ্ট হ'য়েচে, লোকালয়ের কোলাহলে তা'র মন উদ্‌ভ্রান্ত, তা'রই পথের ধূলায় তা'র চিত্ত ম্লান। সে আপন ক্লান্ত বিক্ষত চরণ নিয়ে তা'র সেই সৌন্দর্য্যের স্বপ্নরাজ্যে

ফিরে যেতে চাচ্চে। তা'র জীবনের মধ্যাহ্নে কাজও সে অনেক ক'রেচে, ভুলও কম করেনি; আজ তা'র কাজ কর্‌বার শক্তি নেই, ভুল কর্‌বার সাহস নেই। আজ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় সে আর-একবার বিশ্ব-প্রকৃতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারার সঙ্গে সুর মিলিয়ে শেষ বাঁশী বাজিয়ে যেতে চায়। যে-রহস্যলোক থেকে এই মর্ত্ত্যলোকে একদিন সে এসেছিলো সেখানে ফিরে যাবার আগে শান্তি-সরোবরে ডুব দিয়ে স্নান ক'র্‌তে চায়। তেমন ক'রে ডুব দিতে যদি পারে তা হ'লে তা'র জীর্ণতা তা'র ম্লানতা সমস্ত ঘুচে যাবে; আবার তা'র মধ্য থেকে সেই চিরশিশু বাহির হ'য়ে আস্‌বে।

সংসারের জটিলতায় ঘিরে ঘিরে আমাদের চিত্তের উপর যে জীর্ণতার আবরণ সৃষ্টি করে সেটা তো ধ্রুব সত্য নয়, সেটা মায়া। সেটা যে-মুহূর্ত্তে কুহেলিকার মতো মিলিয়ে যায় অমনি নবীন নির্ম্মল প্রাণ আপনাকে ফিরে পায়। এমনি ক'রে বারে বারে আমরা নূতন জীবনে নূতন শিশুর রূপ ধরি। সেই নূতন জীবনের সরল বাল্যমাধুর্য্যের জন্যে আমার সমস্ত মন আগ্রহে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেচে।

আজ আমি চ'লেচি সমুদ্র পারে কাজের ক্ষেত্রে ; যখন সেই কাজের ভিড়ে থাক্‌বো তখন হয় তো আমার ভিতরকার কর্ম্মী আর-সকল কথা ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু তবু সেই সুদূর গানের ঝরণাতলায় বাঁশীর বেদনা ভিতরে ভিতরে আমাকে নিশ্চয়ই ডাক্‌বে ;—ডাক্‌বে সেই নির্জ্জন নির্ম্মল নিভৃত ঝরণাতলার দিকেই। সেই ডাক আমার সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদের ভিতর দিয়ে আমার বুকের মধ্যে আজ এসে কুহরিত হ'চ্চে। ব'ল্‌চে, সেখানে ফিরে যাবার পথ এখনো সম্পূর্ণ হয় নি, এখনো আমার সুরের পাথেয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হ'য়ে যায় নি, এখনো সেই নব নব বিস্ময়ে দিশাহারা বালককে কোনো এক ভিতরমহলে খুঁজে পাওয়া যায়।

তাই, যদিও আজ চ'লেচি পশ্চিম-সমুদ্রের তীরে, আমার মন খুঁজে বেড়াচ্চে আর-এক তীরে সকল-কাজভোলা সেই বালকটাকে। পূরবী গানে সে আপন লীলা শেষ ক'র্‌তে না পার্‌লে সন্ধ্যা ব্যর্থ হবে ; এখন সে কোথায় ঘুরে ম'র্‌চে। ফিরে আয়, ফিরে আয়, ব'লে ডাক প'ড়েচে। একজন কে তা'র গান শুন্‌তে ভালোবাসে। আকাশের মাঝখানে

তা'ব আসন পাতা, সেই তো শিশুকালে তাকে বাঁশীর দীক্ষা দিয়েছিলো, নিশীথরাতের শেষ রাগিণী বাজানো হ'লে তা'রপরে তা'র বাঁশী ফিরে নেবে। আজ কেবলি সেই কথাই আমার মনে প'ড়্চে। ইতি, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪।

৫৫

কলিকাতা

আজ সন্ধ্যাবেলায় ঘন মেঘ ক'রে খুব একচোট বৃষ্টি হ'য়ে গেচে। এখন বৃষ্টি নেই কিন্তু আকাশে মেঘ কালো হ'য়ে জ'মে আছে। প্রশান্ত আর রাণী কোথায় চ'লে গেচে—বাড়িতে কেউ কোথাও নেই—আমি টেবিলের উপর ইলেক্‌ট্রিক্ আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে ব'সেচি। সমস্ত দিন নানা কাজে, নানা লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে, নানা লেখায় কেটে গিয়েচে। এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম ক'র্‌তে পাইনি—লেখার মাঝে মাঝে খুব ঘুম পেয়েছিলো, কিন্তু ক'ষে ঝাঁকানি দিয়ে ঘুম তাড়িয়ে কাজ ক'রে গেচি। নিজেকে একরকম ক'রে খুঁচিয়ে কাজ করানো

একেবারেই ভালো নয় জানি। তাতে কাজও-যে ভালো হয় তা নয় আর বিশ্রামও মাটি হ'য়ে যায়। কিন্তু আমার কুষ্ঠিতে কর্ম্ম-স্থানে শনি আছে, সে আমাকে দয়ামায়া একটুও করে না—ক'ষে খাটিয়ে নেয়, মজুরিও যথেষ্ট দেয় না। কাল দিনেরবেলায় আবার নানারকম কাজের পালা আরম্ভ হবে—তাই এখন চিঠি লিখ্‌তে ব'সেচি। এখন সন্ধ্যে সাড়ে আটটা —তোমার ওখানে হয় তো তুমি এখন পড়ার বই নিয়ে ব'সে গেচো। আজকাল আমাকে যে-রকম দায়ে প'ড়ে খাট্‌তে হয়, যদি তোমাদের বয়সে সেইরকম পরীক্ষার পড়ায় খাট্‌তুম তা হ'লে এতদিনে হয় তো আই, এ, পরীক্ষা পাসের তকমা প'রে কন্যাকর্ত্তাদের মহলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পার্‌তুম। তা হ'লে পণের টাকায় বিশ্বভারতীর ঝুলি ভর্ত্তি ক'রে দিনে-দুপুরে নাকে তেল দিয়ে নিদ্রা দিতে একটুও দ্বিধা বোধ হ'তো না। আমার ক'ল্‌কাতার কাজ শেষ হ'য়ে এলো, পরশু কিম্বা শনিবার শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবো, সেখানে এতদিনে শরৎকালের রোদ্দুরে আকাশে সোনার রং ধ'রেচে আর শিউলি ফুলের গন্ধে বাতাস ভোর হ'য়ে আছে। আজ বুধবার; আজ থেকে

ছেলেরা সব হো হো ক'র্‌তে ক'র্‌তে বাড়িমুখো দৌড়েচে—কাল পশুর মধ্যে আশ্রম প্রায় শূন্য হ'য়ে যাবে। এদিকে শুক্লপক্ষ এসে প'ড়্‌লো, দিনে দিনে সন্ধ্যার পেয়ালাটি চাঁদের আলোয় ভর্ত্তি হ'য়ে উঠ্‌তে থাক্‌বে। আমি বারান্দায় আরাম কেদারার উপর পা তুলে দিয়ে একলা চুপ ক'রে ব'স্‌বো—চাঁদ আমার মনের ভাবনাগুলির 'পরে আপন রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে তাদের স্বপ্নময় ক'রে তুল্‌বে,—ছাতিমতলায় ঝ'রে-পড়া মালতী ফুলের গন্ধ জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশে যাবে। সেই সুগন্ধি শুক্লরাত আমার মনের একোণ-ওকোণে উঁকি দিয়ে কোনো নতুন গানের সুর খুঁজে বেড়াবে—বেহাগ কিম্বা সিন্ধু কিম্বা কানাড়া। থাক্—সে-সব কথা পরে হবে, আপাততঃ চিঠি বন্ধ ক'রে এখানকার বারান্দায় মেঘাবৃত রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম ক'র্‌তে যাই। যদি ক্লান্তির ঘুমে চোখ বুজে আসে তা হ'লে তাকে তাড়া দিয়ে দেশছাড়া ক'র্‌বো না।

৫৬

বোম্বাই

তুমি লিখেচো, তোমার সব কথার জবাব দিতে; অতএব তোমার চিঠি সাম্‌নে রেখে জবাব দিতে ব'সেচি—এবারে বোধ হয় পূরো মার্ক পাবো। তোমার প্রথম প্রশ্ন—আমি এখন কোথায় আছি। ছিলুম নানা জায়গায়, প্রধানতঃ কাঠিয়াবাড়ে, তা'রপরে আমেদাবাদে, তা'রপরে বরোদায়, আজ সকালে এসেচি বোম্বাইয়ে। এতকাল ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম ব'লে সমস্ত চিঠি এখানে জমা হ'চ্ছিলো, তা'র মধ্যে তোমার দু খানা চিঠি। লেফাফার সর্ব্বাঙ্গে নানাপ্রদেশের নানা ডাকঘরের কালো কালো চাকা চাকা ছাপ। এখানে বেশিদিন থাকা হবে ব'লে বোধ হ'চ্চে না, কারণ ৭ই পৌষ নিকটবর্ত্তী। অতএব দু-চার দিনের মধ্যে সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং বঙ্গভূমিকে প্রণাম ক'র্‌তে যাত্রা ক'র্‌বো। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েচি, যাই হোক্, খৃষ্টমাসের পূর্ব্বেই ফির্‌বো। তোমার বাবাকে লিখে দিয়েচি, তোমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে

আস্‌তে। এই পর্য্যন্ত তোমায় উত্তর দিয়ে তোমার চিঠি খুঁজে দেখ্‌লুম, আর কোনো প্রশ্ন নেই।

এল্‌ম্‌হার্ষ্ট্‌ আমার সঙ্গে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে বরোদায় এসে জ্বরে প'ড়েছিলো। সেখানে তিন দিন বিছানায় প'ড়েছিলো, এখানে এসে সেরে উঠেচে। আর আমার সঙ্গে আছে গোরা। এবারে সাধুচরণের সঙ্গ ও সেবা থেকে বঞ্চিত আছি। বনমালী নামধারী উৎকলবাসী সেবক বৌমার আদেশক্রমে এসেচে। সে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে আছে। সবচেয়ে ভয় আমাকে, অথচ আমি বিশেষ ভয়ঙ্কর নই। দ্বিতীয় ভয়, পাছে রাজবাড়ির অন্নপানে বিদেশে গঙ্গাতীর হ'তে দূরবর্ত্তী দেশে অকালমৃত্যু ঘটে। তৃতীয় ভয়, রেলগাড়িতে বিদেশীয় জনতাকে,—তা'রা ওর সঙ্গে হিন্দী বলে, ও বলে বাংলা—তাতে কথোপকথন উভয় পক্ষেই দুর্ব্বোধ হ'য়ে ওঠে। ওর বিশ্বাস, এ জন্য বিদেশীরাই দায়িক। ওর আর-একটা বিশেষ গুণ এই-যে, ওকে যদি কোনো কাপড় বের ক'রে দিতে বলি তা হ'লে সিন্দুক থেকে একে একে সব কাপড় বের ক'রে তবে সেটা নির্ব্বাচন ক'র্‌তে পারে, আবার সবগুলো তাকে একে একে ফিরে গোচাতে হয়। মানুষের আয়ু যখন অল্প, সময় যখন

সীমাবদ্ধ, তখন এরকম চাকর নিয়ে মর্ত্ত্যলোকে অসুবিধায় প'ড়্‌তে হয়। ওর একটা মস্ত গুণ এই-যে, ও ঠাট্টা ক'র্‌লে বুঝ্‌তে পারে, ঠিক সময়ে হাস্‌তে জানে; আমার late lamented সাধুচরণের সে-বালাই ছিল না। আমার আবার স্বভাব এমন-যে, ঠাট্টা না ক'রে বাঁচিনে, তাই ও যতক্ষণ কাপড় বের ক'র্‌চে আর গোচাচ্চে, আমি ততক্ষণ সেই সুদীর্ঘ সময় ঠাট্টা ক'রে অতিবাহন করি। যাই হোক্, ওকে বিদেশী হাওয়া, বিদেশী খাওয়া, বিদেশী ভিড় থেকে ফিরে নিয়ে গিয়ে কোনোমতে বৌমার হাতে আস্তটি ফিরে দিতে পার্‌লে নিরুদ্বিগ্ন হই। আমার-যে কতবড়ো দায়িত্ব, সে ওকে না দেখ্‌লে ভালো ক'রে অনুধাবন ক'র্‌তেই পার্‌বে না। একে আমার বিশ্বভারতী, তার উপর বনমালী। ভাবনার আর অন্ত নাই।

আমি বোধহয় দুই তিন দিনের মধ্যেই রওনা হবো, অতএব যদি চিঠি লেখো তো শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় লিখো। ইতি, বোধ হ'চ্চে ১০ই ডিসেম্বর।

৫৭

জাহাজ প্রায় ন-টার সময় ছাড়্লো। সেই আমাদের পুরোনো গঙ্গাতীর—এই তীর ছেলেবেলায় আমাকে কতদিন কী গভীর আনন্দ দিয়েচে। ধীরে ধীরে যখন সেই শান্ত সুন্দর নিভৃত শ্যামল শোভা দেখি আর এই উদার গঙ্গার কলধ্বনি শুনি তখন আমার সমস্ত মন একে আঁক্‌ড়ে ধরে ;—ছোটো শিশু যেমন ক'রে মাকে ধরে। আমি জীবনের কতকাল-যে এই নদীর বাণী থেকেই আমার বাণী পেয়েচি, মনে হয় সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুল্‌বো না: বস্তুতঃ এই জীবনেই আমার সেই জন্ম কেটে গিয়েচে।

ছেলেবেলায় যখন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে এই জলস্থল আকাশের মহাপ্রাঙ্গণে আমার খেলা আরম্ভ ক'রেছিলুম, সেই খেলার দিন আজ ফুরিয়ে গেচে। আজ এই বিপুল বিচিত্র মাতৃ-অঙ্গন থেকে বহুদূরে এসেচি। সকালবেলাকার ফুলের সব শিশির শুকিয়ে গেচে—আজ প্রখর মধ্যাহ্নের কর্ত্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ ক'র্‌চি। আমার কর্ম্মের সঙ্গে পাখীর গান, নদীর

কল্লোল, পাতার মর্ম্মর আপনার সুর যোগ ক'রে দিতে পার্‌চে না—অন্যমনস্ক হ'য়ে আছি। নীলাকাশের অনিমেষ দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে এসে তেমন অবারিত আত্মীয়তায় মিল্‌চে না, কর্ম্মশালার জানলা-দরজার ফাঁক দিয়ে এই বিশ্বের হৃদয় আগেকার মতো তেমন সম্পূর্ণ ক'রে আমার বুকের উপর এসে পড়ে না, মাঝখানে কত রকমের চিন্তার, কত রকমের চেষ্টার ব্যবধান। এই তো দেখ্‌চি সেদিনকার লীলা-লোক থেকে আজকের দিনের কর্ম্মলোকে জন্মান্তর গ্রহণ ক'রেচি, তবু সেদিনকার ভোরবেলায় সানাইয়ের সুরে ভৈরবী আলাপ এখনো ক্ষণে ক্ষণে মনে প'ড়ে মনকে উতলা ক'রে দেয়।

কাল গঙ্গার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলুম। তখন কেবলি জলের থেকে আকাশ থেকে তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি থেকে এই প্রশ্ন আমার কানে আস্‌ছিলো, "মনে পড়ে কি?" এবারকার এই দেহের ক্ষেত্র থেকে যখন বেরিয়ে চ'লে যাবো, তখনো কি এই প্রশ্ন ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয়ের উপর হাওয়ায় ভেসে আস্‌বে? এবারকার এই জীবনের এই ধরণীর সমস্ত "জন্মান্তর-সৌহৃদানি"!

কাল দোল-পূর্ণিমা গঙ্গার উপরেই দেখা দিল। জাহাজ বালির চরে জোয়ারের অপেক্ষায় রাত্রি সাতটা পর্য্যন্ত আট্‌কে প'ড়েছিলো। সমুদ্রে যদি দোল-পূর্ণিমার আবির্ভাব হ'তো তা হ'লেই তা'র নাম সার্থক হ'তো—তা হ'লে দোলনও থাক্‌তো, আর নীলের সঙ্গে শুভ্রের, সাগরের সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিলনও দেখ্‌তুম।

আজ ভোরে উঠে দেখ্‌লুম, জাহাজ কূলরেখাহীন জলরাশির উপরে ভেসে চ'লেচে—"মধুব বহিছে বায়ু।" আজ শনিবার; সোমবারে শুন্‌চি রেঙ্গুনে পৌঁচবো। সেখানে দিন-দুয়েক সভাসমিতি, অভ্যর্থনা, মাল্যচন্দন, বক্তৃতা, জনতার করতালিতে আমাকে চেপে মার্‌বার চেষ্টা। তা'রপরে বোধ হয় বুধবারে কোনো এক সময়ে মুক্তি। ইতি, চৈত্র ১৩৩০।

৫৮

কলম্বো

ভারতবর্ষ ছেড়ে এই খানিকক্ষণ হ'লো সিংহলে এসেচি। কাল সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়্‌বে। আকাশ অন্ধকার। ঘন বাদ্‌লার মেঘ সকালবেলার

সোনার আলো গণ্ডূষ ভ'রে পান ক'রেচে, কেবল তা'র তলানি ছায়াটুকু বাকি। দেশে থাক্‌লে সকালবেলায় দিনের এই ছায়াবগুণ্ঠন ভালোই লাগ্‌তো। ইচ্ছে ক'র্‌তো, কাজকর্ম্ম বন্ধ ক'রে মাঠের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নরাজ্যে মনটাকে পথহারা ক'রে ছেড়ে দিই, কিম্বা হয় তো গুন-গুন সুরে নতুন একটা গান ধ'রে মেঘদূতের কবির সঙ্গে যথাসাধ্য পাল্লা দিতে ব'স্‌তুম।

কিন্তু এখানে মনটা বিরাগী, তা'র একতারাটা কোথায় হারিয়ে গেচে। "গানহারা মোর হৃদয়তলে" এই অন্ধকার যেন একটা স্তূপাকার মূর্চ্ছার মতো উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছে। সুদূর এবং সুদীর্ঘ যাত্রার দিনের মুখে আকাশ থেকে সূর্য্যের আলো দেবতার অভিনন্দ-নের মতো বোধ হয়। আজ মনে হ'চ্চে যেন আমার সেই জয়যাত্রার অধিদেবতা নীরব। গগন-বীণার থেকে যে-বাণী পাথেয় স্বরূপ সংগ্রহ ক'রে সমুদ্রে পাড়ি দিতুম, সেই আকাশভরা বাণী আজ কোথায়?

কালস্রোতে যে-বাড়িতে এসে আছি, এ একজন লক্ষপতির বাড়ি। প্রকাণ্ড প্রাসাদ। আরামে বাস কর্‌বার পক্ষে অত্যন্ত বেশি ঢিলে, ঘরগুলোর প্রকাণ্ডতা মানুষকে গিলে ফেলে। যে-ঘরে ব'সে আছি,

তা'র জিনিসগুলো এত বেশি ফিটফাট-যে, মনে হয় সেগুলো ব্যবহার কর্‌বার জন্যে নয়, সাজিয়ে রাখ্‌বার জন্যে। বস্‌বার শোবার আসবাবগুলো শুচিবায়ুগ্রস্ত গৃহিণীর মতো; সন্তর্পণে থাকে, কাছে গেলে যেন মনে মনে স'রে যায়। এই ধনী-ঘরের অতিপারিপাট্য এও যেন একটা আবরণের মতো।

আমার সেই তেতালা ঘরেব চেহারা মনে পড়ে তো? সমস্ত এলোমেলো। সেখানে শোবার বস্‌বার জন্যে একটুও সাবধান হবার দরকাব হয় না;—তা'র অপরিচ্ছন্নতাই যেন তা'র প্রসারিত বাহু, তা'র অভ্যর্থনা। সে-ঘর ছোটো, কিন্তু সেখানে সবাইকেই ধরে। মানুষকে ঠিক মতো ধর্‌বার পক্ষে হয় ছোট্ট একটি কোণ, নয় অসীম বিস্তৃত আকাশ। ছেলেবেলায় যখন আমি পদ্মার কোলে বাস ক'র্‌তুম, তখন পাশা-পাশি আমার দুই রকম বাসাই ছিল। একদিকে ছিল আমার নৌকোর ছোটো ঘরটি, আর-একদিকে ছিল দিগন্তপ্রসারিত বালুর চর। ঘরের মধ্যে আমার অন্তরাত্মার নিশ্বাস, আর চরের মধ্যে তা'র প্রশ্বাস। একদিকে তা'র অন্দরের দরজা, আর একদিকে তা'র সদর দরজা।

৫৯

শান্তিনিকেতন

পৃথিবীতে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জ্ঞানীলোকেরা এই গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রেচেন-যে, রাত্রিটা নিদ্রা দেবার জন্যে। নিজেদের এই মত সমর্থন কর্‌বার জন্যে তাঁরা স্বয়ং সূর্য্যের দোহাই দেন। তাঁরা আশ্চর্য্য গবেষণা এবং যুক্তি-নৈপুণ্য প্রয়োগ ক'রে ব'লেচেন, রাত্রে নিদ্রাই যদি প্রকৃতির অভিপ্রায় না হবে তবে রাত্রে অন্ধকার হয় কেন, অন্ধকারে দর্শন মনন শক্তির হ্রাস হয় কেন, উক্ত শক্তির হ্রাস হ'লে কেনই বা আমাদের দেহ তন্দ্রালস হ'য়ে আসে ?

গভীর অভিজ্ঞতা-প্রসূত এই সকল অকাট্য যুক্তির কোনো উত্তর দেওয়া যায় না, কাজেই পরাস্ত হ'য়ে ঘুমোতে হয়। তাঁরা সব শাস্ত্র ও তা'র সব ভাষ্য ঘেঁটে ব'লেচেন-যে, রাত্রে ঘুম না হওয়াকেই বলে অনিদ্রা, ঘুম হ'লে অনিদ্রা ব'লে জগতে কোনো পদার্থ থাক্‌তোই না। এতবড়ো কথার সমস্ত তাৎপর্য্য বুঝ্‌তেই পারি না, আমাদের তো দিব্যদৃষ্টি নেই, আমরা যথোচিত পরিমাণে ধ্যান-ধারণা-নিদিধ্যাসন করিনি, সেই জন্যে

সংশয়-কলুষিত চিত্তে আমরা তর্ক ক'রে থাকি-যে, রাত্রে কয়েক ঘণ্টা না ঘুমোলেই সেটাকে লোকে অনিদ্রা ব'লে নিন্দা করে, অথচ দিনে অন্ততঃ বারো ঘণ্টাই-যে কেউ ঘুমোইনে সেটাকে ডাক্তারীশাস্ত্রে বা কোনো শাস্ত্রেই তো অনিদ্রা বলে না। শুনে প্রবীণ লোকেরা আমাদের অর্ব্বাচীন ব'লে হাস্য করেন; বলেন আজকালকার ছেলেরা দু-চার পাতা ইংরেজি প'ড়ে তর্ক ক'র্‌তে আসে, জানে না-যে, "বিশ্বাসে মিলয়ে নিদ্রা, তর্কে বহু দূর।"

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ বারবার পরীক্ষা ক'রে দেখা গেচে-যে, তর্ক যতই ক'র্‌তে থাকি নিদ্রা ততই চ'ড়ে যায়, বিনা তর্কে তা'র হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়। অতএব আজকের মতো চিঠি বন্ধ ক'রে শুতে যাই। যদি সম্ভবপর হয় তা হ'লে কাল সকালে চিঠি লিখ্‌বো।

চিঠি বন্ধ করা যাক্, কেরোসিন প্রদীপটা নিবিয়ে দেওয়া যাক্, ঝপ্ ক'রে বিছানাটার মধ্যে গিয়ে পড়া যাক্। শীত,—বেশ একটু রীতিমতো শীত,—উত্তর-পশ্চিমের দিক থেকে হিমের হাওয়া বইচে। দেহটা ব'লে উঠ্‌চে, "ওহে কবি, আর বাড়াবাড়ি ভালো নয়, তোমার বাজে কথার কারবার বন্ধ ক'রে মোটা কম্বলটা

মুড়ি দিয়ে একবার চক্ষু বোজো, অনন্যগতি আমি তোমার আজন্মকালের অনুগত, আর আমরণ কালের সহচর, তাই ব'লেই কি আমাকে এত দুঃখ দিতে হবে? দেখ্‌চো না, পা দুটো কী রকম ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেচে, আর মাথাটা হ'য়েচে গরম? বুঝ্‌চো না কি, এটা তোমার রাত্রিকালের উপযোগী মন্দাক্রান্তা ছন্দের যতি-ভঙ্গের লক্ষণ,—এ সময়ে মস্তিষ্কের মধ্যে শার্দ্দূলবিক্রীড়িতের অবতারণা করা কি প্রকৃতিস্থ লোকের কর্ম্ম?"—কায়ার এই অভিযোগ শুনে তা'র প্রতি অনুরক্ত আমার মন ব'লে উঠ্‌চে, "ঠিক্ ঠিক্! একটুও অত্যুক্তি নেই।" ক্লান্ত দেহ এবং উদ্‌ভ্রান্ত মন উভয়ের সম্মিলিত এই বেদনাপূর্ণ আবেদনকে আর উপেক্ষা ক'র্‌তে পারিনে, অতএব চ'ল্‌লুম শুতে।

প্রভাত হ'য়েচে। তুমি আমাকে বড়ো চিঠি লিখ্‌তে অনুরোধ ক'রেচো। সে-অনুরোধ পালন করা আমার সহজ-স্বভাব-সঙ্গত নয়, পল্লবিত ক'রে পত্র লেখার উৎসাহ আমার একটুও নেই। আমি কখনো মহাকাব্য লিখিনি ব'লে আমার স্বদেশী অনেক পাঠক আমাকে অবজ্ঞা ক'রে থাকেন,—মহাচিঠিও আমি সচরাচর লিখ্‌তে পারিনে। কিন্তু যেহেতু আমার চীনপ্রয়াণের

সময় নিকটবর্ত্তী, এবং তখন আমার চিঠি অগত্যা যথেষ্ট বিরল হ'য়ে আস্‌বে, সেই জন্যে আগামী অভাব পূরণ কর্‌বার উদ্দেশ্যে বড়ো চিঠি লিখ্‌চি। সে-অভাব যে অত্যন্ত গুরুতর অভাব এবং সেটা পূরণ কর্‌বার আর কোনো উপায় নেই, এটা কল্পনা ক'র্‌চি নিছক অহঙ্কারের জোরে। আসল কথাটা এই-যে, এবার তুমি যে চিঠিটা লিখেচো সেটা তোমার সাধারণ চিঠির আদর্শ অনুসারে কিছু বড়ো, সেই জন্যে তোমার সঙ্গে পাল্লা দেবার গর্ব্বে বড়ো চিঠি লিখ্‌চি। তুমি নামতায় আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, লজিকেও তোমার সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করা আমার কর্ম্ম নয়, কিন্তু বাগ্‌বিস্তার বিদ্যায় কিছুতেই আমাকে পেরে উঠ্‌বে না। এই একটি মাত্র জায়গায় যেখানে আমার জিৎ আছে, সেইখানে তোমার অহঙ্কার খর্ব্ব কর্‌বার ইচ্ছা আমার মনে এলো। ইতি ৫ই ফাল্গুন, ১৩৩০।

পথে ও পথের প্রান্তে

১

আমরা ছিলুম অস্তসূর্যের শেষ আলোয়, তোমরা ছিলে ঘাটের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এল, ক্রমে আড়াল পড়ল, বস্তুর আড়াল। ফিরলুম সেই ক্যাবিনে—মনে পড়ে ক্যাবিনটা? মনে রাখবার মতো কিছুই না, দুদিনের বাসা। যেখানে আমরা পাকা ক'রে বাসা বাঁধি সেখানে বাসার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধস্মৃতি জড়িয়ে যায়—কিন্তু পথে চলতে চলতে পান্থশালার সঙ্গে কোনো গ্রন্থি বাঁধে না—স্রোতের শৈবাল যেমন নদীর বাঁকে বাঁকে ক্ষণকালের জন্যে ঠেকতে ঠেকতে যায় তেমনি আর কি। তবু পথিক-জীবনের পথচলা প্রবাহের মধ্যেও অনেক কথা মনের মধ্যে জড়িয়ে থাকে। প্রতিদিন তুমি নিজের হাতে সেবাযত্ন করেছিলে—কখন আমি কী পরি কখন আমার কী চাই সমস্ত তুমি জেনে নিয়েছিলে, তারপরে পথে পথে সমস্ত জিনিসপত্র তোমার হাতে বাঁধা আর খোলা। এ সবগুলো অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল—সেই অভ্যেসটা এক দিনের মধ্যেই হঠাৎ আপন ছয়মাসব্যাপী প্রতিদিনের দাবি থেকে বঞ্চিত হয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

এখনো প্রায় তিন হপ্তার পথ বাকি আছে। তারপরে শান্তিনিকেতন। আমার কেবলি মনে হচ্ছে সূর্যাস্তের দিক থেকে সূর্যোদয়ের পথে যাত্রা করেছি। যে পর্যন্ত না পৌঁছই, সে-পর্যন্ত বেদনা। দিনের পর দিন, ঘটনার পর ঘটনা যখন বাইরে থেকে বিছিন্ন ভাবে আসে তখন বুঝতে পারি আপনার সত্যকে পাইনি। তখনই এই বাইরের আঘাতগুলো ক্রোধ লোভ মোহের তুফান তোলে। অন্তরের মধ্যে এই সমস্ত বহির্ব্যাপারের একটা কেন্দ্র খুঁজে পেলে তখন নিখিলের মহান ঐক্য নিজের ভিতর একান্তভাবে বুঝতে পারি—তাকেই বলে মুক্তি—প্রতিদিনের প্রতিজিনিসের প্রতি ঘটনার খাপছাড়া বিচ্ছিন্নতার থেকে মুক্তি। এই মুক্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি। ইতি ২৬ নভেম্বর, ১৯২৬ ; জাহাজ।

২

নিজেকে বিশেষ কোনো একজন মনে করতে আজও পারিনে—এ সম্বন্ধে আমার স্বদেশের অনেক লোকের সঙ্গেই আমার মতের মিল হয়। আমার অন্তরলোকে কোনো একটা অগমস্থানে একজন কেউ বাস করে—সে কোথা থেকে কথা কয়—সে-কথার মূল্যও আছে কিন্তু আমিই যে সে, তা ভাবতেও পারিনে—আমার মধ্যে তার বাসা আছে এই পর্যন্ত। যে-আমি প্রত্যক্ষগোচর সে নিতান্তই বাজে লোক—তাকে সহ্য করা শক্ত, বন্দনা করা দূরের কথা। তাকে কোনো রকম ক'রে তফাতে সরিয়ে দিতে পারলে তবেই আমার অন্তরতর মানুষটির মান রক্ষা হয়। সেই চেষ্টায় আছি।

এ জায়গায় অনেক দেখবার আছে। আমি তেমন দেখনেওয়ালা নই এই দুঃখ। কিন্তু তবু ম্যুজিয়মে যাবার লোভ সামলাতে পারি নি। দেখবার এত জিনিস খুব অল্প জায়গায় পাওয়া যায়। একটা ব্যাপার এখানে খুব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে—গ্রীসের যে পার্থেনন্ গ্রীসের স্বকীয় কীর্তি ব'লে এতদিন চলে এসেছে সেই পার্থেননের মূল প্রতিরূপ ইজিপ্টের ভূগর্ভে পাওয়া গেছে। যে-স্থপতি এই রীতির স্তম্ভ প্রথম তৈরি করেছিলেন অতি প্রাচীন ইজিপ্টে তিনি

একজন অসামান্য রূপকার ব'লে পূজা পেয়েছিলেন। গ্রীকরা তাঁরই কাজের অনুকরণে নিজেদের মন্দির নির্মাণ করেছিল। এই ব্যাপার নিয়ে আরও অনেক মাটি ও মাথা খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। মানুষ যে কত সুদূর যুগেও আপন প্রতিভা প্রকাশ করেছে তা ভাবলে আশ্চর্য হোতে হয়। কত অজানা সভ্যতার কত বিচিত্র গৌরব মাটির নিচে সমুদ্রের তলায় সর্বভুক কালের গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তারই বা ঠিকানা কে জানে। আমাদের কাহিনীও একদিন লুপ্ত ইতিহাসের নিচের তলায় কবে অদৃশ্য হয়ে যাবে। যতদিন উপরের আলোতে আছি ততদিন কিছু গোলমাল করা গেল—সম্পূর্ণ চুপচাপ করবার সুদীর্ঘ সময় সামনে আছে। ইতি ২ ডিসেম্বর, ১৯২৬।

৬

কাল সুয়েজে এসে খবর পেলুম যে, সন্তোষ মারা গেছে। মৃত্যুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যে এত কঠিন তার কারণ অন্যের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমি আছি, অথচ আর যে-একজন আমার সঙ্গে এমন একান্ত মিলিত ছিল সে একেবারেই নেই এমন বিরুদ্ধ কথা ঠিকমতো মনে করাই শক্ত। আমরা নিজেকে অনেকখানি পাই অন্যের মধ্যে—সন্তোষ সেই তাদেরই মধ্যে অন্যতম ছিল। আমার জীবনের একটা বিভাগ, সকলেব চেয়ে বড়ো ও সত্য বিভাগ—তাকে নিয়ে সম্পূর্ণ ছিল। আমার মনে হচ্ছে সেইখানে যেন ফাঁক প'ড়ে গেল। সন্তোষের প্রতি আমার একটি যথার্থ নির্ভর ছিল কেননা আমার গৌরবে সে একান্ত গৌরব বোধ করত—আমার প্রতি কোনো আঘাত তার নিজের পক্ষে সব চেয়ে বড়ো আঘাত ছিল। যে-একজন ব্যক্তি বাইরের দিক থেকে শ্রদ্ধার দ্বারা আমাকে ডাক দিতে পারত সে রইল না। ইতি, ৫ ডিসেম্বর, ১৯২৬।

৪

ভেবেছিলুম জাহাজ এডেনে দাঁড়াবে তখন তোমার চিঠি ডাকে দেব। খবর পেলুম সুয়েজ থেকে কলম্বোর মধ্যে জাহাজ কোথাও দাঁড়াবে না। তাই ভাবছি আরও একটুখানি লিখি।

মৃত্যুর কথাটা মন থেকে কিছুতে যাচ্ছে না। আমাদের আপন সংসারের প্রত্যেককে নিয়ে বিশেষ কোনো-না-কোনো আমিই বিস্তৃত হয়ে আছি— কোথাও গভীর কোথাও অগভীরভাবে। সেই সবটা নিয়েই আমার জীবন। বিশ্বজগতে আমার প্রায় কোনো কিছুতেই ঔদাসীন্য নেই, তার মানে আমি খুব ব্যাপকভাবে বেঁচে আছি। কিন্তু যত ব্যাপ্তি তত তার আনন্দও যেমন দুঃখও তেমনি। প্রাণের পরিধি যেখানে প্রসারিত মৃত্যুর বাণ সেখানে নানা জায়গায় এসে বিদ্ধ হবার জায়গা পায়। জীবনের সত্য সাধনা হচ্ছে অমরতার সাধনা, অর্থাৎ এমন কিছুতে বাঁচা যা মৃত্যুর অতীত। অনেক সময় প্রিয়জনের মৃত্যুতে-যে বৈরাগ্য আনে তার মানে হচ্ছে এই যে, তখন আহত প্রাণ সব ত্যাগ ক'রে এমন কিছুতে বাঁচতে চায় যার ক্ষয় নেই বিলুপ্তি নেই। পিতৃদেবের জীবনীর প্রথম অধ্যায়ে সেই কথাটাই পাই। মৃত্যু যখন জীবনের

সামনে আসে তখন এই কথাটাই প্রশ্ন করে, "আমি যা নিলুম তার ভিতরকার কিছু কি বাকি আছে। কিছুই যদি বাকি না থাকে তাহলে সম্পূর্ণ ঠকেছ।" প্রাণ প্রাণকেই চায়, সে কোনোমতেই মৃত্যুর দ্বারা ঠক্‌তে চায় না—যেই ঠিকমতো বুঝতে পারে ঠকেছি, অমনি সে ব্যাকুল হয়ে ব'লে ওঠে "যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।" মানুষ কতবার এই কথা বলে আর কতবার এই কথা ভোলে। ইতি ৭ ডিসেম্বর, ১৯২৬।

৫

কিছু খবর দেবার চেষ্টা করব। নইলে চিঠি বেশি ভাবি হয়ে পড়ে। অনেকদিন থেকে চিঠিতে খবব চালান দেবার অভ্যাস চলে গেছে। এটা একটা ত্রুটি। কেননা আমবা খবরের মধ্যেই বাস করি। যদি তোমাদের কাছে থাকতুম তাহলে তোমরা আমাকে নানাবিধ খবরের মধ্যেই দেখতে, কী হোলো এবং কে এল এবং কী করলুম এইগুলোর মধ্যে গেঁথে নিয়ে তবে আমাকে স্পষ্ট ধবতে পারা যায়। চিঠিব প্রধান কাজ হচ্ছে সেই গাঁথন সূত্রটিকে যথাসম্ভব অবিচ্ছিন্ন করে রাখা। আমি-যে বেঁচে বর্তে আছি সেটা হোলো একটা সাধারণ তথ্য—কিন্তু সেই আমার থাকার সঙ্গে আমার চারিদিকের বিচিত্র যোগবিয়োগের ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারাই আমি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষগোচর। এইজন্যেই চিঠিতে খবর দিতে হয়—দূরে থাকলে পরস্পরের মধ্যে সেই প্রত্যক্ষতাকে চালাচালি করবার দরকার হয়। প্রয়োজনটা বুঝি কিন্তু সত্যিকার চিঠিলেখার যে আর্ট সেটা খুইয়ে বসে আছি। তার কারণ হচ্ছে কাছের মানুষ আমাকে আমার চারিদিকের নব নব ব্যাপারের সঙ্গে মিলিয়ে যেমন করে দেখতে পায়, আমি নিজেকে তেমন করে দেখিনে। অন্যমনস্ক স্বভাবের জন্যে আমি চারিদিককে বড়ো বেশি বাদ দিয়ে ফেলি। সেইজন্যে যা ঘটে

তা পরক্ষণেই ভুলে যাই—ঐতিহাসিকের মতো ঘটনাগুলিকে দেশকালের সঙ্গে গেঁথে রাখতে পারিনে। তার মুশকিল আছে। তোমরা কেউ যখন আমার সম্বন্ধে কোনো নালিশ উপস্থিত করো, তখন তোমাদের পক্ষের প্রমাণগুলোকে বেশ সুসম্বদ্ধ সাজিয়ে ধরতে পারো—আমার পক্ষের প্রমাণগুলো দেখি আমার আনমনা চিত্তের নানা ফাঁকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমি কেবল আমার ধারণা উপস্থিত করতে পারি। কিন্তু ধারণা জিনিসটা বহুবিস্মৃত প্রমাণের সম্মিলনে তৈরি। সে প্রমাণগুলোকে সপিনে দিয়ে সাক্ষ্যমঞ্চে আনা যায় না। যাদের ধারণাগুলো শনিগ্রহের মতো বহু প্রমাণমণ্ডলের দ্বারা সর্বদাই পরিবেষ্টিত তাদের ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার ঠোকাঠুকি হোলে আমার পক্ষেই দুর্বিপাক ঘটে।

কিন্তু খবর সম্বন্ধে এতক্ষণ যে তত্ত্বালোচনা করলুম তাকে খবর বলা যায় না। কী দিয়ে আরম্ভ করব সেই কথা ভাবছি। আলেকজান্দ্রিয়ার থেকে খবরের ধারার মধ্যে এসে পড়েছি। যাঁরা আমার ইজিপ্টের পালা জমাবার ভার নিয়েছিলেন তাঁরা ইটালিয়ান, নাম "সোয়ারেস্", ধনী ব্যাঙ্কার। আমাকে তাঁদের যে বাগানবাড়িতে রেখেছিলেন সে অতি সুন্দর। সে বারান্দাগুলো খুব দিলদরিয়া গোছের—একদিকে বাগান, আর-একদিকে নীল সমুদ্র, আকাশ মেঘশূন্য, সূর্যের আলোয় শ্যামল পৃথিবী ঝলমল করছে, সমস্তদিন নিস্তব্ধ নির্জন অবকাশের অভাব ছিল না। যেদিন সকালে পৌঁছলুম তার পরদিন সায়াহ্নে বক্তৃতা, সুতরাং মনটা গভীর বিশ্রামের মধ্যে

অনেকক্ষণ তলিয়ে থাকতে পেরেছিল। সেইজন্যেই বক্তৃতাটি অতি সহজেই পাকা ফলের মতো বর্ণে গন্ধে রসে বেশ টস্‌টসে হয়ে উঠতে পেরেছিল। পরদিন কায়রোর পালা। ঘণ্টা চারেক গেল রেলগাড়িতে। এবার হোটেল। হোটেল বলতে কী বোঝায় এবার তা তোমাব খুব ভালো করেই জানা আছে। খুব বড়ো হোটেল—খুব মস্ত খাঁচা। পৌঁছলেম মধ্যাহ্নে। বৈকালেই সেখানকার সর্বোত্তম আরবি কবির বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ। কবির নিমন্ত্রণ ছাড়া এই নিমন্ত্রণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, সেখানে ইজিপ্টের সমস্ত রাষ্ট্রনায়কের দল উপস্থিত ছিলেন। পাঁচটার সময় পার্লামেণ্ট বসবার সময়। আমার খাতিরে একঘণ্টা সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে জানানো হোলো এমন ব্যবস্থা বিপর্যয় আর কখনো আর কারো জন্যে হোতে পারত না। বস্তুত এটা আমাকে সম্মান দেখাবার একটা অসামান্য প্রণালী উদ্ভাবন করা। আমি বললেম, এ হচ্ছে বিদ্যার কাছে রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রণতি, এ কেবল-মাত্র প্রাচ্যদেশেই সম্ভবপর। ওখানে কানুন ও বেহালা যন্ত্র-যোগে আরবি গান শোনা গেল—স্পষ্টই বোঝা গেল ভারতের সঙ্গে আরব পারস্যের রাগরাগিণীর লেন্ দেন্ এক সময় খুবই চলেছিল। মণ্টুকে বলব ইজিপ্টে এসে যেন সে এই তথ্যের গবেষণা করে। যখন ছুটি পেলুম তখন সমস্ত দিনের ক্লান্তির ভূত আমার মেরুদণ্ডের উপর চেপে বসেছে, তার উপরে একটা অত্যুগ্র অজীর্ণ পীড়া আমার পাকযন্ত্রের মধ্যে বিপাক বাধিয়েছে। পাকযন্ত্রের কোনো অপরাধ ছিল না। প্রথমত

রুমানিয়ান্ জাহাজে যা খাদ্য ছিল তা পথ্য ছিল না, দ্বিতীয়ত সোয়ারেসের বাড়িতে যে ভোজের ব্যবস্থা ছিল সেটাও ছিল অভ্যাস-বিরুদ্ধ এবং গুরুপাক। এমন অবস্থায় ক্লান্তি ও ব্যাধি নিয়ে যখন বক্তৃতামঞ্চে উঠে দাঁড়ালুম তখন আমার মন কোনোমতে কথা কইতে চাচ্ছিল না। পালে হাওয়া ছিল না, কেবলি লগি মারতে হোলো। স্পষ্টই বুঝতে পারছিলুম পাড়ি জমছে না। যা হোক কোনোমতে ঘাটে পৌঁছনো গেল। সেটা কেবল আবৃত্তির জোরে। সুইডেনের সেই মিনিস্টর ছিলেন, বক্তৃতা তাঁর ভালো লেগেছিল বললেন। যে-মেয়ের পাত্র জোটা সহজ নয় যখন দেখি তারো বেশ ভালো বিয়ে হয়ে গেল তখন যে-রকম মনে হয় এঁর মুখে প্রশংসা শুনে আমার সেই রকম মনের ভাব হোলো। ইনি যদি য়ুরোপের উত্তর দেশের লোক না হতেন তাহলে মনে করতে পারতেম কথাটা অকৃত্রিম নয়। পরদিন ম্যুজিয়ম দেখতে গিয়েছিলেম —দেখবার জায়গা বটে, তার বর্ণনা করতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। ফেরবার পথে তোমরা নিজেরাই দেখে যাবে— তোমাদের সেই স্বচক্ষের উপরেই বরাত দিয়েই চুপ করা গেল। এই সব কীর্তি দেখে মনে মনে ভাবি যে, বাইরের মানুষ সাড়ে তিন হাত কিন্তু ভিতরে সে কত প্রকাণ্ড।

এখানকার রাজার সঙ্গেও দেখা হোলো। তাঁকে বললেম য়ুরোপের অনেক রাজ্য থেকে বিশ্বভারতী অনেক গ্রন্থ উপহার পেয়েছেন ; আরবি সাহিত্য সম্বন্ধে য়ুরোপে যে সব ভালো বই বেরিয়েছে যদি তদীয় মহিমা তা আমাদের দিতে পারেন

তাহলে রাজোচিত বদান্যতা দেখানো হবে। তদীয় মহিমা খুব উৎসাহের সঙ্গেই রাজি হয়েছেন।

ইতি মধ্যে মিস্ প—অবাধে অক্ষুণ্ণ শরীরে আমাদের দলে এসে ভিড়েছেন। হোটেলের বাইরে খোলা পৃথিবী থাকে, জাহাজের বাইরে মানুষের যোগ্যস্থান নেই। এই জন্যে সকল দলের লোকের সঙ্গে খুব ঘেঁষাঘেঁষি অনিবার্য। তাতেও নতুন মানুষ যে ঠিক কী তা জানা যায় না বটে কিন্তু কী নয় তা অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। প্রথমত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এঁর কিছুই জানা নেই এবং ঔৎসুক্য আকর্ষণ নেই। বুদ্ধিগম্য বিষয় সম্বন্ধেও কোনো অনুরক্তি দেখা গেল না।—সাদা কথার একটুমাত্র বাইরে গেলেই ওর পক্ষে ডুব জল হয়ে পড়ে।

মনে কোরো না, আমি কোনো সিদ্ধান্ত মনের ভিতর এঁটে বসে আছি। সিদ্ধান্ত দ্বারা মানুষের প্রতি অবিচার করার আশঙ্কা আছে। জন্তুরা তাদের অন্ধ সংস্কার থেকে ভয় পায়, সন্দেহ করে। প্রকৃতি তাদের বিচার করতে দেননি, বিচারে যতগুলো প্রমাণের দরকার হয়, তা সংগ্রহ করতে সময় লাগে—ইতিমধ্যে বিপদ এসে পড়ে—যেটা চূড়ান্ত প্রমাণ সেইটেই চূড়ান্ত বিপদ। হরিণ শব্দমাত্র শুনলেই অন্ধসংস্কারের তাড়ায় দৌড় মারে—শব্দটা ঝোপের ভিতরকার বাঘের কাছ থেকে এল কি না তার নিঃসংশয় প্রমাণ নিতে গেলে বাঘ এবং প্রমাণ ঠিক এক সঙ্গেই এসে পড়ে। মানুষ যখন কোনো কারণে বিষম সংকটের অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ যখন খুব তাড়া-

তাড়ি মন স্থির করা অত্যাবশ্যক, মানুষেরও তখন হরিণের অবস্থা হয়। পৃথিবীতে যে সব-জাত নিজেদের সম্বন্ধে যথোচিত নিরাপদ ব্যবস্থা করতে পেরেছে, যাদের আইন যথোচিত পাকা, যাদের আত্মরক্ষাবিধি সুবিহিত তারা অন্ধ সংশয়ের হাত থেকে বেঁচেছে—কেননা ওটা তাদের পক্ষে সহায় নয়, বাধা।

ওর (Miss P—এর) জীবনে বিস্তর ভাঙাচোরা ঘটেছে—এদিকে ওদিকে অনেক ব্যথা অনেক আকারে ওর মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। ও মনে করেছে আমি বুঝি কোনো একরকম ক'রে ওকে সাহায্য করতে পারি। কেননা ও অনেকের কাছে শুনেছে-যে আমি তাদের সাহায্য করেছি। অথচ আমি যে কোথায় সত্য, কোথায় আমায় সম্পদ, তা ও জানে না, বুঝতেও পারে না। ও মনে করেছে আমার কাছাকাছি থাকার মধ্যেই বুঝি সাহায্য ব'লে একটা পদার্থ আছে। বুঝতে পারে না কাছাকাছি যাকে প্রত্যহ পাওয়া যায় সে অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তি, অনেক বিষয়ে সে নির্বোধ, অনেক বিষয়ে সে মন্দ। আসল কথা ও স্ত্রীলোক। আঁকড়ে থাকলেই একটা সত্য বস্তু পাওয়া যায় ব'লে ওর ধারণা। হায়রে পৌত্তলিক। প্রতিমার মাটি সত্য নয়, তাকে যতই গয়না দিয়ে সাজাইনে কেন। অথচ প্রতিমার মধ্যে যে সত্য নেই এত বড়ো ঘোর ব্রাহ্মিক গোঁড়ামিও ঠিক নয়। আসল কথা তাকে আঁকড়ে ধরতে গেলেই ভুলটাকে ধরা হয়, তখনি সত্য দেয় দৌড়। যে-পোকা বইএর কাগজ কেটে খায়, সেই পৌত্তলিক, যে তাকে

চিত্ত দিয়ে পড়তে পারে, কাগজ তার কাছে থেকেও নেই। এ পর্যন্ত মনে হচ্ছে মিস্ 'প' আমার বইখানার কাগজ নিয়ে ঝাড়পোঁচ করছে, কোনোদিন হয়তো তাতে সিন্দুর চন্দনও মাখাবে—তাতে কিছু তৃপ্তিও পাবে। কিন্তু কোনোকালে কি পড়তে পারবে মনে করো।

৬

সন্তোষের কথাটা ভুলতে পারিনে। নিজের জীবনের কথাটা ভাবি—কত সুদীর্ঘ কাল বেঁচে আছি—কত সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা চেষ্টা ও সাধনা, কত বহু গ্রন্থিজটিল ইতিহাস বুন্‌তে বুন্‌তে জীবন গেল। তার তুলনায় সন্তোষের জীবন কতই অল্পপরিসর। যৌবন সমাপ্ত হোতে না হোতে ওর জীবন সমাপ্ত হোলো। তবুও ওর জীবনের ছবি সুব্যক্ত,—বৈচিত্র্য-বিহীন, কিন্তু অর্থবিহীন নয়। চারদিকে কত লোক ব্যবসা করছে, চাকরি করছে, সংসার করছে, সমস্তটাই ঝাপ্‌সা। তাদের দিনগুলো দিনের স্তূপ, একটার উপর আর একটা জড়ো হয়ে উঠেছে, সবগুলো মিলে কোনো রূপ ধরছে না। সন্তোষের জীবন তেমন রূপহীন জীবন নয়। মনে পড়ছে, এই সেইদিন এল আমেরিকার শিক্ষা শেষ ক'রে। শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যে এসে জায়গা ক'রে নিলে। আরো অনেক অধ্যাপক এখানে কাজ করছেন,—যেমন অন্য জায়গায় করতে পারতেন, তেমনি, কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি। কিন্তু সন্তোষ তার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা নিয়ে এই কাজের ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অবশ্য এর সঙ্গে তার জীবিকার যোগ ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু তার আত্মার যোগ আরো বেশি ছিল।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দাবিতে আমরা প্রতিদিন যে কাজ করে থাকি তার কোনো উদ্বৃত্ত নেই, নিজের মধ্যেই তা শোষিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু এমন একটি সাধনার সঙ্গে সন্তোষের সমস্ত জীবন সম্পূর্ণ সম্মিলিত হয়ে ছিল যে-সাধনা তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনমণ্ডলের অনেক অতীত। তার শ্রদ্ধাপ্রদীপ্ত জীবনের সেই পরিণতির ছবিটি আমি খুব স্পষ্ট দেখছি, যেহেতু তার জীবন স্বচ্ছ ও সরল ছিল—তার মধ্যে উপাদানের বহুলতা ছিল না। তার সংসার এবং তার সাধনা, তার কর্ম্ম এবং আদর্শ একত্র মিলিত ছিল, তার অল্পকালের আয়ুটুকু নিয়ে সে যে তারি মধ্যে জীবন যাপন করে যেতে পেরেছে এ তার সৌভাগ্য। আমি যদি প্রমাণের দ্বারা সন্তোষকে জানতুম তাহলে ভুল জানতুম—আমি তাকে সম্পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা জানি। ভালবাসার দ্বারা সব সময়েই যে দৃষ্টির বিকৃতি ঘটে তা নয়, দৃষ্টির সম্পূর্ণতাও ঘটে। আমার বুদ্ধি প্রমাণকে অস্বীকার করে না, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি প্রত্যক্ষবোধকেও শ্রদ্ধা করে। দুইয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে একান্ত বিরোধও ঘটে তখনি রহস্য বড়ো কঠিন ও বড়ো দুঃখকর হয়ে ওঠে। স্বয়ং মৃত্যুর মধ্যেই এই বিরোধ আছে—আমাদের হৃদয়ের সহজ বোধ তাকে চরম ব'লে মানতে চায় না—কিন্তু বিরুদ্ধ প্রমাণের আর অন্ত নেই—এই দুই প্রতিপক্ষের টানাটানিতেই তো এত দুঃসহ বেদনা। আমার "যেতে নাহি দিব" কবিতাটি এই বেদনারই কবিতা।

আজ জাহাজের মধ্যশ্রেণীর যাত্রীদের দরবার নিয়ে

গোরা এসেছিল। এই অপরাহ্ণে তারা আমার মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়। যদি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হোত তাহলে হঠাৎ রাজি হতুম না—দ্বিতীয় শ্রেণীর মনুষ্যত্বের আবরণ অনেক হাল্‌কা,—সেখানে মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে যাবার সময় হয়ে এল।

৭

সমুদ্রে আজ নিয়ে আর চারদিন আছি। ১৬ই সকালে কলম্বো পৌঁছব। কিন্তু দেশে পৌঁছবার শান্তি পাব না। দীর্ঘ রেলযাত্রা নানা ভাগে বিচ্ছিন্ন। তারপরে পুপে যাকে বলতে শিখেছে "মালপত্র", তার সংখ্যা বহু, তার আয়তন বিপুল এবং তার আধারগুলির অবস্থা শোকাবহ। কোনো বাক্স আছে যাত্রার সূচনাতেই চাবির সঙ্গে যার চিরবিচ্ছেদ, দড়িদড়ার বন্ধন ছাড়া যার আর গতি নেই; কোনো বাক্স আছে যার সর্বাঙ্গ আঘাতে জর্জর, কোনো বাক্স আছে যা ভূরিভোজপীড়িত রোগীর মতো উদ্গারের দ্বারা ভার প্রশমনের জন্য উৎসুক—অথচ যুদ্ধক্ষেত্রের হাঁসপাতালের রোগীর মতো এদের সম্বন্ধে রথীর উদ্বেগ সকরুণ। তা হোক তবুও দেশের মুখে চলেছি এবং দীর্ঘপথের সেই তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন শেষ ভাগটা যেন দেখা যাচ্ছে। এখানে আমাদের দেশের সেই দাক্ষিণ্যপূর্ণ সূর্যালোক আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। শুক্ল-পক্ষের চাঁদ প্রতিদিন পূর্ণতর হয়ে উঠছে; আমাদের মর্মর-মুখরিত শালবীথিকার পল্লবপুঞ্জের মধ্যে তার দোললীলা মনে মনে দেখতে পাচ্ছি। প্রবাসবাসের সমস্ত বোঝা উত্তরায়ণের বহির্দ্বারে নামিয়ে দিয়ে আপন মনে স্বেচ্ছাবিহারের পালা অনতিবিলম্বে শুরু করব ব'লে কল্পনা করছি। কিন্তু

হায়, এও নিশ্চয় জানি যে, দেবলোকে আমাদের বাস নয়, যেখানেই থাকি না কেন। অনেকের অনেক ইচ্ছার ভিড় ঠেলে ঠেলে নিজের ইচ্ছার জন্য অতি সংকীর্ণ একটুখানি পথ পাওয়া যায়,—একটু সুবিধা এই যে, পথ সংকীর্ণ হোলেও সেটা অনেক কালের অভ্যস্ত পথ—ভিড়ের মধ্যেও খানিকটা আপন-মনে চলা সম্ভব।

আমাদের সহযাত্রীর মধ্যে একজন জর্মন নৃতত্ত্ববিদ সস্ত্রীক ভারতবর্ষে চলেছেন। তিনি আমাদের অধ্যাপকের নাম শুনেছেন। আমাকে বললেন—"শুনেছি তিনি ফিজিক্‌সের অধ্যাপনা করেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে তিনি নৃতত্ত্ব-বিদ্যার আঙ্কিক দিকটার চর্চা করেন; আমরা এর মানবিক দিকটা নিয়ে আছি।" মানবিক দিক বলতে যে কতখানি বোঝায় তা এঁর অধ্যবসায় দেখে একটু আন্দাজ করা যেতে পারে। দক্ষিণ ও মধ্যভারতের বন্যজাতিদের বিবরণ সংগ্রহ করতে চলেছেন, এ সব জাতদের বিষয় এখনো অজ্ঞাত ও দুর্জ্ঞেয়, আমি তো এদের নামও শুনিনি। এরা খুব দুর্গম জায়গায় প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। ইনি তাদের সেই প্রচ্ছন্নতার মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছেন। তাঁবুতে থাকলে পাছে তা'রা ভয় পায় সন্দেহ ক'রে একটা থলি নিয়েছেন; রাত্রে তারি মধ্যে থাকবেন। সাপ আছে, হিংস্র জন্তু আছে, অনিয়মে অপথ্যে ব্যাধির আশঙ্কা আছে। অর্থাৎ প্রাণ হাতে ক'রে নিয়ে চলেছেন। একটি শিশু সন্তানকে আত্মীয়ের হাতে রেখে এসেছেন। পাছে অরণ্যে স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েন

এইজন্য সঙ্গ নিয়েছেন তাঁর স্ত্রী। ইতিমধ্যে ম্যাপ নিয়ে বই নিয়ে সমস্ত দিন নোট তৈরি করছেন, স্বামীর কাজ এগিয়ে দেবার জন্যে। যাদের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে দুঃসহ কষ্ট ও বিপদ অগ্রাহ্য ক'রে চলেছেন তারা আত্মীয়জাতি নয়,.সভ্য-জাতি নয়, মানবজাতিসম্বন্ধীয় তথ্য ছাড়া তাদের কাছে থেকে আর কোনো দুর্মূল্য জিনিস আদায় করা যাবে না। এরা পৃথিবীর সমস্ত তথ্য ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে বেরিয়েছে, আমরা পৃথিবীর মাটি জুড়ে ছেঁড়া মাদুর পেতে গড়াগড়ি দিচ্ছি। জায়গা ছেড়ে দেওয়াই ভালো—বিধাতা জায়গা সাফ করবার অনেক দূতও লাগিয়েছেন।

৮

কাল সকালে কলম্বো পৌঁছব। যখন য়ুরোপে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম আজকের এই দিনের ছবি অনেকদিন মনে মনে এঁকেছি জাহাজ এসেছে ভারতবর্ষের কাছাকাছি; উজ্জ্বল আকাশ বুক বাড়িয়ে দিয়েছে; শকুন্তলায়, বালক ভরত যেমন সিংহের কেশর ধরে খেলছে, শীতের নির্মল রৌদ্র তেমনি তরঙ্গিত নীল সমুদ্রকে নিয়ে ছেলেমানুষি করছে, আর সেই নারকেল গাছের ঘন বন, যেন দূরে থেকে ডাঙার হাত-তোলা ডাক। সেই কল্পনার ছবি এখন সামনে এসেছে। কাল লাক্কাডীভের খুব কাছ ঘেঁষে জাহাজ এল—শ্যামল তটভূমির কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেলুম। ঐ তরুবেষ্টিত দিগন্তের ধারে মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা চলছে এই কথাটা যেন নতুন ও নিবিড় বিস্ময়ের সঙ্গে আমার মনে লাগল। আমি জানি যারা ঐখানে মাটি আঁকড়ে আছে তারা নিজে এর আনন্দ, এর সৌন্দর্য, এর মহার্ঘতা যে স্পষ্ট বুঝছে তা নয়। অভ্যাসে আমাদের চৈতন্যকে ম্লান ক'রে দেয়, কিন্তু তবু যা সত্য তা সত্যই। দূরের থেকে শান্তিনিকেতন আমার কাছে যতখানি, কাছের থেকে ঠিক ততখানি না হোতেও পারে—কিন্তু তার থেকে কী প্রমাণ হয়। দূরের দৃষ্টিতে যে-সমগ্রতা আমরা এক ক'রে দেখতে পাই সেইটাই বড়ো দেখা, কাছের দৃষ্টিতে যে

খুঁটিনাটিতে মন আবদ্ধ হয়ে সমষ্টিকে স্পষ্ট দেখতে দেয় না, সেইটেই আমাদের শক্তির অসম্পূর্ণতা। এই কারণেই, আমাদের সমস্ত আয়ু নিয়ে আমরা যে জীবনযাপন করেছি তাকে আমরা পুরোপুরি জানতেই পারিনে,—যা পাইনে তার জন্যে খুঁত খুঁত করি, যা হারিয়েছে তার জন্যে বিলাপ করি, এমনি করে যা পেয়েছি তার সবটাকে নিয়ে তাকে যাচাই করার অবকাশ পাইনে। আসল কথা, শান্তিনিকেতনের আকাশ ও অবকাশে পবিবেষ্টিত আমাদের যে জীবন তার মধ্যে সত্যই একটি সম্পূর্ণরূপ আছে, যা কলকাতার সূত্রচ্ছিন্ন জীবনে নেই। সেই সম্পূর্ণরূপের অন্তর্গত নানা অভাব ও ত্রুটি তার পক্ষে ঐকান্তিক নয়, সেগুলো অপ্রাসঙ্গিক, পর্বতের গায়ের গর্তের মতো, যা পর্বতের উচ্চতাকে বৃথা প্রতিবাদ করে। শান্তিনিকেতনের ভিতর দিয়ে মোটের উপর আমি নিজেকে কী রকম ক'রে প্রকাশ করেছি সেইটের দ্বারাই প্রমাণ হয় শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে কী—মাঝে মাঝে কী রকম নালিশ করেছি, ছটফট করেছি তার দ্বারা নয়। শুধু আমি নই, শান্তিনিকেতনে অনেকেই আপন আপন সাধ্যমতো একটি সুসংগতির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছেন। এটা যে হয়েছে সে কেবল আমার জন্যেই হয়েছে এ কথা যদি বলি তাহলে অহংকারের মতো শুনতে হবে কিন্তু মিথ্যে বলা হবে না। আমি নিজের ইচ্ছার দ্বারা বা কর্মপ্রণালীর দ্বারা কাউকে অত্যন্ত আঁট করে বাঁধিনে; তাতে ক'রে কোনো অসুবিধে হয় না তা বলিনে—

আমি নিজেই তার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছি কিন্তু তবু আমি মোটের উপর এইটে নিয়ে গৌরব করি। অধিকাংশ কর্মবীরই এর মধ্যে ডিসিপ্লিনের শিথিলতা দেখে—অর্থাৎ না-এর দিক থেকে, হাঁ-এর দিক থেকে দেখে না। স্বাধীনতা ও কর্মের সামঞ্জস্য সংঘটিত এই যে ব্যবস্থা এটি আমার একটি সৃষ্টি—আমার নিজের স্বভাব থেকে এর উদ্ভব। আমি যখন বিদায় নেব, যখন থাকবে সংসদ, পরিষদ ও নিয়মাবলী; তখন এ জিনিসটিও থাকবে না। অনেক প্রতিবাদ ও অভিযোগের সঙ্গে লড়াই করে এতদিন একে বাঁচিয়ে রেখেছি—কিন্তু যারা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ তারা একে বিশ্বাস করে না। এর পরে ইস্কুল-মাস্টারের ঝাঁক নিয়ে তারা অতি বিশুদ্ধ জ্যামিতিক নিয়মে চাক বাঁধবে—শান্তিনিকেতনের আকাশ ও প্রান্তর ও শালবীথিকা বিমর্ষ হয়ে তাই দেখবে ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে। তখন তাদের নালিশ কি কোনো কবির কাছে পৌঁছবে।

৯

আমার মনটা স্বভাবতই নদীর ধারার মতো, চলে আর বলে একসঙ্গেই—বোবার মতো অবাক হয়ে বইতে পারে না। এটা যে ভালো অভ্যাস তা নয়। কারণ মুছে ফেলবার কথাকে লিখে ফেললে তাকে খানিকটা স্থায়িত্ব দেওয়া হয়—যার বাঁচবার দাবি নেই সেও বাঁচবার জন্যে লড়তে থাকে। ডাক্তারি শাস্ত্রের উন্নতির কল্যাণে অনেক মানুষ খামকা বেঁচে থাকে প্রকৃতি যাকে বাঁচবার পরোয়ানা দিয়ে পাঠান নি—তারা জীবলোকের অন্নধ্বংস করে। আমাদের মনে যখন যা উপস্থিত হয় তার পাসপোর্ট বিচার না করেই তাকে যদি লেখনরাজ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় তাহলে সে গোলমাল ঘটাতে পারে। যে কথাটা ক্ষণজীবী তাকেও অনেকখানি আয়ু দেবার শক্তি সাহিত্যিকের কলমে আছে, সেটাতে বেশি ক্ষতি হয় না সাহিত্যে। কিন্তু লোকব্যবহারে হয় বই কি। চিন্তাকে আমি তাড়াতাড়ি রূপ দিয়ে ফেলি—সব সময়েই যে সেটা অযথা হয় তা নয়—কিন্তু জীবনযাত্রায় পদে পদে এই রকম রূপকারের কাজের চেয়ে চুপকারের কাজ অনেক ভালো। আমি প্রগল্‌ভ, কিন্তু যারা চুপ করতে জানে তাদের শ্রদ্ধা করি। যে-মনটা কথায় কথায় চেঁচিয়ে কথা কয় তাকে আমি এখানকার নির্মল আকাশের নিচে

গাছতলায় ব'সে চুপ করাতে চেষ্টা করছি। এই চুপের মধ্যে শান্তি পাওয়া যায়, সত্যও পাওয়া যায়। প্রত্যেক নূতন অবস্থার সঙ্গে জীবনকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে নানা জায়গায় ঘা লাগে—তখনকার মতো সেগুলো প্রচণ্ড, নতুন চলতে গিয়ে শিশুদের পড়ে যাওয়ার মতো, তা নিয়ে আহা উহু করতে গেলেই ছেলেদের কাঁদিয়ে তোলা হয়। বুদ্ধি যার আছে সে এমন জায়গায় চুপ করে যায়—কেননা সব কিছুকেই মনে রাখা মনের শ্রেষ্ঠ শক্তি নয়, ভোলবার জিনিসকে ভুলতে দেওয়াতেও তার শক্তির পরিচয়। ইতি
২৭ পৌষ, ১৩৩৩।

১০

আমি যে তোমাকে চিঠি লিখেছি এতদিন পরে তার একখানি প্রাপ্তিস্বীকার পাওয়া গেল। ইতি পূর্বে গতসপ্তাহে প্রশান্তর একখানি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। তাতে বর্তমান য়ুরোপের সর্বত্রই যে—একটা দুশ্চিন্তার আলোড়ন চলছে তার একটা বেশ স্পষ্ট ছবি দেওয়া হয়েছে। মনে করছি এর ইংরেজি অংশ বাংলা ক'রে এটাকে কোনো একটা কাগজে ছাপানো যাবে।

এই মাত্র বিকেলের গাড়িতে রেখা চোখের জল মুছতে মুছতে ঢাকায় তার শ্বশুরবাড়ি অভিমুখে চলে গেল। অমিয় বললে, নতুন বিয়ের কালে যে-কোনো স্বামীকেই তার যে-কোনো স্ত্রীর উপযুক্ত ব'লে মনে হয় না। শুনে মনে হোলো, তার কারণটা এই যে, নববধূ আপনার সব কিছুকেই দান করে, তার চোখের জলের মধ্যে সেই কথাটাই প্রচ্ছন্ন থাকে। অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধ বন্ধনের তন্তুতে তন্তুতে বদ্ধ জীবনকে ছিন্ন করে নিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে। কিন্তু তার স্বামী সব দিতে বাধ্য হয় না। এই আদান প্রদানের অসমানতাকে নিজের পৌরুষ সম্পদ দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারে এমন সামর্থ্য অল্পলোকেরই আছে। তার পরে দিন যায়, স্ত্রী ক্রমে যখন নিজের গুণে ও শক্তিতে নিজের সংসার সৃষ্টি ক'রে তোলে

তখন সেইটেই তার পুরস্কার হয়। কেননা তার বাপমায়ের যে-সংসারে সে ছিল সে সংসারে সে ছিল অকর্তা—সে সংসারে তার অধিকার আংশিক ; তার দাম্পত্যের জগৎ তার আপনারি জগৎ। এই জন্যে তার চোখের জল শুকোতে দেরি হয় না। যে-অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ অনেক অংশে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, বর্তমানের তুলনায় সে অতীতের গৌরব কমে যায়, এইজন্যে তার আকর্ষণ শক্তিও ক্ষীণ হয়ে আসে। তখন, যা সে দিয়ে এসেছে তার পরিবর্তে যা সে পায় তা বেশি বই কম হয় না।

আমার চিঠি লেখার বয়স চলে গেছে। কলমের ভিতর দিয়ে কথা কইতে গেলে কথার প্রাণগত অনেকটা অংশ ফসকে যায়। যখন মনের শক্তি প্রচুর থাকে তখন বাদসাদ দিয়েও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকে। তাই তখন লেখার বকুনিতে অভাবের লক্ষণ দেখা যায় না। এখন বাণী সহজে বকুনিতে উছলে উঠতে বাধা পায়—তাই কলমের ডগায় কথার ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে, বোধ হয় এইজন্যেই লেখবার দুঃখ স্বীকার করতে মন রাজি হয় না।

তা হোকগে, তবু তোমাকে একটা ভিতরকার কথা বলি। সময় অনুকূল নয়, নানা চিন্তা, নানা অভাব, নানা আঘাত, সংঘাত। ক্ষণে ক্ষণে অবসাদের ছায়া ঘনিয়ে আসে, একটা পীড়ার হাওয়া মনের একদিক থেকে আর একদিকে হুহু ক'রে বইতে থাকে। এমন সময় চমকে উঠে মনে পড়ে যায় যে এ ছায়াটা "আমি" ব'লে একটা রাহুর। সে রাহুটা সত্য

পদার্থ নয়। তখন মনটা ধড়ফড় করে চেঁচিয়ে উঠে' ব'লে ওঠে—ও নেই ও নেই। দেখতে দেখতে মন পরিষ্কার হয়ে যায়। বাড়ির সামনে কাঁকর-বিছানো লাল রাস্তায় বেড়াই আর মনের মধ্যে এই ছায়াআলোর দ্বন্দ্ব চলে। বাইরে থেকে যারা দেখে তারা কে জানবে ভিতরে একটা সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। এ সৃষ্টির কি আমারই মনের মধ্যে আরম্ভ আমারই মনের মধ্যে অবসান। বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে এর কি কোনো চিরন্তন যোগসূত্র নেই। নিশ্চয়ই আছে। জগৎ জুড়ে অসীম কাল ধরে একটা কী হয়ে উঠছে আমাদের চিত্তের মধ্যে বেদনায় বেদনায় তারি একটা ধাক্কা চলছে। সভ্যতার ইতিহাস ধারায় মানুষ আজ যে অবস্থার মধ্যে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে, এই অবস্থাসৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যে কত কোটি কোটি নামহীন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের চিরবিস্মৃত চিত্ত-সংঘাত আছে। সৃষ্টির যা-কিছু রয়ে যাওয়া তা সংখ্যাহীন চলে যাওয়ার প্রতিমুহূর্তের হাতের গড়া। আজ আমার এই জীবনের মধ্যে সৃষ্টির সেই দূতগুলি, সেই চলে-যাওয়ার দল তার কাজ করছে—"আমি" ব'লে পদার্থটা উপলক্ষ্য মাত্র—বাড়ি তৈরির যে ভারা বাঁধা হয় আজকের দিনে এর প্রয়োজনীয়তার প্রাধান্য যতই থাক্ কালকের দিনে যখন এর চিহ্নমাত্র থাকবে না তখন কারো গায় একটুও বাজবে না। ইমারত আপন ভারার জন্যে কোথাও শোক করে না। মোদ্দা কথাটা এই-যে, আজ আমার এ আমিটাকে নিয়ে যে-গড়াপেটা চলছে এই লাল কাঁকর বিছানো রাস্তা

দিয়ে চলতে চলতে ভিতরে ভিতরে যা-কিছু উপলব্ধি করছি তার অনেকখানিই আমার নামের স্বাক্ষর মুছে ফেলে দিয়ে মানুষের সৃষ্টি ভাণ্ডারে জমা হচ্ছে। ইতি ২৫ মাঘ, ১৩৩৩।

তখন সেই ইতরতায় আমি নিজেকে অসুন্দর দেখি। তাতেই কষ্ট পাই। আত্মমর্যাদার একটি শোভা আছে প্রবৃত্তির বশে আত্মবিস্মৃত হয়ে সেইটেকে যখন ক্ষুন্ন করি তখন অনতিকাল পরে মনে ধিক্কার জন্মায়। আমার মধ্যে বন্ধনের জোর বেশি ব'লেই আমার মধ্যে মুক্তির আগ্রহ এত বেশি প্রবল। আমার ব্যবহারে এই দুই শক্তির পরস্পর বিরোধের মধ্যে দিয়ে এ পর্যন্ত সংসার পথে যাত্রা ক'রে এলেম। আজ মাঝে মাঝে আমার এই বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে একলা চলতে চলতে ভাবি—সব ভাঙাচোরাকে সেরে নেবার সময় আছে কি।

কথা বলতে গিয়ে কথা বেড়ে যায়—হায় রে, মধ্যমাঙ্গুলি আহত বলদের মতো কলম টেনেই চলেছে—ইতি ২ মার্চ, ১৯২৭।

১২

আমার সেই আঙুল আজো বন্দীশালায়। যারা তাকে এই অবস্থায় রেখেছে—তারা বলছে ঐ হতভাগ্য এখনো আত্মশাসনের অধিকার পাবার যোগ্য হয়নি। তাই বন্ধনবশত তার আত্মপ্রকাশ অবরুদ্ধ। লেখার কাজ একপ্রকাব বন্ধই আছে। আমার কলম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঝে মাঝে এক একটা গান লেখে মাত্র।—"মাত্র" বলছি জনসাধারণের দাবির মাত্রার মাপে। কাব্য রচনাতেও তারা মাপের ফিতে লাগায়। কাব্যরাজ্যে দশলাইনের একটা গানেরও আভিজাত্য থাকতে পারে এ তাদের বোঝানো শক্ত। বোম্বাই আমের চেয়ে চালকুমড়োকে যখন তারা বেশি গৌরব দেয়, তখন সন্দেহ প্রকাশ করলে দাঁড়ি পাল্লা এনে হাজির করে। মনে স্থির করেছি "ম্যালেরিয়াবধ" নাম দিয়ে একটা মহাকাব্য লিখব তাতে কুইনীনকে করব প্রধান নায়ক—কেরোসিন তৈলবাণে মশক সৈন্যদল বধ করবার পুনঃপুন সংগ্রাম হবে তার প্রধান বর্ণনার বিষয়—সাতটা সর্গের ভিতর দিয়ে প্লীহা যকৃতের বিকৃতি মোচন ব্যাখ্যা ক'রে ক্ষুদ্রকায়া কাব্যরচনার দুর্নাম দূর করবার ইচ্ছে রইল।

সম্প্রতি আমার শরীরটা খিটমিট করছে। দু-চার দিন থেকে একটু একটু জ্বরের আভাসও দেখা দেয়। মনটা ক্লান্ত।

আমার চৈতন্যের অগোচরে বোধ হচ্ছে কোনো একটা কালো দুশ্চিন্তা তার ডিমে তা দিচ্ছে। এই ডিমগুলো ভেদ ক'রেই বোধ হয় একটু ক্লান্তি, একটু জ্বর ক্ষণে ক্ষণে বের হয়ে পড়ে। শীতের দস্যু হাওয়ায় কেবলি চারিদিকের গাছ-পালা রিক্ত ক'রে হি হি ধরিয়ে দিয়েছে। আকাশ তারি দৌরাত্ম্যে আচ্ছন্ন, মন একটুও আরাম পায় না। মনে মনে ধ্যান করবার চেষ্টা করি এ সমস্তই বাইরের জিনিস—ইচ্ছা করি, আমার অন্তরলোকের সামঞ্জস্য এরা যেন নষ্ট না করে। জীবনের যে-জিনিস এঁকে শেষ করতে হবে তার পট তো এই এতটুকু—এর মধ্যে নানা বাজে আঁচড় কাটতে দিলে জীবন রচনার দশা কী হবে।

১৩

ভ্রমণ শেষ করে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছি। আজ নববর্ষের দিন। মন্দিরের কাজ শেষ করে এলুম। বাইরের কেউ ছিল না কেবল আমাদের আশ্রমের সবাই।

এবার আমার জীবনে নূতন পর্যায় আরম্ভ হোলো। এ'কে বলা যেতে পারে শেষ অধ্যায়। এই পরিশিষ্টভাগে সমস্ত জীবনের তাৎপর্যকে যদি সংহত করে সুস্পষ্ট করে না তুলতে পারি তাহলে অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়ে বিদায় নিতে হবে। আমার বীণায় অনেক বেশি তার—সব তারে নিখুঁত সুর মেলানো বড়ো কঠিন। আমার জীবনে সব চেয়ে কঠিন সমস্যা আমার কবিপ্রকৃতি। হৃদয়ের সব অনুভূতির দাবিই আমাকে মানতে হোলো—কোনোটাকে ক্ষীণ করলে আমার এই হাজার সুরের গানের আসর সম্পূর্ণ জমে না। অথচ নানা অনুভূতিকে নিয়ে যাদের ব্যবহার, জীবনের পথে সোজা রথ হাঁকিয়ে চলা তাদের পক্ষে একটুও সহজ নয়—এ যেন একাগাড়িতে দশটা বাহন জুতে চালানো। তার সবগুলোই যদি ঘোড়া হোত তাহলেও একরকম করে সারথ্য করা যেতে পারত। মুশকিল এই, এর কোনোটা উট, কোনোটা হাতি, কোনোটা ঘোড়া, আবার কোনোটা ধোবার বাড়ির গাধা, ময়লা কাপড়ের বাহক। এদের সকলকে একরাশে বাগিয়ে

এক চালে চালাতে পারে এমন মল্ল ক'জন আছে। কিন্তু আমি যদি নিছক কবি হতুম তাহলে এজন্যে মনে ভাবনাও থাকত না, এমন কি যখন ঘাড়ভাঙা গর্তের অভিমুখে বাহন-গুলো চার পা তুলে ছুটত তখনো অট্টহাস্য করতে পারতুম,—এমন-সকল মরীয়া কবি সংসারে মাঝে মাঝে দেখা যায় তারা স্পর্ধার সঙ্গে বলতে পারে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমার স্বধর্ম কী তা নিয়ে বিতর্ক আর ঘুচল না। এটুকু প্রতিদিনই বুঝতে পারি কবিধর্ম আমার একমাত্র ধর্ম নয়—রস বোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই আমার খালাস নয়। অস্তিত্বের নানা বিভাগেই আমার জবাবদিহি—সব হিসাবকে একটা চরম অঙ্কে মেলাব কী করে। যদি না মেলাতে পারি তাহলে সমস্যা অত্যন্ত কঠিন ব'লে তো পরীক্ষক আমাকে পার করে দেবেন না—জীবনের পরীক্ষায় তো হাল আমলের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য পাওয়া যায় না। আমার আপনার মধ্যে এই নানা বিরুদ্ধতার বিষম দৌরাত্ম্য আছে ব'লেই আমার ভিতরে মুক্তির জন্যে এমন নিরন্তর এবং এমন প্রবল কান্না। ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩৩৪।

১৪

আমাকে পোর্টসায়েদে চিঠি দিতে লিখেছ। গেল সপ্তাহে পাঠিয়েছি। দেনা পাওনার কোনো প্রত্যাশা না করেই এতদিন আমার চিঠিতে আমি নিজের মনের ঝোঁকে বকে গিয়েছি। বকবার সুযোগ পেলেই আমি বকি, এবং বকতে পারলেই আমি নিজের মনকে চিনি, তার বোঝা লাঘব করি—সাহিত্যিক মানুষের এইটেই হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু বকতে পারা একান্ত আমার নিজের গুণ তা নয়—শ্রোতার পক্ষে বকুনি আদায় করে নেবার শক্তি থাকা চাই। ইচ্ছে করলেও মন মনের কথা দিতে পারে না। আমাদের এখানে প্রতিদিনই এই বৈশাখের আকাশে জলভরা মেঘ আনাগোনা করছে, প্রতিদিন ফিরে ফিরে যাচ্ছে, এক ফোঁটা জল দিতে পারছে না। যে বায়ুমণ্ডল জল নেবে, তার জোর পৌঁচচ্ছে না। মোট কথা হচ্ছে, আমার কথাভরা মনের পক্ষে বকুনিটা আমার নিজেরই গরজে। কিন্তু তাই ব'লে পোস্টআপিস ব'লে একটা বস্তাবাহক স্থূল পদার্থকে মনের সামনে খাড়া করে কথা বলতে চাইলেই যে নিরবধি বলে যেতে পারি এত বড়ো পৌত্তলিক আমি নই। সেইজন্যে যখন মনে ধোঁকা আসে যে পোস্টআফিসের চরম প্রান্তে কর্ণবান কেউ নেই, আছে আমেরিকান এক্স্‌প্রেসের

আপিস, তখন কথার ধারা বন্ধ হয়ে যায়। তোমাদের চিঠি মনের কথার চিঠি নয়, খবর দেওয়ার চিঠি,—সেই খবরগুলি কোথায় গিয়ে পৌঁছয় তাতে তেমন বেশি কিছু আসে যায় না। কিন্তু কথাটা ভালো হোলো না। তুমি ভাববে তোমাকে খাটো করলেম। ইচ্ছে ক'রে খোঁটা দেবার জন্যে করিনি—হয়তো অবচেতন চিত্ত থেকে করে থাকতে পারি। একথা বলতেই হবে মনের কথা বলাই আমার প্রকৃতি ;—বলতে পারি ব'লেই বলি, না বলতে পারলে খবর লিখতুম। তাতে দোষ নেই, পড়তে ভালোই লাগে—এমন কি, চিঠিতে খবর লিখতে না পারার অক্ষমতা নিয়ে আমি নিজেকে নিন্দাও করি। ইতি ৮ই বৈশাখ, ১৩৩৪।

১৫

আজ সকালে বিচ্ছিন্ন মেঘের মধ্যে দিয়ে চমৎকার সূর্যোদয় হয়েছিল, ঈষৎ বাষ্পাবিষ্ট তার সকরুণ আলো এখানকার গাছপালা বাড়িঘর সব কিছুকে স্পর্শ করেছিল। এই তো চির পরিপূর্ণতার সুর—এইতো বিশ্বকে চিরনবীন করে রেখেছে—যত বড়ো আঘাত যত নিবিড় কালিমাই জগতের গায়ে আঁচড় কাটতে থাকে তার কোনো চিহ্নই থাকে না—পরিপূর্ণের শান্তি সমস্ত ক্ষয়কে অনিষ্টকে নিয়তই পূরণ ক'রে বিরাজ করে। ঐ প্রতিদিন প্রভাতের কাঁচাসোনাকে কিছুতেই একটুও ম্লান করতে পারেনি, আর আমার দ্বারের কাছে নীলমণিলতা যে উচ্ছ্বসিত বাণী আকাশে প্রচার করছে আজ পর্যন্ত সে একটুও ক্লান্ত হোতে জানল না। আমি ঐখান থেকে আমার জীবনের মন্ত্র নিতে চাই, কোনো গুরুভার গুরুবাক্য থেকে নয়—গাছ যেমন করে পাতা মেলে দিয়ে আকাশের আলো থেকে অদৃশ্য অচিহ্নিত পথে ডেকে নেয় আপনার প্রাণ আপনার তেজ। ইতি ৩০ কার্তিক, ১৩৩৪।

১৬

ঠিক সময়েই বর্ধমানে গাড়ি পৌঁছল। স্টেশনে নেমে সময় কাটাবার উপলক্ষ্যে খাবার ঘরে ঢুকে টানাপাখার নিচে বসলুম—এক পেয়ালা কফি হুকুম করতে হোলো—বলা বাহুল্য সেটা অনাবশ্যক ছিল। যখন এল কফি, তখন দেখা গেল সেটা পান করা অনাবশ্যকের চেয়েও মন্দ। দ্বিতীয় গাড়ি আসতে পাঁচ মিনিট বাকি—আরিয়াম এসে বললে আজকের দিনেই বিশেষ কারণে গাড়ি অন্য প্ল্যাটফর্মে ভিড়বে—সাঁকো পার হয়ে যেতে হবে। আমাকে একটা ঝুলিবাহনে কুলি-বাহন যোগে লাইন পার করবার ব্যবস্থা করেছিল—আমি এরকম অপ্রচলিত যানাধিষ্ঠিত হয়ে সাধারণের গোচর হোতে আপত্তি করলুম। তারপরে সর্বসাধারণের নির্দিষ্ট পথে চলতে গিয়ে দেখলুম, প্রকৃতি সে পথের পাথেয় আমার অনেক কমিয়ে দিয়েছেন—বুঝলুম প্রকৃতি আমাকে অনাবশ্যক বোধে সাধারণের পথ থেকে হাফ পেন্‌সনে সরিয়ে রেখেছে, বছরে বছরে যখন তার বাজেট স্থির হবে আমার পেন্সন থেকে আরো বাদ পড়বে। পুরোনো সেবকের প্রতি প্রকৃতির দয়ামায়া নেই। এক মুহূর্তে কোনো কারণ না দেখিয়ে তাকে বরখাস্ত করতে তার একটুও বাধে না। কিন্তু আমি যে কর্মক্ষেত্র থেকে বরখাস্তের যোগ্য একথা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাই।

বোলপুর স্টেশনে এসে পৌঁছলুম। কী ঘনঘোর মেঘ—বৃষ্টিতে সমস্ত মাঠ ভেসে গেছে—চারদিকে সবুজ। এত বড়ো আকাশ এবং অবারিত মাঠ না থাকলে বর্ষার মেজাজটা ছিঁচকাঁদুনে গোছের হয়ে ওঠে, তার মর্যাদা নষ্ট হয়। যাই হোক এতদিনে এখানে এসে পুরো বছরের বর্ষা পাওয়া গেল—তার মধ্যে ছাঁট কাট নেই।

আডিয়ার আশ্রমে মশার সংখ্যা এবং হিংস্রতা দেখে দেহ মন অভিভূত হয়েছিল—শান্তিনিকেতন আশ্রম তার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। এদের সঙ্গে যুদ্ধের একমাত্র উপায় বাষ্পবাণ—সন্ধ্যা থেকে সমস্ত রাত্রি কাটোল-ধূম প্রয়োগ করেছি—এই রূঢ় আচরণে কিছু তারা দুঃখিত হোলো দেখলুম, এমন কি একদল walk out করলে কিন্তু যে কয়টি die-hards টিকে রইল শান্তিভঙ্গের পক্ষে তারা যথেষ্ট। ভোরে উঠে প্রতিদিন একটুখানি বসি—কিন্তু তারা আমার চেয়েও ভোরে ওঠে। এদিকে মুষলধারায় বৃষ্টি, দক্ষিণ ও পুব দিক থেকে বেগে হাওয়া দিচ্ছে, দরজা বন্ধ করে সকাল কাটল—আলো জ্বাললুম, তাতে মশাগুলো উৎসাহিত হয়ে মনে করলে তাদের ভোজে নিমন্ত্রণ করেছি—কিছুতেই চরণ-প্রান্ত ছাড়তে চায় না। ইতি ২০ আষাঢ়, ১৩৩৫।

১৭

বৃষ্টি ধরে গেছে, মেঘও গেছে সরে—চারিদিকে সরস সবুজের চিকন আভা—একেবারে ঝল্‌মল্ করছে—বাঙ্গালোরের সেই সবুজ সিল্কের সাড়িতে যেন সোনালি সুতোর কাজ করা। একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে। এখন বেলা তুটো। কেয়াফুলের গন্ধ আসছে—টেবিলের একপাশে কে রেখে দিয়েছে। এই বর্ষাদিনের তুপুরবেলাকার রোদ্দুর ঈষৎ আর্দ্র, তার উপরে যেন তন্দ্রার আবেশ; সামনের আকন্দগাছে ফুল ধরেছে, গোটাকতক প্রজাপতি কেবলি ফুরফুর করে বেড়াচ্ছে।—কোথাও কোনো শব্দটিমাত্র নেই, —চাকরবাকর আহারে বিশ্রামে রত, ছুতোর মিস্ত্রির দল এখনো কাজ করতে আসেনি। বসে বসে কোনো একটা খেয়ালের কাজ করতে ইচ্ছে করছে—এই "রৌদ্রমাখানো অলস বেলায়"—গুন্ গুন্ করে গান করতে কিংবা সৃষ্টিছাড়া ধরণের ছবি আঁকতে—অথচ তুটোর কোনোটাই করা হবে না, সহজ ইচ্ছেগুলোরই সহজে পূরণ হয় না। আমার ক্লান্তিভরা কুঁড়েমির ডিগ্রিটা অতটুকু কাজ করারও নিচে। সেই "মিতা" গল্পটায় মাজাঘষা করছিলুম—অল্প কিছু বেড়েও গেছে। এখানকার শ্রোতাদের ভালোই লাগল। আবার একটা নূতন গল্পে প্রথম ধাক্কা দেবার মতো জোর পাচ্ছিনে।

যে গল্পের মানুষগুলো প্রচ্ছন্ন আছে, সে গল্পের বোঝা ভারি, তার কারণ একলাই তাকে ঠেলতে হয়—যখন তারা প্রস্তুত হয়ে বেরোয় তখন তারা অনেকটা পরিমাণ নিজেরাই ঠেলা লাগায়। ইতি ৮ জুলাই, ১৯২৮

১৮

কলকাতায় যাই যাই করি, কিন্তু পা ওঠে না। তার কারণ এ নয় যে এখানকার শ্রাবণের টানে আট্‌কা পড়েছি। কারণটা কিছু সূক্ষ্ম—সাইকোলজিকাল।

আজ চল্লিশবছর হয়ে গেল আমার মনের মধ্যে একটা সংকল্পের সম্পূর্ণ ধ্যানমূর্তি জেগে উঠেছিল, ইংরেজিতে যাকে বলে Vision। তখন বয়স ছিল অল্প, মনেব দৃষ্টিশক্তিতে একটুও চাল্‌শে পড়েনি। জীবনের লক্ষ্যকে বড়ো করে সমগ্র করে স্পষ্ট করে দেখতে পাবাব আনন্দ যে কতখানি তা ঠিক-মতো তোমরা বুঝতে পারবে কিনা জানিনে। সে আনন্দের পরিমাণ পাবে আমার ত্যাগের পরিমাপে। আমার শিলাইদা, আমার সাহিত্যসাধনা, আমার সংসার সমস্তকেই বঞ্চিত করে আমি বেরিয়ে এসেছিলুম। আমার ঋণের বোঝা ছিল প্রকাণ্ড, কাজের অভিজ্ঞতা ছিল নাস্তি। তারপরে সুদীর্ঘ-কাল এই দুস্তর অধ্যবসায়ে একলা পাড়ি দিয়েছিলুম। কাউকে দোষ দিইনি, কারো উপর দায় চাপাইনি, কারো কাছে ভিক্ষে চাইনি। তারি মাঝখানে সংসারের নানান দুঃখ গেল। কিন্তু সেই সময়টাতেই মনের ভিতর মহলে যেন সব আলোই জ্বলে উঠেছিল। সেটা বুঝতে পারবে যদি ভেবে দেখো তখনকার বঙ্গদর্শনে কী লিখছি—তখনকার পার্টিশন

আন্দোলনে কী দোলা লাগিয়েছি,—মনের মধ্যে ভারতবর্ষের একটা নিত্যরূপ দেখা দিচ্ছে অথচ তার সঙ্গে মানুষের বিশ্ব-রূপের বিরোধ নেই,—পল্লীতে পল্লীতে নিজের চেষ্টায় স্বাতন্ত্র্যের কেন্দ্র স্থাপনের কল্পনা মনের মধ্যে খেপে বেড়াচ্ছে,—শিলাইদহে নিজেদের জমিদারির মধ্যে তার চেষ্টাও চলছে। আমার এই নানামুখী চেষ্টার মাঝখানে গভীর একটা তপস্যা ছিল—একেবারে ছিলুম সন্ন্যাসী, সত্যের অন্বেষণে এবং সত্যকে রূপ দেবার একান্ত সাধনায়। তখন বিপদ ছিল চারিদিকে এবং দারিদ্র্য ছিল ঘরের মধ্যে। সেদিনকার ঢেউ থামল কিন্তু আমার অন্তরের মধ্যে নিয়ত কর্ম চলছেই। মনকে টানছে মানুষের দিকে—বাইরের বড়ো রাস্তায়। ডাক-ঘর লিখেছিলুম সেই কথাটা বলতে। দইওয়ালার হাঁক বলো আর প্রহরীর ঘণ্টা বলো কিছুই তুচ্ছ নয়—তারা বিরাট বাহিরের বাণীতেই প্রকাশ পাচ্ছে—সেই বাহির আমাকে সেদিন বলছিল আমার মধ্যে তোমার স্থান। সেই সময়েই রোজ সকালে বিকেলে রাত্তিরে লিখছি গীতাঞ্জলির গান—শারদোৎসবে ছেলেদের সঙ্গে উৎসব জমিয়েছি, এখানকার শাল-বীথিকায় জ্যোৎস্না নিশীথে পরিপূর্ণ মন নিয়ে একলা একলা ঘুরেছি। সেদিন ছেলেরা নিশ্চয়ই আমার প্রাণোচ্ছ্বাসের অংশ পাচ্ছিল, অন্তত আমি তাদের কৈশোরের রসে অভিষিক্ত ছিলুম।

এখন শরীর ক্লিষ্ট ক্লান্ত, মনের অনেকগুলো আলো নিভে গেছে—আমার সেদিনকার পরিচয়টাকে এখানকার

প্রদোষান্ধকারে ভালো করে আর খুঁজে পাইনে। আমার সেদিনকার ধ্যানরূপের প্রতিবিম্ব আমার চারিদিকে কারো মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায় না। বুঝতে পারি কাছের লোকের মধ্যে আমার প্রাণের অনুপ্রাণন ঠিকমতো ঘটে ওঠেনি। আমার পিতৃদেব যেমন করে আপনার জীবনের দীক্ষাকে রেখে গেছেন আমি আমার অন্তরের ধ্যানটিকে তেমন করে রেখে যেতে পারব না। তার জায়গায় ব্যবস্থা আসবে, কর্মের চাকা চলবে। একটা কারণ, আমার মনঃপ্রকৃতির বিচিত্রতা, আমি সব দিকেই যাই, সব কথাই বলি, সব ছবিই আঁকি।

অথচ ক্ষণে ক্ষণে যখন দেখি বিদেশের লোক এ জায়গা-টার ভাবের ছবি দেখে গেছে, তাদের অনেক লেখাতেই সেটা পড়লুম—তখন মনের ভিতরে একটা কান্না আসে এই ছবিটিকে মুছতে দিয়ো না, এর দাম আছে, তোমার যা কিছু বড়ো, যা কিছু সজীব এখনো এর মধ্যে উৎসর্গ করো।

সেই যে সেদিন আমার জীবনের কেন্দ্রস্থল থেকে একটি উজ্জ্বল ধ্যান, নীহারিকার মাঝখানে নক্ষত্রের মতো, অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল তাকে আবার দেখতে পাই এখানে যখন একলা বসে থাকি, চারিদিকে আর কোনো কথা থাকে না কেবল থাকে আমার সেই অতীতকালের বাণী। তাকে হারাতে ভুলতে ঝাপসা হোতে দিতে ইচ্ছে করে না। জীবনের সত্যযুগ মাঝে মাঝে আসে, তখন নিজেকে সত্য করে পাই, তখনকার চিন্তা এবং কর্ম একটা ধ্যানকেন্দ্রকে ভাবকেন্দ্রকে আশ্রয়

ক'রে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। সেই সত্যযুগের সঙ্গে সঙ্গে আসে কর্মযুগ—কর্মযুগে নানা মানুষ নানা কথা তুচ্ছতায় মনের আকাশকে কেবল যে আবিল করে তা নয় উদ্যমকে ক্লান্ত করতে থাকে। আমাদের দেশের মন আধিভৌতিক, materialistic। সেই মনের ধ্যান সম্পদ নেই—আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে বড়ো খর্ব,বড়ো সংকীর্ণ, বড়ো কঠিন করে দেয়। যাদের ধ্যানরূপের দৃষ্টি নেই তাদের কাছে ধ্যানরূপের মূল্য নেই। চারিদিকের এই ঔদাসীন্য থেকে এই স্থূলহস্তাবলেপ থেকে নিজের মনে উৎসাহের নবীনতাকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হয়। বিশেষত শরীর যখন দুর্বল।

এইজন্যেই এখান থেকে নড়তে এত অনিচ্ছা হয়। সেদিনকার বিশুদ্ধ আনন্দের স্পর্শ চুপচাপ বসে এখনো পাই—আজ বুধবার ভোরে আমার সেইদিনকার আমি আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেল। আমার দৌর্বল্যের উপলক্ষ নিয়ে এ'কে আবার একপাশে সরিয়ে ফেলতে একটুও ইচ্ছে করে না। কেননা জীবনের সত্যকে যতই ম্লান করি ততই অবসাদে নৈরাশ্যে পেয়ে বসে। সত্য যখন সজাগ থাকে তখন কর্মের ফলাফল যাই হোক না কেন পরিতৃপ্তির অভাব ঘটে না। ইতি ৯ শ্রাবণ, ১৩৩৫।

১৯

দীর্ঘকাল না করেছি কোনো কাজের মতো কাজ, বা পড়ার মতো পড়া। সেইজন্যেই ভিতরে ভিতরে মনটা আত্ম-অসন্তোষের ভারে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে আছে। শূন্য দিনের মতো বোঝা জীবনে আর কিছুই নেই বিশেষত জীবনের মেয়াদ যখন খাটো হয়ে এসেছে। নিজেকে যতই ছোটো করে আনছি ততই তার ভার বড়ো করে বইতে হচ্ছে। প্রতি-দিনই মনে মনে নিজেকে লাঞ্ছনা করছি—মনে হচ্ছে অন্ধকারে হাৎড়ে হাৎড়ে নিজেকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনে—কোথায় সে কোন্ অকিঞ্চিৎকরতার মধ্যে তলিয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই। অনবধানতায় প্রত্যহ আমি আমার অধিকাংশ জিনিসই হারাই, কাগজ কলম ঘড়ি চষমা খাতা ইত্যাদি—নিজেকেও হঠাৎ হারিয়ে ব'সে আর তার টিকি দেখতে পাইনে। মরার চেয়ে এই হারানো আরো বেশি লোক-সানের। এই হারিয়ে যাওয়া ভূতে পাওয়া অকর্মণ্য দিন-গুলো থেকে এক দৌড়ে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছে। যে প্রদীপ সমস্ত রাত পরিষ্কার আলো দিয়েছে ভোরের বেলায় তার তৈল-দীন শিখা নিজের ধোঁয়াতে নিজেকে বন্দী করে কেন। ইতি ১৮ ভাদ্র, ১৩৩৫।

২০

কাল খুব ক্লান্ত হয়েই এসেছিলুম। আজ সকালে শরতের আকাশে আলোতে হাওয়াতে মিলে আমার শুশ্রূষায় লেগে গেছে। অন্য নার্সিংহোমের দোষ হচ্ছে সেটা যে রোগীরই আশ্রয় একথা তার সর্বাঙ্গে ছাপমারা, প্রকৃতির শুশ্রূষাগারে আয়ডোফর্মের গন্ধ নেই—জলে স্থলে আকাশে সবাই বলছে এটা নীরোগী নিকেতন। তাই মনও বলে ওঠে আমার কোনো বালাই নেই। আজ সকালে আমার ভাবখানা এই যে, কাজ করা চাই—কিন্তু কোনো ঝঞ্ঝাট পোহাতে পেরে উঠব না। কোনো কোনো ছেলেকে মাছের কাঁটা বেছে সাবধানে খাওয়াতে হয়, আমার অবস্থাটা সেইরকম—ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়ে আমাকে কাজ করাতে হবে। মাছটা খাওয়াই চাই কিন্তু কাঁটা আর কেউ বেছে দেবে—একেই খাঁটি গ্রাম্য বাংলায় বলে "আহ্লাদ।" কবিত্বটাকে নিয়ে ষোলোআনা মন ভরে না। পাহাড়টা আছে তার উপরে যদি রং বেরঙের মেঘের খেলা থাকে তাহলেই দৃশ্যটা বেশ ভরপুর হয়—শুধু মেঘ নিয়ে দৃশ্য জমে না। আমাকে কাজ করতেই হবে—অথচ ভীরুমনকে হাঙ্গামার ভয় থেকে বাঁচিয়ে চলা চাই। সংসার এত আবদার সইতে পারে না—কিন্তু সংসারের অনেক সেবা অনেক হাঙ্গামা পুইয়ে আমি করেছি—তাই শেষ দশায় এই প্রশ্রয়টুকু দাবি করতেও পারি। ইতি ২৬ ভাদ্র, ১৩৩৫।

২১

আকাশ ঘন মেঘে আজ আচ্ছন্ন, কিছুদিন থেকে বৃষ্টির অভাব ঘটাতে তরুণ ধানের খেত পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে—তারা বিদায়কালীন বর্ষার দানের জন্যে উৎসুক হয়ে আকাশে চেয়ে আছে। মেঘের কৃপণতা নেই কিন্তু বাতাস হয়েছে অন্তরায়। যেই বৃষ্টির আয়োজন প্রায় পূর্ণ হয়ে ওঠে অমনি কুমন্ত্রীর মতো প্রতিকূল হাওয়া কী যে কানে মন্ত্র দেয় উপরিওয়ালার সমস্ত পলিসি যায় বদ্‌লে। আকাশের পার্লামেণ্টে কয়েকদিন ধরে আশা নৈরাশের বিতর্ক চলছে—আজ বোধ হচ্ছে যেন বাজেট পাস হয়ে গেছে—বর্ষণ হোতে বাধা ঘটবে না। খুব ঝমাঝম যদি বৃষ্টি নামে তাহলে চমৎকার লাগবে।—এ বৎসরটা আমার কপালে বাদলের সম্ভোগটা মারা গেছে।—জোড়াসাঁকোর গলি জলে ভেসে গেছে কিন্তু মনের মধ্যে বর্ষার মৃদঙ্গ নাচের তাল লাগায়নি। এবারকার বর্ষায় গান হোলো না—এমন কার্পণ্য আমার বীণায় অনেকদিন ঘটেনি। ইতি ৩১ ভাদ্র, ১৩৩৫।

২২

মহারানী ভিক্টোরিয়া যখন কোনোমতেই মরবার লক্ষণ দেখাচ্ছিলেন না, তখন তাঁর ছেলের রাজ্যভোগের আশা যেমন অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল এবারকার শরতের সেই দশা। বর্ষা, শেষ পর্যন্ত তার আকাশের সিংহাসন আঁকড়ে রইল,—মাঝে মাঝে দু চার দিন ফাঁক পড়েছে—হোলির রাত্রে হিন্দুস্থানির দল ক্ষণকালের জন্য যেমন তাদের মাদোল পিটুনিতে ক্ষান্ত দেয়, তার পরেই আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কোলাহল শুরু করে। এমনি করতে করতে শরতের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল—হেমন্ত এসে হাজির। ধরাতলে শিউলি মালতী বর্ষার অভ্যর্থনার আয়োজন যথেষ্ট করেছে, কিন্তু আকাশতলে দেবতা পথ আট্‌কে ছিলেন। শীতের বাতাস শুরু হয়েছে, গায়ে গরম কাপড় চড়িয়েছি। ভালোই লাগছে--বিশেষত বেলা দশটার পর থেকে প্রান্তরের উপর যখন পৃথিবীর রোদ পোহাবার সময় আসে—নির্মল আকাশে একটা ছুটির ঘোষণা হোতে থাকে—পথ দিয়ে পথিকেরা চলে, মনে হয় যেন ছবি রচনায় সাহায্য করবার জন্যেই, তাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই

আমার এই চেয়ে দেখার বিবরণটা লিখি। পৃথিবী কিছুতেই আমার কাছে পুরানো হোলো না—ওর সঙ্গে আমার মোকাবিলা চলছে এইটেই আমার সব খবরের চেয়ে বড়ো খবর। ইতি ১৮ কার্তিক, ১৩৩৫

২৩

রথীরা পথ খোলা পেয়েছে। শুক্রবার সকালে কলকাতায় এসে পৌঁছবে। তারপরে কবে এখানে আসবে পরে জানতে পাব।

আমার এখনকার সর্বপ্রধান দৈনিক খবর হচ্ছে ছবি আঁকা। রেখার মায়াজাল আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। অকালে অপরিচিতার প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাড়া ছেড়ে চলে গেল। কোনোকালে যে কবিতা লিখতুম সে কথা ভুলে গেছি। এই ব্যাপারটা মনকে এত করে যে আকর্ষণ করছে তার প্রধান কারণ এর অভাবনীয়তা। কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবেও গোড়াতেই মাথায় আসে, তার পরে শিবের জটা থেকে গোমুখী বেয়ে যেমন গঙ্গা নামে তেমনি করে কাব্যের ঝরনা কলমের মুখে তট রচনা করে, ছন্দ প্রবাহিত হোতে থাকে। আমি যে সব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উলটো প্রণালী—রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তার পরে যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পৌঁছতে থাকে মাথায়। এই রূপসৃষ্টির বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে। আমি যদি পাকা আর্টিস্‌ট হতুম তাহলে গোড়াতেই সংকল্প করে ছবি আঁকতুম, মনের জিনিস বাইরে খাড়া হোত—তাতেও আনন্দ আছে। কিন্তু নিজের বহির্বর্তী

রচনায় মনকে যখন আবিষ্ট করে তখন তাতে আরো যেন বেশি নেশা। ফল হয়েছে এই যে, বাইরের আর সমস্ত দায়িত্ব দরজার বাইরে এসে উঁকি মেরে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। যদি সেকালের মতো কর্মদায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতুম, তাহলে পদ্মার তীরে বসে কালের সোনার তরীর জন্যে কেবলি ছবির ফসল ফলাতুম। এখন নানা দাবির ভিড় ঠেলে ঠুলে ওর জন্যে অল্পই একটু জায়গা করতে পারি। তাতে মন সন্তুষ্ট হয় না। ও চাচ্ছে আকাশের প্রায় সমস্তটাই, আমারো দিতে আগ্রহ, কিন্তু গ্রহদের চক্রান্তে নানা বাধা এসে জোটে —জগতের হিতসাধন তার মধ্যে সর্বপ্রধান। ইতি ২১ কার্তিক, ১৩৩৫।

২৪

এতদিনে আমাদের মাঠের হাওয়ার মধ্যে শীত এসে পৌঁছল। এখনো তার সব গাঁঠরি খোলা হয়নি। কিন্তু আকাশে তাঁবু পড়েছে। বাতাসে ঘাসগুলো, গাছের পাতাগুলো একটু একটু সির সির করতে আরম্ভ করল। তরুণ শীতের এই আমেজটায় কঠোরে কোমলে মিশোল আছে। সন্ধ্যাবেলায় বাইরে বসি কিন্তু ঘরের ভিতরকার নিভৃত আলোটি পিছন থেকে মৃদুস্বরে ডাক দিতে থাকে। প্রথমে গায়ের কাপড়টা একটু ভালো করে জড়িয়ে নিই, তার খানিকটা পরে মনটা উঠি উঠি করে, অবশেষে ঘরে ঢুকে কেদারাটায় আরাম করে বসে মনে হয় এটুকুর দরকার ছিল। এখন দুপুর বেলায় মেঘমুক্ত আকাশের রোদ্দুর সমস্ত মাঠে কেমন যেন তন্দ্রালসভাবে এলিয়ে রয়েছে; সামনে ঐ দুটো বেঁটে পরিপুষ্ট জামগাছ পূর্বউত্তরদিকে ঘাসের উপর এক এক পোঁচ ছায়া টেনে দিয়েছে। আজ ওখানে একটিও গোরু নেই, সমস্ত মাঠ শূন্য, সবুজ রঙের একটা প্রলেপ আছে কিন্তু তার প্রাচুর্য অনেক কম। ঐ আমাদের টগরবীথিকার গাছগুলি রোদ্দুরে ঝিলিমিলি এবং হাওয়ায় দোলাদুলি করছে। বাতাস এখনও তেতে উঠল না। নিঃশব্দতার ভিতরে ঐ রাঙা রাস্তায় গোরুর গাড়ির একটা আর্তস্বর মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে—

আর, কী জানি কোন্ সব পাখির অনির্দিষ্ট ক্ষীণ আওয়াজ যেন নীরবতার সাদা খাতায় সরু সরু রেখায় ছেলেমানুষি হিজিবিজি কাটছে। জানি না, কেন আমার মনে পড়ছে বহুকাল আগে সেই যে হাজারিবাগে গিয়েছিলুম; ডাকবাংলার সামনের মাঠে হাতাওয়ালা কেদারায় আমি অর্ধশয়ান, রৌদ্দুর পরিণত হয়ে উঠেছে, কাজকর্মের বেলা হোলো—মাঝে মাঝে অনতিদূরে ঘণ্টা বাজে। সেই ঘণ্টার ধ্বনি ভারি উদাস। আজ হাটের দিনে হাট করে পথিকরা রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে চলেছে, কারো বা মাথায় পুঁটুলি, কারো বা কাঁধে বাঁক। আর সেই ঘণ্টার ধ্বনি যেন আকাশে নীরবে বাজছে, মূলতানে বলছে বেলা যায়। ইতি ২৫ কার্তিক, ১৩৩৫।

২৫

রথীরা এসে পৌঁছেছে। বাড়ি ভরে উঠল, পুপু একটুখানি লম্বা হয়েছে; ভাবখানা আগেকার চেয়ে অল্প একটু গম্ভীর, কিন্তু তবু ওর বয়সের চেয়েও অনেকটা কমবয়সী। অসম্ভব রকমের বাঘের সম্বন্ধে ওর ঔৎসুক্য পূর্বের মতোই আছে। দাদামহাশয়ের লাঠি এবং পুপের চাবুকের ভয়ে বাঘ ব্যাকুল হয়ে লুকিয়ে আছে এ সম্বন্ধে ওর সন্দেহ নেই। আজকাল মাঝে মাঝে আপনি দাদামহাশয়ের কাছে এসে বসে, যা মুখে আসে একটা কোনো ভূমিকা করে কথা শুরু করে দেয়। বিষয়টা যতই অসংলগ্ন হোক ওর ভাষার দৌড়ের ব্যাঘাত করে না। ওর বড়ো বড়ো চঞ্চল কালো চোখ ওর কথার সঙ্গে সঙ্গে জ্বল্‌-জ্বল্‌ করতে থাকে, আমার যেন বুকের ভিতরটা ভরে ওঠে। দীর্ঘকাল আমার মন এই মাধুর্যটুকুর অপেক্ষায় ছিল। অথচ জিনিসটি খুব সহজ, হৃদয়ের মধ্যে এই শিশুর আবির্ভাব ভারি নির্মল, স্নিগ্ধ এবং অনির্বচনীয়, মনকে হরণ করে অথচ মুক্ত রাখে; নদীর প্রথম সূচনা যে ঝরনায় সেই ঝরনার মতো, সেইরকম নৃত্য, সেইরকম কলধ্বনি, সেইরকম শুভ্র চঞ্চল আলোর ঝলমলানি; গভীরতা নেই, কিন্তু প্রবলতা আছে, মগ্ন করে না, অভিষিক্ত করে, মর্ত্যের ভার ওতে যথেষ্ট নেই, তাতে করেই ও যেন আমারও জীবনের ভার মোচন করে। ইতি ২৭ কার্তিক, ১৩৩৫।

২৬

আমি আবার ঘর বদল করেছি। এই উদয়নের বাড়িতেই। বাড়িটার নাম উদয়ন, সে কথা জানিয়ে দেওয়া ভালো। উত্তরের দিকে দুটি ছোটো ঘর। এই রকম ছোটো ঘর আমি ভালবাসি, তার কারণ তোমাকে বলি। ঘরটাই যদি বড়ো হয় তবে বাহিরটা থেকে দূরে পড়া যায়। বস্তুত বড়ো ঘরেই মানুষকে বেশি আবদ্ধ করে। তার মধ্যেই তার মনটা আসন ছড়িয়ে বসে, বাহিরটা বড্ড বেশি বাইরে সরে দাঁড়ায়। এই ছোটো ঘরে ঠিক আমার বাসের পক্ষে যতটুকু দরকার তার বেশি কিছুই নেই। সেখানে খাট আছে টেবিল আছে চৌকি আছে; সেই আসবাবের সঙ্গে একখণ্ড আকাশকে জড়িত ক'রে রেখে আকাশের শখ ঘরেই মেটাতে চাইনে। আকাশকে পেতে চাই তার স্বস্থানে বাইরে; পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ-ভাবে। দেয়ালের ভিতরে যে আকাশকে বেঁধে রাখা হয় তাকে আমি ছেড়ে দেবামাত্রই সে আমার যথার্থ কাছে এসে দাঁড়ায়। একেবারেই আমার বসবার চৌকির অনতিদূরে, আমার জানলার গা ঘেঁষে। তার কাজ হচ্ছে মনকে ছুটি দেওয়া; সে যদি নিজে যথেষ্ট ছুটি না পায়, মনকে ছুটি দিতে পারে না। এইবার আমার ঘরে-আকাশে যথার্থ মিল হয়েছে—বেশ লাগছে। চেয়ে দেখি যতদূর দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই

আমার ডেস্কের মধ্যে চোখ ফিরিয়ে আনতে দেরি হয় না। জানলার কাছে বসে বসে প্রায়ই ভাবি, দূর ব'লে একটা পদার্থ আছে, সে বড়ো সুন্দর। বস্তুত সুন্দরের মধ্যে একটি দূরত্ব আছে, নিকট তার স্থূল হস্ত নিয়ে তাকে যেন নাগাল পায় না। সুন্দর আমাদের সমস্ত দিগন্ত ছাড়িয়ে যায়, তাই সে আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সংলগ্ন থাকলেও আমাদের প্রয়োজনের অতীত। আমাদের নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও এই দূর পদার্থকে যদি না রাখতে পারি তাহলে আমাদের ছুটি নেই, তাহলে সমস্ত অসুন্দর হয়ে পড়ে। যারা বিষয়কর্মে অত্যন্ত নিবিষ্ট, তাদের জীবনে নিকট আছে দূর নেই। কেননা স্বার্থ জিনিসটা মানুষের অত্যন্ত বেশি কাছের জিনিস, তার আসক্তি দেয়ালের মতো। আপন দেয়ালকে মানুষ ভালবাসে, কেননা, দেয়াল আমারই, আর কারো নয়। সেই ভালবাসা যখন একান্ত হয়ে ওঠে তখন মানুষ ভুলে যায় যে যা আমার অতীত তা কত আনন্দময় হোতে পারে, তার প্রতি ভালবাসার আর তুলনা হয় না।

কর্ম যখন বিষয়কর্ম না হয়, তখন সেই কর্ম মানুষকে দূরের স্বাদ দেয়, দূরের বাঁশি বাজায়। কবিতা লিখি, ছবি আঁকি, তার মধ্যে প্রয়োজনের অতীত দূরের আকাশ আছে বলেই এত ভালবাসি, তাতে এমন মগ্ন হোতে পারি। সেই সঙ্গে আজকাল আমার বিদ্যালয়ের কাজ যোগ দিয়েছে— এরকম কাজে মনের মুক্তি। এ কাজের ক্ষেত্র নিকটের ক্ষেত্র নয়। দেশ কালে বহুদূর বিস্তীর্ণ; অব্যবহিত নিজের কাছে

থেকে কতদূরে চলে গেছে তার ঠিকানা নেই; তাই এর জন্য ত্যাগ করা সহজ, এর জন্যে কাজ করতে ক্লান্তি নেই। সেই-জন্য আজকাল আমি আমার মধ্যে যেন বহুদূরকে দেখি, আমি এখন আমার কাছে থাকিনে। আমার চোখের সামনে যেমন এই আকাশ, আমার চিন্তার মধ্যে সেই আকাশ, আমার চেষ্টা উড়ে চলেছে সেই আকাশে। এই রকমের কাজে অনেকে জড়িত হয়ে থাকে ব্যক্তিগত ক্ষমতা পাবার জন্যে; এমন উদার কাজও তাদের পক্ষে বন্ধন, মুক্তির ক্ষেত্রেও তারা Interned। আমার কাজে আমি ক্ষমতা চাইনে, আমার নিজের দিকের কিছুই চাইনে, কাজের মধ্যে আমি বিরাট বাহিরকে চাই, দূরকে চাই—"আমি সুদূরের পিয়াসী।" বস্তুত বাহির থেকে দেখলে আজকাল আমার লেশমাত্র সময় নেই, কিন্তু ভিতর থেকে দেখলে প্রত্যেক মুহূর্তই আমার অবকাশ। নিজের দিকে কোনো ফল পাব একথা যখনি ভুলি তখনি দেখতে পাই কর্মের মতো ছুটি আর নেই। কর্মহীন শুধু ছুটিতে মুক্তি পাইনে, কেননা সে ছুটিও নিজেকে নিয়েই। ইতি ৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫।

২৭

অন্য কথা পরে হবে, গোড়াতেই বলে রাখি তুমি যে চা পাঠিয়েছিলে সেটা খুব ভালো। এতদিন যে লিখিনি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ববশত। যেমন আমার ছবি আঁকা তেমনি আমার চিঠি লেখা। একটা যা হয় কিছু মাথায় আসে সেটা লিখে ফেলি, প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ছোটো বড়ো যে সব খবর জেগে ওঠে তার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার ছবিও ঐরকম। যা হয় কোনো একটা রূপ মনের মধ্যে হঠাৎ দেখতে পাই, চারদিকের কোনো কিছুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা সংলগ্নতা থাক্ বা না থাক্। আমাদের ভিতরের দিকে সর্বদা একটা ভাঙা-গড়া চলা-ফেরা জোড়াতাড়া চলছেই; কিছু বা ভাব, কিছু বা ছবি নানারকম চেহারা ধরছে—তারই সঙ্গে আমার কলমের কারবার। এর আগে আমার মন আকাশে কান পেতে ছিল, বাতাস থেকে সুর আসত, কথা শুনতে পেত, আজকাল সে আছে চোখ মেলে রূপের রাজ্যে, রেখার ভিড়ের মধ্যে। গাছপালার দিকে তাকাই, তাদের অত্যন্ত দেখতে পাই—স্পষ্ট বুঝতে পারি জগৎটা আকারের মহাযাত্রা। আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকারের লীলা। আবেগ নয়, ভাব নয়, চিন্তা নয়, রূপের সমাবেশ। আশ্চর্য এই যে তাতে গভীর আনন্দ। ভারি নেশা। আজকাল রেখায়

আমাকে পেয়ে বসেছে। তার হাত ছাড়াতে পারছিনে। কেবলি তার পরিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে। তার রহস্যের অন্ত নেই। যে বিধাতা ছবি আঁকেন এতদিন পরে তাঁর মনের কথা জানতে পারছি। অসীম অব্যক্ত, রেখায় রেখায় আপন নতুন নতুন সীমা রচনা করছেন—আয়তনে সেই সীমা কিন্তু বৈচিত্র্যে সে অন্তহীন। আর কিছু নয়, সুনির্দিষ্টতাতেই যথার্থ সম্পূর্ণতা। অমিতা যখন সুমিতাকে পায় তখন সে চরিতার্থ হয়। ছবিতে যে আনন্দ, সে হচ্ছে সুপরিমিতির আনন্দ, রেখার সংযমে সুনির্দিষ্টকে সুস্পষ্ট করে দেখি—মন বলে ওঠে, নিশ্চিত দেখতে পেলুম—তা সে যাকেই দেখি না কেন, এক টুকরো পাথর, একটা গাধা, একটা কাঁটা গাছ, একজন বুড়ি, যাই হোক। নিশ্চিত দেখতে পাই যেখানেই, সেখানেই অসীমকে স্পর্শ করি, আনন্দিত হয়ে উঠি। তাই ব'লে একথা ভুললে চলবে না যে তোমার চা খুব ভালো লেগেছে। ইতি ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

২৮

কাঁল গাড়ি চলতে চলতে তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম। কিন্তু সে এমন একটা নাড়া-খাওয়া চিঠি, ভূমিকম্পে আগাগোড়া ফাটল-ধরা বাড়ির মতো। তার অক্ষরগুলো অশোকস্তম্ভের প্রাচীন অক্ষরের মতো আকার ধরেছে, পড়িয়ে নিতে গেলে রাখাল বাঁড়ুজ্জের শরণ নিতে হয়। এই জন্যে সেই চিঠিখানার প্রত্যক্ষরীকরণে প্রবৃত্ত হোতে হোলো। এইটুকু গেল আজকের তারিখের অন্তর্গত। নিচে বিগত কল্যকার বাণী :—

আজ তোমাদের বিবাহের সাম্বৎসরিক। এদিন তোমাদের জন্মদিনের চেয়ে বড়ো দিন। সম্মিলিত জীবনের সৃষ্টির প্রথম দিন। সকল সৃষ্টির মূলে একটা দ্বৈততত্ত্ব আছে। মানুষের সংসাররচনার গোড়ায় দুই জীবনের গ্রন্থিবন্ধন চাই। উপনিষদে আছে এক বললেন আমি বহু হব, তার থেকে বিশ্ব সৃষ্টি। মানুষের জীবনে বহু বললে আমি এক হব তার থেকে মানুষের সমাজ, দুই বললে আমি এক হব তার থেকে মানুষের সংসার। তাঁর পর থেকে সুখে দুঃখে ভালোয় মন্দয় বৈচিত্র্যের আর অন্ত নেই। আমি পূর্বে লিখেছি সৃষ্টির মূলে দ্বৈততত্ত্ব—কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ নয়—দ্বৈত এবং অদ্বৈতের সমন্বয়ই সৃষ্টি। তোমাদের মধ্যে এই দ্বৈত অদ্বৈতের সমন্বয়-

রহস্য সার্থক হোক এবং জীবনের বিকাশ বৈচিত্র্যে সম্পদশালী হয়ে উঠুক।

*　　*　　*　　*　　*　　*

খড়্গপুর থেকে বোম্বাই পর্যন্ত একলা গাড়িতে বসে যখন চলছিলুম তখন নানা দুঃখের ভাবনার ভিতর দিয়েও নিজের অন্তরের চলতি স্রোতের মানুষটাকে উপলব্ধি করেছি। সেই আমার বলাকার কবি। দীর্ঘকাল এক জায়গায় বসে বসে এর কথা ভুলে যাই, চারদিকে আবরণ জেগে ওঠে, নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপকে দেখতে পাইনে। চারিদিকে নানা লোকের নানা ইচ্ছার ভিড়ে ধুলো পড়ে, ধুলো জমে। ক্রমে তারই অবরোধের ভিতরকার সংকীর্ণ জগৎটা একান্ত হয়ে ওঠে, নিজের প্রকাশও সেই সঙ্গে সংকীর্ণ ও বিমিশ্র হয়। হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এসে এক মুহূর্তেই বুঝতে পারি বিশ্বে আমার স্থান আছে, প্রয়োজন আছে, অতএব মানবলোকে আমার জীবন সার্থক হয়েছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবনের দিকেও আমি যে বঞ্চিত হয়েছি তা নয়। আমার ব্যক্তিগত সত্তার প্রতি আমার নিজের শ্রদ্ধা নেই। যেখানে আমি বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত সেইখানেই আমার মূল্য। যেখানে আমি নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যে স্বতন্ত্র সেখানে আমি অকৃতার্থ— সেখানেও আমি যা কিছু দান পেয়েছি সে আমার প্রাপ্যের অতীত। সংসার থেকে বিদায় নেবার পূর্বে সেজন্যে আমার কৃতজ্ঞতা রেখে যাব।

এই কিছুক্ষণ আগে বোম্বাই পৌঁছিয়ে অম্বালালের

আতিথ্যভোগ করছি। তিনি আমাদের হোটেলে রেখেছেন। সঙ্গীরা শহরের মধ্যে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতা থেকে কোনো খবর পাইনি। সুধাকান্ত আসবে কিনা জানি না। দৈবক্রমে তারই হাতে আমার সমস্ত বাক্সের চাবি। হোটেলে এসেই নতুন চাবি সংগ্রহের কাজে লেগেছি। তত-ক্ষণকার মতো ভদ্রতা বাঁচিয়ে চলবার সরঞ্জাম কিছু কিছু আছে।

জাহাজ এখনো আসেনি। আগামী কাল বেলা একটার সময় আসবে—চারটের আগে ছাড়বে না। অন্য সব ভাবনা ছেড়ে যে দিকে চলেছি সেই দিকের ভাবনা এখন থেকে ভাবতে আরম্ভ করব। ইতি ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯।

২৯

মানুষ মাকড়ষারই মতো। সে নিজের অন্তর থেকেই হাজার হাজার সূক্ষ্ম সূত্র বের করে জাল বাঁধে, নিজের অব্যবহিত পরিবেশের সঙ্গে নিজের বিশেষ সম্বন্ধ ধ্রুব করতে চেষ্টা করে। যখন সেই বাসা বাঁধে, গ্রন্থি এমন পাকা করে আঁটতে থাকে যে ভুলে যায় যে বারে বারে এগুলো ছিন্ন করতে হবে। এই জন্যেই যখন দূরে যাত্রা করবার সময় আসে তখন খোঁটা ওপড়ানো ও রসি টেনে ছেঁড়া এত কঠিন হয়ে ওঠে। মানুষ যখন বাড়ি তৈরি করে তখন নিজেকে মনে মনে আপন সুদূর ভাবি কালে বিস্তার করে দেয়—যে কালের মধ্যে তার নিজের স্থান নেই। তাই পয়লা নম্বরের ইট ও সেরা মার্কার দামী সিমেণ্ট ফরমাশ করে— তার নিজের ইচ্ছের কঠিন স্তূপটাকে উত্তর কালের হাতে দিয়ে যায়, সেই কাল সেটার গ্রন্থি শিথিল করতে লেগে যায় নয় তো নিজের চলতি ইচ্ছের সঙ্গে সেই স্থাবর ইচ্ছেটার মিল করবার জন্য নানা-প্রকার কসরৎ করতে থাকে। বস্তুত মানুষের বাস করা উচিত সেই তাঁবুতে যে তাঁবুর পত্তন মাটিকে প্রাণপণে আকড়ে ধরে না এবং পাথরের দেয়াল উঁচিয়ে মুক্ত আকাশকে মুষ্টিঘাত করতে থাকে না। আমাদের দেহটাই যে আলগা বাসা, আমাদের যাযাবর আত্মার উপযোগী, ত্যাগ করবার সময় এলে সেটাকে কাঁধে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় না। এই জন্যেই আমি তোমাকে অনেকবার পরামর্শ দিয়েছি ইটকাঠের বাঁধন

দিয়ে অচল ডাঙার উপর বাড়ি তৈরি কোরো না—স্রোতের উপর সচল বাসার ব্যবস্থা করো—যখন স্থির থাকতে চাও একটা নোঙর নামিয়ে দিলেই চলবে—আবার যখন চলতে চাও তখন নোঙরটাকে টেনে তোলা খুব বেশি কঠিন হবে না। আমাদের কালস্রোতে ভাসা জীবনেব সঙ্গে বাসাগুলোব সামঞ্জস্য থাকে না ব'লেই টানা ছেঁড়ায় পদে পদে দুঃখ পেতে হয়। আমাদের বাসাগুলোর মধ্যে দুটো তত্ত্বই থাকা চাই স্থাবর এবং জঙ্গম। থাকবাব বেলা থাকতে হবে ফেলবার বেলা ফেলতে হবে—আত্মার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধের মতো। এ সম্বন্ধ সুন্দর কারণ এটা ধ্রুব নয়। সেইজন্য নিয়তই দেহের সঙ্গে দেহীর বোঝাপড়া করতে হয়। সাধনার অন্ত নেই; এর বেদনা আর আনন্দ সমস্তই অধ্রুবতার স্রোত থেকেই আবর্তিত,—এর সৌন্দর্যও সকরুণ, তাব উপরে মৃত্যুর ছায়া। কালের এবং ভাবেব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এর পরিবর্তন।

সংসারে আমাদের সব বাসাই এমনি হওয়াই ভালো। আমার ধ্যান যে রূপকে আশ্রয় করেছে পরের হাতে নিজেকে বেচবার জন্য সে যেন সেজেগুজে লোভনীয় হয়ে না বসে থাকে। নিজেকে সম্পূর্ণ করে তার পরে অন্যকালের অন্য লোকের তপস্যাকে ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিয়ে যেন একেবারেই সরে দাঁড়ায়। নইলে কালের পথ রোধ করতে চেষ্টা করলে তার দুর্গতি ঘটতে বাধ্য। টাকার জোরে আমরা আমাদের ধ্যানের রূপটাকে বেঁধে দিয়ে যেতে ইচ্ছে করি।

তার মধ্যে অন্য পাঁচজনের ধ্যান যখন প্রবেশ করতে চেষ্টা করে তখন সেটা বেখাপ হোতেই হবে। আমার উচিত ছিল বিশ্ব-ভারতীর সম্পূর্ণতা সাধনের জন্যে বিশ্বভারতীর শেষ টাকা ফুঁকে দিয়ে চলে যাওয়া। তার পরে নতুন কাল নিজের সম্বল ও সাধনা নিয়ে নিজের ধ্যানমন্দির পাকা করুক। আমার সঙ্গে মেলে তো ভালো যদি না মেলে তো সেও ভালো। কিন্তু এটা যেন ধার করা জিনিস না হয়। প্রাণের জিনিসে ধার চলে না—অর্থাৎ তাতে প্রাণবান কাজ হয় না—আমগাছ নিয়ে তক্তপোষ করা চলে কিন্তু কাঁঠালব্যবসায়ী তা নিয়ে কাঁঠাল ফলাতে চেষ্টা যেন না করে। এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে মা গৃধঃ।

আমি যে কথাটা বলতে বসেছিলুম সেটা এ নয়। তোমরা তাঁবুতে থাকবে কিংবা নৌকোতে থাকবে সে পরামর্শ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার হাল খবরটা হচ্ছে এই যে কাল যখন জাহাজে চড়েছিলুম তখন মনটা তার নতুন দেহ না পেয়ে থেকে থেকে ডাঙা আঁকড়ে ধরছিল—কিন্তু তার দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটেছে। তবুও নতুন দেহ সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে কিছুদিন লাগে। কিন্তু খুব সম্ভব কাল থেকেই লেকচার লিখতে বসতে পারব। সেটাকে বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ নতুন ঘরকন্না পাতানো। যে পার ছেড়ে এলুম সে পারের সঙ্গে এর দাবিদাওয়ার সম্পর্ক নেই। এর ভাষাও স্বতন্ত্র। বাজে কথা গেল। এবার সংবাদ শুনতে চাও। আজ সাতটা পর্যন্ত অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলুম। ক্লান্তি যেন

অজগর সাপের মতো আমার বুক পিঠ জড়িয়ে ধরে চাপ দিচ্ছিল। তার পর থেকে নিজেকে বেশ ভদ্রলোকেরই মতো বোধ হচ্ছে। যুগল ক্যাবিনের অধীশ্বর হয়ে খুশি আছি। পূর্ব ক্যাবিনে দিন কাটে পশ্চিম ক্যাবিনে রাত্রি অর্থাৎ আমার আকাশের মিতার পন্থা অবলম্বন করেছি—পূর্বদিগন্তে ওঠা পশ্চিমদিগন্তে পড়া। আমার সহচরত্রয় ভালোই আছে—ত্রিবেণী-সংগমের মতো—উত্তর প্রত্যুত্তর হাস্য প্রতিহাস্যের কলধ্বনি তুলে তাদের দিন বয়ে চলেছে। আমি আছি ঘরে, তারা আছে বাইরে। অপূর্ব মনে করেছে এখানে আমার যা কিছু সুযোগ সুবিধা সমস্তই তার নিজের ব্যবস্থার গুণে। আমি তার প্রতিবাদ করিনে—প্রতিবাদের অভ্যাসটা খারাপ—স্থানবিশেষে সংসারে ছোটো ছোটো অসত্যকে যারা মেনে নিতে পারে না তারা অশান্তি ঘটায়। এইজন্যেই ভগবান মনু বলেছেন—সে কথা যাক। ইতি ২ মার্চ, ১৯২৯।

৫০

জাহাজ জিনিসটাই আগাগোড়া চলে, কিন্তু আর সব চলাকেই সে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। এই বাসাটুকুর বেড়ার মধ্যে সময়ের গতি অত্যন্ত মন্দবেগে। সময়ের এই মন্দাক্রান্তা ছন্দে যে সব ঘটনা অত্যন্ত প্রধান হয়ে প্রকাশ পায় অন্যত্র ছন্দের বেগে সেগুলো চোখেই পড়তে চায় না। এই মুহূর্তেই ডাঙার মানুষ যে সব খেলা খেলছে তা প্রচণ্ড খেলা —জীবন মরণ নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি। জাহাজের ছাদে দুই পক্ষের খেলোয়াড় বিড়ে নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। তাতেই উৎসাহ উত্তেজনার অন্ত নেই। এই সব দেখলে একথা স্পষ্ট করেই বোঝা যায় যে স্থানান্তরকে লোকান্তর বলে না। বিশেষ বিশেষ বেড়া বেঁধে সময়ের গতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে আমাদের জগতের বিশেষত্ব ঘটাই। তার মানেই হচ্ছে ছন্দ বদল হোলেই রূপের বদল হয়। আমি এবং আমার প্রতিবেশী ইংরেজ এক জায়গায় বাস করি কিন্তু এক জগতে নয়। তার মানে তার জীবনে কালের ছন্দ আমার থেকে স্বতন্ত্র। সেই জন্যেই তার খেলার সঙ্গে আমার খেলার তাল মেলে না। আমি ঠেলাগাড়িতে চলছি, সে মোটরে চলছে—আমাদের উভয়ের সময়ের পরিমাণ এক, লয় আলাদা। বস্তুত এক হোলেও ঝাঁপতালে এবং ঢিমেতেতালায় তার মূল্য সম্পূর্ণ বদলে দেয়। মানুষে মানুষে সুরের ঐক্য থাকতেও পারে; সব চেয়ে বড়ো অনৈক্য তালের। তালের দ্বারা জীবনের ঘটনা-

গুলোকে ভাগ করে, সাজায়, বিশেষ বিশেষ জায়গায় ঝোঁক দেয়। একেই বলে সৃষ্টি। জগৎ জুড়ে এই ব্যাপার চলছে। মহাকালের মৃদঙ্গ এক এক তাণ্ডব ক্ষেত্রে এক এক তালে বাজছে, সেই নৃত্যের রূপেই রূপের অসংখ্য বৈচিত্র্য। আমার জীবনের নটরাজ আমার মধ্যে যে নাচ তুলেছেন, সে আর কোথাও নেই—কোনো জীবনচরিতের পটে এর সম্পূর্ণ ছবি উঠবে কী করে। কোনো কালেই উঠবে না। আমাদের আর্টিস্ট যা গড়েন তার নব নব সংস্করণ ঘটতে দেন না, সাজানো টাইপ ভেঙে ফেলেন—অতএব রবীন্দ্রনাথ নিরবধিকালের চয়নিকায় একবার ধরা দেয়, তার পর তাকে ফেলে দেওয়া হয়—অনন্তকালে আর রবীন্দ্রনাথ নেই। হয়তো পরকালে আর একটা ধারা চলতে পারে,কিন্তু তার এ নাম নয়, এ রূপ নয়, এ পরিবেশ নয়, এ সমাবেশ নয় ; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পালা এইখানেই চিরকালের মতো চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। আর যাই হোক বিশ্বসভায় কারো মেমোরিয়াল মিটিং হয় না। হয় কেবল আগমনী এবং বিসর্জন। আজ রাত্রে পিনাঙ। ইতি ৭ই মার্চ, ১৯২৯।

৩১

চলেছি। নতুন নতুন মেয়ে পুরুষের সঙ্গে আলাপ চলেছে। আলাপ জমতে না জমতে আবার ঘাটে ঘাটে মানুষ বদল হচ্ছে। অর্থাৎ দিনের পর দিন যাদের নিয়ে সময় কাটছে তারা যেন এমন জীব যাদের ভিতরটা নেই কেবল উপরটা আছে—যা ধাঁ করে চোখে পড়ে, মনের উপর ছায়া ফেলে সেইটুকু মাত্র। কেদারার পিঠে তাদের নামের ফলক ঝুলছে, আর তারা কেদারার উপর পা ছড়িয়ে বসে আছে,—তারা আর কোথাও নেই কেবল ঐটুকুর উপরে। আমার সঙ্গে কেবল তিনজনমাত্র মানুষ আছে যারা জায়গা ওদের চেয়ে বেশি জোড়ে না, কিন্তু যারা অনেকখানি,—যাদের সত্যতা, দৃশ্য অদৃশ্য বহু সাক্ষ্যের দ্বারা আমার মনের মধ্যে চারদিক থেকে প্রমাণীকৃত—এই জন্যে যাদের কাছ থেকে অনেকখানি পাই এবং যারা সরে গেলে অনেকখানি হারাই। যারা তাসের উপরকার ছবির মতো একতলবর্তী নয় যাদের মধ্যে পূর্ণায়তন জগতের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ণায়তন জগতেই বাস্তবতার স্বাদ পাওয়া আমাদের অভ্যাস, তার চেয়ে কম পড়লে দুধের বদলে এক বাটি ফেনা খাবার চেষ্টা করার মতো হয়। যতটা চুমুক দিলে আমরা জানার পুরো স্বাদ পাই এই জাহাজভরা যাত্রীদের মধ্যে তা পাবার জো নেই। —এই কারণে আমাদের পেট ভরে জানার অভ্যাস পীড়িত হচ্ছে। কিছুদিনের উপবাসে ক্ষতি হয় না কিন্তু বেশিদিন এমন অত্যল্প জানার খোরাকে চলে না। আত্মীয়ের মধ্যে

আমাদের জানার ভরপুর খোরাক মেলে ব'লেই তাতে আমরা এত আরাম পাই। কেন এই কথাটা এমন জোরে মনে এল সেই কথাটা খুলে বলি। আজ বিকেলে সিঙ্গাপুরের ঘাটে জাহাজ থামতেই সরযূ জাহাজে এসে উপস্থিত। আমি তাঁকে গতবারে অল্প কয়দিনমাত্র দেখেছিলুম, সুতরাং তাঁকে সুপরিচিত বললে বেশি বলা হবে। কিন্তু তাঁকে দেখে মন খুশি হোলো এইজন্যে যে তিনি বাঙালি মেয়ে অর্থাৎ এক মুহূর্তে অনেকখানি জানা গেল—তাঁর সরযূ নাম বিয়াট্রীস বা এলিয়োনোরের মতো পরিচয়সূচক নয়, আমার পক্ষে তাতে তার চেয়ে অনেক বেশি পদার্থ আছে। তার পরে তাঁর শাড়ী, তাঁর বালা, তাঁর কপালের মাঝখানের কুঙ্কুমের বিন্দু, কেবলমাত্র দৃশ্যগত নয়, তার পিছনে অনেকখানি অদৃশ্য সামগ্রী আছে এক নিমিষেই সেই সমস্ত এসে চোখ এবং মনকে ভরে ফেলে। ভালো করে ভেবে দেখো এই সমস্ত চিহ্ন, বচনীয় এবং অনির্বচনীয় কত বিচিত্র পদার্থকে সংক্ষেপে একই কালে বহন করে, তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে গেলে আঠারো পর্ব বই ভর্তি হয়ে যায়। এ জাহাজে অনেক মেয়ে আছে তাদের মধ্যে এই বাঙালি মেয়েকে দেখে মন এত খুশি হোলো —তার কারণ আর কিছু নয়,জানতেই মনের আনন্দ, মন যখন ব'লে জানলুম তখন সে খুশি হয়, আমরা যাকে বলি মন-কেমন করা তার মানে হচ্ছে চারিদিকের জানা পদার্থটা যথেষ্ট পূর্ণায়তন নয়। ইতি ১০ মার্চ, ১৯২৯।

৩২

সেদিন হঠাৎ এক সময়ে জানিনে কেন ছেলেবেলাকার একটা ছবি খুব পষ্ট করে আমার মনে জেগে উঠল। শীতকালের সকাল বোধ হয় সাড়ে পাঁচটা। অল্প অল্প অন্ধকার আছে। চির অভ্যাসমতো ভোরে উঠে বাইরে এসেছি। গায়ে খুব অল্প কাপড়, কেবল একখানা সুতোর জামা এবং ইজের। এই রকম খুব গরীবের মতোই আমাদের বাল্যকাল কেটেছে। ভিতরে ভিতরে শীত করছিল—তাই একটা কোণের ঘর, যাকে আমরা তোষাখানা বলতুম, যেখানে চাকররা থাকত—সেইখানে গেলুম। আধা অন্ধকারে জ্যোতিদার চাকর চিন্তে লোহার আঙটায় কাঠের কয়লা জ্বালিয়ে তার উপরে ঝাঁঝরি রেখে জ্যোদার জন্যে রুটি তোস করছে। সেই রুটির উপর মাখন গলার লোভনীয় গন্ধে ঘর ভরা। তার সঙ্গে ছিল চিন্তের গুন গুন রবে মধুকানের গান, আর সেই কাঠের আগুন থেকে বড়ো আরামের অল্প একটুখানি তাত। আমার বয়স বোধ হয় তখন নয় হবে। ছিলুম স্রোতের শেওলার মতো—সংসার প্রবাহের উপরতলে হালকাভাবে ভেসে বেড়াতুম—কোথাও শিকড় পৌঁছয়নি—যেন কারো ছিলুম না, সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত চাকরদের হাতেই থাকতে হোত, কারো কাছে কিছুমাত্র আদর পাবার আশা ছিল না। জ্যোদা তখন বিবাহিত, তাঁর জন্যে ভাববার লোক ছিল, তাঁর জন্যে ভোরবেলা থেকেই রুটি তোস আরম্ভ। আমি ছিলুম সংসার-

পদ্মার বালুচরের দিকে, অনাদরের কূলে —সেখানে ফুল ছিল না, ফল ছিল না, ফসল ছিল না—কেবল একলা বসে ভাববার মতো আকাশ ছিল। আর জ্যোদা পদ্মার যে কূলে ছিলেন, সেই কূল ছিল শ্যামল—সেখানকার দূর থেকে কিছু গন্ধ আসত, কিছু গান আসত, সচল জীবনের ছবি একটু আধটু চোখে পড়ত। বুঝতে পারতুম ঐখানেই জীবনযাত্রা সত্য। কিন্তু পার হয়ে যাবার খেয়া ছিল না—তাই শূন্যতার মাঝখানে বসে কেবলি চেয়ে থাকতুম আকাশের দিকে। ছেলেবেলায় বাস্তব জগৎ থেকে দূরে ছিলুম ব'লেই তখন থেকে চিরদিন "আমি সুদূরের পিয়াসী"। অকারণে ঐ ছবিটা অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে মনে জেগে উঠল। তার পরে ভেবে দেখলুম, সেদিন আমিই ছিলুম ছায়ার মতো, আমার সংসারে বস্তু ছিল না, ঘরে ছিল না আত্মীয়তা, বাইরে ছিল না বন্ধুত্ব। জ্যোতিদাদা ছিলেন নিবিড়ভাবে সত্য, তাঁর সংসার ছিল নিবিড়ভাবে তাঁর নিজের। সেদিন মনে করা অসম্ভব ছিল এই যেটুকু দেখছি যা ঘটছে এর কিছু ব্যত্যয় হোতে পারে। পূর্ণতার চেহারা দেখা যেত কিছুতেই ভাবা যেতে পারত না তার কোনো কালে অন্ত আছে। সেদিনকার সেই রুটিতোস-সুগন্ধি সকালবেলা• যে পূর্ণজীবনের রূপক ছিল সেদিন আমার সমস্ত জীবনে তার সমতুল্য কিছুই ছিল না। কিন্তু কোথায় সেই সকাল, সেই গুন গুন গান-করা চিন্তে চাকর —আর জ্যোদা, তাঁর যা কিছু সমস্ত নিয়ে কোথায়। আজ সেই শীতের সকালের অনাদৃত রবি জাহাজে চড়ে চলছে

বৃহৎ জগতে। সেদিনের সব চেয়ে যা সত্য তার কোনো চিহ্ন নেই, আর সব চেয়ে যা ছায়া তা আজ অদ্ভুত রকমে প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। আবার মনে হচ্ছে আজকের দিনের সমস্ত কিছু যেন এই ভাবেই বরাবর চলবে, পরিবর্তনের কথা মনে করা যায় কিন্তু মস্ত ফাঁকগুলোর কথা কল্পনায় আনতে পারিনে; তবু চলতে চলতে এমন একটা বিশেষ দিন আসে রাত্রি আসে যখন একটানা রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ মস্ত একটা গহ্বর দেখা দেয়, মনে করা যায় না এমন ফাঁক জীবনে সইবে কী করে, তার পরে তার উপর দিয়েও সময়ের রথ অনায়াসে পার হয়ে যায়, তার পরে সেই রথের চিহ্নটাও যায় মুছে। অত্যন্ত পুরোনো কথা কিন্তু অত্যন্ত অদ্ভুত কথা, —একটা ধারা চলেইছে, যেটা চিরকালই আছে অথচ পদে পদেই নেই—'সমস্ত' ব'লে মস্ত একটা কিছু আছে অথচ তার প্রত্যেক অংশটাই থাকছে না—একদিকে সে মায়া তবু আর একদিকে সে সত্য। ইতি ১৪ মার্চ, ১৯২৯।

৩৩

কাল জাপানি বন্দরে এসেছি—নাম মোজি। আগামী কাল পৌঁছব কোবে। পাখি বাসা বাঁধে খড়কুটো দিয়ে, সে বাসা ফেলে যেতে তাদের দেরি হয় না—আমরা বাসা বাঁধি প্রধানত মনের জিনিস দিয়ে কাজে কর্মে, লেখা পড়ায়, ভাবনা চিন্তায় চারদিকে একটা অদৃশ্য আশ্রয় তৈরি হোতে থাকে। হাওয়াগাড়ির গদি যেমন শরীরের মাপে টোল খেয়ে খোঁদলগুলি গড়ে তোলে,—মন তেমনি নড়তে চড়তে তার হাওয়া-আসনে নানা আকারের খোঁদল তৈরি করে, তার মধ্যে যখন সে বসে তখন সে বসে যায়—তারপরে যখন সেটাকে ছাড়তে হয় তখন আর ভালো লাগে না। এ জাহাজে আমার তেমনি ঘটেছে। এই ক্যাবিনে এক পাশে একটি লেখবার ডেস্ক, আর এক পাশে বিছানা, তাছাড়া আয়নাওয়ালা দেরাজ আর কাপড় ঝোলাবার আলমারি, এর সংলগ্ন একটি নাবার ঘর এবং সেটা পেরিয়ে গিয়ে আর একটা ক্যাবিন, সেখানে আমার বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতি। এরই মধ্যে মন নিজের আসবাব গুছিয়ে নিয়েছে। অল্প জায়গা ব'লেই আশ্রয়টি বেশ নিবিড়, প্রয়োজনের জিনিস সমস্ত হাতের কাছে। এখান থেকে নেমে দুদিনের জন্য সাংহাইয়ে সু-র বাড়িতে ছিলুম, ভালো লাগেনি, অত্যন্ত ক্লান্ত করেছিল, তার প্রধান কারণ নূতন

জায়গায় মন তার গায়ের মাপ পায়নি, চারদিকে এখানে ঠেকে ওখানে ঠেকে আর তাব উপরে দিনরাত আদর অভ্যর্থনা গোলমাল।

প্রতিদিনের ভাবনা কল্পনার মধ্যেই নতুনত্ব আছে, বাইরের নতুনত্ব তাকে বাধা দিতে থাকে। জীবনে আমরা যে কোনো পদার্থকে গভীর করে পেয়েছি অর্থাৎ অনেকদিন অনেক করে জেনেছি সত্যিকার নতুন তারি মধ্যে,—তাকে ছেড়ে নতুনকে খুঁজতে হয় না। অন্য সব মূল্যবান জিনিসেরই মতো নতুনকে সাধনা করে লাভ করতে হয়। অর্থাৎ পুরোনো করে তবে তাকে পাওয়া যায়। হঠাৎ যাকে পেয়েছি ব'লে মনে হয়, সে ফাঁকি, দুদিন বাদেই তার যথার্থ জীর্ণতা ধরা পড়ে। আজকের দিনে এই সস্তা নতুনত্বের মৃগয়ায় মানুষ মেতেছে, সেইজন্যেই মুহূর্তে মুহূর্তে তার বদল চাই। তার এই বদলের নেশায় বিজ্ঞান তার সহায়তা করছে, সে সময় পাচ্ছে না গভীরের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে চিরনূতনের পরিচয় পেতে। এই জন্যেই চারিদিকে একটা পুঁথিপড়া ইতরতা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। ধ্রুবসত্যকে সত্যরূপে পাবার সময় নেই, সময় নেই। সাহিত্যে যে অশ্লীলতা দেখা দিয়েছে তার কারণ এই; অশ্লীলতা অতি সহজেই প্রবলবেগে মনকে আঘাত করে, যাদের সময় নেই ও শক্তি কম তাদের পক্ষে অতি দ্রুতবেগে আমোদ পাবার এই অতি সস্তা উপায়। তীব্র উত্তেজনা চাই সেই মনেরই পক্ষে যে মন নির্জীব, যে মনের জীবনীশক্তি কমে গেছে অগভীর মাটিতে—তার শিকড়গুলি উপবাসী। ইতি ৯ই চৈত্র, ১৩৩৫।

আশ্চর্য হবে যখন এই চিঠি লিখছিলুম অত্যন্ত ঘুম পাচ্ছিল সেই ঘোর ঠেলতে ঠেলতে লেখা এগোচ্ছিল। এখনো ঘোর ছাড়েনি। অথচ এখন সকালবেলা, এগারোটা বেজেছে— যাই স্নান করতে।

———

৩৪

কাল রাত্তিরে টোকিয়োতে এসে এক বিখ্যাত হোটেলে আশ্রয় নিয়েছি। বিখ্যাত হোটেলগুলি যে অর্থসম্বল কিংবা আরামের পক্ষে উপযোগী তা নয়, কিন্তু যেহেতু দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও বিখ্যাত সেই জন্যে আমাকে আমার বিখ্যাত সমান মাপের উপদ্রব সহ্য করতে হয়। ছোটো জায়গায় লুকোনো সহজ, কিন্তু জগতে আমার লুকোবার পথ বন্ধ। একদিন জনতার হাত থেকে আত্মরক্ষা আমার অত্যাবশ্যক হবে একথা একদা কল্পনা করতেও পারতুম না, সেই যেদিন ছিলুম আমার পদ্মার চরে বোটের মধ্যে একাকী। তাই লোক ঠেকিয়ে রাখবার অভ্যাস আমার হয়নি, যে খুশি এসে আমাকে টানা-হেঁচড়া করতে পারে। আজ সকালে যখন ক্লান্ত হয়ে বসেছিলুম একজন আমাকে নানা কথায় ভুলিয়ে মোটর চড়িয়ে গলির মধ্যে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। শেষকালে দেখি তাদের সঙ্গে ফটোগ্রাফ তুলিয়ে নেবার জন্য এই উৎপাত।

আমরা প্রথম জন্মেছিলুম সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে, আপন ঘরে, আপন মানুষের আদর যত্নের পরিবেষ্টনে। তখন ছিলুম সম্পূর্ণ বেসরকারী। তখন আড়াল ব'লে একটা অত্যন্ত আপন জিনিস ছিল। ক্রমে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সংসারের সম্পর্ক বাড়তে লাগল। কিন্তু যতই বাড়ুক তার একটা সহজ পরিমাণ ছিল। তাই বেসরকারী

আমি এবং সরকারী আমির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ছিল। অবশেষে দৈবদুর্যোগে অসাধারণ ব'লে খ্যাতি বাড়তে লাগল, আমি যতটা বেসরকারী তার চেয়ে অনেক বেশি সরকারী হয়ে উঠলুম—যে আড়ালটুকুর অধিকার আমার ছিল তাতে এখন আর কুলোয় না। অত্যন্ত পাকা ফলের মতো আমার উপরকার শক্ত খোসাটুকু সাতখানা হয়ে ফেটে গেছে, এখন যে-কোনো আগন্তুক পাখি যে মৎলবেই হোক এসে ঠোকর দিতে পারে কোনো বাধা নেই। ক্ষতি ছিল না যদি এতে তাদের সত্যিকার উপকার হোত। আমার উপর দিয়ে তারা নিজেদের লোভ মিটিয়ে নিতে চায়, নিক—কিন্তু এতে আমার যে গুরুতর ক্ষতি হয় ভেবে দেখতে গেলে সে ক্ষতি তাদেরও। ছোটো ছোটো দাবির আঘাতে চিত্ত বিপর্যস্ত হয়, নিজের যথেষ্ট কাজ করবার শক্তির অপব্যয় হোতে থাকে। তা ছাড়া যখন বুঝতে পারি আমি অন্যের স্বার্থের বাহন হয়ে পড়েছি এবং সে স্বার্থও তুচ্ছ তখন বড়ো ধিক্কার লাগে, বড়ো ইচ্ছে করে আপনার সেই সাবেক খ্যাতিহীন ছোটো বাসার মধ্যে ফিরে যাই, এবং যারা কেবলমাত্র আমার অস্তিত্বের মূল্য দিতে প্রস্তুত আছে তাদের কাছেই আশ্রয় নিই। অথচ মাঝে মাঝে এমন লোকের সঙ্গে দেখা হয়, যারা আমার অপরিচিত, অথচ যারা দূরের থেকে আমাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছে। তারা আমার কাছে কিছুই চায় না—তারা খ্যাতির দ্বারা আমাকে বিচার করে না। তারা নিজের আনন্দের দ্বারা আমাকে স্বীকার করে। এর চেয়ে সৌভাগ্য

আর কিছু হোতে পারে না। এবারে কোবে শহরে যখন আমার স্বদেশীয়দের অবাস্তব সস্তা সম্মাননার দ্বারা পীড়িত হচ্ছিলুম তখন ওখানকার ইংরেজ কন্সালের স্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে অনেক দুঃখ দূর হোলো। অনুভব করলুম কোনো কোনো লোকের পক্ষে আমাব কর্ম গভীরভাবে সফল হয়েছে—তাঁরা আমার অগোচরেই আমার কাছ থেকে যা পেয়েছেন তার চেয়ে আর কিছু চান না।

আজ টোকিয়োতে আমার তিনটে নিমন্ত্রণ আছে—বেলা একটা থেকে রাত্রে ডিনার পর্যন্ত গড়াবে। তার পর মোটর করে য়োকোহামায় যাব—তার পরে কাল ভারতীয়দের নিমন্ত্রণে মধ্যাহ্নভোজন সেরে বেলা তিনটের সময় কানাডায় পাড়ি দেব। তাব পরে জানিনে। ২৭ মার্চ, ১৯২৯।

৩৫

ঘোর বর্ষা নেমেছে। এমনতরো বাদলে আমার মনের শিখরদেশে প্রায়ই সুরের মেঘ ঘনিয়ে আসে আর হৃদয়ের মধ্যে পেখম-মেলা ময়ূরের নাচও শুরু হয়। কিন্তু এবারে কী হোলো, এখনো আষাঢ়ের আহ্বানে আমার অন্তর সাড়া দিল না। হয়তো ছবি আঁকতে যদি বসি তাহলে কলম সরবে কিন্তু কাব্যভাবনার স্পর্শে তাকে চঞ্চল করতে পারছে না। এসে অবধিই কেমন আমার মনে হচ্ছে দেশের হাওয়ায় আমার নিমন্ত্রণ বন্ধ হয়ে গেছে, এখানে দরজা খোলা হোলো না। বুঝি সেই জন্যেই কী ভাবা, কী লেখা, কী কাজ করা কিছুই সহজ হয়ে উঠছে না, সামান্য কর্তব্যগুলোও মনকে ভারাক্রান্ত করছে। কিছুকাল পূর্বে এমন একদিন ছিল যখন আমার মনের নিভৃত দেশে একটি পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তখন সংসারের সমস্ত বিক্ষোভ থেকে সেইখানে প্রতিদিন যাতায়াত করবার একটি যেন পায়ে চলা পথ তৈরি হয়ে আমাকে আমার কাছ থেকে দূরে আনতে পেরেছে। তার পরে নানা কঠিন চিন্তা, নানা জটিল কাজ, নানা চিত্ত-বিক্ষেপ আমাকে কোথায় সরিয়ে নিয়ে গেছে—সে-পথের নাগাল পাচ্ছিনে। চিত্তের মধ্যে যেখানে গভীরতা সেখানে প্রতিষ্ঠালাভ করলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাড়ায় বিচলিত করতে পারে না। সেখানে "আমি"-নামক উৎপাতটা সাহস করে ঢুকতে চায় না। সেইখানকার বেদীর নিচে অচঞ্চল আসন পেতে বসবার জন্যে আজকাল আমাকে কেবলি তাগিদ করছে।

এই বেদনাও ভালো কিন্তু উদাসীনতা ভালো নয়। মনে করছি দেশের হাওয়ায় যে-সব ছোটো কথার ঝাঁক গুঞ্জন ক'রে বেড়ায় তাদের কাছ থেকে মনটাকে অবরুদ্ধ করব—চিরন্তনের নির্মল নিঃশব্দতার মাঝখানে ব'সে নিজের অন্তরতম সত্য বাণীকে নিজের কাছে উদ্ধার করে আনব। এই জায়গাতে সঙ্গ পাবার আশা নেই, একলা মনের প্রদীপ জ্বালতে হবে। একদা সঙ্গের অভাবটাকে অনুভব করিনি—আপনার মধ্যেই আপনার নিরন্তর একটা পূর্ণ দরবার জমেছিল। তার পরে কখন বুঝি শরীরের দুর্বলতার সঙ্গে আমার চিত্তলোকের আলোক কমে এল তখনি আপনার মধ্যে সঙ্গলাভ করবার শক্তি ম্লান হয়ে এসেছে, তখন থেকেই বাইরের সঙ্গকে আগ্রহের সঙ্গে ইচ্ছা করেছি। কিন্তু আমার সত্যকার স্বভাবটা বোধ হয় নৈঃসঙ্গিক—সঙ্গের প্রভাব তাকে বল দেয় না, তাকে অলস করে। এই আলস্যের মন্থরতায় নিজের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সে সমস্ত আচ্ছন্ন হয়ে যায়—আর তার থেকেই আসে ক্লান্তি। এ পর্যন্ত আমি যা কিছু শক্তি পেয়েছি, যা কিছু শিক্ষা পেয়েছি সমস্তই একলা নিজের মধ্যে। আমি চিরদিনের ইস্কুল-পালানো ছেলে—জনহীন আকাশের ডাক শুনে যখনি গড়িমসি করেছি, যখনি সামনে না এগিয়ে পিছনে তাকিয়েছি তখনি বিপদ ঘটেছে। সেই ডাক আজ কানে এসে পৌঁছেছে—প্রদোষের আবছায়ায় পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি। ইতি ২৮শে আষাঢ়, ১৩৩৬।

৩৬

প্ল্যাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে—আকাশের দিগন্ত ঘিরে মেঘ জমেছে, তার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর পড়েছে পরিপুষ্ট শ্যামল পৃথিবীর উপরে। আজ আর বৃষ্টি নেই—হুহু ক'রে হাওয়া দিচ্ছে, সামনে পেঁপে গাছের পাতা কাঁপছে, আরো দূরে উত্তরের মাঠে আমার পঞ্চবটীর নিম-গাছের ডালে ডালে চলছে আন্দোলন, আর তার পিছনে একা দাঁড়িয়ে আছে তালগাছ, তার মাথায় যেন বিস্তর বকুনি। বেলা এখন আড়াইটে। আমার আবার দৃশ্য পরিবর্তন হয়েছে—উদয়নের দোতলায় বসবার ঘরের পশ্চিম পাশে যে-নাবার ঘর ছিল, প্রোমোশন হয়ে সেটাই হয়েছে বসবার ঘর—তার পাশের ছাতটুকুতে নাবার ঘরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মস্ত একটা টেবিল পেতে বসেছি—পিছনে দক্ষিণ দিকের আকাশ, সামনে উত্তর দিকের। আষাঢ় মাসের স্নাননির্মল স্নিগ্ধ মধ্যাহ্নটি এই দুদিকের খোলা জানলা দিয়ে আমার এই নির্জন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে মনে ভাবছি কেন এমন দিনে বহু আগেকার দিনের একটা আভাস চিত্ত আকাশের দিক প্রান্তে অদৃশ্য কোন্ রাখালের মতো মূলতানে বাঁশি বাজায়। অর্থাৎ এ রকম দিন যেন বর্তমানের কোনো দায়কে স্বীকার করে না, এর কাছে জরুরী কিছুই নেই—যে-সব দিন একেবারে চলে গেছে এ তারি মতো বর্তমান ভবিষ্যতের বাঁধনছেঁড়া উদাসী—কারো কাছে কোনো জবাব-

দিহির ধার ধারে না। কিন্তু এই অতীত বস্তুত কোনোদিনই ছিল না—যা ছিল তা বর্তমান—তার প্রত্যেক মুহূর্ত বোঝা পিঠে সার বেঁধে চলেছিল তাব হিসেব দিতে হয়েছে। "গত কাল" ব'লে যে-অতীত সে আজই আছে, গতকাল সে ছিলই না। স্বপ্নরূপিণী সে, বর্তমানেব বাঁ পাশে ব'সে আছে—মধুর হয়ে উঠতে তার কোনো খরচ নেই। সেইজন্যেই বর্তমান কালের মধ্যে যখন কোনো একটা দিনের বিশুদ্ধ সুন্দর চেহারা দেখি তখন বলি সে অতীতকালের সাজ পরে এসেছে—প্রেয়সীকে বলি তুমি যেন আমার জন্মান্তরের জানা, অর্থাৎ এমন কালের জানা যে-কাল সকল কালের অতীত—যে-কালে স্বর্গ, যে-কালে সত্য যুগ—যে-কাল চির অনায়ত্ত। আজকের এই যে সোনায় পান্নায় ছায়ায় আলোয় বিজড়িত সুগভীর অবকাশের মধুতে ভরা মধ্যাহ্নটি সুদূর বিস্তৃত সবুজ মাঠের উপর বিহ্বল হয়ে পড়ে আছে এর অনুভূতির মধ্যে একটা বেদনা এই আছে-যে একে পাওয়া যায় না, ছোঁওয়া যায় না, সংগ্রহ করা যায় না—অর্থাৎ এ আছে তবুও নেই। সেইজন্যেই একে দূর অতীতের ভূমিকার মধ্যে দেখি। সেই অতীতের যা মাধুরী তা বিশুদ্ধ ; সেই অতীতে যা হারিয়েছে ব'লে নিঃশ্বাস ফেলি তার সঙ্গে এমন আরো অনেক হারিয়েছে যা সুন্দর নয় সুখকর নয়, কিন্তু সেগুলি অতীত নয়, তা বিনষ্ট —যা সুন্দর যা সুখের তাই চির অতীত—তা কোনোদিন মরে না, অথচ তার মধ্যে অস্তিত্বের কোনো ভার নেই। আজকের এই দিনটা সেই রকমের—এ আছে তবু নেই—

এই মধ্যাহ্নের উপর বিশ্বভারতীর কোনো দাবি নেই—এ গৌড়সারঙের আলাপ, যখন সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন হিসাবের খাতায় কোনো অঙ্ক রেখে যাবে না।

দূর হোক গে, তবু বিশ্বভারতী আছে, কাজের কথাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। অতএব একটা কথা বিশেষ ক'রে প্রশান্তকে বোলো শনিবারে যখন আসবে আমার সব গদ্য-লেখার ঝুড়িটা যেন নিয়ে আসে। আমার সমস্ত লেখা সম্বন্ধে শেষ কর্তব্য সেরে দিয়ে যাবার অপরাহ্নকাল এসেছে—বিলম্ব করলে আর আলো দেখতে পাওয়া যাবে না। ইতি ৩২ আষাঢ়, ১৩৩৬।

তোমার ছশো টাকার ছবিতে আমার বিনামূল্যের কবিতা লিখে দেব।

৩৭

আমার চিঠিগুলো চিঠি নয় এই তর্ক উঠেছে। আমি নিজে অনেকবার স্বীকার করেছি যে আমি চিঠি লিখতে পারিনে। এটা গর্ব কববার কথা নয়। আমরা যে জগতে বাস করি সেখানে কেবল-যে চিন্তা করবার কিংবা কল্পনা করবার বিষয় আছে তা নয়। সেখানকার অনেকটা অংশই ঘটনার ধারা,—অন্তত যেটা আমাদের চোখে পড়ে, সেটা একটা ব্যাপার; সে কেবল হচ্ছে চলছে আসছে যাচ্ছে; অস্তিত্বের সদর রাস্তা দিয়ে চলাচল, তার ভিতরকার সব আসল খবর আমাদের নজরে পড়ে না। মাঝে মাঝে যদি বা পড়ে, তাদের ধরে রাখিনে, পথ ছেড়ে দিই; সমস্ত ধরতে গেলে মনের বোঝা অসহ্য ভারি হয়ে উঠত। আমাদেব ঘরের ভিতর দিকটাতে সংসারের সংকীর্ণ দেয়াল-ঘেরা সীমানার মধ্যে আমাদের অনেক ভাবনার জিনিস, অনেক চেষ্টার বিষয় আছে তার ভার আমাদের বহন করতে হয়। কিন্তু যখন জানলায় এসে বসি তখন রাস্তায় দেখি চলাচলের চেহারা। ভালো করে যদি খোঁজ নিতে পারতুম তাহলে দেখতুম তার কোনো অংশই হালকা নয়,—ট্রাম হুহু ক'রে চলে গেল৹ কিন্তু তার পিছনে মস্ত একটা ট্রাম কম্পানি,—সমুদ্রের এপারে ওপারে তার হিসেব চালাচালি। মানুষটা ছাতা বগলে নিয়ে চলেছে, মোটরগাড়ি তার সর্বাঙ্গে কাদা ছিটিয়ে চলে গেল—তার সব কথাটা যদি চোখে পড়ত তাহলে দেখতুম বৃহৎ কাণ্ড—সুখে

দুঃখে বিজড়িত একটা বিপুল ইতিহাস। কিন্তু সমস্তই আমাদের চোখে হালকা হয়ে ঘটনাপ্রবাহ আকারে দেখা দিচ্ছে। অনেক মানুষ আছে যারা এই জানলার ধারে বসে যা দেখে তাতে একরকমের আনন্দ পায়। যারা ভালো চিঠি লেখে তারা মনের জানলার ধারে বসে লেখে—আলাপ করে যায়—তার কোনো ভার নেই, বেগও নেই, স্রোত আছে। এই সব চলতি ঘটনার পরে লেখকের বিশেষ অনুরাগ থাকা চাই, তাহলেই তার কথাগুলি পতঙ্গের মতো হালকা পাখা মেলে হাওয়ার উপর দিয়ে নেচে যায়। অত্যন্ত সহজ ব'লেই জিনিসটি সহজ নয়—ছাগলের পক্ষে একটুও সহজ নয় ফুলের থেকে মধু সংগ্রহ করা। ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস। সেই রস পাওয়া এবং দেওয়া অল্প লোকের শক্তিতেই আছে। কথা বলবার বিষয় নেই অথচ কথা বলবার রস আছে এমন ক্ষমতা কজন লোকের দেখা যায়। জলের স্রোত কেবল আপন গতির সংঘাতেই ধ্বনি জাগিয়ে তোলে, তার সেই সংঘাতের উপকরণ অতি সামান্য, তার নুড়ি, বালি, তার তটের বাঁকচোর, কিন্তু আসল জিনিসটা হচ্ছে তার ধারার চাঞ্চল্য। তেমনি যে-মানুষের মধ্যে প্রাণস্রোতের বেগ আছে সে মানুষ হাসে আলাপ করে, সে তার প্রাণের সহজ কল্লোল,—চারিদিকের যে-কোনো কিছুতেই তার মনটা একটুমাত্র ঠেকে তাতেই তার ধ্বনি ওঠে। এই অতিমাত্র অর্থভারহীন ধ্বনিতে মন খুশি হয়—গাছের মর্মরধ্বনির মতো প্রাণ-আন্দোলনের এই সহজ কলরব।

যদি না মনে করো আমি অহংকার করছি তাহলে সত্য কথা বলি, অল্প বয়সে আমি চিঠি লিখতে পারতুম, যা-তা নিয়ে। মনের সেই হালকা চাল অনেকদিন থেকে চলে গেছে—এখন মনের ভিতর দিকে তাকিয়ে বক্তব্য সংগ্রহ করে চলি। চিন্তা করতে করতে কথা কয়ে যাই—দাঁড় বেয়ে চলিনে, জাল ফেলে ধরি। উপরকার ঢেউএর সঙ্গে আমার কলমের গতির সামঞ্জস্য থাকে না। যাই হোক একে চিঠি বলে না। পৃথিবীতে চিঠি লেখায় যারা যশস্বী হয়েছে তাদের সংখ্যা অতি অল্প। যে দুচারজনের কথা মনে পড়ে তারা মেয়ে। আমি চিঠিরচনায় নিজের কীর্তি প্রচার করব এ আশা করিনে।

নীলমণি দ্বিতীয়বার এসে বললে চা তৈরি। চা বিলম্ব সয় না—পোস্টআপিসের পেয়াদাও তথৈবচ। অতএব ইতি ৪ শ্রাবণ, ১৩৩৬।

১৮

সকাল থেকেই আজ বাদলা। চারদিক ঝাপসা। ঘোর ঘনঘটা বললে যা বোঝায় তা নয়। মেঘদূত যেদিন লেখা হয়েছিল সেদিন পাহাড়ের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সেদিনকার নববর্ষায় আকাশে বাতাসে চলার কথাটাই ছিল বড়ো। দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছিল মেঘ, পুবে হাওয়া বয়েছিল "শ্যামজম্বুবনান্ত"কে দুলিয়ে দিয়ে, যক্ষনারী ব'লে উঠেছিল, মাগো, পাহাড় সুদ্ধ উড়িয়ে নিলে বুঝি। তাই মেঘদূতে যে-বিরহ সে ঘরে বসে থাকার বিরহ নয়, সে উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ। তাই তাতে দুঃখের ভার নেই বললেই হয়; এমন কি তাতে মুক্তির আনন্দ আছে। প্রথম বর্ষাধারায় যে পৃথিবীকে, উচ্ছল ঝরনায়, উদ্বেল নদীস্রোতে, মুখরিত বনবীথিকায় সর্বত্র জাগিয়ে তুলেছে সেই পৃথিবীর বিপুল জাগরণের সুরে লয়ে যক্ষের বেদনা মন্দ্রাক্রান্তা ছন্দে নৃত্য করতে করতে চলেছে। মিলনের দিনে মনের সামনে এত বড়ো বিচিত্র পৃথিবীর ভূমিকা ছিল না—ছোটো তার বাসকক্ষ, নিভৃত—কিন্তু বিচ্ছেদ পেয়েছে ছাড়া নদীগিরি অরণ্য শ্রেণীর মধ্যে। মেঘদূতে তাই কান্না নেই, উল্লাস আছে। যাত্রা যখন শেষ হোলো, মন যখন কৈলাসে পৌঁছেছে, তখনি যেন সেখানকার নিশ্চল নিত্য ঐশ্বর্যের

মধ্যেই ব্যথার রূপ দেখা গেল—কেননা সেখানে কেবলি প্রতীক্ষা। এর মধ্যে একটা স্বতোবিরুদ্ধ তত্ত্ব দেখতে পাই। অপূর্ণ যাত্রা করে চলেছে পূর্ণের অভিমুখে—চলেছে ব'লেই তার বিচ্ছেদ নব নব পর্যায়ে গভীর একটা আনন্দ পায়—কিন্তু যে পরিপূর্ণ সে তো চলে না, সে চির যুগ প্রতীক্ষা করে থাকে—তার নিত্য পুষ্প, নিত্য দীপালোক, কিন্তু সে নিত্যই একা, সেই হচ্ছে যথার্থ বিরহী। সুর-বাঁধার মধ্যেও বীণায় সংগীতের উপলব্ধি পর্বে পর্বে শুরু হয়েছে, কিন্তু অগীত সংগীত অসীম অব্যক্তির মধ্যে অপেক্ষা করেই আছে। যে অভিসারিকা তারই জিৎ, কেননা আনন্দে সে কাঁটা মাড়িয়ে চলে। কিন্তু বৈষ্ণব এইখানে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলবে যাঁর জন্যে অভিসার তিনিও থেমে নেই, সমস্তক্ষণ বাঁশি বাজাচ্ছেন, প্রতীক্ষার বাঁশি—তাই অভিসারিণীর চলা আর বাঞ্ছিতের আহ্বান পদে পদেই মিলে যাচ্ছে—তাই নদী চলেছে যাত্রার সুরে, সমুদ্র দুলছে আহ্বানের ছন্দে—বিশ্বজোড়া বিচ্ছেদের আসর মিলনের গানে জমজমাট হয়ে উঠেছে,—অথচ পূর্ণ অপূর্ণের সে মিলন কোনো দিন বাস্তবের মধ্যে ঘটছে না, সে আছে ভাবের মধ্যে। বাস্তবের মধ্যে ঘটলে সৃষ্টি থাকত না—কেননা সৃষ্টির মর্মকথাই হচ্ছে চির অভিসার চির প্রতীক্ষার দ্বন্দ্ব। এভোলুশ্যন বলতে তাই বোঝায়। যাকগে, আমার বলবার কথা ছিল, বাদলার দিন মেঘদূতের দিন নয়—এ যে অচলতার দিন—মেঘ চলছে না, হাওয়া চলছে না, বৃষ্টি-যে চলছে তা মনে হয় না, ঘোমটার মতো দিনের মুখ

আবৃত করেছে। প্রহর চলছে না,বেলা কত হয়েছে বোঝা যায় না। সুবিধা এই যে চারদিকে বৃহৎ মাঠ, অবারিত আকাশ, প্রশস্ত অবকাশ। চঞ্চল কালের প্রবল রূপ দেখছিনে বটে কিন্তু অচঞ্চল দেশের বৃহৎ রূপ দেখা যাচ্ছে—শ্যামাকে দেখলুম না কিন্তু শিবের দর্শন মিলল। ইতি ৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৬।

৩৯

পুত্রসন্তান লাভ হোলে সে সংবাদ খুব উৎসাহ করে প্রচার করা হয়। গতকল্য আমার লেখনী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটককে জন্ম দিয়েছে—দশমাস তার গর্ভবাস হয়নি—বোধ করি দিন দশেকের বেশি সময় নেয়নি। "সর্বাঙ্গসুন্দর" বিশেষণটা প'ড়ে হয়তো তোমার ওষ্ঠাধর হাস্যকুটিল হয়ে উঠবে। ওর মধ্যে একটুখানি সাইকলজির খেলা আছে। বাক্যটা যখন মনের মধ্যে রচিত হয়েছিল তখন কথাটা ছিল "সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ", কিন্তু যখন লেখা হোলো তখন দেখি কথাটা বদলে গেছে। কেটে সংশোধন করা অসম্ভব ছিল না কিন্তু ভেবে দেখলুম যেটাকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করি সেইটেই লেখা হয়ে গেছে। বিনয়টাকে তখনি সদগুণ বলতে রাজি আছি যখন সেটা অসত্য নয়। তোমরা বলবে নিজের লেখা সম্বন্ধে সত্য নির্ণয় করা লেখকের পক্ষে সহজ নয়। সে কথা যদি বলো তাহলে কোনো লেখা সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে সত্যনির্ণয় কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। টেনিসনকে খুব ভালো বলেছিল একযুগে—অনতিপরবর্তী যুগে তাকে যথেষ্টপরিমাণ ভালো বলতে লোকে লজ্জিত হচ্ছে। আমি যেদিন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ প্রথম লিখেছিলেম সেদিন ওটা লিখে আনন্দে বিস্মিত হয়েছিলুম—আজ ওটাকে যদি কোনো নির্মলনলিনী দেবীর নামে চালিয়ে দিতে পারতুম কিছুমাত্র দুঃখিত হতুম না, এমন কি, অনেকখানিই আরাম পাওয়া যেত। এমন অবস্থায়, না

হয়, আজ যেটা ভালো লেগেছে আজই সেটাকে অসংকোচে ভাল বলাই গেল। এতো সত্যাগ্রহ নয়। নিজের লেখা খারাপ লাগতে যার বাধে না, এবং সেটাকে অকুণ্ঠিতভাষায় স্বীকার করতে যার বেদনা নেই, নিজের লেখার প্রশংসা করা তার পক্ষে অহংকার নয়। অতএব খুব জোরের সঙ্গেই বলব নাটকটা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। যারা শুনেছিল তাদের মধ্যে সকলেরই মত আমার সঙ্গে মিলেছিল, বলা বাহুল্য তাদের মধ্যে * * * * ছিল না। তুমি হয়তো বলবে তোমাকে কলকাতায় গিয়ে এটা শোনাতে হবে। কিন্তু এতটা শোনার উত্তেজনা তোমার ডাক্তার কখনোই ভালো বলবেন না—বিশেষত শেষ পর্যন্ত এতে উত্তেজনার উপকরণ যথেষ্ট আছে। অতএব অপেক্ষা করো, জ্বরের মাত্রা কমুক জোরের মাত্রা বাড়ুক, তার পরে ঢের সময় আছে।

ঠিক এইখানটাতে খুব একটা ঘুমের বেগ এসে পড়ল মাথার মধ্যে—হঠাৎ প্রবল বর্ষণে যেমন চারদিক থেকে ঘোলা জলের ধারা নেমে আসে সেইরকমটা। বুদ্ধিটা একেবারেই স্বচ্ছ রইল না। অনেক সময়ে তৎসত্ত্বেও যে-কাজটা হাতে নেওয়া গেছে সেটা আমি জোর করে সেরে ফেলি—টলমল করতে করতেই লেখা চলে—ক'ষে মদ খেয়ে নাচতে গেলে যেরকমটা হয়। আমার অনেক লেখার মাঝে মাঝে এইরকম ঘুমের প্রবাহ বয়ে গেছে—সেই সব জায়গার হাতের অক্ষর দেখলে সেটা ধরা পড়ে। কিন্তু জাহাজ যেমন কুয়াষার

ভিতর দিয়েও গম্যস্থানের দিকে এগোয় আমার লেখাও তেমনি কল একেবারে বন্ধ করে না। যাকগে। বিষয়টা ছিল আমার নতুন নাটক রচনা। রাজা ও রানীর রূপান্তরী-করণ। সেই নাম রইল ; সেই রূপ রইল না। বিশ্বভারতীর কর্মসচিবকে খাজনা দিতে হবে না। যদি সাবেক নামটার জন্যে ভাড়ার দাবি করেন সেটাকে বদলাতে কতক্ষণ। "সুমিত্রা" নামই ঠিক করেছি। প্রশান্ত মাঝে মাঝে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যেন আমি নেড়াছন্দে ব্ল্যাঙ্কভার্সে নাটক লিখি। আমি স্পষ্টই দেখলুম গদ্যে তার চেয়ে ঢের বেশি জোর পাওয়া যায়। পদ্য জিনিসটা সমুদ্রের মতো—তার যা বৈচিত্র্য তা প্রধানত তরঙ্গের—কিন্তু গদ্যটা স্থলদৃশ্য, তাতে নানা মেজাজের রূপ আনা যায়—অরণ্য পাহাড় মরুভূমি, সমতল, অসমতল, প্রান্তর কান্তার ইত্যাদি ইত্যাদি। জানা আছে পৃথিবীর জলময় রূপ আদিম যুগের—স্থলের আবির্ভাব হাল আমলের। সাহিত্যে পদ্যটাও প্রাচীন—গদ্য ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে—তাকে ব্যবহার করা অধিকার করা সহজ নয়, সে তার আপন বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না—নিজের শক্তি প্রয়োগ ক'রে তার উপর দিয়ে চলতে হয়—ক্ষমতা অনুসারে সেই চলার বৈচিত্র্য কত তার ঠিক নেই, ধীরে চলা, ছুটে চলা, লাফিয়ে চলা, নেচে চলা, মার্চ করে চলা—তার পরে না-চলারও কত আকার—কত রকমের শোওয়া বসা দাঁড়ানো। বস্তুত গদ্যরচনায় আত্মশক্তির সুতরাং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়তো ভাবিকালে সংগীতটাও বন্ধনহীন গদ্যের

গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে। কখনো কখনো গদ্যরচনায় সুরসংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ। মনে রাখা দরকার ভাষা এখন সাবালক হয়েছে, ছন্দের কোলে চড়ে বেড়াতে তার লজ্জা হবার কথা। ছন্দ বলতে বোঝাবে বাঁধা ছন্দ। ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৩৬।

৪০

আজ স্কুলে হলচালন উৎসব হবে। লাঙল ধরতে হবে আমাকে। বৈদিক মন্ত্রযোগে কাজটা করতে হবে; ব'লে এর অসম্মানের অনেকটা হ্রাস হবে। বহু হাজার বৎসর পূর্বে এমন একদিন ছিল যখন হাললাঙল কাঁধে ক'রে মানুষ মাটিকে জয় করতে বেরিয়েছিল, তখন হলধরকে দেবতা ব'লে দেখেছে, তার নাম দিয়েছে বলরাম। এর থেকে বুঝবে নিজের যন্ত্রধারী স্বরূপকে মানুষ কতখানি সম্মান করেছে, বিষ্ণুকে বলেছে চক্রধারী, কেননা এই চক্র হচ্ছে বস্তুজগতে মানুষের বিজয়রথের বাহন। মাটি থেকে মানুষ ফসল আদায় করেছে এটা তার বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে হাল লাঙলের উদ্ভাবন। এমন জন্তু আছে যে আপনার দাঁত দিয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ ক'রে খাদ্য উদ্ধার করে, মানুষের গৌরব হচ্ছে সে আপন দেহের উপর চূড়ান্ত নির্ভর করে না, তার নির্ভর যন্ত্র উদ্ভাবনী বুদ্ধির উপর। এরই সাহায্যে শারীর কর্মে একজন মানুষ হয়েছে বহু মানুষ। গৌরবে বহুবচন। আজ আমরা একটা মিথ্যে কথা প্রায় ব'লে থাকি dignity of labour অর্থাৎ শারীর শ্রমের সম্মান। অন্তরে অন্তরে মানুষ এটাকে আত্মাবমাননা ব'লেই জানে। আজ আমাদের উৎসবে আমরা হাল লাঙলের অভিবাদন যদি করে থাকি তবে সেটা আপন উদ্ভাবন কৌশলের আদিম প্রকাশ ব'লে। সেই-

খানে খতম করতে বলা মনুষ্যত্বকে অপমানিত করা। চরকাকে যদি চরম আশ্রয় বলি তাহলে চরকাই তার প্রতিবাদ করবে —আপন দেহশক্তির সহজ সীমাকে মানুষ মানে না এই কথাটা নিয়ে চরকা পৃথিবীতে এসেছে—সেই চরকার দোহাই দিয়েই কি মানুষের বুদ্ধিকে বেড়ার মধ্যে আটকাতে হবে। আজ দেখলুম একটা বাংলা কাগজ এই ব'লে আক্ষেপ করছে যে, বেহারের ইংরেজ মহাজন কলের লাঙলের সাহায্যে চাষ শুরু করেছে তাতে ক'রে আমাদের চাষীদের সর্বনাশ হবে। লেখকের মত এই-যে আমাদের চাষীদের আধপেটা খাওয়াবার জন্যে মানুষের বুদ্ধিশক্তিকে অনন্তকাল নিষ্ক্রিয় ক'রে রেখে দিতে হবে। লেখক এ কথা ভুলে গেছেন-যে চাষীরা বস্তুত মরছে নিজের জড়বুদ্ধির ও নিরুদ্যমের আক্রমণে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যাপারে আমি আর-আর অনেক প্রকারের আয়োজন করেছি—কিন্তু যে-শিক্ষার সাহায্যে মানুষ একান্ত দৈহিক শ্রমপরতার অসম্মান থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে তার আয়োজন করতে পারলুম না এই দুঃখ অনেক দিন থেকে আমাকে বাজছে। দেহের সীমা থেকে যে-বিজ্ঞান আমাদের মুক্তি দিচ্ছে আজ য়ুরোপীয় সভ্যতা তাকে বহন ক'রে এনেছে—একে নাম দেওয়া যাক বলরামদেবের সভ্যতা। তুমি জানো বলরামদেবের একটু মদ খাবারও অভ্যাস আছে, এই সভ্যতাতেও শক্তিমত্ততা নেই তা বলতে পারিনে, কিন্তু সেই ভয়ে শক্তিহীনতাকেই শ্রেয় গণ্য করতে হবে এমন মূঢ়তা আমাদের না হোক। শান্তিনিকেতনকে

কেউ কেউ মনে করে পৌরাণিক যুগের জিনিস, তপোবনের বল্কলে আগাগোড়া ঢাকা। হায় রে দুরদৃষ্ট, শান্তিনিকেতন যে কী সেটা কিছুতেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল না। যারা প্রাচীন-পন্থী তারা আমাদের ললাটে সনাতনের ছাপ না দেখে চটে যায়, যারা তরুণ, আমাদের মধ্যে পুরাতনের পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধা হারায়, কেউ আমাদের আমল দেয় না, কিছুই ক'রে উঠতে পারলুম না, টানাটানি ঘোচে না, মাথার পাগড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে পায়ের জুতোটা পর্যন্ত কোনোটা আঁট, কোনোটা ছেঁড়া, কোনোটা একেবারেই ফাঁক। কিছু যে করেছি দেশের লোক এ কথা মানে না, কিছু-যে করতে পারি আমার উপর এ ভরসাও রাখে না, অবশেষে এমন কথাও শুনতে হোলো যে আমার কবিতায় ছন্দোভঙ্গ হয়। এতদিন মনে এই আশা ছিল-যে, আর কিছুই না পারি অন্তত ছন্দ মেলাতে পারি এইটুকু বিশ্বাস আমার পরে দেশের লোকের আছে। যাবার বেলায় সেটুকুও ভাসিয়ে দিতে হোলো। "আমার জন্মভূমি" আমাকে গ্রহণ করেছেন নগ্নদেহে, বিদায় দেবেন নগ্ন সম্মানে। ইতি ২৫ শ্রাবণ, ১৩৩৬।

৪১

সেদিন একটা কোনো বাংলা কাগজে বঙ্কিমের গল্পের কথা পড়ছিলুম। দেখলুম লেখক প্রশংসা করেছেন বটে কিন্তু বেশ একটু জোর করে সুর চড়াতে হচ্ছে পাছে অন্যমনস্ক পাঠকের কানে গিয়ে না পৌঁছয়। মনে পড়ল যখন বঙ্গদর্শন প্রথম দেখা দিয়েছে, বিষবৃক্ষ মাসে মাসে খণ্ডশঃ বের হচ্ছে, ঘরে ঘরে দেশের মেয়েপুরুষ সকলের মধ্যে কী ঔৎসুক্য, রস-ভোগের কী নিবিড় আনন্দ। মনে করা সেদিন অসম্ভব ছিল যে এই আনন্দের বেগ কোনোদিন এতটা ক্ষয় হোতে পারে যাতে এর উৎকর্ষ প্রমাণ করতে জোর গলায় ওকালতির দরকার হবে। কিন্তু দেখতে দেখতে সেদিনও এল। এমন কি অপ্রকাশ্যে বঙ্কিমের যশ আজকাল অনেকেই হরণ করে থাকেন। আমি ছাড়া আমাদের দেশের আর কোনো খ্যাত লেখকের সম্বন্ধে প্রকাশ্যে এমন কাজ করতে কেউ সাহস করে না। মনে মনে ভাবলুম, ভালোমন্দ লাগার আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ শক্তির দ্বারা মানুষের ইতিহাসে যে মানস-সৃষ্টির উদ্যম চলেছে, সে মায়ার সৃষ্টি। বঙ্কিমকে যেদিন খুব ভালো লাগছিল সেদিন পাঠকসমাজে কতকগুলি মানস-উপাদান কিছু বা বেশি ছিল, কিছু ছিল না বা কম ছিল, সেগুলি বিশেষ আকারে বিশেষ পরিমাণে সম্মিলিত ও সজ্জিত ছিল এই কারণ বশতই তার সম্ভোগসুখরূপ ফলটা এত অত্যন্ত প্রবল হোতে পেরেছে।

ইতিমধ্যেই, ২০।২৫ বছব না যেতে যেতেই, প্রবহমান কালেব ধাক্কায় তাবা নড়ে চড়ে গেছে, সামনেব জিনিস পিছনে পডল, উপরের জিনিস নিচে পডল অমনি সেদিনকাব অত দীপ্তিমান অত বেগবান উপলব্ধিও আজ অবাস্তব হয়ে দাঁডাল, অন্তত অনেক লোকেব পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য হয়েছে সেদিনকাব ভালোলাগা কী কবে সম্ভবপব হোলো। আজকের পাঠক সগর্বস্মিত হাস্যে ভাবছে সেদিনকাব পাঠকদেব মন ছিল নেহাত কাঁচা, এইজন্যেই সেই কাচা ভিতেব উপব প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-বিচাব স্থাযী হোতে পাবে না। নিজেব মনেব একান্ত উপলব্ধিব মতো বাস্তব আমাদেব কাছে আব কিছুই নেই। চোখে যেটাকে যা দেখছি সেটা যে তাই না হোতেও পাবে এমন সন্দেহকে মনে স্থান দিলে বোধশক্তি সম্বন্ধে নাস্তিকতায় পৌঁছতে হয—এতে কাজ চলে না। ভাগ্যক্রমে আমাদেব দৈহিক চোখের বদল হয না অথবা বহুলক্ষ বৎসবে হয়ে থাকে—তাই আমাদের আজকেব দেখাব সঙ্গে কালকেব দেখাব গুরুতব বিবোধ নেই, এই কাবণে আমাদের দৃশ্যলোক ব'লে যে একটা সৃষ্টি আছে সেটাকে অন্তত সাধাবণ লোকে মাযা বলতে পাবে না। কিন্তু আমাদেব দৈহিক চোখের স্নাযু পেশি এবং তার উপকরণ যদি কেবলি নড়াচড়া কবত তাহলে এই দেখার জগৎ আকাশেব মেঘের মতো রূপান্তর ধরতে ধবতেই চলত। কিন্তু কালে কালে আমাদের মনের দৃষ্টির বদল চলছেই, আজ সেই দৃষ্টির যে সব উপকবণেব যোগে একটা বিশেষ অনুভূতি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে, এবং এত স্পষ্ট

হয়েছে ব'লেই এত নিত্যরূপে সে প্রতীত, কাল তাদের আগাগোড়া বদল হয় না বটে কিন্তু অনেকখানি এদিক-ওদিক হয়ে যায়, তখন বোঝা যায় না বিষবৃক্ষকে এত বেশি ভালো লেগেছিল কী ক'রে। একেই বলতে হয় মায়া। এই মায়ার উপরে দাঁড়িয়ে কত গালমন্দ তর্কবিতর্ক রক্তপাত। অথচ মানুষের মনের প্রকৃতিতে মোটামুটি অনেকখানি নিত্যতার বন্ধন যে নেই তা বলতে পারিনে, না থাকলে মানবসমাজ হোত প্রকাণ্ড একটা পাগলা গারদ। বস্তুজগতের মূলভূতের উপাদানসংস্থানে মোটের উপর একটা বন্ধন আছে সেইজন্যেই কার্বনটা কার্বন অক্সিজেনটা অক্সিজেন। কিন্তু বহুদীর্ঘ-কালের ভূমিকায় আদি সূর্য থেকে বর্তমান পৃথিবী পর্যন্ত সৃষ্টিসংঘটনের যে ব্যাপার চলছে, তাতে সেইসব মূলভূতের মধ্যেও টানা-ছেঁড়া ঘটেছে, সেটা ভেবে দেখতে গেলে দেখি সৃষ্টিটা অনাদিকালের ক্ষেত্রে অনন্ত মরীচিকার প্রবাহ। এত-দিন বিজ্ঞান ব'লে আসছিল সেই পরিবর্তনের মধ্যে একটা বাঁধা নিয়মের সুদৃঢ় ধ্রুবসূত্র আছে। আজ বলছে সে-কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়, থেকে থেকে অঘটন ঘটে, দুই-দুইয়ে পাঁচও হয় নিত্য এবং আকস্মিকের দ্বন্দ্ব সমাসে। বস্তুজগতের তত্ত্বালোচনা আমার কলমে শোভা পায় না, বলছিলুম ভাব-জগতের কথা, বিশেষভাবে সাহিত্যকে নিয়ে। এই জগতে নিন্দা প্রশংসার নিত্যতার কথা কে বলতে পারে। সমা-লোচকেরা দৈবজ্ঞের সাজ পরে গণনা করে কুষ্ঠি তৈরি করছেন —তখনকার মতো সে কুষ্ঠি দাম দিয়ে কিনে লোকে মাথায়

ক'রে নিচ্ছে—কিন্তু হায়রে শেষকালে আয়ুর কোঠায় মিল পায় না, গুণাগুণ ফলাফলও তথৈবচ। তবুও মানবপ্রকৃতি একেবারে উন্মাদ নয়, মোটামুটি তার মধ্যে একটা হিসাবের ধারা পাওয়া যায়, যদিচ সে হিসাব সম্বন্ধে গণনার ভুল প্রতিদিন ঘটে। গতকল্যের গণনার ভুল আজকে দেখে যাঁরা খুব উচ্চকণ্ঠে হাসছেন আবার তাঁরাই দেখি খুব দম্ভসহকারে ছক কেটে গণনায় বসে গেছেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁদের গণনা অপ্রমাণ হয় ভাবীকালে, আশু তাঁরা নগদ বিদায় পান, লোকে যেটা শুনতে চায় সেইটেকে খুব বিজ্ঞের মতো বিছে ফলিয়ে বলবার শক্তি আছে তাঁদের, নিজের ও অন্যের ঈর্ষাবিদ্বেষকে তাঁরা উপস্থিত মতো খোরাক জুগিয়ে তাদের পালোয়ান ক'রে তোলেন, অবশেষে দুদিন বাদে তাঁদের কথা কারো মনেও থাকে না, সুতরাং তখন তাঁদের মিথ্যে ধরা পড়লেও জবাবদিহি করবার জন্য কোনো আসামীকে হাজির পাওয়া যায় না।—সন্দেহ হচ্ছে মনের মধ্যে অনেকদিনের অনেক ঝগড়া জমা হয়ে রয়েছে তোমার পত্রযোগে সেগুলোকে নিরাপদে ব্যক্ত করতে বসেছি। কিন্তু কিসেরই বা আক্ষেপ। খ্যাতি জিনিসটার পনরো আনাই মৃত্যুর পরবর্তী ভাবীকালের সম্পদ, সে সম্পদ খাঁটি কি মেকি তাতে কার কী আসে যায়, যিনি প্রশংসা পেতে চান তিনিও পান এমন কিছু যা কিছুই নয়, আর যিনি গাল দিয়ে খুশি হোতে চান তাঁরও সে খুশি শূন্যের উপর। মায়া! "অতএব বলি শুন ত্যজ দম্ভ তমোগুণ।" অতএব যা চারদিকে

রয়েছে তাকে সহজ মনে গ্রহণ করে হও খুশি।—অতএব যদিচ আজ ভাদ্রমাসের মধ্যাহ্নের অসহ্য গরম তবু সর্বত্রই শরৎকালের মাধুর্য অজস্র, এইটাই যদি পরিপূর্ণ মনে ভোগ করে নিতে পারি তবে সেটাকে ফাঁকি বলতে পারব না—যদিও এর পরবর্তী ফাল্গুনমাসের সৌন্দর্য অন্যজাতের তবুও সেই বসন্তের দোহাই পেড়ে এই শরতের দানে খুঁত ধরে তার থেকে বৃথা নিজেকে বঞ্চিত করা কেন। ইতি ১৮ ভাদ্র, ১৩৩৬।

৪২

ফুল ফোটে গাছের ডালে, সেই তার আশ্রয়। কিন্তু মানুষ তাকে আপনার মনে স্থান দেয় নাম দিয়ে। আমাদের দেশে অনেক ফুল আছে যারা গাছে ফোটে, মানুষ তাদের মনের মধ্যে স্বীকার করেনি। ফুলেব প্রতি এমন উপেক্ষা আর কোনো দেশেই দেখা যায় না। হয়তো বা নাম আছে কিন্তু সে নাম অখ্যাত। গুটিকয়েক ফুল নামজাদা হয়েছে কেবল গন্ধের জোরে—অর্থাৎ উদাসীন তাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করলেও তারা এগিয়ে এসে গন্ধের দ্বারা স্বয়ং জানান দেয়। আমাদের সাহিত্যে তাদেরই বাঁধা নিমন্ত্রণ। তাদেরও অনেক-গুলির নামই জানি, পরিচয় নেই, পরিচয়ের চেষ্টাও নেই। কাব্যের নামমালায় রোজই বারবার প'ড়ে আসছি যূথী জাতি সেঁউতি। ছন্দ মিললেই খুশি থাকি, কিন্তু কোন্ ফুল জাতি, কোন্ ফুল সেঁউতি সে-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবারও উৎসাহ নেই। জাতি বলে চামেলিকে, অনেক চেষ্টায় এই খবর পেয়েছি, কিন্তু সেঁউতি কাকে বলে আজ পর্যন্ত অনেক প্রশ্ন ক'রে উত্তর পাইনি। শান্তিনিকেতনে একটি গাছ আছে তাকে কেউ কেউ পিয়াল বলে—কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে বিখ্যাত পিয়ালের পরিচয় কয়জনেরই বা আছে। অপরপক্ষে দেখো, নদীর সম্বন্ধে আমাদের মনে ঔদাস্য নেই, নিতান্ত ছোটো নদীও আমাদের

মনে প্রিয়নামের আসন পেয়েছে, কপোতাক্ষী, ময়ূরাক্ষী, ইচ্ছামতী—তাদের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের সম্বন্ধ। পূজার ফুল ছাড়া আর কোনো ফুলের সঙ্গে আমাদের অবশ্য প্রয়োজনের সম্বন্ধ নেই। ফ্যাশানের সম্বন্ধ আছে অচিরায়ু সীজ্‌ন্‌ ফ্লাউয়ারের সঙ্গে—মালীর হাতে তাদের শুশ্রূষার ভার—ফুলদানিতে যথারীতি তাদের গতায়াত। একেই বলে তামসিকতা, অর্থাৎ মেটীরিয়ালিজ্‌ম্‌—স্থূল প্রয়োজনের বাইরে চিত্তের অসাড়তা। এই নামহীন ফুলের দেশে কবির কী দুর্দশা ভেবে দেখো, ফুলের রাজ্যে নিতান্ত সংকীর্ণ তার লেখনীর সঞ্চরণ। পাখি সম্বন্ধেও ঐ কথা, কাক কোকিল পাপিয়া বৌ-কথা-কওকে অস্বীকার করবার উপায় নেই—কিন্তু কত সুন্দর পাখি আছে যার নাম অন্তত সাধারণে জানে না। ঐ প্রকৃতিগত ঔদাসীন্য আমাদের সকল পরাভবের মূলে—দেশের লোকের সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্যও এই স্বভাববশতই প্রবল। পরীক্ষা পাসের জন্যে ইতিহাস পাঠে উপেক্ষা করবার জো নেই—আমাদের স্বাদেশিকতা সেই পুঁথির ঝুলি দিয়ে তৈরি, দেশের লোকের পরে অনুরাগের ঔৎসুক্য দিয়ে নয়। আমাদের জগৎটা কত ছোটো ভেবে দেখো—তার থেকে কত জিনিসই বাদ পড়েছে। ইতি ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯।

৪৩

আমার জীবনে নিরন্তর ভিতরে ভিতরে একটি সাধনা ধরে রাখতে হয়েছে। সে-সাধনা হচ্ছে আবরণ মোচনের সাধনা, নিজেকে দূরে রাখবার সাধনা। আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা। স্থির হয়ে বসে এ-কথা প্রায়ই আমাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতে হয়, যে, যে-আমি প্রতিদিনের সুখ দুঃখে কর্মে চিন্তায় বিজড়িত, সে ঐ সংখ্যাহীন অনাত্মের নিরুদ্দেশ স্রোতে ভেসে যাওয়ার সামিল। তাকে দ্রষ্টারূপে স্বতন্ত্রভাবে দেখতে পারলেই ঠিক দেখা হয়—তার সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছিন্ন এক ক'রে জানাই মিথ্যা জানা। আমার পক্ষে এই উপলব্ধির অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন আছে ব'লেই আমি একে এত ক'রে ইচ্ছা করি। আমার মনের বাসা চৌমাথায়, আমার সব দরজাই খোলা, সব রকমের হাওয়া এসেই পৌঁছয়, সব জাতেরই আগন্তুক একেবারে অন্দরে ঢুকে পড়ে। মানুষের জীবনে অন্দর ব'লে একটা জায়গা আছে, সেইটে তার বেদনার জায়গা, সেইখানে তার অনুভূতি। এইজন্যেই এর মধ্যে কেবল অন্তরঙ্গের প্রবেশ। তাদেরই নিয়ে সুখদুঃখের লীলাই সংসারের লীলা। ঐ সীমার মধ্যে সবই সহ্য করতে হয়। কিন্তু আমার জীবনদেবতা আমাকে কবি করবেন স্থির করেছেন ব'লেই আমার অন্দরমহলকে অরক্ষিত রেখেছেন, আমার খিড়কির দরজা নেই, চারিদিকেই

সদর দরজা। সেইজন্যেই আমার অন্দরমহলে কেবল আহূত নয়, রবাহূত অনাহূতের আসা যাওয়া। আমার বেদনা যন্ত্রে সকল সপ্তকের সকল সুর বাজবার মতোই তার চড়িয়ে রাখা হয়েছে। সুর থামালে আমার নিজের কাজ চলে না। সংসারকে বেদনার অভিজ্ঞতাতেই আমাকে জানতে হবে—নইলে প্রকাশ করব কী। আমার তো বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের মতো জ্ঞানের ব্যাখ্যা নয়, আমার-যে প্রাণের প্রকাশ। কিন্তু একদিকে এই অনুভূতিতেই যেমন প্রকাশের প্রবর্তনা তেমনি আর একদিকে তাকে ছাড়িয়ে দূরে আসাও রচনার পক্ষে দরকার। কেননা দূরে না এলে সমগ্রকে দেখা যায় না, সুতরাং দেখানো যায় না। সংসারের সঙ্গে অত্যন্ত এক হয়ে গেলেই অন্ধতা জন্মায়, যাকে দেখতে হবে সেই জিনিসটাই দেখাকে অবরুদ্ধ করে। তা ছাড়া ছোটো হয়ে ওঠে বড়ো, এবং বড়ো হয়ে যায় লুপ্ত। সংসারে বড়োর সুবিধে এই যে, সে আপনার ভার আপনি বহন করে, কিন্তু ছোটোগুলো হয়ে ওঠে বোঝা। তারাই সব চেয়ে অনর্থক অথচ সব চেয়ে বেশি চাপ দেয়। তার প্রধান কারণ তাদের ভার অসত্যের ভার। দুঃস্বপ্ন যখন বুকের উপর চেপে বসে, প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, তবুও সেটা মায়া। যখন আমি-র গণ্ডী দিয়ে জীবনের পরিমণ্ডলটাকে ছোটো করি তখনি সেই ছোটো-র রাজ্যে ছোটোই বড়োর মুখোষ প'রে মনকে উত্তেজিত করে। যা সত্যই বড়ো, অর্থাৎ যা আমি-র পরিধি ছাপিয়ে যায়, তার সামনে যদি এদের ধরা যায় তাহলে তখনি এদের মিথ্যে আতিশয্য ঘুচে গিয়ে এরা

এতটুকু হয়ে যায়। তখন, যা কাঁদায়, তাকে দেখে হাসি পায়। এই কারণেই আমি-র বড়োটাকে আমার থেকে সরানোই জীবনের সব চেয়ে বড়ো সাধনা, তাহলেই আমাদের অস্তিত্বের সব চেয়ে বড়ো অপমানটাই লুপ্ত হয়। অস্তিত্বের অপমানটা হচ্ছে ছোটো খাঁচায় থাকা, সেটা পশুপাখিকেই শোভা পায়। এই আমি-র খাঁচার মধ্যে সব মারই হয় বেঁধে মার, সব বোঝাই হয়ে ওঠে অচল বোঝা। এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অন্তত এক পংক্তি দূরে সরিয়ে বসিয়ে রাখাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অত্যন্ত দরকার, নইলে নিজের দ্বারা নিজেকে পদে পদে লাঞ্ছিত হোতে হয়। মৃত্যুশোকের দ্বারা বৈরাগ্য আনে, সেই রকম বৈরাগ্যের মুক্তি একাধিকবার অনুভব করেছি, কিন্তু যথার্থ বৈরাগ্য আনে যা কিছু সত্য বড়ো তাকেই সত্য ক'রে উপলব্ধি করার দ্বারায়। আমার নিজের মধ্যেই বড়ো আছে, যে দ্রষ্টা, আমার নিজের মধ্যে ছোটো হচ্ছে, যে ভোক্তা। ঐ দুটোকে এক ক'রে ফেললে দৃষ্টির আনন্দ নষ্ট হয়, ভোগের আনন্দ দুষ্ট হয়। কাজ জিনিস-টাকে বাইরে থেকে ঠেলাগাড়ির মতো ঠেলতে থাকলেই সেটা চলে ভালো, কিন্তু ঠেলাগাড়িটাকে যদি কাঁধে নিয়ে চলি তবে গলদ্‌ঘর্ম ব্যাপার হয়ে ওঠে। বিশ্বভারতী ব'লে একটা কাজ নিয়েছি, এ কাজটা সহজ হয় যদি একে 'আমি-র ঘাড়ে না চাপাই, যদি আমি-র থেকে বিযুক্ত ক'রে রাখি। অবস্থাগতিকে কাজ সফলও হয় বিফলও হয় কিন্তু সেটা যদি আমি-কে স্পর্শ না করে তাহলেই সেই আমি-নির্মুক্ত কাজ নিজেরও মুক্তি

আনে, আমারও মুক্তি আনে। সব চেয়ে যিনি বড়ো তাঁরই কাছে আমাদের সব চেয়ে বড়ো প্রার্থনা এই—অসতো মা সদ্‌গময়। কেমন ক'রে এ প্রার্থনা সার্থক হবে। না, আমার মধ্যে তাঁর আবির্ভাব যদি পূর্ণ হয়। তাঁকে যদি আমার মধ্যে সত্য করে দেখি তবেই আমি-র উপদ্রব শান্ত হোতে পারে।

জানি না আমার এ চিঠি কবে পাবে। যদি জন্মদিনে পাও তো খুশি হব। যদি না-ও পাও তবে জন্মদিনকে আরো একটি দিন পর্যন্ত বাড়িয়ে নিলে বিশেষ ক্ষতি হবে না। যে সব কথা নিজের অন্তরতম তা সব সময়ে বলতে পারা যায় না, অথচ বলা চাই নিজেরই জন্যে। তাই তোমার জন্ম-দিনকে উপলক্ষ্য ক'রে এই চিঠি লিখলুম, কেননা প্রত্যেক জন্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে মুক্তির মন্ত্র, অন্ধকার থেকে জ্যোতির মধ্যে মুক্তি। ইতি ৬ কার্তিক, ১৩৩৬।

৪৪

প্রশান্ত তার চিঠিতে লিখেছে বুলার পেন্সিল দিয়ে যে-লেখাগুলো বেরোয় বিশেষ ক'রে তার পরীক্ষা আবশ্যক। আমার নিজের মনে হয় এ সব ব্যাপারে অতি নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। আমার আপন সম্বন্ধে যাকে ফ্যাকট্‌স্‌ বলা যায় তাই নিয়ে যদি তুমি পরীক্ষা করো তবে প্রমাণ হবে আমি রবীন্দ্রনাথ নই। যে-গান নিজে রচনা করেছি পরীক্ষা দিতে গেলে তার কথাও মনে পড়বে না তার সুরও নয়। একজন জিজ্ঞাসা করেছিল চন্দননগরের বাগানে যখন ছিলুম তখন আমার বয়স কত, আমাকে বলতে হয়েছিল, আমি জানিনে, বলা উচিত ছিল, প্রশান্ত জানে। আমি যখন দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছিলুম, সে দুবছর হোলো, না তিন বছর, না চার বছর নিঃসংশয়ে বলতে পারিনে। আমার মেজো মেয়ের মৃত্যু হয়েছিল কবে, মনে নেই—বেলার বিয়ে হয়েছিল কোন্‌ বছরে কে জানে। অথচ টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা কবার সময়ে তুমি যা নিয়ে আমার সম্বন্ধে নিঃসংশয় সেটা তোমার ধারণা মাত্র। তুমি জোর করে বলছ ঠিক আমার স্বর, আমার ভাষা, আমার ভঙ্গী, আর কেউ যদি বলে, না, তার পরে আর কথা নেই। কেননা তোমার মনে আমার ব্যক্তিত্বের যে একটা মোট ছবি আছে, অন্যের মনে

তা না থাকতে পারে কিংবা অন্যরকম থাকতে পারে। অথচ এই ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্যই সব চেয়ে সত্য সাক্ষ্য, কেননা এটাকে কেউ বানাতে পারে না। আমার জীবনের বিশেষ বিশেষ তথ্য আমার চেয়ে প্রশান্ত বেশি জানে, কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও আমার মোট ছবিটা সে নিজের মধ্যে ফোটাতে পারবে না। আত্মার চরম সত্য তথ্যে নয়, আত্মার আত্মকীয়তায়।

ইতিমধ্যে পশু বুলার হাতে একটা লেখা বেরিয়েছে তাতে নাম বেরোল না। বললে, নাম জিজ্ঞাসা কোরো না, তুমি মনে যা ভাবছ আমি তাই। তার পরে যেসব কথা বেরোল সে ভারি আশ্চর্য। তার সত্যতা আমি যেমন জানি আর দ্বিতীয় কেউ না। কোনো এক অবসরের সময় কপি করে তোমাকে পাঠাব। কিন্তু অবসর আর পাব কিনা জানিনে। অনেক কাজ। প্রশান্ত এখনো ওখানে আছে কিনা জানিনে। তাকে এই চিঠি দেখিয়ো। ইতি ১০ নবেম্বর, ১৯২৯।

৪৫

আমার কেমন মনে হয় আমি আবার যেন পৃথিবীর খুব কাছে এসেছি। যেমন কাছে ছিলুম ছেলেবেলায়। মন তখন আপন চিন্তায় জগৎ তৈরি করতে এত ব্যস্ত ছিল না—সেই জন্যে বাইরের সঙ্গে আমার যোগ অত্যন্ত সহজ ছিল। সেই সময় আমার অনুভব করবার শক্তি ছিল সজীব। তাই আমি ছিলুম আমার চারিদিকে—ঘরের লোকের যেমন ঘরের কোনো জায়গায় যাবার বাধা থাকে না, এই বাইরের পৃথিবীতে আমার যেন সেই রকম অধিকার ছিল। আমার কাছে ভাবের দাবি এবং চিন্তার দাবি দুইই খুব প্রবল। আমি ভালো করে চেয়ে দেখায় সুখ পাই, ভালো ক'রে ভেবে না দেখেও থাকতে পারিনে। যেমন আমার চেয়ে-দেখাকে কাজে লাগিয়েছি সাহিত্যে, তেমনি আমার ভেবে-দেখাকেও কাজে লাগিয়েছি নানা প্রতিষ্ঠানে। এমনি ক'রে অনেকদিন চলে আসছিল। কিন্তু চিন্তার শাসনটাই উঠছিল সব চেয়ে জবরদস্ত হয়ে—অন্তরে বাহিরে তার কর্মের তাগিদ নানা শাখাপ্রশাখায় আমার সমস্ত অবকাশ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছিল। জগতে সবাই অবকাশের অধিকার নিয়ে আসে না—অনেকের পক্ষেই অবকাশটা শূন্যতা—আমি কিন্তু শিশুকাল থেকেই বিধাতার

কাছ থেকে আমার সব চেয়ে বড়ো দান পেয়েছি এই অবকাশের দান। আর একবার এখান থেকে বিদায় নেবার আগে অবকাশের পশ্চিম দিগন্তে রঙের খেলা খেলিয়ে তার পরে অস্ত সমুদ্রে ডুব দিতে ইচ্ছে করে। খ্যাতির বোঝা ঘাড়ে চেপেছে সেটাকে শেষ পর্যন্ত নামাতে পারব না—তবু যতটা পারি আমার অভিমানটাকে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে তাতে আলপনা কেটে যাব এই ইচ্ছেটা প্রতিদিন দরজায় ধাক্কা মেরে যাচ্ছে—শীতের মধ্যাহ্নে নীলাভ সুদূরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি।

তুমি কেমন আছ তার খাপছাড়া খবর পাই। কোথায় কী ভাবে আছ তার ছবিটা আন্দাজ করা শক্ত। ইতি ২০ ভাদ্র।

৪৬

তোমাকে চিঠি লিখব লিখব করছি এমন সময় তোমার চিঠি পেলুম। বিশেষ ক'রে লেখবার বিষয় কিছু আছে তা নয়—কিন্তু যা লিখলেও হয়, না লিখলেও হয় কিছুতেই আসে যায় না সেটা হচ্ছে উড়ো ভাবনা, তাকে ধরা শক্ত। যাকে বলে খবর সে--

এই পর্যন্ত লিখেছি তার পরে অনেকদিন হোলো, সময় চাপা পড়ে গেল নানা আকার আয়তনের নানাপ্রকার কাজের তলায়। সেদিনকার উড়ো ভাবনা সেইদিনেই লীলা সাঙ্গ ক'রে বৈতরণী পেরিয়ে চলে গেছে। সেদিন ছিল শীতের দুপুরবেলাটা আমার জগতে সব চেয়ে বড়ো স্থান নিয়ে—পেয়ালা উপচিয়ে পড়ছিল—আমার মনটা যেন সমস্ত আকাশ জুড়ে ছিল, আর তার মধ্যে জমে উঠেছিল সোনার আলোর নেশা—এই মন, আকাশ আলো আর খোলা মাঠ নিয়ে সবসুদ্ধ ব্যাপারখানা যে কী তা তো স্পষ্ট ক'রে বলবার জো ছিল না। অস্পষ্ট ক'রেই বলতে বসেছিলুম এমন সময় কোনো একটা সুস্পষ্ট কর্তব্য কিংবা অকর্তব্য মনটাকে নিয়ে গেল সেই কলমের মুখ থেকে ছিনিয়ে। ঠিক সেই জায়গাটাতে ফিরে আসা আর ঘটল না। যেটাকে "সেই জায়গা" বলছি "সেই জায়গাটা" সুদ্ধ দৌড় মেরেছে।

সেদিন আমার এক বন্ধু এসেছিলেন যারা

আমার কুৎসা করছে তাদের সঙ্গে তাঁর যোগ নেই এই কথাটা জানিয়ে যেতে। অথচ আমার তরফেও কিছু কিছু ত্রুটি আছে এই আভাসও তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। আমার সহচরদের বাক্যে বা ব্যবহারে যত কিছু মূঢ়তা প্রকাশ পায়, আমার জীবনচরিতের অধ্যায়ে লোকে সেগুলো যোজনা ক'রে আমার নামের উপর কালিমা লেপন করে। যেমন ঝড়ের উপর মারীর উপর মানুষ রাগ করে না, তেমনি এই সমস্ত আঘাতকে স্বীকার ক'রে নিয়ে আমি যেন রাগ না করি, যেন শান্ত থাকি প্রতিদিনই নিজেকে এই কথাই বলছি এবং মনের ভিতর থেকে এর সায় পাচ্ছি। আজ সাতই পৌষ। সকালবেলাকার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। ভিতরকার গভীর কথাকে প্রকাশ করার দ্বারা যে একটা শান্তি আসে আজ সেই শান্তি আমাব মনের উপর বিরাজ করছে। ইতি ৭ই পৌষ, ১৩৩৬।

৪৭

শরীর অলস, মনটা মন্থর। শক্তির গোধূলি। কেদারায় বসে আছি তো বসেই আছি, একটুখানি উঠে টেবিলে বসে সামান্য কিছু একটা কাজ করব তাও কেবলি পিছিয়ে যাচ্ছে। রাত হয়ে যায়, বিছানায় শুতে যাব, তাতে গড়িমসি, সকাল হোলো রোদ উঠেছে, বিছানা ছেড়ে উঠব সেও তথৈবচ। কোনো বিশেষ অসুখ আছে তাও নয়, জীবনের স্রোতটা থমথমে। বাইরের দিকে চেয়ে আছি তো চেয়েই আছি, ঠিক যেন ঐ রোদ-পোহানো জাম গাছটার মতো। দুপুর বেলাকার আলোটা আমার মনের উপর ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানকার দিগন্তে সুদূর নীলাভ রেখা, আর সেখানকার ঝোপের মধ্যে কোথায় একটা ঘুঘু ডাকছে, প্রহর যাচ্ছে চলে। ঐ শূন্য মাঠের পর দিয়ে থেকে থেকে একটা ছিন্ন মেঘ যেমন তার ছায়া বুলিয়ে চলেছে, তেমনি কোন্ একটা দিশাহারা উড়ো বিষাদের ছায়া মনের উপর দিয়ে চলে যায়—মেঘেরই মতো খাপছাড়া—বাস্তব কিছুর সঙ্গেই জড়িত নয়।

এই পর্যন্ত কাল লিখেছি এমন সময় ডাক পড়ল। মেয়েরা ঋতুরঙ্গ অভিনয় করবে আজ সন্ধ্যেবেলায়। তাদের অভ্যাস করাতে হবে। ওরা অঙ্গভঙ্গিমার তানে রেখা দিয়ে গানের সুরের উপর নক্শা কাটতে থাকে। মনে মনে ভাবি এর অর্থটা

কী। আমাদের প্রতিদিনটা দাগ-ধরা, ছেঁড়াখোঁড়া, কাটা-কুটিতে ভরা, তার মধ্যে এর সংগতি কোথায়। যারা লোকহিত-ব্রতপরায়ণ সন্ন্যাসী তারা বলে বাস্তব সংসারে দুঃখ দৈন্য শ্রীহীনতার অন্ত নেই, তার মধ্যে এই বিলাসের অবতারণা কেন। তারা জানে "দরিদ্রনারায়ণ" তো নাচ শেখেন নি, তিনি নানা দায় নিয়ে কেবলি ছটফট ক'রে বেড়ান, তাতে ছন্দ নেই। এরা এই কথাটা ভুলে যায় যে দরিদ্র শিবের আনন্দ নাচে। প্রতিদিনের দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হোত তাহলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগত না, এটাকে পাগলামি বলতুম। কিন্তু ছন্দের এই সুসম্পূর্ণ রূপলীলাটি যখন দেখি তখন মন বলতে থাকে এই জিনিসটি অত্যন্ত সত্য —ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছন্নভাবে চারদিকে যা চোখে পড়তে থাকে তার চেয়ে অনেক গভীরভাবে নিবিড়ভাবে। পর্দাটার উপরেই প্রতিদিনের চলতি হাতের ছাপ পড়ছে, দাগ ধরছে, ধুলো লাগছে, পরিপূর্ণতার চেহারাটা কেবলি অপ্রমাণ হচ্ছে—একেই বলি বাস্তব। কিন্তু পর্দার আড়ালে আছে সত্য, তার ছন্দ ভাঙে না, সে অম্লান, সে অপরূপ। তাই যদি না হবে তবে গোলাপফুল ফুটে ওঠে কিসের থেকে, কোন্ গভীরে কোথায় বাজে সেই বাঁশি যার ধ্বনি শুনে মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে যুগে যুগে গান চলে এসেছে আর মনে হয়েছে মানুষের কলহ-কোলাহলের চেয়ে মানুষের এই গানেই চিরন্তনের লীলা। অঙ্গে অঙ্গে যখন নাচ দেখা দিল তখন ঐ ময়লা ছেঁড়া পর্দা-টার এক কোণা উঠে গেল—"দরিদ্র নারায়ণ"কে হঠাৎ দেখা

গেল বৈকুণ্ঠে, লক্ষ্মীর ডানপাশে। তাকেই অসত্য ব'লে উঠে চ'লে যাব, মন তো তাতে সায় দেয় না। দরিদ্র নারারায়ণকে বৈকুণ্ঠের সিংহাসনেই বসাতে হবে, তাঁকে লক্ষ্মীছাড়া ক'রে রাখব না। আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্রবেশ আর অন্নপূর্ণায় তাঁর ঐশ্বর্য, বিশ্বে এই ছুইয়ের মিলনেই সত্য। সাধুরা এই মিলনকে যখন স্বীকার করতে চান না তখন কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তখন শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দোহাই পেড়ে সেই যুগলকেই আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নান্দীতে আবাহন করব যাঁরা "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ"। যাঁদের মধ্যে অভাব ও অভাবের পূর্ণতার নিত্যলীলা।

আর ছুই একদিনের মধ্যেই আমাদের জাহাজের সঠিক খবর পেলে আমাদের গতিবিধির নিশ্চিত খবর তোমাকে জানাব। আজ আর সময় নেই। ইতি তারিখ ভুলেছি—ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০।

৪৮

তোমাকে চিঠি লিখছি কোপেনহেগেন থেকে, পড়েছি ঘূর্ণির মধ্যে। কোথাও একদণ্ড থামতে দিলে না। অপরিচিতের পরিচয় কুড়োতে কুড়োতে চলেছি কিন্তু সে পরিচয় সঞ্চয় ক'রে রাখবার মতো সময় নেই। তা ছাড়া আমার ভোলা মন, আমার স্মরণের ভাণ্ডারে তালা চাবি নেই—একটা কিছু যেই মজুদ হয়েছে অমনি আর একটা কিছু এসে তাকে সরিয়ে ফেলে। কিছু তলিয়ে যায়, কিছু দুমড়ে যায়; অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটাকে সম্পূর্ণ লোকসান ব'লে আক্ষেপ করব না, বর্জন করতে না পারলে অর্জন করা যায় না, জমাতে গেলে জমিয়ে বসতে হয়, নড়াচড়া বন্ধ। আমার মনোরথটাকে বহু কাল ধরে কেবলি চালিয়ে এসেছি, এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তায়—গারাজে বন্ধ করে রাখবার সময়ই জুটল না। সঞ্চয়শালার দ্বারের সামনে গদিয়ান হয়ে বসতে যদি পারতুম তাহলে নামের বদলে বস্তু পাওয়া যেত বিস্তর। সামান্য কথাটা ভেবে দেখো না, মনে রাখবার মতো বুদ্ধি যদি থাকত তাহলে অন্তত পরীক্ষা পাসের পালা শেষ পর্যন্ত চুকিয়ে সংসারটাকে সেলাম ঠুকে এবং সেলাম কুড়িয়ে বুক ফুলিয়ে চলে যেতে পারতুম। একটা কিছু বলতে যদি চাই তার রেফারেন্স দিতে পারিনে, পণ্ডিত সভায় বোকার

মতো কেবল নিজের বকুনি দিয়েই বিদ্যের অভাব চাপা দিয়ে রাখি। কাব্যালোচনা সভায় প্যারাফ্রেজ ও প্যারাল্যাল প্যাসেজ মাথায় জোটে না ব'লে কবিতা রচনা ক'রে নিজের মান রাখি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি পড়ে যাচ্ছ আর হাসছ মনে মনে এবং প্রকাশ্যে। বলছ এটা তো ফাঁকা বিনয়; অহংকারের বস্তা। উপায় নেই—সমাজনীতি অনুসারে সত্যের খাতিরে অন্যকে প্রশংসা করতে পারি নিজেকে নয়। আত্মস্তুতি মনে মনেই করতে হয় তাতে পাপ বাড়ে বই কমে না। আসল কথা, স্বদেশ থেকে বিদেশে এলেই আত্মগৌরব অত্যন্ত বেড়ে ওঠে। যার কপালে ঠাণ্ডা জলও জোটে না সে হঠাৎ পায় শ্যাম্পেন। তখন তোমাদের অধ্যাপক-মণ্ডলীকে ডাক দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, ওগো মাস্টারমশায়েরা, আমাকে তোমাদের ছাত্র ব'লে হঠাৎ ভ্রম কোরো না, আমি যে পেপারগুলো লিখেছি তাতে তোমাদের একজামিনেশন পেপার-এর মার্কা দিয়ো না, কেননা সেগুলো তোমাদের এখানকার অধ্যাপকেরা দাবি করেন। তুমি জানো আমি স্বভাবত বিনয়ী, স্বদেশী মাস্টাররা মেরে মেরে আমাকে অহংকারী ক'রে তুললে। এ জন্যে মনে মনে প্রায়ই লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু সত্যি কথা বলি তোমাকে, খ্যাতি সম্মান পেয়েছি প্রচুর, তবু মন ভারতসমুদ্রের পারের দিকে তাকিয়ে থাকে। শান্তিনিকেতন থেকে খুকু লিখেছে, "কাল খুব ঝমাঝম বৃষ্টি গেছে, আজ সকালে উঠেছে কাঁচা সোনার মতো রোদ"—ঐ কথা ক'টা যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিলে,

মন ধড়ফড় ক'রে উঠল, বললে, আচ্ছা, তাই সই, যাব সেই অধ্যাপকবর্গে, তারা যদি আমাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দেয় তবু তো খোলা জানলা দিয়ে কাঁচা সোনার মতো রোদ পড়বে আমার ললাটে, সেই হবে আমার বরমাল্য। ইতিমধ্যে ভানুসিংহের পত্রাবলী নতুন ছাপা হয়ে পড়ল আমার হাতে এসে। শান্তিনিকেতনের বর্ষার মেঘ ও শরতের রৌদ্রে পরিপূর্ণ সেই চিঠিগুলি। দূরদেশে এসে সেই চিঠিগুলি পড়ছি ব'লে সেগুলো এত পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গেলুম—কোথায় আছি। এত তফাৎ। এখানকার ভালো আর সেখানকার ভালোয় প্রভেদটা এখানকার সংগীত আর সেখানকার সংগীতের মতো। য়ুরোপের সংগীত প্রকাণ্ড এবং প্রবল এবং বিচিত্র, মানুষের বিজয়রথের উপর থেকে বেজে উঠছে। ধ্বনিটা দিগদিগন্তের বক্ষস্থল কাঁপিয়ে তুলছে। ব'লে উঠতেই হয়, বাহবা। কিন্তু আমাদের রাখালী বাঁশিতে যে-রাগিণী বাজছে, সে আমার একলার মনকে ডাক দেয় একলার দিকে, সেই পথ দিয়ে যে-পথে পড়েছে বাঁশবনের ছায়া, চলেছে জলভরা কলসী নিয়ে গ্রামের মেয়ে, ঘুঘু ডাকছে আমগাছের ডালে, আর দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মাঝিদের সারিগান—মন উতলা ক'রে দেয়, চোখটা ঝাপসা ক'রে দেয় একটুখানি অকারণ চোখের জলে। অত্যন্ত সাদাসিধে, সেইজন্যে অত্যন্ত সহজ মনের আঙিনায় এসে আঁচল পেতে বসে। আমার নিজের সেদিনকার চিঠি যেন আমার আজকের দিনকে লেখা। কিন্তু জবাব ফিরিয়ে দেবার জো নেই;

সেদিনকার ডাকঘর বন্ধ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিঠি বন্ধ করা যাক। সামনে আছে যাকে বলে এনগেজমেণ্ট আর আছে ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতি ৮ অগস্ট, ১৯৩০।

৪৯

বাংলাভাষায় একটা শব্দ প্রচলিত হয়েছে, "সাময়িক পত্র" কিন্তু পত্রপুটে সময়কে ধরবার এবং পাঠাবার উপায় নেই। জর্মনিতে যখন আমার ছবির আসর জমেছিল তার সংবাদ পৌঁছেছে কবে জানিনে—অথচ আজ তোমার চিঠিতে যখন জানলুম ছবির খবর তোমরা পাওনি তখন সেই খবরের সময়ও নিশ্চয় পেরিয়ে গেছে। এদিকে আজ আমার জর্মনির পালা সাঙ্গ হোলো, কাল যাব জেনিভায়। এ পত্র পাবার অনেক আগেই জানতে পেরেছ যে জর্মনিতে আমার ছবির আদর যথেষ্ট হয়েছে। বর্লিন ন্যাশনাল গ্যালারি থেকে আমার পাঁচখানা ছবি নিয়েছে। এই খবরটার দৌড় কতটা আশা করি তোমরা বোঝো। ইন্দ্রদেব যদি হঠাৎ তাঁর উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া পাঠিয়ে দিতেন আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যে তাহলে আমার নিজের ছবির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতুম। কিন্তু এ সব কথা আমার আলোচনা করবার উৎসাহ হয় না—কে জানে কেন। বোধ হয় আমার মনের ভিতরে একটা বৈরাগ্য আছে, আমাদের দেশের সঙ্গে আমার চিত্র-ভারতীর সম্বন্ধ নেই ব'লে মনে হয়। কবিতা যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর সঙ্গে তার ভাবের যোগ আপনি জেগে ওঠে। ছবি যখন আঁকি তখন রেখা বলো রং বলো কোনো বিশেষ

প্রদেশের পরিচয় নিয়ে আসে না। অতএব এ জিনিসটা যারা পছন্দ করে তাদেরই, আমি বাঙালি ব'লে এটা আপন হতেই বাঙালির জিনিস নয়। এইজন্যে স্বতই এই ছবিগুলিকে আমি পশ্চিমের হাতে দান করেছি। আমার দেশের লোক বোধ হয় একটা জিনিস জানতে পেরেছে যে আমি কোনো বিশেষ জাতের মানুষ নই; এইজন্যেই ভিতরে ভিতরে তারা আমার প্রতি বিমুখ, কটূক্তি করতে তাদের একটুও বাধে না। আমি যে শতকরা একশো হারে বাঙালি নই, আমি যে সমান পরিমাণে য়ুরোপেরও এই কথাটারই প্রমাণ হোক আমার ছবি দিয়ে।

অনেক পূর্বপরিচিত জায়গা দিয়ে ঘুরে এলুম, তেমনি করে বক্তৃতাও দিয়েছি। কিন্তু এই যাত্রায় আগের বারের চেয়ে জর্মনির অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে আমার প্রবেশাধিকার ঘটেছে। ওদের কাছাকাছি এসেছি। এদের মধ্যে যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বজাতীয়তা আছে তা নয়, য়ুরোপের অন্য সকল জাতের হাতের ঠেলা খেয়ে এরা ভিতরে ভিতরে খুব কঠোরভাবেই ন্যাশানালিস্ট হয়ে উঠেছে। অথচ আমার উপরে এদের একটা বিশেষ প্রীতি কেন আছে ঠিক ভেবে পাইনে। আর যাই হোক অসামান্য এদের শক্তি, প্রকাণ্ড এদের বুদ্ধি, তা ছাড়া সব জিনিসকে সমষ্টীকরণের ক্ষমতা এদের আশ্চর্য। আমার তো মনে হয় য়ুরোপের কোনো জাতেরই সকল বিষয়েই এত বেশি জোর নেই। জর্মনির বিভীষিকা ফ্রান্সের মনে কিছুতেই যে ঘুচতে চায় না তার মানে বুঝতে পারি।

এরা ভয়ংকর এক-রোখা। দারিদ্র্যের ঠেলা খেয়েই এদের শক্তি আরো যেন দুর্দম হয়ে উঠেছে।

বিশ্বজাতীয়তার উদ্যম সঙ্ঘীভূত হয়ে উঠেছে জেনিভায়। লীগ অফ নেশনে ঠিক সুর বাজেনি—হয়তো বাজবেও না—কিন্তু আপনা আপনিই এই শহর সমস্ত জগতের মহানগরী হয়ে উঠেছে। যাদের প্রকৃতি বিশ্বপ্রাণ তারা আপনা আপনি এখানে এসে মিলবে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের একটা মহাকল্যাণ-শক্তির উদ্বোধন ঘটছে ব'লে আমার বিশ্বাস। ইতি ১৮ আগস্ট, ১৯৩০।

———

৫০

যাই যাই করতে করতে এতদিন পরে যাবার সময় কাছে এল। প্রায় একবৎসর কাটবে। যতদিন য়ুরোপে ছিলুম লাগছিল ভালো। আমেরিকায় গিয়ে মনটা যেন চাপা পড়ল, শরীরেও খুব একটা ধাক্কা লেগেছিল। আমেরিকায় বাইরে ব'লে পদার্থটা বড়ো বেশি উগ্র এবং চঞ্চল, কিছুদিন নিরন্তর নাড়া খাওয়ার পরে ভারি একটা বৈরাগ্য আসে। আমি সেই অবস্থায় আছি, অন্তরের মধ্যে আশ্রয় পাবার জন্যে কিছুকাল থেকে একটা ব্যাকুলতা লেগে আছে। নানান কাণ্ডকারখানা নিয়ে চিত্ত আমার বহির্মুখ হয়ে পড়েছিল, নিজের সত্য যেখানে, সেখানকার তালা চাবিতে মরচে পড়ে আসছিল। এমন সময় আমেরিকায় এসে চোখে পড়ল মানুষ কতই অনাবশ্যক ব্যর্থতায় সমাজকে একঝোঁকা ক'রে তুলেছে, আবর্জনাকে ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে সাজিয়েছে, আর তারি পিছনে দিনরাত্রি নিযুক্ত হয়ে আছে, পৃথিবীর বুকের উপর কী অভ্রভেদী বোঝা চাপিয়েছে। এই সমস্ত জবড়জঙ্গের বিষম ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রাণ যখন অস্থির হয়ে ওঠে তখন ভিতরকার মানুষের চিরন্তনের দাবি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সন্ধ্যাবেলায় ধেনুকে গোষ্ঠে ফেরাবার মতো নিজের ছড়িয়ে-পড়া আপনাকে আপনার গভীরের মধ্যে প্রত্যাহরণ ক'রে

আমার জন্যে ডাক দিচ্ছি। হয়তো জীবনের অপরাহ্নের উপর প্রদোষের ছায়া নেমেছে, মনের যে শক্তি নিজের উদ্যমকে বাইরের নানা কাজে নানা দিকে চালান করে দিয়েছিল তার মেয়াদ শেষ হয়ে এল—দেউড়ির দ্বারী সদর দরজা বন্ধ করবে ব'লে ঘণ্টা দিয়েছে, অন্দরমহলে দীপ না জ্বাললে আর চলবে না।

অনেকদিন কিছু লিখিনি—লিখতে ইচ্ছেই করে না—তার মানে প্রকাশ করবার শক্তি পরিশিষ্টে এসেছে; তার তহবিলে বাড়তির অংশ নেই ব'লেই সহজেই সে বাইরের বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে—অথচ সেটা খারাপ লাগছে না—ভিতরে ফল যদি ধরে তবে ফুলের পাপড়ি ঝরলে লোকসান নেই।

আগামী ৯ই জানুয়ারিতে নার্কণ্ডা জাহাজে (P. & O.) যাত্রা করব মাসের শেষে পৌঁছব দেশে। ইতি ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩০।

৫১

যেটা আমার নিত্য কাজ এতদিন পরে দেখছি সেটাতে আমার মন বসছে না। মন চঞ্চল হয়েছে ব'লেই যে এটা ঘটল তা নয়, মন স্তব্ধ হয়েছে ব'লেই বাহিরের তাড়ায় সে আর আগের মতো সাড়া দিতে চায় না। ডুবো জাহাজ থেকে মাল তোলবার একটা ব্যবসা আছে, সেই কাজের ডুবারীর মতো অবকাশের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে নিজের সমস্ত ডুবে যাওয়া দামী দিনগুলিকে উদ্ধার করে আনবার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠছে। অন্য সব কাজের পক্ষে যে উদ্যম আবশ্যক তার তেজ বোধ করি ক্রমেই কমে এল তাই এই গোধূলির আলোয় নিজের অন্তরতর সঙ্গলাভ করবার জন্যে মনটা আজ আত্মনিবিষ্ট হয়ে আছে।

শরৎকালের মতো ভাবগতিক। মেঘও আছে স্তূপে স্তূপে, রৌদ্রও আছে খরতর, দুটোই একসঙ্গে। শ্রাবণ তেড়ে এসে এক একদিন নিজেকে সপ্রমাণ করবার চেষ্টা করে, খুব ঝমা-ঝম বৃষ্টি পড়ে, মাঠ ভেসে যায়, বড়ো বড়ো গাছগুলো তাদের অচল গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে মাতামাতি করতে থাকে। তার পরেই দেখি পালা শেষ হয়ে যায়, আকাশ কে যেন নিকিয়ে দিয়ে গেল, শূন্য আকাশটায় জাজিম বিছিয়ে দিয়ে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ এসে দখল জারি করে। চেয়ে চেয়ে দেখি, আর এক

একবার মনের মধ্যে এই কথাটা আসে, যে, এই রকম দেখে নেওয়াটা দুর্লভ।—ভিতর থেকে কে এই সব দেখিয়ে দিলে এই সত্তরটা বছর—কত চলতি মুহূর্তের খেয়ায় বোঝাই করা কত আশ্চর্যরকমের যোগাযোগ।

•তোমরা কি এবারকার হপ্তাশেষের রেলপথে এ অঞ্চলে আসছ। একটা জরুরি কাজে প্রশান্তকে ডেকেছিলুম। ইতি ১৮ শ্রাবণ, ১৩৩৮।

৫২

মেঘদূতের মন্দাক্রান্তাছন্দে বৃষ্টিবাদল হয়ে গেল কিছুদিন। বৈশাখের রৌদ্রকে কালো ভিজে ব্লটিং চাপা দিয়ে শুষে নিয়েছিল। দুদিন ফাঁক পড়তেই বৈশাখ আবার আকাশে বাগিয়ে বসেছিল তার আগুন রংএর চিত্রপটখানা, তার জ্বলন-লেপা তুলি নিয়ে। আজ আবার দেখি দিগন্তের প্রাঙ্গণে মেঘদূতের উঁকি ঝুঁকি কানাকানি। এ বছরটার গ্রীষ্মের আসরে দুইপক্ষে বোধ করি এই রকম ছড়াকাটাকাটি চলবে। তবে আর পাহাড় পর্বতের দিকে ছুটোছুটি করব কিসের প্রত্যাশায়।

ঠিক যে সময়ে বৃষ্টি আসন্ন এমন একটা লগ্ন দেখে যদি আসতে পারো তাহলে তাপ বা পরিতাপ বোধ করবে না। আগামী অমাবস্যার ডাক পড়েছে, চাঞ্চল্য তাই দেখছি আকাশে —শ্যামলের মজলিস জমবে বোধ হচ্ছে। দেখে রৌদ্রতপ্ত আঁখি জুড়িয়ে যাবে। আর এক দফায় পাঁচ পয়সার খরচ লিখলুম খাতায়। ইতি ৮ বৈশাখ, ১৩৩৯।

৫৩

গাছপালাগুলো দুলছে—হাওয়া দিয়েছে পশ্চিমের দিক থেকে। রোদ্দুরে সোনার রং ধরেছে। এই রংটাতে মন ভোলায়—অনির্দিষ্ট কোন্ সুদূরের জন্যে মন কেমন করে। মানুষের মন দুইবাসার পাখি, একটা কাছের বাসা, একটা দূরের। শরৎকালটা হচ্ছে দূরের কাল—আকাশের আবরণটা উঠে গেছে কিনা, আর যে আলোটা সমস্ত ভাবনাকে রাঙিয়ে তোলে, সেটা যেন দিগন্তপারের প্রাসাদবাতায়ন থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে আসছে, আর তারি সঙ্গে ভেসে আসছে একটি অশ্রুত ধ্বনির সানাইয়ে মূলতানের আলাপ। এখন বেলা তিনটে হবে—রথী বৌমা পুপে, এই ট্রেনে যাত্রা করছে দার্জিলিঙের উদ্দেশে। আজ ছুটি-পাওয়া ছেলেমেয়ের দলও চলল বাড়িমুখে। আজ অপরাহ্ণের আকাশে এই যানে-ওয়ালাদের স্রোতের টান ধরেছে—মনে হচ্ছে ঐ শিউলিগাছ-গুলোও উন্মনা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দুটো একটা চল্‌তি মেঘের দিকে তাকিয়ে। মনকে বোঝাচ্ছি, কর্তব্য আছে,—কিন্তু আজ এই দিগন্তব্যাপী ছুটির বেলায় কর্তব্যটা উজোনের নৌকো, গুণ টেনে হাঁপিয়ে মরতে হবে—প্রাণটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ছুটির ঘণ্টা বাজছে আমার বুকের মধ্যে, শিরায় শিরায় রব উঠছে দৌড় দৌড় দৌড়। কিন্তু হায়রে, আমার

বয়েস আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধেছে—স্থাবর শক্তিকে নড়াতে গেলে অনেক টানাটানির দরকার, ফস্ ক'রে কোমর বেঁধে বেরিয়ে পড়লেই হোলো না। তাই ডাঙার বটগাছের মতো মস্ত ছায়া মেলে তাকিয়ে দেখছি, ঢেউগুলো লাফ দিয়ে দিয়ে চলেছে রৌদ্রে ঝিল্‌মিল্ করতে করতে—তাদের সঙ্গে সুর মেলাতে চায় আমার অন্তরের মর্মরধ্বনি—কিন্তু তাতে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সুর লাগে। আমিও তো যানে-ওয়ালা, কিন্তু আমার যাত্রা একান্ত ডুবে যাওয়ার দিকে, সামনের পথে ছুটে যাওয়ার দিকে নয়। ছুটির এই চঞ্চলতা কাল পরশুর মধ্যেই শান্ত হয়ে যাবে, তখন মনের পালে উদাস হাওয়ার বেগ যাবে কমে, তখন কর্মহীন প্রহরগুলোর স্তব্ধতার মাঝখানে বসে ওই বিলিতি নিমের নিঃশব্দ বীথিকার দিকে চুপ করে চেয়ে থাকবার সময় আসবে।

অভিনয়ের খবর দিতে অনুরোধ করেছিলে তারি ভূমিকাটা লেখা হোলো। অভিনয়টা হয়ে চুকে গেছে এই খবরটাতেই মন আছে ভরে। ওস্তাদজি গান বন্ধ করলেন—এসরাজের তার দিলে আল্‌গা করে, বন্ধ রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জা সব খুলে ফেলেছে—ছেলেরা প্রায় কেউ নেই, কুকুরগুলো আসন্ন উপবাসের উদ্বেগ মনে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আসল খবরটা দিয়ে ফেলি। ভালোই হয়েছিল অভিনয়, দেখলে খুশি হোতে, মেয়েরা নাচেনি, নেচেছিল ছেলেরা, সেটা পীড়াজনক হয়নি।

বৌমা পুপে বিদায় নিয়ে গেল। হঠাৎ আজ লাল এসে পৌঁছেছে, তাই রথী আজ যেতে পারলে না—কাল যাবে ব'লে জনরব। তোমার ঘরে সঙ্গের অভাব নেই—মিস্ত্রিদের নিয়ে দিন ভরতি হয়ে আছে। কবে যাবে গিরিডিতে।

৩ অক্টোবর, ১৯৩২।

৫৪

মনে পড়ছে সেই শিলাইদহের কুঠি, তেতালার নিভৃত ঘরটি—আমের বোলের গন্ধ আসছে বাতাসে—পশ্চিমের মাঠ পেরিয়ে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে বালুচরের রেখা, আর গুণটানা মাস্তুল। দিনগুলো অবকাশে ভরা—সেই অবকাশের উপর প্রজাপতির ঝাঁকের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে রঙিন পাখাওয়ালা কত ভাবনা এবং কত বাণী। কর্মের দায়ও ছিল তারি সঙ্গে—আর হয়তো মনের গভীরে ছিল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, পরিচয়হীন বেদনা। সব নিয়ে ছিল যে আমার নিভৃত বিশ্ব সে আজ চলে গিয়েছে বহুদূরে। এই বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে ছিল আমার পরিণত যৌবন—কোনো ভারই তার কাছে ভার ছিল না—নদী যেমন আপন স্রোতের বেগেই আপনাকে সহজে নিয়ে চলে, সেও তেমনি আপনার ব্যক্ত অব্যক্ত সমস্ত কিছুকে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে চলেছিল—যে ভবিষ্যৎ ছিল অশেষের দিকে অভাবনীয়। এখন আমার ভবিষ্যৎ এসেছে সংকীর্ণ হয়ে। তার প্রধান কারণ যে লক্ষ্যগুলো এখন আমার দিনরাত্রির প্রয়াসগুলিকে অধিকার করেছে তারা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। তার মধ্যে অচরিতার্থ অসম্পূর্ণ আছে অনেক কিন্তু অপ্রত্যাশিত নেই। এইটেতেই বোঝা যায় যৌবন দেউলে হয়েছে, কেন না যৌবনের প্রধান সম্পদ হচ্ছে অকৃপণ ভাগ্যের অভা-

বনীয়তা। তখন সামনেকার যে অজানা ক্ষেত্রের ম্যাপ আঁকা বাকি ছিল, মাইলপোস্ট বসানো হয় নি সেখানে, সম্ভবপরতার ফর্দ তলায় এসে ঠেকেনি। আমার শিলাইদহের কুঠি পদ্মার চর সেখানকার দিগন্ত-বিস্তৃত ফসল খেত ও ছায়ানিভৃত গ্রাম ছিল সেই অভাবনীয়কে নিয়ে, যার মধ্যে আমার কল্পনার ডানা বাধা পায় নি। যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম কাজ আরম্ভ করেছিলাম তখন সেই কাজের মধ্যে অনেকখানিই ছিল অভাবনীয়, কর্তব্যের সীমা তখন সুনির্দিষ্ট হয়ে কঠিন হয়ে ওঠেনি, আমার ইচ্ছা আমার আশা আমার সাধনা তার মধ্যে আমার সৃষ্টির ভূমিকাকে অপ্রত্যাশিতের দিকে প্রসারিত ক'রে রেখেছিল—সেই ছিল আমার নবীনের লীলাভূমি—কাজে খেলায় প্রভেদ ছিল না। প্রবীণ এল বাইরে থেকে, এখানে কেজো লোকের কারখানাঘরের ছক কেটে দিলে, কর্তব্যের রূপ সুনির্দিষ্ট ক'রে দিলে, এখন সেইটের আদর্শকে নিয়ে ঢালাই পেটাই করা হোলো প্রোগ্রাম—ছাপারের ছাঁপানি শব্দ উঠছে, আর দমাদম চলছে হাতুড়িপেটা। যথা-নির্দিষ্টের শাসন আইনেকানুনে পাকা হোলো, এখানে অভাবনীয়কেই অবিশ্বাস ক'রে ঠেকিয়ে রাখা হয়। যে পথিকটা একদিন শিলাইদহ থেকে এখানকার প্রান্তরে শাল-বীথিচ্ছায়ায় আসন বিছিয়ে বসেছিল তাকে সরতে সরতে কতদূরে চলে যেতে হয়েছে তার আর উদ্দেশ মেলে না—সেই মানুষটার সমস্ত জায়গা জুড়ে বসেছে অত্যন্ত পাকা গাঁথুনির কাজ। মাঝখানে পড়ে শুকিয়ে এল কবির যৌবন, বৈশাখে

অজয় নদীর মতো। নইলে আমি শেষদিন পর্যন্তই বলতে পারতুম আমার পাকবে না চুল, মরব না বুড়ো হয়ে। জিৎ হোলো কেজো লোকের। এখন যে কর্মের পত্তন তার পরিমাপ চলে, তার সীমানা সুস্পষ্ট, অন্য বাজারের সঙ্গে তার বাজারদর খতিয়ে হিসাব মিলবে পাকা খাতায়। মন বলছে, "নিজবাসভূমে পরবাসী হোলে।" এর মধ্যে যেটুকু ফাঁকা আছে সে ঐ সামনে যেখানে রক্তকরবী ফোটে, সেদিকে তাকাই আর ভুলে যাই যে, পাঁচজনে মিলে আমাকে কারখানা-ঘরের মালিকগিরিতে চেপে বসিয়ে দিয়ে গেছে। ইতি ৮ই এপ্রেল, ১৯৩৫।

৫৫

ব্যালাটন ফ্যুরেডের ছবিটির উপরে কালের দূরত্বের ছায়া আছে। অনুভব করলুম তখনকার ঘাট থেকে পাড়ি দিয়ে যে পরপারের কাছে এসে পৌঁছেছি সেখান থেকে ঐ দিনকার দৃশ্য স্বপ্নের মতো দেখায়। এক জীবনের মধ্যেই কত জন্মান্তর ঘটে সেই কথাই ভাবি। সেদিনকার বাগান থেকে হয়তো ফুল সঙ্গে আনা যায় কিন্তু সেই বাগানের পথটা লুপ্ত। পরিবর্ত্যমান সময়ের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে চলতে হবেই, অতীতের সঙ্গে পদে পদে হিসেব চুকিয়ে না দিয়ে উপায় নেই। সেই হিসাবের পুরানো খাতাটা মাঝে মাঝে হাতে পড়ে কিন্তু পুরানো তহবিলটার উপর দাবি খাটে না। পিছন থেকে কেবলি ধাক্কা আসছে, চলো, চলো, নিজের রাস্তা নিজে রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না। চলেইছি, চলেইছি, পিছনের দিগন্তে পথচিহ্নগুলো একে একে ঝাপসা হয়ে আসছে।

রাজার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা-নৃত্যাভিনয়ের মহড়া সমানই চলছে। খুব ভালো লাগছে। আর সবই অস্পষ্ট অবাস্তব ঠেকতে পারে কিন্তু আর্ট জিনিসটাকে সত্য অত্যন্তই মানতে হয়। কেননা তার তো বয়স নেই—আমাদের প্রাত্যহিক সংসারের খাঁচায় তার বাস নয়, অমরাবতীর আকাশে চলে সে রঙিন পাখা মেলে, মনটা যতক্ষণ সওয়ার

হয়ে থাকে তার পিঠে, ততক্ষণ ভুলে থাকে আপন ধুলোর রাস্তায় ভ্রমণের ক্লান্ত ভাগ্যকে।

জিজ্ঞাসা করেছ কবে কলকাতায় যাব। হয়তো ৬ই ফেব্রুয়ারি অথবা তারি কাছাকাছি কোনোসময়ে। নিশ্চিত তারিখটা বলার অভ্যেস আমার কোনোকালে নেই, এ সম্বন্ধে স্পষ্ট খবর জানলেও সেটা অস্পষ্ট হয়ে আসে। চিঠিতে আন্দাজে আমি তারিখ বসিয়ে দিই—সেই আন্দাজের বহর অনেক সময়ে খুব মস্ত। অতএব ব'লে রাখলুম আমার চিঠিকে কখনো গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার কাজে লাগিয়ো না। ইতি বোধ করি ২১ জানুয়ারি, ১৯৩৬।

———

৫৬

তথাস্তু। চললুম। কলকাতায় এক আধদিন কাজ আছে —আরো বেশি কাজ আছে শান্তিনিকেতনে। দশ হাজার টাকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে অত্যন্ত বিচলিত হইনি। এ পর্যন্ত আমার কুষ্টিতে ব্যয়ের স্থানের চঞ্চলতা। আয়ের সংবাদ নিয়ে যাঁরা আনন্দ করবেন তাঁদের সঙ্গে আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। টাকাটাও পূর্বপ্রতিশ্রুত অতএব প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে নূতন পুলক-সঞ্চারের কারণ নেই। ইতিমধ্যে কা—মসুরি থেকে আমার দর্শনের জন্যে এসে দুদিন কাটিয়ে গেছেন। তাঁর দুঃখের দিনে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পেরেছিলুম, সে কথা ভুলতে পারেন নি —এইটেই আমার যথার্থ পুরস্কার। দৈব সুযোগে এমন কিছু দিতে পারা যায় প্রতিদান অক্ষয় হয়ে থাকে, শ্রদ্ধা যার ম্লান হয় না। যখন কোনো উপলক্ষে আবিষ্কার করা যায় যে আমার কিছু সম্পদ আছে যা বিশুদ্ধভাবে দানেরই জন্য, তখন নিজের সেই মূল্য উপলব্ধি করে কৃতজ্ঞ হই ভাগ্য-বিধাতার কাছে। অন্যকে দান করতে পারাই সব চেয়ে বড়ো দান নিজের প্রতি। হয়তো এই দানের ধারা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে কিছু কিছু প্রবাহিত হয়ে থাকবে—কিন্তু সেটা অত্যন্ত বেশি নৈর্ব্যক্তিক। প্রত্যক্ষ কৃতজ্ঞতার দীপ্তি তাতে অন্তরালে পড়ে, তার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে খ্যাতি নিন্দার

বিচার। তাতে আমার লোভ ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মানুষের বুদ্ধির যাচাইয়ের চেয়ে মানুষের হৃদয়ের অর্ঘ্য অনেক বেশি মূল্যবান। সেটাকেও যেন আত্মদানের সহজ পন্থা দিয়েই পাওয়া সম্ভব হয়—তার জমা ওয়াসিল বাকির খাতাটা যেন চিতাভস্মের পূর্বেই সম্পূর্ণ ভস্মসাৎ হোতে পারে এই কামনা করছি।—পর্শু যাব আমরা। বিদায়কালের দিনগুলি মধুর হয়ে উঠেছে। বসন্তকালের মতো আতপ্ত, শরৎকালের মতো নির্মল। নীল আকাশে বরফের পাহাড়গুলি অত্যন্ত একটি কোমল শুভ্রতা ও লাবণ্য বিস্তার করেছে। এর থেকে যে ভাষা প্রকাশ পায় কোনোমতেই তার উত্তর দিতে পারি নে। কত অল্পই বলা হয়েছে। সেই অকথিত বেদনা কি সঙ্গে থেকে যাবে। ইতি ২৭।৬।৩৭

———

৫৭

তুমি রেগে বসে আছ বরানগরে, আর আমি রেগে বসে আছি শান্তিনিকেতনে। মাঝখানে ৯৯ মাইলের ব্যবধান ব'লে কোনো অপঘাতের সম্ভাবনা নেই। তোমরা মেয়েরা আজকাল কাগজে প্রায় নিজেদেরই দয়ামায়াপ্রবণ চিত্তবৃত্তি এবং মাতৃধর্ম নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে ব্যস্ত আছ, তা না করে যদি অবসর মতো দুই একখানা দেড় পৃষ্ঠা আন্দাজ চিঠি লিখতে তাহলে রোগদুঃখসন্তপ্ত সংসারে অনেকখানি সান্ত্বনা দিতে পারতে। চার পয়সা দামের একখানা প্রশ্ন যে, শরীরটা আছে কেমন, তার সঙ্গে দুটো লাইন অত্যুক্তি জুড়ে দেওয়া যে, খবর না পেয়ে উৎকণ্ঠায় দিন যাপন করছি—এর মূল্য চার পয়সা ছাড়িয়ে কত সংখ্যায় গিয়ে পৌঁছয় তার সীমা নেই।—আমার বোলপুরযাত্রার প্রথম দিনকার খবরটা বিবৃতির যোগ্য। সেক্রেটরি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, রসুলপুর—বলতে বলতে দুই চক্ষু ভাবাবেশে মুদে এল। পৌঁছলুম রসুলপুরে, অপরাহ্নের রৌদ্রে বেনারসির সাড়ির আঁচলা জড়িয়ে দিয়েছে বনশ্রীর শ্যামলচিক্কন দেহ ঘিরে। এ কথা সত্য যে রেল-ডিঙোনো ঊর্ধ্ব সেতুর ঔদ্ধত্য নেই সেখানে। পদচালনা করে স্টেশন ঘর পর্যন্ত যেতে যেতে মনে হোলো বুক বিদীর্ণ হয়ে যাবে। শেষের দশ পা বাকি থাকতে পড়ে গেলুম অসমর্থ দেহে। এই প্রথম পতন—শেষ পতনে গিয়ে পৌঁছবার

উপক্রমণিকা। একটা চৌকিতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে, দেহমর্যাদানাশের দৃশ্যে হেসে উঠতে পারে, এমন রসিকা নারী তখন কেবলমাত্র উপস্থিত ছিলেন আমার ভাগ্যদেবী। এর থেকে বুঝতে পারবে শরীরের উপর অকুণ্ঠিত মনে নির্ভর করবার দিন আমার গেছে—বিশ্বাসঘাতক হঠাৎ একদিন বিশ্বাসঘাতকতা করবে ব'লে সন্দেহ হচ্ছে। করুণ হৃদয়ে উৎকণ্ঠা উৎপাদনের আনন্দ সম্ভোগ করবার ইচ্ছায় খবরটা বিস্তারিত করে জানালুম। আশা করি যথোচিত দুঃখ বোধ করবে—এই দুঃখ, রাগের তাপ নিবারণের বোলেস্বারার কাজ করতেও পারে।

বাষ্পভারমন্থর বাতাসের মধ্যে আবৃত হয়ে আছি—রাত্রে যখন সুখনিদ্রার প্রত্যাশা ত্যাগ করতে হয় তখন একাধিক সহস্র রজনীর আয়োজনের কথা স্মরণ করে মন লুব্ধ হয়—ঘন ঘন হাত পাখা সঞ্চালন করে দুরাশাটাকে উড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করি।—এঞ্জিন যায় বিগড়িয়ে, মনটা তার সঙ্গে যোগ দেয়।

তোমাদের বরানগরের নতুন বাসায় আমার স্থান সংকুলান হবে এ কথাটা মনে রাখলুম। স্থান হয় তো অবসর হয় না—সুযোগ বিদ্রূপ করতে থাকে—উপরের দিকে কল খুলে দেয়, ঘড়ার তলায় রেখে দেয় ছেঁদা। কোনো একসময়ে দেশ কালপাত্রের সামঞ্জস্য হবেই। অলমতি বিস্তরেণ। ইতি ৯ই জুলাই, ১৯৩৭।

৫৮

নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে আমি যেন সপ্তম শতাব্দীর একটা ভগ্নাবশেষ—অধিকাংশ মহলটাই কাজের বার হয়ে গেছে, কেবল একটা অংশে শেলাই করা চট আর কেরোসিনের টিনে মিলিয়ে একটা বাসা তৈরি করা আছে, উইয়ে কাটা প্যাক বাক্সের উপরে বসে আছি। বসে বসে চেয়ে আছি বাইরেব দিকে—গরমে ফলের গুটি-ঝরে-পড়া আম গাছ ছেয়ে গেছে নিবিড় কচি পাতায়; ফুলের অর্ঘ্য আকাশের দিকে তুলে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে পাতাহীন গোলক-চাঁপাব আঁকা বাঁকা ডালের গাছ, লাল কাঁকরের রাস্তার ধারে অশোক গাছ দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর প্রথম অশোকগুচ্ছ ধরিয়েছে ঐ কাঁকরেরই মতো ঘন লাল রঙের। আমার এই জীর্ণ দেহের জানলার ফাঁক দিয়ে এখনো মোকাবিলা চলেছে বাইরের জগতের সঙ্গে, কিন্তু মনে হচ্ছে ওর উপরে ক্রমে আড়াল করে আসছে একটা ঝুঁকে পড়া ভাঙা ছাত। অকস্মাৎ দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হোতে আরম্ভ করেছে। শেষ বয়সে মস্তিষ্ক যখন ক্লান্ত হবে তখন ছবি এঁকে দিন যাবে এই ভরসা করে ছিলুম কিন্তু সন্দেহ ধরিয়ে দিয়েছে। বাইরের সঙ্গে আনাগোনার রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আপন অন্তর্লোকে নির্জনবাসের একটা পালা আরম্ভ হবে,

হয়তো তাতে মৃত্যুর উপক্রমণিকার একটা অভিজ্ঞতা লাভ করব—হয়তো তারো একটা কোনো রকমের সার্থকতা আছে—আগাম কল্পনায় যে শূন্যতার আশঙ্কা করি সেটা হয়তো মিথ্যা। কিন্তু যেটা মনে করতে সকলের চেয়ে খারাপ লাগে সে হচ্ছে দেহযাত্রায় পরের উপর নির্ভরতা;—আশা করি এঞ্জিন একেবারে বিগড়বার পূর্বেই শেষ টর্মিনাসে এসে থামব; অসমাপ্ত পথের মাঝখানে ঠেলাগাড়ির জন্যে কুলি ডাকতে হবে না।

খুবই গরম। কিন্তু গরম নিয়ে নালিশ করতুম না যদি আমার চোখের দুর্বলতার জন্যে ঘর অন্ধকার করে থাকতে না হোত। জীবনে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নকে এই প্রথম দরজার বাইরে খেদিয়ে রেখেছি। ইতি ৩১।৩।৩৮

৫৯

নির্মল নীল আকাশ, কাঁচা সোনা-রঙের রোদ্দুর, পাতলা রেশমি চাদরে ঢাকা ছোটো পাহাড়গুলির উর্ধ্বে নগাধিরাজের তুষার-কিরীটি মহিমা, মহাদেবের ধ্যানোদ্দীপ্ত শুভ্র ললাট। আমাদের কাছের অধিত্যকার বনে বনে স্নিগ্ধ চিক্কণ পুঞ্জীভূত সবুজে লেগেছে পরশমণির স্পর্শ, পাতায় পাতায় জেগেছে সোনার রোমাঞ্চ, নীল নিস্তব্ধতার উপর পাখিদের মিশ্রিত কাকলী নীলাম্বরী কাপড়ের উপর জরির কাজের মতো ঝিলিমিলি করছে। এইমাত্র খেয়ে উঠলুম, একটা আম, গোটা-কতক লিচু, টোস্ট করা রুটি, পাহাড়ী গোষ্ঠের মাখনে আর পাহাড়ী মৌচাকের মধুতে লিপ্ত। এসে বসেছি মুক্তদ্বার ঘরে। প্রচুর আলোতে আমার মন গিয়েছে তলিয়ে, আমার উড়ো ভাবনা ঝাপসা বেগনি কুহেলিকায় অস্পষ্ট, কর্তব্যবুদ্ধিটা যেন নেশা করে ভোলানাথ হয়ে বসে আছে। ঈর্ষা হচ্ছে না? সেইজন্যেই লেখা। কালিম্পঙ, ১৪ই মে, শনিবার, ১৯৩৮।

৬০

গত কালকার চিঠির প্রান্তে তোমাকে যা লিখেছিলুম তার সংক্ষেপ মর্ম এই, আরামের চরম আরাম হচ্ছে অন্যের অনারাম উপলব্ধি করে। এই ধরণের একটা ইংরাজি বচন আছে, তাতে কবি বলেছেন দুঃখের চূড়ান্ত দুঃখ হচ্ছে সুখীতর দিনকে স্মরণ করা। পূর্ববাক্য আজ আমি চার পয়সা খরচ ক'রে শোধন করতে চাই—বলতে চাই আরামের পরম আরাম হচ্ছে অন্যকে সেই আরামের শরীক করতে ডাক দেওয়া, এর থেকে যা বোঝো তাই বুঝো। দেবতার সোনার রঙের মদের পাত্র ভোর থেকে উলটে পড়ে গেছে—মাতাল হয়ে উঠল গাছপালাগুলো, নীল আকাশের চোখে লেগেছে বিহ্বলতা, আর ক্ষীণ-কুয়াশায় আবছায়া করা পাহাড়গুলোর গদগদ ভাষা। একটা কথা ব'লে রাখি ধ্বনি প্রেরণ করি প্রতিধ্বনির প্রত্যাশায়, তা মনে কোরো না। বাচালতা যাদের স্বধর্ম তাদের বকুনি অহৈতুক আবেগে। বাইরে থেকে এর মজুরি সব সময় মেলে না, দরকারও নেই। ১লা কিংবা ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫।